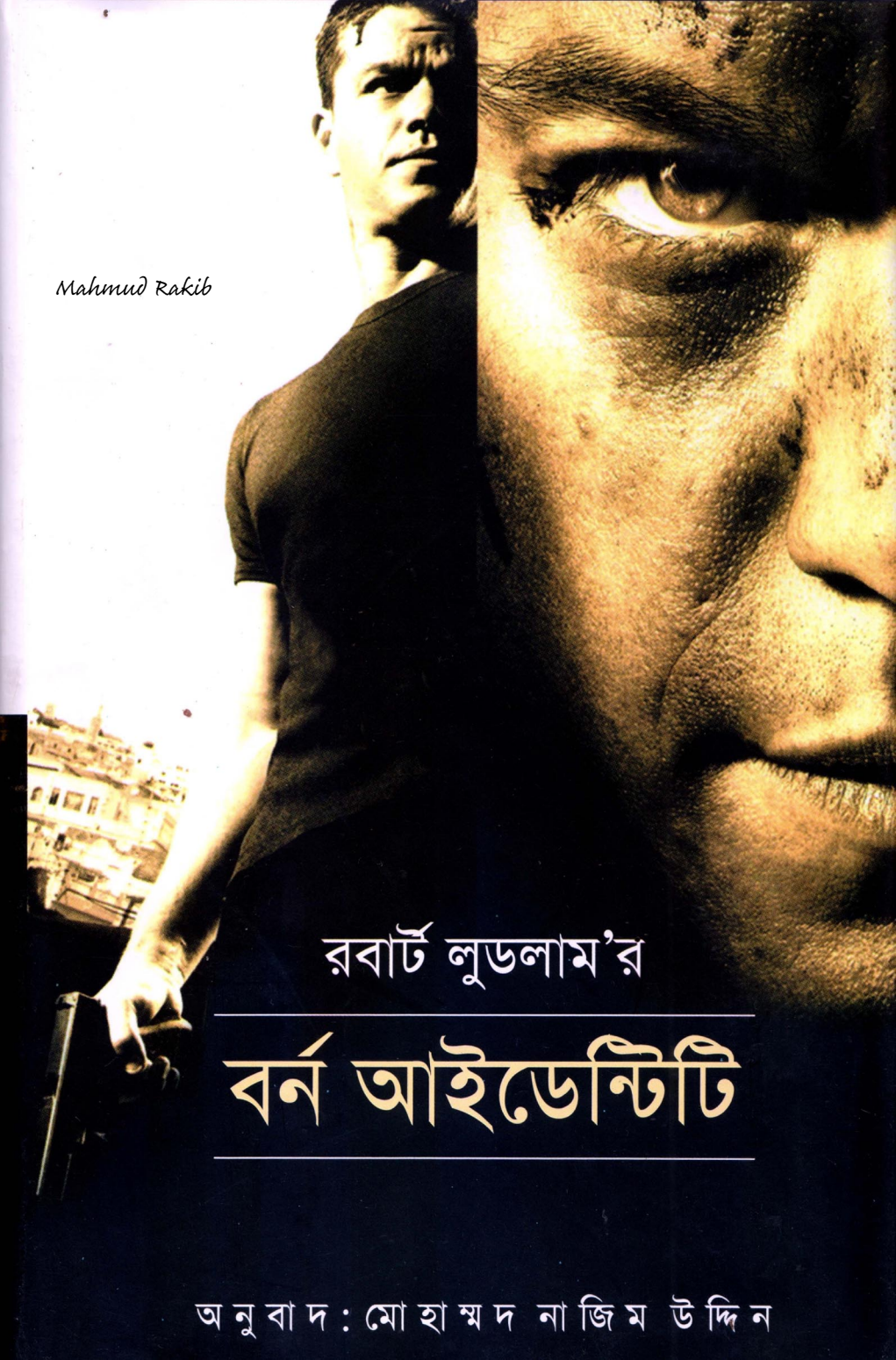




Mahmud Rakib

রবার্ট লুডলাম'র

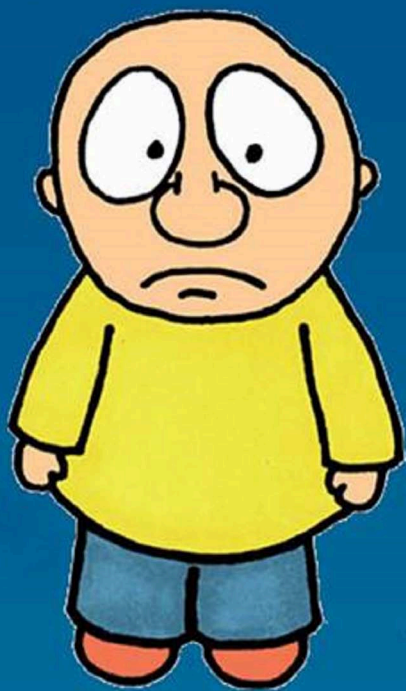
বর্ন আইডেন্টিটি

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!



Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্
গুরুবার, ১১ই জুলাই, ১৯৭৫
প্রথম পৃষ্ঠা

কার্লোস নামের এক ফেরারি সন্ত্রাসীর সঙ্গে কূটনীতিকদের সখ্যতা

প্যারিস, ১০ই জুলাই—ফ্রান্স আজ তিনজন কিউবান কূটনীতিককে বরখাস্ত করেছে কার্লোস নামের এক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীর সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যে। এই কার্লোসের রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন। সন্দেহভাজনের আসল নাম ইলিচ রামিরেজ সানচেজ, তাকে দু'জন ফরাসি কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট এবং ২৭শে জুন লাতিন কোয়ার্টারে এক লেবানিজ ইনফর্মারকে হত্যার অভিযোগে খোঁজা হচ্ছে। এই তিন খুনের অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ এখানে এই বৃটেনে, কার্লোসের একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের হদিস পেয়েছে। কার্লোসকে পাকড়াও করার মিশনে জার্মানিতে এক অভিযানে বিপুল পরিমাণের অস্ত্র উদ্ধার করা হলে পুলিশ জানতে পারে কার্লোসের সাথে জার্মানির একটি বড় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ইউরোপের অনেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নায়ক এই কার্লোস বলে জানা যায়।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস
সোমবার, জুলাই ৭, ১৯৭৫
সিভকেটেড ডিসপ্যাচ

খুনির জন্যে জাল ফেলা হয়েছে

লন্ডন, (এপি)—নারী এবং অস্ত্র, গ্রেনেড আর দামি পোশাক, মোটা মানিব্যাগ, রোমান্টিক সব জায়গায় বিমানের টিকেট আর আধডজন দেশের রাজধানীতে চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট। এ হলো জেট যুগের এক সেলিব্রিটি খুনির প্রতিকৃতি যাকে ধরার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক ম্যানহাট অপারেশন চালানো হচ্ছে।

প্যারিসে দু'জন ফরাসি ইন্টেলিজেন্স আর একজন লেবানিজ ইনফর্মার খুন হলে এই অপারেশনের সূচনা হয়। দুটো রাজধানীতে চার জন মেয়েকে কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে এই ঘটনার সূত্র ধরে। খুনি অবশ্য উধাও হয়ে গেছে—ফরাসি পুলিশের বিশ্বাস বর্তমানে সে লোবাননে আছে।

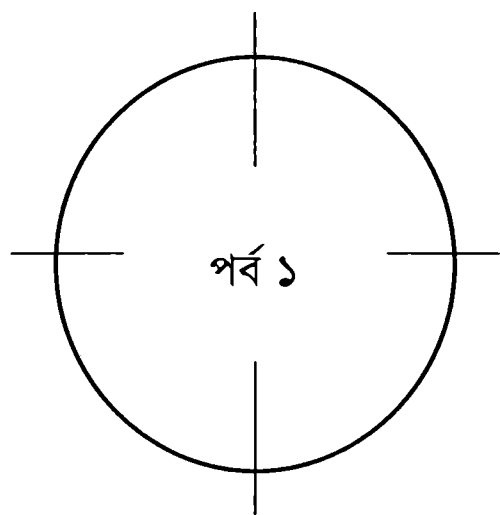
লন্ডনে বিগত কয়েক সপ্তাহে তার পরিচিতজনেরা তাকে একজন সুবেশী, সুশিক্ষিত, ফ্যাশন সচেতন, ধনী আর ভদ্রলোক বলেই উল্লেখ করেছে। কিন্তু তার সহযোগী নারী-পুরুষেরা এ বিশ্বের সবচাইতে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কার্লোস জাপানি রেড আর্মি, বিভিন্ন আরব সশস্ত্র সংগঠন, পশ্চিম জার্মানির বাদের মেইনহফ গ্যাং, কুইবেক লিবারেশন ফ্রন্ট, ফ্রান্স আর স্পেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং আইরিশ রিপাবলিক আর্মির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। এই খুনি যখন প্যারিস, হেগ, পশ্চিম বার্লিনে ভ্রমণ করে তখনই সেই সব জায়গায় বোমা বিস্ফোরিত হয়, বন্দুকবাজী হয়, ঘটে অপহরণের মতো ঘটনা।

প্যারিসের ২৭শে জুনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এক লেবানিজ সন্ত্রাসী কড়া জেরার মুখে অসাধারণ এক তথ্য দিয়েছে। সে তিন জনকে গুলি করে পালিয়ে গিয়েছিলো। পুলিশ তার অস্ত্র এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের 'মৃত্যু তালিকা' সংবলিত একটি নোটবুক খুঁজে পেয়েছে।

গতকাল লন্ডনে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে, পুলিশ ঐ তিনটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে এক ভেনেজুয়েলান কমিউনিস্ট উকিলের ছেলেকে খুঁজছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলেছে, “আমরা রিপোর্টটা অস্বীকার করছি না,” তবে তারা এও জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। কেবল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ যাকে খুঁজছে সে কারাকাসের ইলিচ রামিরেজ সানচেজ। প্যারিসে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার স্থান থেকে ফরাসি পুলিশ যে চারটা পাসপোর্ট পেয়েছে সেখানে তার নামে একটা পাসপোর্ট ছিলো।

পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, ইলিচ নামটি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নাম থেকে রাখা হয়েছে। এই ইলিচ মস্কোতে লেখাপড়া করেছে, রুশ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে সে।

কারাকাসে ভেনেজুয়েলান কমিউনিস্ট পার্টির এক মুখপাত্র বলেছে, ইলিচ ৭০ বছর বয়স্ক মার্ক্সিস্ট আইনজীবির ছেলে। কারাকাস থেকে ৪৫০ মাইল পশ্চিমে এক অঞ্চলে তার আবাস। তবে “তার বাবা এবং সে, কেউই আমাদের পার্টির সদস্য নয়।” সে আরো বলেছে বর্তমানে ইলিচ কোথায় আছে সেটা সে জানে না।



অধ্যায় ১

ট্রলারটা গভীর অন্ধকারে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত সাগরের মধ্যে যেনো ডুবেই গেলো, যেনো কোনো শ্বাসরোধ হওয়া প্রাণী পানিতে তলিয়ে যাবার সময় নিজেকে বাঁচানোর যত্নপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সাগরের ঢেউ পর্বতসম উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ছে ভয়ংকর গর্জনে। চারপাশে সর্বত্রই প্রাণহীন যন্ত্রণার শব্দ। কাঠের সাথে কাঠের সংঘর্ষ, দাঁড়ি মোচড়ানোর আওয়াজ। প্রাণীটা মরতে বসেছে।

দুটো বিস্ফোরণের শব্দ সাগরের বাতাস আর নৌযানের গর্জনকে বিদীর্ণ করলো। শব্দ দুটো এসেছে ট্রলারের মৃদু আলোর কেবিন থেকে। দরজা খুলে এক পাতে রেলিং আর অন্য হাতে নিজের পেটটা ধরে এক লোক এগিয়ে যাচ্ছে।

তার পেছন পেছন আরেকজন লোক, যার ভাবভঙ্গী খুবই সতর্ক আর হিংস্র। কোবনের দরজাটা বন্ধ করে হাতের অস্ত্রটা তুলে আবারো গুলি চালালো সে। পর পর কয়েকটা।

রেলিংয়ের লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে নিজের মাথাটা ধরে ফেললো। চতুর্থ গ্যাপেটটার আঘাতে একটু পেছনে টলে গেলো সে। ট্রলারটা আচমকা দুটো দৈত্যাকৃতির ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে গেলে আহত লোকটা একটু শূন্যে ভেসে উঠলো যেনো। সে বাম দিকে ঘুরে গেলেও অন্য হাতটা মাথা থেকে সরাতে পারলো না। ট্রলারটা একটু উপরে উঠে আবার নিচে আছড়ে পড়লে সাগরের পানিতে পুরো ডেকা ভেসে গেলো মুহূর্তে। এর ফলে কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা কেবিনের ভেতর হ্রমুড় করে উল্টে পড়ে গেলে পঞ্চম গুলিটা এমনভাবেই অন্ধ থেকে ছিটকে বের হয়ে গেলো। তীব্র এক চিৎকার দিয়ে কিছু একটা ধরার জন্যে হাত বাড়ালো গুলিবিদ্ধ লোকটি। রক্তের প্রবাহ আর সমুদ্রের পানির ছটায় সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এমন কিছু নেই যে সে ধরতে পারে। ট্রলারটা আবারো ভয়ংকরভাবে দূলে উঠলে ভারসাম্য হারিয়ে আহত লোকটি নিচের সুকঠিন গাঢ় অন্ধকার পানিতে পড়ে গেলো।

ট্রলার পেলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি তাকে জাপটে ধরছে। গিলে ফেলছে চারপাশ থেকে, নিচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। বৃত্তাকারের কুণ্ডলীর মধ্যে পড়ে গেছে সে। তারপরই একটু পানির উপর ভেসে উঠলো আবার—কেবলমাত্র এক দমে একটু নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পেলো সে। ঐ পর্যন্তই। আবারো তলিয়ে গেলো নিচে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে সে তীব্র উষ্ণতাও টের পাচ্ছে। তার মাথায় অদ্ভুত এক ভেঁজা উষ্ণতা তাকে গিলে ফেলা কঠিন শীতল পানিতেও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই উষ্ণতা এমন এক আগুন যে আগুনে কিছু পোড়ে না। কিন্তু চারপাশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার বুক, পেট, হাত-পা অদ্ভুত এক শীতলতায় অবশ হয়ে যাচ্ছে। সুকঠিন হিমশীতল সমুদ্রটা টের পাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে সে একটু ঘাবড়ে গেছে। পানির ঘূর্ণির বিপরীতে উদ্ভ্রান্তের মতো সে হাত-পা ছুড়তে শুরু করলো এবার। অনুভব করতে পারছে, ভাবতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে, আঁচ করতে পারছে সুতীব্র ভীতি আর বেঁচে থাকার সংগ্রামকেও। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, একধরনের প্রশান্তিও বোধ হচ্ছে তার। যেনো ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন এক দর্শক সে, যে কিনা এগুলো টের পেলেও এসবে মোটেও জড়িত নয়।

তারপর আরেক ধরনের ভীতি তার মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। উষ্ণতা, শীতলতা আর বিচ্ছিন্নতাকে ভেদ করে ঢুকে পড়ছে সেটা। কোনো প্রশান্তির মধ্যে আর নিজেকে রাখতে পারছে না সে! এখন নয়! যেকোনো মুহূর্তে এটা ঘটবে; তবে সে নিশ্চিতও নয় কি ঘটবে। কিন্তু এটা ঘটবেই।

উদ্ভ্রান্তের মতো পানিতে লাথি মারতে শুরু করলো সে। উপরের জলরাশির দেয়ালটাকে খামচে ধরার চেষ্টা করলো। তার বুক দাউ দাউ করে জ্বলছে। পানির উপরে উঠে এলে ঘনকালো ঢেউয়ের উপরে থাকার চেষ্টা করলো। উপরে ওঠো। উপরে ওঠো!

একটা দৈত্যাকৃতির ঢেউ এসে আবার তাকে গিলে ফেলতে গেলে সে ঢেউয়ের উপরেই ভেসে রইলো। তার চারপাশে সাগরের ফেনা আর ঘন অন্ধকার। ঘোরো! ঘোরো!

ঘটনাটি ঘটলো। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। সাগরের গর্জন আর বাতাসের তীব্রতা ছাপিয়ে শব্দটা কানে এলো তার। এই দৃশ্য আর শব্দ যেভাবেই হোক না কেন তার মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তির সূচনা ঘটালো। আকাশটা আগুনের বৃত্তে আলোকিত হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সেই আলোতে দেখা গেলো টুকরো টুকরো কিছু বস্তু ছটিকে পড়ছে চারপাশের অন্ধকারে।

সে জিতে গেছে। যাইহোক না কেন, সে জিতে গেছে।

আচমকা আবারো নিচের দিকে একটি গহ্বরের ভেতরে তলিয়ে গেলো সে। তার কাঁধে সবেগে ছুটে আসা পানির আঘাত টের পাচ্ছে। মাথার উষ্ণতা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে এখন...

তার বুক। তার বুকো তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে! তার মাথায় আঘাত লেগেছে—আঘাতটা খুবই তীব্র আর অসহ্য। আবারো এটা ঘটলো! আমাকে একা থাকতে দাও! আমাকে শান্তি দাও!

আবারো!

আবারো সে লাথি মারতে শুরু করলো, চেঁচা করলো খামুচে ধরার... যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ওটা টের পেলো। মোটা, তেলতেলে একটা বস্তু, যা কেবলমাত্র সমুদ্রের সঞ্চালনেই নড়ছে। সে বলতে পারবে না এটা কি, কিন্তু জিনিসটা আছে, আর এটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে, ধরতেও পারছে সে।

ওটা ধরো! ওটা তোমাকে প্রশান্তির দিকে বয়ে নিয়ে যাবে; গাঢ় অন্ধকারের নিশ্চিন্তায়... প্রশান্তির দিকে।

পূর্ব আকাশের কুয়াশা ভেদ ক'রে ভোরের সূর্যটা উদিত হলে ভূ-মধ্য সাগরের বুক চকচক ক'রে উঠলো। ছোট্ট মাছ ধরার ট্রলারের ক্যাপ্টেন, যার চোখ দুটো লাল টকটকে আর দু'হাতে রোদে পোড়ার চিহ্ন, বোটের সম্মুখভাগে ব'সে গোলোয়ে ব্যান্ডের সিগারেট খাচ্ছে। শান্ত সমুদ্রটা দেখে খুশি হয়ে খোলা হুইল হাউজের দিকে তাকালো সে; তার ছোটো ভাই সামনের দিকে চেয়ে আছে। অন্য একজন ক্রু একয়েক ফিট দূরে একটা জাল নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে আর কিছু একটা নিয়ে হাসাহাসি করছে। এটা খুবই ভালো কথা, গতরাতে তো হাসার মতো কিছু ছিলো না। ঝড়টা এসেছিলো কোথেকে? মার্সেই'র আবহাওয়া সংবাদে এ ব্যাপারে কিছুই বলা হয় নি। তারা যদি সেটা জানাতো তবে উপকূলের নিরাপদ আশ্রয়েই থাকতো তারা। সকালের মধ্যেই এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে দক্ষিণের লা সিয়েনসুর মে'তে যেতে চায় সে। ট্রলারটা মেরামত করতে হবে। আজকাল কম টাকায় কি কোনো জিনিস মেরামত করা যায়?

গতরাতে এরকম একটা মুহূর্তও এসেছিলো যে আরেকটুর জন্যে তার নিজের জীবনটাই খরচ হয়ে গিয়েছিলো।

“তুয়ো ফাতিগ, হেঁই, মৌয়া ফেরে?” তার ভাই চিৎকার ক'রে বলে দাঁত বের ক'রে হাসলো। “ভা তে কুশে মেইতেনা। লেইসে মোই ফেয়ার।”

“দাকোর্দ,” সে জবাবে বললো। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে চলে গেলো তাদের দিকে। “একটু ঘুমালে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না।”

হুইলে নিজের একজন ভাই থাকা খুবই ভালো একটি ব্যাপার। কোনো পারিবারিক বোটে পরিবারের একজন সদস্যেরই পাইলট হওয়া উচিত। তার যে ভাইটি খুব নম্র আর ভদ্রভাবে কথা বলে, শিক্ষিত লোকের মতো আচরণ করে সে তীব্রভাবেই এর বিরোধীতা করেছিলো। পাগল! একবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েই তার ভাইটি নিজের ট্রলার নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চায়। বন্ধ পাগল। গতরাতে যখন তার মাছধরার ট্রলারটি উল্টে যেতে বসেছিলো তখন তার ঐসব বইপুস্তকের জ্ঞান কি এমন ভালো কাজে এসেছিলো?

চোখ বন্ধ ক'রে ডেকের উপর ঢেউয়ের ছিটায় নিজের হাত দুটো ভিজিয়ে নিলো সে। হাতে দড়ির ঘষার কারণে যে ক্ষতচিহ্ন হয়েছে তার জন্যে সমুদ্রের নোনা জল বেশ উপকারী। ঝড়ের সময় দড়িগুলো আঁটকে রাখতে গিয়ে হাতে এরকম ফস্কা পড়েছে।

“দ্যাখো! ঐযে ওখানে!”

তার ভাই বললো। বোঝাই যাচ্ছে, পরিবারের এক সদস্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণে ঘুমের বারোটা বাজলো বুঝি।

“ওটা আবার কি?” সে পাল্টা চিৎকার ক'রে জানতে চাইলো।

“পানিতে একজন মানুষ! সে কিছু একটা ধরে রেখেছে! কোনো ধ্বংসাবশেষ মনে হয়। মনে হচ্ছে প্লাংকটন জাতীয় কিছু।”

ক্যাপ্টেন এখন নিজেই হুইল ধরে আছে। পানিতে ভাসমান শরীরটার দিকে ট্রলারটা ঘুরিয়ে নিয়ে ইঞ্জিনটা বন্ধ ক'রে গতি কমিয়ে ফেললো সে। দেখে মনে হচ্ছে একটু মৃদু আলোড়ন হলেই লোকটার হাতে ধরে থাকা কাঠের টুকরোটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তার হাত দুটো ধ্বংসবে সাদা হয়ে গেছে। শুধু হাত দুটোই পানির উপরে, বাকি শরীরের বেশিরভাগই পানির নিচে।

“দড়ি ফেলো!” ক্যাপ্টেন তার ভাই আর ক্রুম্যানকে চিৎকার ক'রে বললো।

“তার পায়ে দড়িটা আঁটকে দাও। আস্তে! ওটা তার কোমরের কাছে নিয়ে আসো। আস্তে আস্তে টানো এবার।”

“তার হাত তো কাঠটা ধরে রেখেছে, ছাড়ছে না!”

“আরেকটু কাছে গিয়ে টেনে তোলো। মনে হয় মরে গেছে।”

“না। সে বেঁচে আছে...তবে অবস্থা খুবই খারাপ। ঠোঁট দুটো নড়ছে। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তার চোখও নড়ছে না। মনে হয় না সে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে।”

“হাতটা ছেড়ে দিয়েছে!”

“টেনে তোলো তাকে। কাঁধটা ধরে টেনে ওঠাও। আস্তে!”

“হায় ঈশ্বর, তার মাথাটা দ্যাখো!” ক্রুম্যান আত্ননাদ ক'রে উঠলো।

“একেবারে ফেঁটে যাচ্ছে।”

“ঝড়ের সময় এই কাঠটার সাথে আঘাত লেগেই এমনটি হয়েছে,” ভাইটি বললো।

“না,” ক্যাপ্টেন ভিন্নমত পোষণ করলো। আঘাতটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। “মনে হয় ধারালো কিছু দিয়ে একেবারে নিখুঁতভাবে কাঁটা হয়েছে। বুলেটের আঘাত। তাকে গুলি করা হয়েছে।”

“তুমি এতোটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারো না।”

“একটা জায়গায় নিয়ে গেলেই সব পরিস্কার বোঝা যাবে,” ক্যাপ্টেন বললো। তার চোখ লোকটার শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। “আমরা পোর্ত নোয়ে যাবো, ওটাই সবচাইতে কাছাকাছি দ্বীপ। ওখানকার ওয়াটারফ্রন্টে একজন ডাক্তার আছে।”

“ঐ ইংরেজটা?”

“সে ওখানে চিকিৎসা করে।”

“যখন সে করতে পারে আর কি,” ক্যাপ্টেনের ভাইটি বললো। “প্রচুর মদ খায় যখন কেবল তখনই পারে। মানুষের চেয়ে পশুপাখির ব্যাপারেই তার সফলতা বেশি।”

“তাতে কিছুই যায় আসে না। ওখানে পৌছানোর আগেই এই লোকটা লাশ হয়ে যাবে। ঘটনাক্রমে যদি সে বেঁচেও যায় তবে আমি তার কাছ থেকে বাড়তি পেট্রল এবং যে পরিমাণ মাছ ধরতে পারি নি তার জন্যে টাকা চাইবো। ঔষুধের বাস্কেট নিয়ে আসো। তার মাথাটা বেঁধে দিতে হবে। এছাড়া আমরা আর কীইবা করতে পারি।”

“দ্যাখো!” ক্রুয়ান চিৎকার করে বললো। “তার চোখটা দ্যাখো।”

“চোখের আবার কি হয়েছে?” ভাইটি জানতে চাইলো।

“একটু আগেও গুগুলো একেবারে স্টিলের তারের মতো ধূসর ছিলো। এখন নীল হয়ে গেছে!”

“রোদ উঠে গেছে,” ক্যাপ্টেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো। “অথবা চোখে ভুল দেখেছো তুমি। মৃতের চোখে কোনো রঙ থাকে না।”

গাঙচিলের ডাকের মাঝে মাঝে মাছ ধরার ট্রলারগুলোর হুইসেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ দুয়ে মিলে জন্ম দিয়েছে ওয়াটারফ্রন্টের চিরায়ত কোলাহলের। পড়ন্ত বিকেল এখন। আগুনের গোলার মতো সূর্যটা একটু স্ত্রিয়মান হয়ে পশ্চিম দিকে হেলে রয়েছে। বাতাস থেমে আছে, একটা ভ্যাপসা গরম আবহাওয়া। জেটি আর বেড়াগুলোর ওপাশে পিচঢালা পথ আর কয়েকটা সাদা সাদা ঘরবাড়ি। এই দুয়ের মাঝখানে রয়েছে অযত্নে অবহেলায় বেড়ে ওঠা ঘাস। কয়েক যুগ আগে এখানকার বাসিন্দারা ভুলবশত মনে করেছিলো পোর্ত নোয়ে আরেকটা ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের ব্যস্ততম এলাকা হয়ে উঠবে। কিন্তু সেটা কখনই হয় নি।

প্রধান সড়কের সাথে সবগুলো বাড়িরই রাস্তা রয়েছে। কিন্তু সারি সারি বাড়িগুলোর মধ্যে শেষ বাড়িটার পথ যে অন্য বাড়িগুলোর তুলনায় একটু বেশি ঘোরানো প্যাচানো সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এই বাড়ির মালিক এক ইংরেজ ভদ্রলোক, আট বছর আগে এই পোর্ত নোয়ে’তে এসে আস্তানা গৈঁড়েছে এমন

একটি কারণে যা এখানকার কেউ বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না। সে একজন ডাক্তার আর এই ওয়াটারফ্রন্টে একজন ডাক্তারের দরকার আছে। হুক, সুঁচ আর ছুরি, কাঁচি খুব দ্রুতই জীবনধারণের পাথেয় হয়ে উঠলো, সেই সঙ্গে হয়ে উঠলো অযোগ্যতার একটি নিদর্শনও। ভালো কোনো দিনে লো দজুরের ভাবসাব দেখলে খারাপ ব'লে মনে হবে না। কিন্তু মদ আর হুইস্কি খাওয়া অবস্থায় দেখলে এ কথা বলা যাবে না। তার সেলাইয়ের কাজগুলোকে খুব একটা খারাপ বলা যায় না। তবে সত্যি কথা বলতে কি, পেটে বেশি মদ পড়লেই তার কাজ ভালো হয়।

তান্ত পিস্! তার চেয়ে ভালো কোনো ডাক্তার তো এখানে নেইও।

কিন্তু আজ না; আজকে কেউ এই পথটি ব্যবহার করছে না। আজ রোববার, আর এটা সবাই জানে, প্রতি শনিবারেই ডাক্তার সাহেব মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকেন। হাতের কাছে থাকা যেকোনো পতিতাকে নিয়ে রাতটা শেষ করেন তিনি। তবে এটাও ঠিক, বিগত কয়েকটি শনিবার ডাক্তার সাহেব তার এই রুটিনটা বদলে ফেলেছেন। তাকে গ্রামে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এইটুকু পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই বদলায় নি। স্কচের বোতল ডাক্তারের ঘরে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। তিনি নিজের ঘরেই থাকছেন আজকাল। লা সিওতাত থেকে মাছ ধরার নৌকাটা সেই অজ্ঞাত লোকটিকে, যাকে দেখলে মানুষের চেয়ে লাশ বলেই মনে হয়, নিয়ে আসার পর থেকেই তিনি ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।

ডাক্তার জিওফ্রে ওয়াশবার্ন একটু চম্কে জেগে উঠলেন। তার থুতনীটা কাঁধের হাড়ের উপর গিয়ে ঠেকলে নিজের মুখের গন্ধ নাকে প্রবেশ করেছিলো। এটা মোটেই সুখকর কিছু নয়। তিনি কয়েক পলক ফেলে একটু ধাতস্থ হয়ে শোবার ঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকালেন। তার রোগীর আরেকটা ঘ্যানঘ্যানানির জন্যেই কি তার এই ঘুমে ব্যাঘাত ঘটেছে? না, কোনো শব্দ তো হচ্ছে না। এমন কি বাইরের গাঙচিলগুলোও দয়া ক'রে শান্ত আছে। পোর্ট নোয়ে'তে আজ ছুটির দিন। মাছ ধরার কোনো ট্রলার আসবে না।

ওয়াশবার্ন তার চেয়ারের পাশে টেবিলে রাখা অর্ধেক খালি হওয়া মদের বোতল আর গ্লাসের দিকে তাকালেন। এটা উন্নতির একটা লক্ষণ। অন্য কোনো রোববার হলে দুটো বোতলই খালি হয়ে যেতো অনেক আগে। গত রাতের যন্ত্রণাটা স্কচের কারণে আরো বেশি জেঁকে ধরেছিলো তাকে। মনে মনে তিনি হাসলেন। আরেকবার কভেন্ট্রির বৃদ্ধ সিস্টার তার স্টাইপেন্ডের টাকায় এটা পাঠিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছেন। মহিলা খুবই ভালো। ঈশ্বর জানে, মহিলা যা পাঠিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাঠানোর ক্ষমতা তার রয়েছে। তবে মহিলা যা করেছেন তার জন্যে তিনি খুবই কৃতজ্ঞ। একদিন তিনি এটা বন্ধ ক'রে দেবেন, টাকা পাঠানোও বন্ধ হয়ে

যাবে। তারপর সস্তা মদের দ্বারস্থ হবেন তিনি, আর এটা চলতে থাকবে মৃত্যুর আগপর্যন্ত।

তিনি এটা প্রায় মেনেই নিয়েছিলেন...যদি তিন সপ্তাহ পাঁচ দিন আগে এই অর্ধমৃত আগন্তুকটা না আসতো। জেলেরা তাকে পানি থেকে টেনে তুলেছে, তবে লোকটা কে, সেই পরিচয় তারা বের করতে পারে নি। বের করার কোনো পারোয়াও তারা করে নি। তাদের কাজটা ছিলো মানবিক, এসবে জড়িত হওয়ার কোনো ইচ্ছে তাদের নেই। ঈশ্বরই সেটা ভালো বুঝবেন।

লোকটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু জেলেরা যা জানতে পারে নি, তা হলো বুলেটগুলো লোকটার শরীরের অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে। ঢুকে গেছে মনেরও গভীরে।

ডাক্তার সাহেব নিজের ভারি শরীরটা চেয়ার থেকে তুলে জানালার কাছে গিয়ে পোতাশয়ের দিকে তাকালেন। চোখ দুটো একটু সরিয়ে কুচকে ফেললেন সূর্যের আলোর কারণে। তারপর নিচের রাস্তার যেখান থেকে হৈহল্লাটা আসছে সেখানে ভালো ক'রে তাকালেন। ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি; এক জেলে পরিবার ছুটির দিনে বাইরে যাচ্ছে বেড়াতে। এরকম দৃশ্য অন্য কোথাও কি কেউ দেখতে পাবে? তারপরই তার মনে পড়ে গেলো লন্ডনে পর্যটকদের পরিবহনে ব্যবহৃত ঘোড়ার গাড়িগুলোর কথা। তুলনাটা করতেই তিনি উচ্চস্বরে হেসে ফেললেন। তবে তার হাসিটা ক্ষণস্থায়ী হলো, সেই জায়গায় যেটা প্রতিস্থাপিত হলো সেটা তিন সপ্তাহ আগেও অচিন্তনীয় ছিলো। তিনি ইংল্যান্ড দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব। এই আগন্তুকের জন্যে সেটা সম্ভব হতেও পারে।

যদি তার অনুমানটি ভুল না হয়ে থাকে তবে এটা যেকোনো একদিন ঘটবে, যেকোনো দিন, যেকোনো সময়। পায়ে, পেটে আর বুকের আঘাতটি খুবই মারাত্মক; এটা এজন্যে নয় যে, বুলেটগুলো শরীরের ভেতর রয়ে গেছে, বরং সেখানে সমুদ্রের পানি ঢুকে গিয়েছিলো। বুলেটগুলো বের করাটা তেমন বিপজ্জনক নয়, মাংস নরম আর পরিষ্কার হয়ে গেছে, ছুরি চালানোর জন্যে একেবারে যথার্থ অর্থেই প্রস্তুত বলা চলে। কোরানিয়াল আঘাতটি হলো আসল সমস্যা। দেখে মনে হচ্ছে এটা থালামাস আর হিপোক্যাম্পাস এলাকাটি ঘেষে চলে গেছে। আর এক মিলিমিলিটার এদিক ওদিক হলেই উভয় দিকের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতো। বুলেটগুলো বাধাগ্রস্ত হয় নি, তাই ওয়াশবার্ন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে একেবারে পানি স্পর্শ করলেন না। একজন মানুষের পক্ষে যতো বেশি পরিমাণ সম্ভব মদ আর রুটি খেলেন তারপর লন্ডনের ম্যাকক্লিন্স হাসপাতাল থেকে বরখাস্ত হবার পর সবচাইতে জটিল কাজটি করতে নেমে পড়লেন তিনি। আস্তে আস্তে ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার ক'রে তাতে চাকু চালিয়ে চামড়া ভেদ করলেন। জানেন একটু এদিক ওদিক হলেই রোগীর মৃত্যু হবে।

এই অজ্ঞাত পরিচয়ের রোগীটি কোনো কারণে মারা যাক সেটা তিনি চান না ।

কাজটা শেষ হবার পরও যখন লক্ষণগুলো আগের মতোই থাকলো তখন ডাঃ জিওফ্রে ওয়াশবার্ন তার রাসায়নিক এবং মানসিক ভূমিতে ফিরে গেলেন । মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রইলেন । তবে একেবারে বদ্ধ মাতাল হলেন না । কোথায় আছেন, কি করছেন, সেই জ্ঞানটা থাকলো । নিশ্চিতভাবেই এটা একটা উল্লিতি ।

সম্ভবত এখন থেকে যেকোনো দিন, যেকোনো সময় আগন্তুক হয়তো চোখ খুলে কোনো বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ আওড়াবে ।

এমন কি যেকোনো মুহূর্তেও সেটা হতে পারে ।

শব্দটাই আগে এলো । সেটা এমনভাবে ঘরে ভেসে বেড়ালো যেভাবে ভোরের সামুদ্রিক নির্মল বাতাস ঘরটাকে ঠাণ্ডা ক'রে দেয় ।

“ওখানে কে? এই ঘরে কে?”

ওয়াশবার্ন নিজের খাটে আস্তে ক'রে ধীরসূত্রে উঠে বসলেন, আচম্কা কোনো শব্দ বা চমকে যাবার মতো কিছু করলে রোগীর মানসিক অবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । এরকম সময় প্রথম কয়েক মিনিট অপারেশন করার মতোই নাজুক । তার নিজের ভেতরের ডাক্তার সত্তাটি খুব দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলো ।

“একজন বন্ধু,” তিনি নরম কণ্ঠে বললেন ।

“বন্ধু?”

“তুমি ইংরেজিতে কথা বলছো দেখছি । আমিও তাই ভেবেছিলাম । ধারণা করেছিলাম আমেরিকান কিংবা কানাডিয়ান হবে । তোমার দাঁতের যে ডাক্তারি অপারেশন আমি দেখেছি সেটা বৃটেন কিংবা প্যারিসে হওয়ার কথা নয় । এখন তোমার কেমন লাগছে?”

“বুঝতে পারছি না ।”

“একটু সময় লাগবে । তুমি কি পেট পরিস্কার করবে এখন?”

“কি?”

“একটা টিসুপেপার নিয়ে নাও, বুড়ো খোকা । এজন্যেই তো তোমার পাশে প্যান্টা রাখা আছে । সাদাটা তোমার বাম দিকে ।”

“কি বললেন?”

“খুবই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড । আমি তোমার ডাক্তার । আমার নাম জিওফ্রে ওয়াশবার্ন । তোমার নাম কি?”

“কি?”

“আমি বলছি, তোমার নাম কি?”

আগন্তুক একপাশের সাদা দেয়ালটার দিকে তাকালো। রোদ এসে পড়েছে সেখানে। এরপর সে ফিরে তাকালে তার নীল চোখ জোড়া ডাক্তারের দিকে সরাসরি নিষ্কিপ্ত হলো। “আমি জানি না।”

“হায় ঈশ্বর।”

“আমি তো তোমাকে বলেছিই, সময় লাগবে। যতো বেশি মনে করার জন্যে চাপাচাপি করবে ততো বেশি খারাপ হবে পরিস্থিতি। খুবই খারাপ হবে।”

“আপনি মদ খেয়েছেন।”

“সবসময়ই তো খাই। এটা নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। শোনো, আমি তোমাকে কিছু কু দিতে পারি। যদি তুমি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।”

“আমি শুনছি।”

“না, তুমি শুনছো না, তুমি মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। তুমি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছো। নিজের মনটাকেও রেখেছো কোনো বাস্তবে বন্দী ক’রে। আমার কথাটা আবার শোনো।”

“আমি শুনছি।”

“তুমি যখন দীর্ঘদিন কোমায় ছিলে, মানে অচেতন ছিলে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেছো তখন। ইংরেজি, ফরাসি আর এমন একটা অদ্ভুত ভাষা যা আমার মতে কোনো প্রাচ্যদেশীয় ভাষাই হবে। তার মানে তুমি বহু ভাষায় দক্ষ। তুমি পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছো। একটু ভৌগলিকভাবে ভাবো। তুমি কোন্টাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো?”

“অবশ্যই ইংরেজি।”

“ঠিক আছে। তাহলে অস্বস্তি লাগে কোন্টাতে?”

“আমি জানি না।”

“তোমার চোখ দুটো বৃত্তাকার, ছোটো নয়। আমি নিশ্চিত করেই বলবো প্রাচ্যদেশীয়।”

“অবশ্যই।”

“তাহলে এ ভাষায় কথা বলছো কেন? এবার একটু ভালো ক’রে খেয়াল করো। আমি কিছু শব্দ লিখছি। সেগুলো শোনো। আমি শব্দগুলো উচ্চারণ করছি। মা-কাওয়া। তাম-কুয়ান। সি-সাহ। এসব শুনে তোমার মনে সবচাইতে প্রথমে যা এলো সেটা আমাকে বলো।”

“কিছুই মনে আসছে না।”

“বেশ ভালো পারফরমেন্স।”

“আপনি চাচ্ছেনটা কি?”

“কিছু একটা। যেকোনো কিছু।”

“আপনি মাতাল।”

“এটা আমি আগেই স্বীকার করেছি। সবসময়ই তাই থাকি। তবে আমিই কিন্তু তোমার এই জীবনটা বাঁচিয়েছি। মাতাল হই আর যা-ই হই, আমি একজন ডাক্তার। এক সময় খুবই ভালো একজন ডাক্তার ছিলাম।”

“কি হয়েছিলো?”

“রোগী ডাক্তারকে প্রশ্ন করছে?”

“কেন করবে না?”

ওয়াশবার্ন একটু থেমে জানালা দিয়ে বাইরের জলরাশির দিকে তাকালেন। “আমি মাতাল ছিলাম,” বললেন তিনি। “তারা বললো আমি অপারেশন টেবিলে মাতাল হয়ে অপারেশন ক’রে দু’জন রোগীকে মেরে ফেলেছি। তারা এ থেকে খুব সহজেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। আমার মতো কোনো মানুষকে কখনও এই সম্মানজনক পোশাক আর ছুরি দেবে না, বুঝলে।”

“তার কি কোনো দরকার আছে?”

“কোন্টার কথা বলছো?”

“মদের বোতলের।”

“হ্যাঁ। অবশ্যই দরকার আছে।” জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে এনে ওয়াশবার্ন আস্তে ক’রে বললেন। “সেটা আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আর ডাক্তার কোন্ বিষয়ে মনোযোগ দেবে সেটা রোগীর ঠিক ক’রে দেবার কথা নয়।”

“দুঃখিত।”

“তোমার দেখি ক্ষমা চাওয়ার বিরক্তিকর অভ্যাস আছে। তবে তুমি এরকম ক্ষমা চাওয়ার লোক এটা আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।”

“তার মানে আপনি এমন কিছু জানেন যা আমি জানি না।”

“তোমার ব্যাপারে, হ্যাঁ। অনেক কিছু। তবে খুব কমই বুঝতে পেরেছি।”

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লোকটা সামনাসামনি বসলো। তার শার্টের খোলা বোতাম দিয়ে বুকের ব্যান্ডেজটা দেখা যাচ্ছে। সে তার হাত দুটো বুকের কাছে এনে ভাঁজ ক’রে রাখলো। তার হাত দুটো বেশ পেশীবহুল। “আমি যখন কোমায় ছিলাম তখন কি এমন কিছু বলেছি যাতে ক’রে আপনার এরকম ধারণা হয়েছে?”

“না, ঠিক তা নয়। ওগুলোর বেশির ভাগই অর্থহীন প্রলাপ। আমি বলছি ভাষার ব্যাপারটা, তোমার ভৌগলিক জ্ঞান—এমন সব শহরের নাম বলেছো যা আমি কখনও শুনি নি—কোনো নাম উচ্চারণ না করার বাতিক আছে তোমার, তুমি চাইলেও সেটা এড়িয়ে গেছো। তোমার কথাবাতায় আক্রমণ, পশ্চাদপসরণ,

পুকানো, পালানো ইত্যাদি ছিলো—সবই হিংসাত্মক। এজন্যে ক্ষতস্থানগুলো রক্ষা করার জন্যে তোমার দু’হাত আমাকে বেঁধে রাখতে হয়েছিলো। তবে এগুলো ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে।”

“কি বলতে চাচ্ছেন? সেগুলো কি? সে কথা কেন আমাকে বলেন নি?”

“কারণ, ওগুলো দৈহিক ব্যাপার। আমি বুঝতে পারছি না কথটা শোনার জন্যে তুমি প্রস্তুত কিনা।”

লোকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। তার চোখ দুটোতে ভাবনা খেলে যাচ্ছে এখন। “আমি প্রস্তুত আছি। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, বলুন?”

“আমরা কি আরো বেশি গ্রহণযোগ্য কিছু নিয়ে শুরু করতে পারি না, মানে তোমার মাথাটা নিয়ে? বিশেষ করে মুখের ব্যাপারটা।”

“সেটার আবার কি হয়েছে?”

“এটা এমন কিছু যা নিয়ে তুমি জন্মাও নি।”

“কি বলতে চাচ্ছেন?”

“একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালো করে দেখলে অপারেশনের চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায়। তোমার চেহারা বদল করা হয়েছে, বুড়ো খোকা।”

“বদলানো হয়েছে?”

“তোমার গাল দুটো একটু বেশি উঁচু। আমি বলতে পারি ওটাতে অপারেশন করা হয়েছে। তোমার গালের উপরের হাড়টার কথা বলছি—তোমার গালের হাড়ও একটু উঁচু। সেটাতেও অপারেশনের চিহ্ন রয়েছে। আমি বলবো, একটা আর্চিল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তোমার নাকটা ইংলিশ নাক। আগের চেয়ে এটা একসময় আরেকটু বেশি খাড়া ছিলো। এটা এখন একটু পাতলাও হয়েছে। তোমার তীক্ষ্ণ চেহারাটা একটু নরম নরম লাগছে। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি?”

“না।”

“তুমি দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, তবে তোমার চেহারাটা একটু অন্য ধরণের।”

“অন্য ধরণের?”

“হ্যাঁ। তোমার আদল ক্রিকেট কিংবা টেনিস-কোর্টে দেখা প্রতিদিন অসংখ্য এ্যাংলো-স্যান্ড্রন লোকদের মতো। অথবা বলতে পারি, মিরাবেলের বারে দেখা শোকগুলোর মতো। এসব চেহারা একে অন্যের সাথে খুব বেশি আলাদা বলে মনে হয় না, তাই না? সবকিছুই ঠিকঠাক মতো আর জায়গামতো আছে, দাঁতগুলো সোজা, সমান, কান দুটো মাথার তুলনায় চ্যাটানো বা ফ্ল্যাট—ভারসাম্যহীন কিছু নেই, সবই যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে, কেবল একটু নরম।”

“নরম?”

“মানে, ‘বিকৃত’ শব্দটাকে আদর করে বলছি আর কি। নিশ্চিতভাবেই তুমি আত্মবিশ্বাসী, এমনকি উল্লাসিকও, নিজের মতো করে চলতে অভ্যস্ত।”

“আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাচ্ছেন।”

“তাহলে এটা একটু চেষ্টা ক’রে দ্যাখো। তোমার চুলের রঙ বদলে ফেলো, দেখবে তোমার চেহারাটা একেবারেই বদলে যাবে। হ্যা, একটু ছোপ ছোপ হবে, ডাই করবে। চশমা পরো অথবা গৌফ রাখো, তাহলেই দেখবে তুমি একেবারে আলাদা একজন হয়ে গেছো। আমার ধারণা তোমার বয়স মধ্য-ত্রিশে, তবে তুমি তার চেয়েও দশ বছরের বেশি বড় হতে পারো, অথবা পাঁচ বছরের।” ওয়াশবার্ন একটু থেমে লোকটার প্রতিক্রিয়া দেখলো, যেনো তার প্রতিক্রিয়া দেখেই সে সিদ্ধান্ত নেবে আরো বলবে, নাকি বলবে না। “চশমার কথা বলছিলাম, তোমার কি সেইসব এক্সারসাইজগুলো মনে আছে, এক সপ্তাহ আগে আমরা যে টেস্টগুলো করেছিলাম?”

“অবশ্যই।”

“তোমার চোখের পাওয়ার একদম ঠিক আছে। তোমার চশমার কোনো দরকার নেই।”

“আমার মনে হয় না আমি চশমা পরতাম।”

“তাহলে তোমার রেটিনা এবং চোখের পাপড়িতে কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কেন?”

“আমি জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“আমি কি সম্ভাব্য একটি ব্যাখ্যা দেবো?”

“আমি সেটাই শুনতে চাচ্ছি।”

“তুমি হয়তো খুশি হবে না।” ডাক্তার জানালার সামনে গিয়ে উদাস হয়ে চেয়ে থাকলেন। “কিছু কনট্যাক্ট লেন্স আছে যা কেবল চোখের রঙ বদল করার জন্যে পরা হয়। সাধারণত যারা ধূসর অথবা নীল চোখের হয় তারাই বেশি পরে থাকে। তোমারটা মিশ্র। এরকম আলোতে পিঙ্গলবর্ণের কিংবা ধূসর, আরেক রকম আলোতে সেটাই আবার নীল হয়ে যায়। প্রকৃতি এক্ষেত্রে তোমার পক্ষে। রঙ বদলানোর জন্যে কোনো কিছুই দরকার নেই তোমার।”

“কিসের দরকার নেই?”

“তোমার বেশভূষা খুবই পেশাদারীভাবে বদলাবার কথা বলছি আর কি। ভিসা, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স—এসব নেবার জন্যে অনেকেই এটা ক’রে থাকে। চুলে ধূসর, বাদামী, সাদা, সোনালী ইত্যাদি রঙ করা যায়। কিন্তু চোখ—সবুজ, ধূসর, নীলে বদলাতে পারবে না, পারবে কি?”

চেয়ার থেকে একটু কষ্ট ক’রে উঠে দাঁড়ালো রোগী। ওঠার সময় তার শ্বাস কষ্টও হলো। “আপনি হয়তো ঠিক ধরতে পেরেছেন, আবার এমনও হতে পারে, ভুল অনুমান করছেন।”

“চিহ্নগুলো আছে। সেটাই তো আলামত।”

“সেটা তো আপনার ব্যাখ্যা, খুব বেশি মদ গিলেছেন তাই হয়তো সন্দেহবাতিকতায় আক্রান্ত হচ্ছেন। ধরুন আমার একটা দূর্ঘটনা হয়েছিলো, সেজন্যেই অপারেশন করতে হয়েছিলো। এটা কি হতে পারে না?”

“তোমার চিহ্নটা যেরকম তাতে দূর্ঘটনাজনিত ব'লে মনে হচ্ছে না। ডাই করা ১৭, হাড়ের সংকোচন আর একটা আঁচিলের অপসারণ তা বলছে না।”

“আপনি তো সেটা জানেন না!” অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকটি রেগেমেগে এলো। “বিভিন্ন ধরনের দূর্ঘটনা আছে, তার জন্যে অপারেশনও রয়েছে আলাদা আলাদা রকম। আপনি তো সেখানে ছিলেন না। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না।”

“ভালো! আমার সাথে আরো রাগ দেখাও। তুমি তো সচরাচর এরকমটি আমার সাথে করো না। আর তুমি যখন ক্ষেপে যাবে, সেই মুহূর্তের একটু ভাববে। তুমি কি ছিলে? কে তুমি?”

“একজন সেলসম্যান...বহুজাতিক কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, দূরপ্রাচ্যের ওপর অভিজ্ঞ কেউ। সেটা তো হতে পারে। অথবা একজন শিক্ষক...ভাষার শিক্ষক। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের। এটাও তো সম্ভব।”

“চমৎকার। এ থেকে যেকোনো একটা বেছে নাও তাহলে। এখনই!”

“আমি...আমি পারছি না।” লোকটার চোখেমুখে অসহায়ত্বের ছাপ দেখা যাচ্ছে এবার।

“কারণ তুমি বিশ্বাস করো তুমি এগুলোর কোনোটাই নও।”

লোকটা সজোরে দু'পাশে মাথা নাড়লো। “না, তা করি না। আপনি করেন কি?”

“করি না,” ওয়াশবার্ন বললেন। “একটা নির্দিষ্ট কারণেই সেটা আমি বিশ্বাস করি না। ঐসব পেশায় শারীরিক শক্তির কোনো ব্যবহার হয় না। কিন্তু তোমার এমন একটি শরীর আছে যাতে শারীরিক পরিশ্রম আর শক্তির ব্যাপার রয়েছে। ওহ, তার মানে আমি এই বলছি না যে, তুমি একজন ক্রীড়াবিদ অথবা সেরকম কিছু। তুমি এরকম সাধারণ কেউ নও। তোমার মাংসপেশী বেশ সুগঠিত। শক্তিশালী হাত তোমার। আমি বরং তোমাকে সেদিক থেকে কোনো শ্রমিকই বলবো। যে কিনা ভারি ভারি জিনিস তোলে অথবা সমুদ্রে জাল ফেলে সারাদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু তোমার জ্ঞানের পরিধি দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটাও বাদ দিতে হচ্ছে আমাকে।”

“আমার কেন মনে হচ্ছে আপনি অন্য কিছুর দিকে ইঙ্গিত করছেন?”

“কারণ, কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব ঘনিষ্ঠভাবে এবং প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আমরা একসাথে কাজ ক'রে যচ্ছি। তোমার একটা প্যাটার্ন আছে।”

“তাহলে আমি ঠিকই আছি?”

“হ্যা। আমাকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে এইমাত্র বলা আমার কথাগুলো তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে। মানে এর আগের করা সার্জারি, চুলের ব্যাপারটা আর কনট্যাক্ট লেন্সের কথা বলছি।”

“আপনার এই পরীক্ষায় আমি কি পাস করেছি?”

“টেনেটুনে। এখন সময় হয়েছে, এটা না বলে আর উপায়ও নেই। খুলেই বলি তোমাকে, আমার অতো ধৈর্য নেই। এসো আমার সাথে।” ওয়াশবার্ন লোকটাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছে এই ঘরটাই তার ডিসপেন্সারি। এক কোণে একটা প্রজেক্টরের কাছে গেলেন তিনি। “এটা আমি মার্সেই থেকে এনেছি,” প্রজেক্টরটা চালু করে বললেন। “এটা তেমন ভালো না হলেও আমাদের কাজ চলবে। জানালার পর্দাগুলো নামিয়ে দেবে কি?” নামহীন অথবা স্মৃতিহীন লোকটাকে বললে লোকটা জানালার পর্দাগুলো নামিয়ে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেলো। ওয়াশবার্ন প্রজেক্টরটা সচল করলে দেয়ালে ভেসে উঠলো একটা সাদা রঙের চারকোনা উজ্জ্বল আলো। এরপর তিনি ছোট্ট একটা সেলুলয়েড লেন্সের সামনে ঢুকালে সেই চারকোনা সাদা উজ্জ্বল আলোটার মাঝখানে কতোগুলো বড় বড় অক্ষর ভেসে উঠলো এবার।

গেইমেনশ্যাফট ব্যাংক

ব্যানহফস্ট্রাস। জুরিখ।

০-৭-১৭-১২-০-১৪-২০-২০-৬-০

“এটা কি?” নামহীন লোকটা জানতে চাইলো।

“এটা দ্যাখো। ভালো করে দ্যাখো। ভাবো।”

“এটা তো কোনো ব্যাংক একাউন্ট বলেই মনে হচ্ছে।”

“ঠিক। একটা ব্যাংকের ঠিকানা। কিন্তু নিচের হাতের লেখাটা একাউন্টের মালিকের স্বাক্ষর। স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম।”

“এটা আপনি কোথেকে পেলেন?”

“তোমার থেকে। এটা খুবই ক্ষুদ্র একটি নেগেটিভ। আমার অনুমান, পয়ত্রিশ মিলিমিটারের অর্ধেক আকারের হবে ফিল্মটা। এটা প্রোথিত ছিলো—সার্জিক্যাল অপারেশন করে তোমার ডান উরুর চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। সংখ্যাগুলো তোমার হাতেরই লেখা। স্বাক্ষরটাও তোমার। এটা দিয়ে তুমি জুরিখের একটা ভল্ট খুলতে পারবে।”

অধ্যায় ২

তারা জঁ পিয়েরে নামটি বেছে নিলো। এটা কাউকে চম্কেও দেয় না, বিরক্তও করে না। পোর্ট নোয়ে'তে এই নামটি খুবই সাধারণ আর পরিচিত।

বইগুলো এলো মার্सेই থেকে। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির এবং পুরুত্বের; চারটা ইংরেজি, দুটো ফরাসি। এগুলো মাথা এবং মানসিক আঘাতের উপর রচিত মেডিকেল বই। মস্তিষ্কে অনেক ক্রশ-সেকশন আছে, শত শত অপরিচিত শব্দ গ্রহণ করা এবং বোঝার চেষ্টা করা হয় সেখানে। স্মৃতি সংরক্ষণ আর স্মরণ করার কাজ করে একটি অংশ, সেটা আঘাতপ্রাপ্ত হলে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্মৃতিভ্রষ্ট তথা অ্যামেনেসিয়ার কারণ হয়ে থাকে।

অ্যামেনেসিয়া।

“এক্ষেত্রে কোনো নিয়ম নেই,” বললো কালো চুলের লোকটি। টেবিল ল্যাম্পের স্বল্প আলোর কারণে চোখ দুটো ঘষে নিলো। “এটা একটা জ্যামিতিক পাজল; যেকোনো ভাবেই এটা হতে পারে। শারীরিক অথবা মানসিকভাবে—কিংবা কিছুটা উভয় কারণেই। এটা স্থায়ীও হতে পারে, অস্থায়ীও হতে পারে। আবার পুরোপুরি সব অংশেও হতে পারে। কোনো নিয়ম নেই!”

“ঠিক বলেছো,” ঘরের এককোণে একটা চেয়ারে ব'সে হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ওয়াশবার্ন বললেন। “তবে আমার মনে হচ্ছে, কী ঘটছে সে ব্যাপারে আমরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। মানে যেটা আমি ভাবছি।”

“কোন্টার কথা বলছেন?” লোকটি উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো।

“এইমাত্র যেটা তুমি বললে : ‘উভয় কারণেই।’ যদিও ‘কিছুটা’ শব্দ বদলে ‘মারাত্মক’ হবে। মারাত্মক কোনো আঘাতের কারণে।”

“কি ধরনের মারাত্মক আঘাত?”

“শারীরিক এবং মানুষিক আঘাত। এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত। একে অন্যের পরিপূরক—বলা যায় একে অন্যের সাথে বিশেষভাবে জড়িত।”

“কি পরিমাণ মদ খেয়েছেন?”

“যতোটা তুমি ভেবেছো তার চেয়েও কম। এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।” ডাক্তার একটা ক্লিপবোর্ড হাতে নিলেন, ওটাতে কতোগুলো পৃষ্ঠা আছে। “এ হলো তোমার ইতিহাস—তোমার নতুন ইতিহাস—যেদিন থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তার ইতিহাস। সংক্ষেপে বলি। শারীরিক আঘাতটি আমাদেরকে বলছে তোমার মানসিক আঘাতটিও ব্যাপক ছিলো। প্রচণ্ড চাপ। নয় ঘণ্টা পানিতে

থাকার কারণে হিস্টিরিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। এতে ক'রে মানসিক ক্ষতি হয়েছে। অন্ধকার, হিংসাত্মকভাবে হাত পা ছোড়াছুড়ি, ফুসফুসে খুব কম বাতাস থাকা; এগুলো হলো হিস্টিরিয়ার অনুশঙ্গ। এসব কিছু পরই মস্তিষ্ক স্মৃতিকে মুছে ফেলেছে যাতে তুমি মানিয়ে নিতে পারো, টিকে থাকতে পারো। তুমি কি আমার কথা শুনছো?”

“হ্যা, শুনছি। মানব মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে রক্ষা করে।”

“মাথাটা নয়, মনটা। এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মাথার প্রসঙ্গে আবার আসছি। তবে সেটাকে আমরা মস্তিষ্ক বলেই চিহ্নিত করবো।”

“ঠিক আছে। মন, মাথা নয়...মানে মস্তিষ্ক।”

“ভালো।” ওয়াশবার্ন পৃষ্ঠাগুলো ওল্টালেন। “এখানে কয়েকশ' অবজারভেশন লিপিবদ্ধ করা আছে। সাধারণ মেডিকেল তথ্য—ডোসেজ, সময়, প্রতিক্রিয়া, এরকম কিছু—কিন্তু মূল বক্তব্যটি তোমাকে নিয়ে। যে শব্দ তুমি ব্যবহার করো, যে শব্দে তুমি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করো এগুলো আর কি। যেসব পদবাচ্য তুমি ব্যবহার করো—কোমায় থাকার সময় অথবা ঘুমের মধ্যে যখন ছিলে তখন আমি শব্দগুলো লিখে রেখেছিলাম। এমনকি তুমি যেভাবে কথা বলো, কোনো কিছু দেখে চমকে যাও, কিংবা আগ্রহী হয়ে ওঠো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকগুলো বৈপরীত্য আছে তোমার মধ্যে। তোমার মনের গহীনে হিংসাত্মক ব্যাপার আছে, তুমি সেটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছো সবসময়, তবে খুবই প্রকটভাবে সেটা তোমার ভেতরে রয়েছে। তোমার আরেকটা ঔদাসীন্য রয়েছে, মনে হয় সেটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। তবে তুমি সেটা খুব কমই প্রকাশ করো। যে যন্ত্রণা তোমাকে ক্ষেপিয়ে তোলে সেটাও কমই প্রকাশ করো।”

“আপনি এখন কিন্তু আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন,” লোকটা বাঁধা দিয়ে বললো। “আমরা একই শব্দ আর পদবাচ্য নিয়ে বার বার কথা বলেছি—”

“আমরা সেটাই অব্যাহত রাখবো,” ওয়াশবার্ন বললেন। “যতোক্ষণ না কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।”

“কোনো উন্নতি হয়েছে ব'লে আমার তো মনে হচ্ছে না।”

“পরিচিতি এবং পেশাগত ব্যাপারে হয় নি। মানে, তোমার পরিচয় কি, পেশা কি, সেটা এখনও জানা যায় নি। তবে আমরা খুঁজে বের করবো, ঠিক কিসে তোমার স্বস্তি লাগে। কোন্ কাজটাতে তুমি সেরা। এটা একটু ভীতিকরও বটে।”

“কোন্ দিক থেকে?”

“একটা উদাহরণ দেই।” ডাক্তার ক্লিপবোর্ডটা রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালের একটা আলমারির ড্রয়ার খুললেন তিনি। সেখান থেকে বড় একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করলে স্মৃতিহীন লোকটা একটু বিচলিত হয়ে উঠলো।

ওয়াশবার্ন এই প্রতিক্রিয়াটি খেয়াল করলেন। “এটা আমি কখনই ব্যবহার করি নি, কিভাবে করতে হয় সেটাও জানি না। কিন্তু আমি তো ওয়াটারফ্রন্টে থাকি, তাই এটা রাখতে হয়।” তিনি হাসলেন। আচ্ছমকা, কোনো রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই অস্ত্রটা তার দিকে ছুড়ে মারলেন। অস্ত্রটা শূন্যেই ধরে ফেললো সে। খুবই নিখুঁতভাবে। বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে। “এটা খুলে ফেলো তো দেখি।”

“কি?”

“অস্ত্রটার বিভিন্ন অংশ খুলে ফেলো।”

লোকটা অস্ত্রের দিকে তাকালো। তারপর নিরবে তার হাতের আঙুল অস্ত্রটার উপর বিচরণ করতে লাগলো বেশ দক্ষতার সাথে। ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অস্ত্রটার বিভিন্ন অংশ খুলে টুকরো টুকরো ক’রে ফেলা হলো। এবার ডাক্তারের দিকে তাকালো লোকটা।

“বুঝতে পেরেছো আমি কি বোঝাতে চাইছিলাম?” ওয়াশবার্ন বললেন। “তোমার দক্ষতার মধ্যে অস্ত্র সংক্রান্ত অসাধারণ জ্ঞান রয়েছে।”

“সেনাবাহিনী?” লোকটা জানতে চাইলো খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে।

“একদমই মনে হচ্ছে না,” জবাব দিলেন ডাক্তার। “তুমি যখন কোমা থেকে প্রথম জ্ঞান ফিরে পেলো কথাটা তোমাকে বলেছিলাম। মানে তোমার দাঁতের ব্যাপারে। আমি তোমাকে আশ্বস্ত ক’রে বলছি, ওগুলো সেনাবাহিনীর কোনো কাজ নয়। আর অবশ্যই সার্জারির কথাটা তো বলতেই হয়। সেটা তোমাকে সেনাবাহিনীর একজন হিসেবে নাকচ ক’রে দিচ্ছে।”

“তাহলে কী দাঁড়ালো?”

“সেটা নিয়ে ভেবো না এখন। কি ঘটেছে তাতে ফিরে যাই আমরা। মন নিয়ে কথা বলছিলাম, মনে আছে? মানসিক চাপ, হিস্টিরিয়া। মস্তিষ্কের কথা বলছি না, মানসিক চাপের কথা বলছি। আমি কি পরিষ্কার বোঝাতে পেরেছি?”

“বলে যান।”

“আঘাতটা সরে যেতেই, চাপটা থেকে মুক্ত হতেই মস্তিষ্ক আর নিজেকে রক্ষা করার জন্যে পূর্বের অবস্থায় থাকবে না। ধীরে ধীরে তোমার দক্ষতা, প্রতিভা ফিরে আসতে থাকবে। সব কিছুই মনে পড়ে যাবে তোমার। তবে একটা ফাঁক থেকে যাবে, আর সেইসব ফাঁকে যা কিছু থাকবে তার সবটাই হবে স্থায়ী।” ওয়াশবার্ন হেসে আবার চেয়ারে বসে গ্রাসটা তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ ক’রে মদে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি। তার চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ।

“বলুন,” লোকটা চাপা কণ্ঠে বললো।

ডাক্তার চোখ খুলে সরাসরি তার রোগীর দিকে তাকালেন। “আমরা আবার মাথায় ফিরে আসি, যাকে আমরা মস্তিষ্ক ব’লে ডাকবো। মস্তিষ্কে রয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন কোষ। তুমি সেটা বইতে পড়েছো। এসবের একটু ওদিক হলেই বিরাট

কিছু হয়ে যেতে পারে। সেটাই তোমার হয়েছে। ক্ষতিটা শারীরিক। এটা এরকম, যেনো কোনো ব্লকের রি-অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। শারীরিক গঠন বা কাঠামোটি আর আগের অবস্থায় নেই,” ওয়াশবার্ন থেমে গেলেন।

“আর?” লোকটা জানতে চাইলো।

“শারীরিক চাপগুলোর অপসারিত হলে তোমার প্রতিভা আর দক্ষতা ধীরে ধীরে ফিরে আসবে। সেটাই হচ্ছে এখন। তবে আমি মনে করি না সেগুলো জড়ো করে একসূত্রে গেঁথে তুমি তোমার অতীতকে বের করতে পারবে।”

“কেন, কেন পারবো না?”

“কারণ শরীরবৃত্তীয় যে অংশটি স্মৃতিকে সম্প্রচার বা সংরক্ষণ করে সেটা বদলে ফেলা হয়েছে। এমনভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে যেটা আর কোনোদিন ঠিক করা যাবে না। এসবের মূল উদ্দেশ্য ছিলো সেগুলোকে ধ্বংস করা।”

লোকটা ভাবলেশহীনভাবে ব’সে রইলো। “এই প্রশ্নের জবাব আছে জুরিখে,” সে বললো।

“এখন নয়। তুমি এখনও প্রস্তুত হও নি। তোমার শক্তিও এখন তেমন একটা নেই।”

“আমি আমার শক্তি ফিরে পাবো।”

“হ্যা, অবশ্যই তুমি পাবে।”

কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। ফিরে আসতে লাগলো লোকটার শক্তি। ভাষাগত অনুশীলনটা চলতে লাগলো পুরোদমে। উনিশতম সপ্তাহের সকালের মাঝামাঝি সময়, দিনটা খুবই উজ্জ্বল, ভূমধ্যসাগরটা বেশ শান্ত আর চক্‌চক্‌ করছে। অভ্যাস অনুযায়ী লোকটা ওয়াটারফ্রন্ট আর পাহাড়ের উপরে কয়েক ঘণ্টার দৌড়ানো শেষ করেছে মাত্র। প্রতিদিন প্রায় বারো মাইলের মতো দৌড়ায় সে। আর প্রতিদিনই তার গতি বাড়ছে। ক্রমাগতভাবেই কমে আসছে বিশ্রামের সময়। সে ব’সে আছে তার শোবার ঘরের জানালার পাশের চেয়ারে। খুব দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে, ঘামে একেবারে ভিজে গেছে তার টি-শার্টটা। পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকার হলওয়ে পেরিয়ে লিভিংরুম হয়ে শোবার ঘরে ঢুকেছে সে। এটা একেবারেই সহজ একটি কাজ। লিভিংরুমটা ওয়াশবার্নের ওয়েটিংরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে এখনও দু’য়েকজন কাটা-হেঁড়ার রোগী চেয়ারে ব’সে আছে চোখেমুখে ভয় আর আশংকা নিয়ে। ডাক্তারের অবস্থা কি সেটা নিয়ে ভাবছে তারা। সত্যি বলতে কী, আজ ডাক্তারের অবস্থা ভালোই আছে। জিওফ্রে ওয়াশবার্ন মদ খেয়ে চুর হয়ে আছেন। তবে তিনি নিজ বাড়িতেই আছেন আজ। স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটা বুঝতে পেরেছে। সব প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে জুরিখের ব্যানহফস্ট্রাসের একটি ব্যাংকে। জুরিখের পথঘাট কেন খুব সহজেই তার মনে ভেসে এলো?

শোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেলে ডাক্তার হুড়মুড় ক'রে প্রবেশ করলেন, দাঁত বের ক'রে হাসছেন তিনি। তার সাদা কোটে রোগীর রক্ত লেগে রয়েছে।

“আমি পেরেছি!” তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিজয় উল্লাস। “আমি নিজের জন্যে ভাড়া করা একটি হল খুলবো, কমিশন পেয়ে বেঁচে থাকবো। একটু থিতু হওয়া যাবে।”

“আপনি কি বলছেন এসব?”

“এরকম একটা কিছুই তোমার দরকার ছিলো। তোমাকে বাইরে কাজ করতে হবে। দুই মিনিট আগে মঁসিয়ে জঁ পিয়েরে নামের নামহীন ব্যক্তিটি একটা চাকরি পেয়ে গেছে! অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহের জন্যে।”

“আপনি কিভাবে এটা করতে পারলেন? ভেবেছিলাম এখানে এরকম কোনো সুযোগ নেই।”

“রুদ লামুশের সংক্রমিত পায়ে অপারেশন করার মধ্য দিয়েই সুযোগটা এসেছে। আমি জানিয়েছি, আমার লোকাল অ্যানেসথেটিক সরবরাহ খুবই সীমিত। আমাদের মধ্যে সমঝোতা হলো; আর তুমি হলে সেই পণ্যবিনিময়ের মুদ্রা।”

“এক সপ্তাহের জন্যে?”

“তুমি যদি মোটামুটি ভালো কাজ করো তাহলে হয়তো সে তোমাকে আরো বেশি দিন রেখে দেবে,” ওয়াশবার্ন একটু থামলেন। “যদিও সেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই না?”

“আমি অবশ্য কিছুই বুঝতে পারছি না। একমাস আগে হলে হয়তো দেখা যেতো, কিন্তু এখন না। আমি তো আপনাকে বলেছিই, আমি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমার ধারণা আপনিও তাই চান। জুরিখে আমার কাজ আছে।”

“আমিও চাই তুমি তোমার সেই কাজটা ভালোমতো করো। আমার স্বার্থটা খুবই স্বার্থপর ধরণের, কোনো ধরণের কাটছাটের অনুমতি দেয়া হবে না।”

“আমি প্রস্তুত।”

“আমার কথাটা মনে রেখো, পানিতে দীর্ঘ সময় থাকাটা তোমার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুটা সময় রাতেও থাকবে। কোনো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নয়। একজন যাত্রী হিসেবেও নয়। একটু কঠিন আর কষ্টকর পরিবেশে—সত্যি বলতে কী, যতো কঠিন হবে ততোই ভালো।”

“আরেকটা পরীক্ষা?”

“এই আদিম-অসভ্য পোর্ট নোয়ে'তে এছাড়া আমি আর কী করতে পারি। আমার পক্ষে যদি তোমার জন্যে একটা ঝড় অথবা জাহাজডুবির ঘটনা ঘটানো সম্ভব হতো, তবে আমি তাই করতাম। অন্যদিক থেকে বলতে গেলে, লামুশে নিজেই একটা ঝড়। লোক হিসেবে সে খুবই কঠিন। তার পায়ের ব্যথা যতো বাড়বে সে তোমাকে ততো বেশি ঘৃণা করবে। অন্যদেরকেও। তুমি অন্য কারোর স্বলাষিক্ত হচ্ছেো।”

“অনেক ধন্যবাদ ।”

“এটা আর বলার দরকার নেই । আমরা দুটো চাপকে একত্র করার চেষ্টা করছি । কমপক্ষে এক অথবা দু’রাত পানিতে থাকবে । লামুশে যদি তার শিডিউলটা ঠিক রাখে তাহলে এই দুর্গম আর কঠিন পরিবেশ তোমার হিস্টিরিয়ায় বেশ ভালো অবদানই রাখবে । তোমার চারপাশের লোকদের থেকে সন্দেহ আর ঘৃণার যে প্রকাশ ঘটবে সেটা প্রাথমিক চাপ হিসেবে কাজ করবে ।”

“ধন্যবাদ আবারো । ধরা যাক তারা আমাকে জাহাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো? আপনি তো এরকমই একটা পরীক্ষা চাচ্ছেন, না? কিন্তু আমি যদি পানিতে ডুবে যাই তাহলে আমার আর কী ভালো হবে সেটা বুঝতে পারছি না ।”

“ওহ্, এরকম কিছু হবে না,” ওয়াশবার্ন বললেন ।

“আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলাতে খুব খুশি হলাম ।”

“তাই হওয়া উচিত । চিন্তা করো না, আমি তো আছিই । হয়তো আমি ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড অথবা মাইকেল ডি. বেকি নই, তবে আমি সেইসব লোকের খুবই প্রয়োজনীয় একজন ব্যক্তি, আমাকে তাদের দরকার আছে । আমাকে হারানোর ঝুঁকি তারা নেবে না ।”

“কিন্তু আপনি তো চলে যেতে চান । আর আমি হলাম আপনার চলে যাবার পাসপোর্ট ।”

“মাই ডিয়ার রোগী, তুমি এটা বুঝবে না । এবার আসো তো । লামুশে চাচ্ছে তুমি ডকে যাও, যাতে তার যন্ত্রপাতির সাথে তুমি পরিচিত হয়ে উঠতে পারো । আগামীকাল ভোর চারটা বাজে তুমি কাজ শুরু করবে । সমুদ্রের এক সপ্তাহ সময়টা কিভাবে কাজে লাগাবে ভেবে নাও । এটাকে একটা সমুদ্রযাত্রা হিসেবে মনে করো ।”

এটাকে কোনোভাবেই সমুদ্র ভ্রমণ বলা যাবে না । নোংরা গালিগালাজ আর তেল চিটচিটে মাছ ধরার ট্রলারের ক্যাপ্টেন হলো ক্যাপ্টেন ব্রাইয়ের মতোই জঘন্য । নিঃসন্দেহে পোর্ত নোয়ের জঘন্য লোকটাই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা লামুশের সাথে ক্রু হিসেবে কাজ করেছে । নিয়মিত পঞ্চম সদস্যটি ছিলো প্রধান নেটম্যানের আপন ভাই । সকাল চারটা বাজে হার্বার ত্যাগ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলো জ্যঁ পিয়েরে নামের লোকটা ।

“তুমি আমার ভায়ের রুটিকুজি কেড়ে নিয়েছো!” সিগারেটে বিরামহীন টান দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে নেটম্যান রেগেমেগে বললো । “তার বাচ্চাদেরকে অভুক্ত রেখেছো!”

“মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে,” জ্যঁ পিয়েরে প্রতিবাদ করে বললো । ওয়াশবার্নের স্টাইপেন্ড থেকে তার চাকরিচ্যুত হওয়া ভাইকে সাহুনা হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে

দেয়াটা খুবই সহজ একটা কাজ হতো। কিন্তু ডাক্তার আর তার রোগী এরকম আপোষ না করার জন্যে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলো।

“আশা করি জালের কাজে তুমি বেশ দক্ষ!”

সে মোটেও দক্ষ নয়।

পরবর্তী বাহান্তর ঘটায় এমন একটি মুহূর্ত এলো যখন জ্যঁ পিয়েরে নামের পোকটি টাকা দিয়ে দেয়াটাকেই বেশি ভালো কাজ হতো ব’লে মনে করতে শুরু করলো। তাকে সারাক্ষণই পেরেসানির মধ্যে রাখা হচ্ছে, এমনকি রাতের বেলায়ও। যেনো একজোড়া চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে, যেই মুহূর্তে সে একটু বিশ্রাম নেবে কিংবা দু’চোখে বন্ধ করবে ঘুমানের জন্যে অমনি শুরু করে দেয়।

“তুমি! পাহারা দাও গিয়ে! মেট খুব অসুস্থ। তুমি তার জায়গায় কাজ করবে।”

“ওঠো! ফিলিপ তার ডায়রি লিখছে! তাকে বিরক্ত করা যাবে না।”

“উঠে দাঁড়াও! আজকে বিকেলে তুমি একটা জাল ছিড়ে ফেলেছো। আমরা তোমার বোকামীর জন্যে কোনো ক্ষতি মেনে নেবো না। আমরা সবাই তা মনে করি। এক্ষুণি ওটা মেরামত করো!”

জালগুলো আর কি।

কোনো কাজে যদি দু’জন লোক লাগে তো সেই কাজটা তাকে একা একা করতে হয়। কোনো কিছু যদি দু’জনে মিলে তুলতে যায় তো সে থাকলে অন্য জন এমন অলসভাবে শক্তি প্রয়োগ না করে কাজ করে যে, তাকে প্রায় পুরো বোঝাটাই একা সামলাতে হয়, নয়তো বা সেটা সামলাতে গিয়ে পড়ে যেতে হয়।

আর লামুশে। এক খোড়া শয়তান, যে কিনা প্রতি ইঞ্চি পানি থেকে মাছ ধরতে চায়। তার কণ্ঠটা ভাঙা, ফ্যাস্ফ্যাসে, ফাঁটা বাঁশের মতোই পীড়াদায়ক। সবার নামের আগেই একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে ডাকে সে। এর ফলে স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটা খুব দ্রুতই ক্ষেপে গেলো। তবে লামুশে ডাক্তার ওয়াশবার্নের এই রোগীটির গায়ে হাত তোলে নি।

তৃতীয় দিনের সূর্যাস্তের সময় লামুশের পোর্ট নোয়ে’তে ফিরে আসার কথা। মাছগুলো নামানো হবে। পরের দিন সকাল চারটা পর্যন্ত ত্রুকে ঘুমানো, মদ খাওয়া অথবা যৌনসঙ্গম করার সুযোগ দেয়া হবে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে এই তিনটিই সে করতে পারবে। স্থলভাগের দেখা পাওয়া মাত্রই এটার বাস্তবায়ন শুরু হবে।

জালগুলো ভিজিয়ে ভাঁজ করে রাখা হলো। নেটম্যান আর তার সহকারী এই কাজটা সেয়ে নিলো জাহাজেই। জ্যঁ পিয়েরে নামের নতুন যে ত্রুকে তারা ‘পরগাছা’ বলে গালি দেয় সে লম্বা হাতলওয়ালা একটা ব্রাশ নিয়ে ডেক পরিষ্কার করছে আর বাকি দু’জন ত্রু সমুদ্র থেকে বালতিতে করে পানি নিয়ে ফেলছে তার ব্রাশের সামনে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই পানি ডেকে না ফেলে পরগাছাটার উদ্দেশ্যেই ফেলা হচ্ছে যাতে সে পানিতে ভেসে যায়।

এক বালতি পানি এমনভাবে ফেলা হলো যে, ওয়াশবার্নের রোগীর চোখে-মুখে লেগে গেলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কিছুই দেখতে পেলো না সে। ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। ভারি ব্রাশটা ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত হানা হলো নেটম্যানের উরুতে। ধাতব হাতলের কারণে ব্যথায় কঁকড়ে উঠলো সে।

“মার্দে আলোয়া!”

“দিসোলো,” চোখমুখ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলে ক্ষিপ্ত লোকটি বললো।

“কি বললে!” চিৎকার করে বললো নেটম্যান।

“আমি বলছি, আমি দুঃখিত,” জ্যঁ পিয়েরে নামের লোকটি জবাব দিলো।

“তোমার বন্ধুদেরকে বলো আমার উপরে নয়, জাহাজের ডেকে পানি ফেলতে।”

“আমার বন্ধুরা আমার সাথে তো এরকম করে না।”

“আমার সাথে কিন্তু এইমাত্র করেছে।”

নেটম্যান ব্রাশটার হাতল ধরে সেটাকে বেয়নেটের মতো উঁচিয়ে ধরলো। “তুমি আমার সাথে লাগতে চাও, শালার পরগাছা?”

“ওটা আমাকে দিয়ে দাও।”

“আনন্দের সাথেই দিচ্ছি, শালার পরগাছা। এই যে!” নেটম্যান ব্রাশটা দিয়ে গুঁতো দিলে স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটির শার্টের বোতাম গলে ব্রাশের আঁশ ঢুকে গেলো। হয় আগের সেই আঘাতের স্থানে লাগার জন্যে নয়তো বিগত তিন দিন ধরে নানান রকম হয়রানির শিকার হয়ে লোকটার একেবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেলো। তবে সে জানে না কেন। কেবল জানে তাকে এর সমুচিত জবাব দিতে হবে। আর জবাবটা যে এরকম হবে এটা সে নিজেও কল্পনা করতে পারে নি।

সে হাতলটা ডান হাতে ধরে লোকটার পেটে সজোরে গুঁতো মারলো। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় ব্রাশের লম্বা হাতলটা, যেটা এখন লাঠি বলেই মনে হচ্ছে, সেটা দিয়ে লোকটার বাম পায়ে এবং গলায় আঘাত করে বসলো সে।

“তাও!” তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই আতর্নাদটি বেরিয়ে এলো। সে জানে না এর মানে কি।

কোনো কিছু বোঝার আগেই সে তার ডান পা দিয়ে নেটম্যানের বাম কিডনি বরাবর একটা লাথি মেরে বসলো।

“সি-শা!” চাপা কণ্ঠে বললো সে।

নেটম্যান পিছু হটে গেলেও পরক্ষণেই পাল্টা আঘাত হানলো। তীব্র ব্যথায় আর ভয়ে সামনের দিকে ছুটে এলো সে। তার হাত দুটো বাঘের থাবার মতো লাগছে এখন। “শূয়োরের বাচ্চা!”

স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটি একটু নিচু হয়ে ডান হাত দিয়ে নেটম্যানের বাম হাতের কজি ধরে সজোরে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে মোচর দিলো। তারপর লোকটার পিঠে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলে হুড়মুড় করে জালের উপর গিয়ে পড়লো ফরাসি লোকটা। গানেরলের সঙ্গে আঘাত লাগলো তার মাথায়।

“সি-সাহ!” আবারো অজ্ঞাত শব্দটি উচ্চারণ করলো সে।

পেছন দিক থেকে একজন ত্রু তার গলাটা চেপে ধরলে ডাক্তার ওয়াশবার্নের রোগী তার বাম হাতের মুঠি দিয়ে লোকটার জননেন্দ্রীয়তে আঘাত হানলো। তারপরই এক ঝটকায় সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটু মুড়ে ব’সে পড়ে আক্রমণকারীর বাহুটা ধরে বাম দিকে সজোরে মোচর মারলে লোকটা মেঝেতে ব’সে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার মুখে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারলে সে ছটকে গিয়ে পড়লো বড়সড় একটা পুলিশ মাঝখানে।

বাকি দু’জন লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল-ঘুষি আর লাথি মারতে শুরু করলো। যদিও জাহাজের ক্যাপ্টেন বার বার তাদেরকে সতর্ক ক’রে দিচ্ছে।

“লো দোকুর! রাপেলোঁয়া লো দোকুর! ভা দোসমেন্দ!”

কিন্তু দৃশ্যটি দেখে ক্যাপ্টেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। রোগীটি এক লোকের কজি ধরে এক ঝটকায় উল্টো দিকে মোচড় দিয়ে ভয়ংকরভাবে সেটা ভেঙে ফেললো। তীব্র যন্ত্রণায় একটা গোঙানী দিলো লোকটা।

ওয়াশবার্নের রোগী নিজের দু’হাত হাতুড়ির মতো এক সঙ্গে ক’রে হাতভাঙা ত্রুকে এমন সজোরে আঘাত করলো যে, লোকটা ডেকের উপর আছড়ে পড়লো।

“কোয়া-সাহ!” নিজের কথাটা নিজের কানেই প্রতিধ্বনিত হলো তার। চতুর্থ লোকটি পিছু হটে গিয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটির দিকে চেয়ে দেখতে পেলো তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে।

খেল খতম। লামুশের তিনজন ত্রু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তারা যা করেছে তার জন্যে একটু বেশিই শাস্তি পেয়ে গেছে। ভোর চারটা বাজে ডকে নামার মতো কেউ থাকবে কিনা সে ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

লামুশের কথাবার্তায় বিস্ময় আর ক্ষোভের বহির্প্রকাশ দেখা গেলো। “তুমি কোথেকে এসেছো আমি জানি না। তবে তোমাকে এই ট্রলার থেকে নেমে যেতে হবে।”

স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটি ক্যাপ্টেনের অবস্থা বুঝতে পারলো। আরে, আমিও তো জানি না আমি কোথেকে এসেছি।

“তুমি এখন আর এখানে থাকতে পারবে না,” অন্ধকার শোবার ঘরে ঢুকেই জিওফ্রে ওয়াশবার্ন বললেন। “আমি সত্যি বিশ্বাস করতাম আমি তোমার উপর যেকোনো মারাত্মক আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবো। কিন্তু এখন এই ঘটনার পর আমি আর তোমাকে রক্ষা করতে পারবো ব’লে মনে হচ্ছে না।”

“ওরাই আমার সাথে ঝগড়া বাধিয়েছে।” আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো।”

“ঝগড়া না বলে বলো মারামারি। একটা ভাঙা হাত, কাঁটাছেঁড়া, মাথার খুলিতে আর মুখে এক লোকের সেলাইয়ের দরকার হয়েছে। মাথায় গুরুতর আঘাত আর কিডনিতে মারাত্মক ইনজুরি? বিচিতে সজোরে লাথি মারাটা বাদই দিলাম, নাকি? আমি বিশ্বাস করি শব্দটি হবে খুব বেশি বাড়াবাড়ি রকমের মারামারি।”

“আমি যদি কিছু না করতাম তবে নির্ঘাত খুন হতাম,” রোগীটি একটু থামলো। কিন্তু ডাক্তার কিছু বলার আগেই আবার সে বলতে লাগলো, “আমার মনে হচ্ছে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। কয়েকটি ব্যাপার ঘটে গেছে। অন্য সব ভাষাও আমার মুখ দিয়ে বের হয়েছে। আমাদেরকে এ নিয়ে কথা বলতে হবে।”

“আমাদের কথা বলা উচিত, তবে আমরা বলতে পারছি না। সময় নেই। তোমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা ক’রে ফেলেছি।”

“এখনই?”

“হ্যাঁ। আমি তাদেরকে বলেছি তুমি সম্ভবত মদ খেতে গ্রামে চলে গিয়েছো। ওদের পরিবারের লোকজন তোমাকে খুঁজবে। ভাই-বোন জামাই, চাচাতো-মামাতো ভাই, পরিবারের সক্ষম সবাই তোমাকে খুঁজবে। তারা যখন তোমাকে খুঁজে পাবে না, তখন তারা এখানে আসবে। তোমাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তারা থামবে না।”

“এমন একটা লড়াইয়ের জন্যে যেটা আমি শুরু করি নি?”

“না, সেটা নয়। এর কারণ তুমি তিনজন মানুষকে এমনভাবে মেরেছো যে, তারা একমাস পর্যন্ত কোনো কাজই করতে পারবে না। আরেকটা কারণও আছে, যা সীমাহীনভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।”

“সেটা কি?”

“অপমান। এই পোর্ট নোয়ে’তে একজন বহিরাগত তিনজন সম্মানিত জেলেকে ধরাশায়ী করেছে। এটা খুবই অপমানজনক।”

“সম্মানিত?”

“শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে। লামুশের জুরা এই ওয়াটারফ্রন্টে সবচাইতে জাঁদরেল লোক হিসেবে পরিচিত। এখানে সবল লোকদেরকে সম্মানিত লোক হিসেবেই মনে করা হয়।”

“এটা তো হাস্যকর।”

“তাদের কাছে নয়। এটা তাদের সম্মান...এবার তাড়াতাড়ি করো। নিজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। মার্সেই থেকে একটা ট্রলার এসেছে। ক্যান্টেন তোমাকে নিতে রাজি হয়েছে। সে তোমাকে লা সিওতাতের উপকূল থেকে আধ মাইল দূরে নামিয়ে দেবে।”

স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটি নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ ক’রে রাখলো। “তাহলে যেতেই হবে,” আশ্তে ক’রে বললো সে।

“যেতেই হবে,” ওয়াশবার্ন জবাব দিলেন। “আমি জানি তুমি কি ভাবছো। নিজেই খুব অসহায় মনে করছো। চাকা ছাড়া গাড়ি চালানোর মতো আর কি। আমি ছিলাম তোমার চাকা। কিন্তু আমি তোমার সাথে থাকতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারবো না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, আমি যখন বলছি তুমি অসহায় নও, তখন তুমি জানবে আসলেই তুমি অসহায় নও। তুমি তোমার পথ খুঁজে নিতে পারবে।”

“জুরিখে,” রোগীটি বললো।

“হ্যা, জুরিখে,” ডাক্তারও একমত হলেন। “এখানে, এই সব জামাকাপড়ের মধ্যে আমি তোমার জন্যে কিছু জিনিস রেখেছি। এটা তোমার কোমরে জড়িয়ে নাও।”

“কি জিনিস?”

“আমার সমস্ত টাকা-পয়সা। দু’হাজার ফ্রাঁ’র মতো হবে। খুব বেশি নয়। তবে শুরু করার জন্যে তোমার সাহায্যে লাগবে। আর আমার পাসপোর্ট, এটা দিয়ে যা পারো করো। আমাদের দু’জনের বয়স প্রায় একই, আর এটা আট বছর আগেরকার। সবার চেহারাও বদলায়। কাউকে এটা বেশি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে দিও না। এটা একেবারেই অফিশিয়াল কাগজপত্র।”

“আপনি কি করবেন?”

“তোমার কাছ থেকে কোনো সংবাদ না পেলে বা তোমার দেখা না পেলে এটা আমার কোনো দরকার হবে না।”

“আপনি খুবই ভালো একজন মানুষ।”

“আমার মনে হয় তুমিও তাই...যেমনটি তোমাকে জেনেছি আমি। কিন্তু তারপরও বলতে হয়, তোমাকে আমি আগে থেকে চিনতাম না। তাই আমি তোমার জন্যে কোনো প্রতীক্ষা করতে পারছি না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে করতে, কিন্তু সেরকম কিছু করার কোনো সুযোগ আমার নেই।”

লোকটা রেলিংয়ে ঝুঁকে ক্রমশ অপসূয়মান পোর্ট নোয়ে’র দৃশ্য দেখতে লাগলো দূর থেকে। মাছ ধরার ট্রলারটা অন্ধকারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। আর আজ থেকে প্রায় পাঁচ মাস আগে সে এই অন্ধকারে অনুপ্রবেশ করেছিলো।

যেমনটি এখন আবার আরেক অন্ধকারে প্রবেশ করছে সে।

অধ্যায় ৩

ফরাসি উপকূলে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না; খ্রিয়মান চাঁদের আলোয় কেবল তটরেখাটা দৃশ্যমান। তারা স্থলভাগ থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে আছে এখন। মাছ ধরার ট্রলারটা আস্তে আস্তে ঘর্ঘর্ শব্দ করতে করতে থেমে গেলে ক্যাপ্টেন উপকূলের দিকে ইশারা করলো।

“এখানে, দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা সৈকত আছে। খুব বড় নয়, ডান দিক দিয়ে সাঁতার কাটলে সহজেই পৌঁছে যাবে। আমরা বড়জোড় আরো ত্রিশ-চল্লিশ গজ ভেতরে যেতে পারি, এর বেশি নয়।”

“আমার প্রত্যাশার চেয়েও আপনি বেশি করছেন। এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।”

“তার কোনো দরকার নেই। আমি আমার ঋণ শোধ করেছি।”

“আমাকে সাহায্য করে?”

“অবশ্যই। পোর্ট নোয়ে’র ডাক্তার সাহেব পাঁচমাস আগে সেই ঝড়ের রাতে আমার তিনজন আহত ক্রু’কে চিকিৎসা দিয়েছিলেন। কেবল তোমাকেই তার ওখানে নিয়ে আসা হয় নি, বুঝলে।”

“ঝড়ের কথা বলছেন? আপনি আমাকে চেনেন?”

“তোমাকে ডাক্তারের টেবিলের উপর একেবারে চকের মতো সাদা দেখেছি। তবে আমি তোমাকে চিনি না ৬ চিনতে চাইও না। তখন আমি কোনো মাছ ধরতে পারি নি। আমার কাছে কোনো টাকাও ছিলো না। ডাক্তার বলেছিলেন, আমার যখন সক্ষমতা হবে তখন যেনো তার ঋণ পরিশোধ ক’রে দেই। তুমি হলে আমার ঋণ শোধ।”

“আমার কিছু কাগজপত্র লাগবে,” সাহায্য পাওয়া যাবে টের পেয়ে রোগীটি বললো। “আমার একটা পাসপোর্ট দরকার।”

“আমাকে বলছো কেন?” বললো ক্যাপ্টেন। “আমি একটা প্যাকেজ লা সিওতাতে দক্ষিণে রেখে দিয়ে আসবো ব’লে কথা দিয়েছি। কেবল এটাই বলেছি আমি।”

“আপনি কিন্তু এটা বলেন নি, আপনি অন্য কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।”

“আমি তোমাকে মার্সেই’তে নিয়ে যেতে পারবো না। পেট্রলবোটের কাছে ধরা খাওয়ার কোনো ঝুঁকি আমি নেবো না। ফরাসি সুরেঁত গার্ডরা কড়া নজর রাখে সব

জায়গায়। আর মাদকদ্রব্য বিরোধী টিমটা তো একেবারে উন্মাদই বলা যায়। হয় তুমি তাদেরকে টাকা দেবে নয়তো বিশ বছর জেলের ভাত খাবে।”

“তার মানে আমি মার্সেই থেকে কাগজপত্র জোগাড় করতে পারবো। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।”

“আমি কিন্তু সেটা বলি নি।”

“হ্যা, আপনি বলেছেন। আমার যেখানে গেলে কাজ হবে সেখানে আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন না—যদিও ওখানে গেলেই কাজটা হবে। আপনি এটাই বলেছেন।”

“বলেছি কি?”

“বলেছেন, আপনি মার্সেই’তে আমার সাথে কথা বলবেন—যদি আমি আপনাকে ছাড়া ওখানে যাই। শুধু বলুন, কোথায়?”

ক্যাপ্টেন রোগীর চেহারা ভালো ক’রে লক্ষ্য করলো। সিদ্ধান্তটি হালকভাবে নেয়া হলো না। “রুই সারাসিনে একটা ক্যাফে আছে। পুরনো হারবারের দক্ষিণ দিকে লো চোখ দ্য মার। আজ রাত নয়টা থেকে এগারোটার মধ্যে আমি সেখানে থাকবো। কিছু টাকা লাগবে। অগ্রীম দিতে হবে।”

“কতো?”

“সেটা তুমি এবং যে লোকটার সাথে কথা বলবে সেই দু’জন ঠিক ক’রে নেবে।”

“আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।”

“তোমার কাছে কোনো ডকুমেন্ট থাকলে সস্তায় কাজ হবে, তা না হলে কারো কাছ থেকে সেটা চুরি করতে হবে।”

“আমি তো আপনাকে বলেছিই, আমার কাছে ওরকম একটা আছে।”

ক্যাপ্টেন কাঁধ ঝাঁকালো। “পনেরোশ’, মানে দু’হাজার ফ্রাঁ। আমরা কি সময় নষ্ট করছি?”

রোগী তার কোমরে জড়ানো কাপড়টার কথা ভাবলো। এটা খরচ করলে মার্সেই’তে একেবারে ফতুর হয়ে যাবে সে। তবে সেটা দিয়ে একটা পাসপোর্ট আর জুরিখের ব্যাংকের ভল্টও খোলা যাবে। “তাহলে আজ রাতে দেখা হচ্ছে,” সে বললো।

মৃদু আলোর উপকূলের দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। “এ পর্যন্ত আমরা যেতে পারি, এর বেশি না। এখন নিজের পথ নিজে দ্যাখো। মনে রেখো, তুমি যদি মার্সেই’তে আমার সাথে দেখা না করো, তবে আমাকে আর তুমি কখনও দেখতে পাবে না, আমিও তোমাকে কখনও দেখতে পাবো না। আমার কোনো ক্রু’ও তোমাকে কখনও আর দেখবে না।”

“আমি ওখানে থাকবো। লো চোখ দ্য মার, রুই সারাসিন, পুরনো হারবারের দক্ষিণে।”

“সব ঈশ্বরের হাতে,” ক্যাপ্টেন বললো। হুইলে থাকা এক ক্রু’কে ইশারা করলে ট্রলারটার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলো। “ভালো কথা, লো চোখ-এর ঐ লোকটা প্যারিসের টানে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। তোমার জায়গায় আমি হলে সেটাকে একটু গ্রাম্য ক’রে নিতাম।”

“উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ,” রোগীটি এ কথা বলেই পানিতে নেমে পড়লো। সে তার কাপড়ের পুটলিটা এক হাতে নিয়ে পানির উপর তুলে রাখলো যাতে ভিজ়ে না যায়। নিজের পা দুটো কাঁচির মতো ব্যবহার ক’রে শরীরটা ভাসিয়ে রাখলো সে। “আজ রাতে দেখা হচ্ছে,” কালো রঙের বিশাল ট্রলারটাকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে দেখে চিৎকার ক’রে সে বললো।

কেউ নেই। ক্যাপ্টেন রেলিং থেকে চলে গেছে। কেবল ঢেউ আর ইঞ্জিনের শব্দই শোনা যাচ্ছে এখন।

এখন তুমি তোমার নিজের পথে নেমে গেছো।

ঠাণ্ডা পানি তার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলো। আস্তে আস্তে ডান দিকে সাঁতার কেটে উপকূলের দিকে যেতে লাগলো সে।

এক সময় পায়ে বালুর স্পর্শ পেলো। পাড়ি দেবার জন্যে শেষ ত্রিশ গজ দূরত্বটা খুব বেশি কষ্টকর হলো তার জন্যে। তা সত্ত্বেও হাতের কাপড়ের পুটলিটা একটুও ভিজ়ে গেলো না।

কয়েক মিনিট পর, ঘাসের উপর ব’সে আছে সে। সকালের প্রথম আলো আকাশে উঁকি ঝুঁকি মারছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সূর্যোদয় হবে। তাকেও রওনা দিতে হবে তখন।

পুটলিটা খুলে একজোড়া বুট, মোজা, ট্রাউজার আর মোটা জিপ্সের একটা শার্ট বের করলো। তার অতীতে সে খুব অল্প জায়গায় বেশি সংখ্যক কাপড়চোপড় ভাঁজ ক’রে রাখার বিদ্যেটা শিখেছিলো। পুটলিটার মধ্যে যতোটুকু কাপড় থাকার কথা তার চেয়েও অনেক বেশি রাখা আছে। এসব সে কোথেকে শিখেছে? কেন? প্রশ্নগুলো কখনই থামছে না।

ভেঁজা কাপড়গুলো ঘাসের উপর মেলে রাখলো শোকাবার জন্যে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সৈকতে। তার পেটে এক ধরনের যন্ত্রণা আর অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে। যন্ত্রণাটা ভয়ের, সে জানে। উত্তেজনাটাও বুঝতে পারলো সে।

প্রথম পরীক্ষায় সে পাস করেছে। এক ঘণ্টা আগেও তার সামনে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য ছিলো না। কেবল জানতো জুরিখই হলো তার লক্ষ্য। কিন্তু এটাও জানতো সেজন্যে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করেই কিছু সীমাস্ত অতিক্রম করতে হবে তাকে। আট বছরের পুরনো একটা পাসপোর্ট, সেটাও আবার নিজের নয়, এটা তো যেকোনো

মাথা মোটা ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে এক পলকেই ধরা পড়ে যাবে। আর সে যদি তা দিয়ে সুইজারল্যান্ডে কোনোভাবে ঢুকেও যেতে পারে, তাকে তো আবার ওখান থেকে বের হতে হবে। তার ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়ে যাবে তাতে। এটা সে হতে দিতে পারে না। এখন তো নয়ই। যতোক্ষণ না সে নিজের পরিচয়টা জানে। উত্তরটা জুরিখে আছে, তাকে মুক্তভাবে ভ্রমণ করতে হবে। সে একজন ক্যাপ্টেনকে এই কাজটা সম্ভব করার জন্যে রাজি করিয়েছে।

তুমি অসহায় নও। তুমি তোমার পথ খুঁজে নেবে।

দিন শেষ হবার আগেই সে ওয়াশবার্নের পাসপোর্ট বদলে নেবে কোনো পেশাদার লোকের সাহায্যে, সেটা দিয়ে ভ্রমণের একটা লাইসেন্স ক'রে নেবে। এটা হবে প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু তার আগে টাকার কথাটা এসে যায়। ডাক্তারের দেয়া দু'হাজার ফ্রাঁ একেবারেই অপ্রতুল। এ দিয়ে একটা পাসপোর্টও করা যাবে না। খালি একটা লাইসেন্স দিয়ে কিভাবে ভ্রমণ করা যাবে?

টাকা। তাকে টাকা যোগাড় করতে হবে। এ নিয়ে ভাবতে হবে তাকে।

পুটলি থেকে বের করা পোশাকগুলো ঝেড়ে নিয়ে পরে ফেললো। বুট জোড়া পায়ে দিয়ে বালুর উপর সটান শুয়ে পড়ে আকাশের তারা দেখতে লাগলো সে। আকাশটা আশু আশু উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দিনের জন্য হুঁচকি, যেমনটি হচ্ছে তার।

লা সিওতাতের সংকীর্ণ পথ ধরে সে হাটছে। দোকানে দোকানে ঢুকে ক্লার্কদের সাথে কথা বললো। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে তার এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। তার মনে পড়ে গেলো ক্যাপ্টেনের উপদেশ বাণীটা, তাই নিজের ফরাসিটা একটু ভেজাল ক'রে নিলো সে। এর ফলে নিজেকে শহরের একজন বৈশিষ্ট্যহীন, সাধারণ অচেনা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারবে।

টাকা।

লা সিওতাতের একটা অংশে বেশ ধনীরা থাকে। দোকানগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার আর জমকালোভাবে সাজানো। মাছগুলো টাটকা, মাংসগুলোও সুন্দর ক'রে কেটে রাখা হয়েছে। এমনকি তরিতরকারিগুলোও চকচক করছে। অনেক অজ্ঞাত জিনিস উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে রপ্তানী ক'রে আনা হয়েছে। এলাকাটা যেনো এক টুকরো প্যারিস। ছোট্ট একটা সুন্দর ক্যাফে দেখা যাচ্ছে, যার পনটা খুবই সুন্দর ক'রে সাজানো।

টাকা।

একটা কসাইর দোকানে ঢুকলে বুঝতে পারলো দোকানী তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। তার চাহুনিটাও বন্ধুসুলভ নয়। লোকটা মধ্যবয়সী এক দম্পতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

“গত সপ্তাহের গরুর মাংসটা মোটেই ভালো ছিলো না,” মহিলা বললো। “এবারেরটা দেখে শুনে দেবেন, তা না হলে আমি মার্সেই থেকে অর্ডার দিতে বাধ্য হবো।”

“আরেক দিন রাতে মার্কুইজ আমাকে বলেছে খাসির মাংসের টুকরোগুলো নাকি বেশি পাতলা ছিলো। সোয়া এক ইঞ্চির মতো ছিলো ওগুলো।”

মালিক লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকালো, একেবারে ক্ষমাপ্রার্থী আর আশ্বস্ত করার ভঙ্গী করলে মহিলা তার স্বামীর দিকে ফিরলো।

“প্যাকেজগুলোর জন্যে অপেক্ষা করো, ওগুলো গাড়িতে নিয়ে রাখো। আমি মুদি দোকানে গেলাম। ওখানে এসো।”

“অবশ্যই, মাই ডিয়ার।”

মহিলা চলে গেলো। দরজার বাইরে যেতেই মহিলার স্বামী দোকানের মালিকের দিকে তাকালো। তার ভাবসাব একেবারে বদলে গেছে এখন। হৃদযন্ত্রি ভাবটা চলে গিয়ে দাঁত বের করা হাসির দেখা মিললো।

“আর সব দিনের মতোই, তাই না মার্সেল?” সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বললো সে।

“মাংসের টুকরোগুলো কি আসলেই খুব পাতলা ছিলো?”

“হায় ঈশ্বর, মোটেই না। তবে আমার বউ মনে করে অভিযোগ করলে পরের বার আরো ভালো পাওয়া যাবে। বোঝোই তো।”

“শালার মার্কুইস এখন কোথায় আছে?”

“পাশের বাড়িতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে। তুলোন থেকে আসা কোনো পতিতার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। আমি বিকেলে গিয়ে তাকে তুলে আনবো, তারপর আস্তাবলে নিয়ে যাবো। নিজের গাড়িটা পর্যন্ত চালাতে পারবে বলে মনে হয় না। সে জ্যঁ পিয়েরের রান্নাঘরের ঘরটা ব্যবহার করছে, জানো।”

“শুনেছি।”

জ্যঁ পিয়েরে নামটি উল্লেখ করতেই ওয়াশবার্নের রোগীটি পোলট্রির ডিসপেন্স থেকে চোখ সরিয়ে তাদের দিকে তাকালো। এটা স্বয়ংক্রিয় একটি প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই চমকানোর ফলে কসাই কেবল তার উপস্থিতিটা টের পেলো।

“কি হয়েছে? কি চাচ্ছেন আপনি?”

সময় হয়েছে তার ফরাসিটা একটু দুর্বলভাবে বলার। “নাইসের এক বন্ধু আমাকে আপনার কথা বলেছে,” রোগীটি বললো, তার বাচনভঙ্গী লো চোখ দ্য মারের চেয়ে কুয়ে দরসি বলেই বেশি মনে হচ্ছে।

“ওহ?” দোকান মালিকের ভাবভঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো। তার কিছু ক্রেতার মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ-যুবকেরা নিজেদের স্ট্যাটাসের বিপরীত পোশাক পরে থাকে। সাধারণ বান্ধু শার্ট আজকাল ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। “আপনি এখানে নতুন, স্যার?”

“আমার বোটটা রিপেয়ার করা হচ্ছে, আজ রাতে মার্সেই’তে পৌছাতে পারবো ব’লে মনে হচ্ছে না।”

“আমি কি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি?”

রোগীটি হাসলো। “আপনি হয়তো বাবুর্চির কাজে লাগতে পারেন, আমি সেটা বলতে পারছি না। একটু পরেই সে এখানে এসে পৌছাবে, এখানে আমার কিছু ক্ষমতাসালী পরিচিত লোকজন আছে।”

কসাই আর বন্ধুটি হেসে ফেললো। “আমিও সেরকমই মনে করি, স্যার,” দোকানি বললো।

“আমার দরকার এক ডজন কচি হাঁসের মাংস আর আঠারোটি শ্যাঁতুব্রাইয়ে।”

“অবশ্যই।”

“ভালো। আমি আমার ছেলেটাকে সরাসরি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।” রোগীটি মধ্যবয়সী লোকটার দিকে ফিরলো। “ভালো কথা, আপনাদের কথা আমার কানে এসেছে, আমার কিছু করার ছিলো না...তবে এ নিয়ে অতোটা ভাববেন না। আপনরা কি মার্কুইস দামবোয়ের সেই গাধাটার কথা বলছিলেন? আমার মনে হয় কেউ আমাকে বলেছে সে এখানে, আশেপাশে কোথাও থাকে।”

“ওহ, তা নয়, স্যার,” চাকর লোকটি বললো। “আমি মার্কুইস দামবোয়েকে চিনি না। আমি মার্কুইস দ্য শামফোর্দের কথা বলছিলাম। সে খুবই চমৎকার একজন ভদ্রলোক, স্যার। তবে তার সমস্যা আছে। খুবই কঠিন একটি বিয়ে, স্যার। খুবই কঠিন। এটা লুকোছাপার কোনো বিষয় নয়।”

“শামফোর্দ? হ্যা, আমার মনে হয় এর আগে আমাদের দেখা হয়েছিলো। একটু বেটে লোকটা, তাই না?”

“না স্যার, খুবই লম্বা। আপনার মতোই হবে।”

“তাই নাকি?”

দোতলার ক্যাফেটার বিভিন্ন প্রবেশপথ আর সিঁড়িগুলো খুব দ্রুত দেখে নিলো ওয়াশবার্নের রোগী—রকুভোয়ার একজন ডেলিভারিমান সে, ঠিকানাটা নিয়ে খুবই দ্বিধাশ্রিত সে। একটা রান্নাঘর থেকে দ্বিতীয় তলার যাবার জন্যে দুটো সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। অন্যটা সামনের ফ্যারের ঠিক পাশেই। এটা কাস্টমাররা দোতলায় গিয়ে হাত ধোয়ার জন্যে ব্যবহার করে থাকে। ওখানে একটা জানালাও আছে, যা দিয়ে কেউ ইচ্ছে করলেই বাইরে থেকে এই সিঁড়িটা যে ব্যবহার করবে তাকে দেখতে পারবে। রোগীটি নিশ্চিত হলো, সে যদি খুব বেশি সময় ধরে এখানে অপেক্ষা করে তবে সে দু’জন লোককে সেটা ব্যবহার করতে দেখবে।

তারা সন্দেহাতীতভাবেই আলাদা আলাদাভাবে উপরে যাবে। তাদের কেউই হাত ধোবার ঘরে যাবে না, যাবে রান্নাঘরের উপরে শোবার ঘরে। রোগীটি অবাক

হয়ে ভাবতে লাগলো বাইরে পার্ক ক'রে রাখা কোন্ গাড়িটা মারকুইস দ্য শামফোর্দের হতে পারে ।

টাকা ।

মেয়েটা এসে পৌঁছালো একটা বাজার ঠিক একটু আগেই । তার চুলগুলো একেবারে সাদা ধবধবে । তার বিশাল বক্ষ নীল রঙের সিল্কের ব্লাউজ উপচে পড়ছে যেনো । লম্বা পায়ে স্পাইকের হিল জুতো । আঁটোসাঁটো সাদা স্কার্ট । শামফোর্দের হয়তো সমস্যা রয়েছে, তবে মেয়েটারও রুচি আছে ।

বিশ মিনিট বাদে সে জানালা দিয়ে সাদা রঙের স্কার্টটা দেখতে পেলো । মেয়েটা দোতলায় উঠছে । ষাট সেকেন্ডেরও কম সময় বাদে আরেকজন লোক জানালার ফ্রেমে দেখা গেলো । কালো রঙের ট্রাউজার আর রেজার পরা, সতর্কভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে । রোগীটি সময় গুনতে লাগলো । আশা করলো মার্কুইসের কাছে একটা হাতঘড়ি থাকবে ।

তার ক্যানভাস খোলাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে রোগীটি রেস্টোরার প্রবেশপথের দিকে পা বাড়ালো । ভেতরে ঢুকে ফ্যারের বাম দিকে মোড় নিলো সে । সিঁড়ি দিয়ে ধীরেসুস্থে উঠতে থাকা এক বয়স্ক লোককে মাফ করবেন ব'লে অতিক্রম ক'রে গেলো । দ্বিতীয় তলায় উঠেই বাম দিকে মোড় নিলো আবার । সেখানে একটা করিডোর দিয়ে ভবনের পেছনে রান্নাঘরের উপরে চলে এলো । হাত ধোয়ার ঘরটা পেরিয়ে সংকীর্ণ একটা হলওয়ার শেষ মাথায় থাকা বন্ধ একটা দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লো সে । দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো । বয়স্ক লোকটা হাত ধোয়ার ঘরে ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করছে । তারপর লোকটা যখন প্যান্টের জিপার খুলতে যাচ্ছে তখনই দরজাটা আঙুলে ক'রে খুলে ফেললো সে ।

রোগীটি কোনোরকম ভাবনা চিন্তা না করেই তার পুটলিটা তুলে দরজার প্যানেলের উপর রাখলো । দু'হাতে ওটা ধরে রেখে একটু পিছিয়ে গিয়ে তড়িৎ গতিতে নিজের বাম কাঁধ দিয়ে সেই পুটলিটাতে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করলো সে । দরজাটা সটান খুলে গেলে ডান হাতটা দিয়ে দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললো যাতে দেয়ালে গিয়ে সেটা আঘাত না করে । নিচের রেস্টোরার কেউই এই মৃদু শব্দটি শুনতে পেলো না । বুঝতে পারলো না অযাচিতভাবে একজন প্রবেশ করছে ।

“নম দ্য দিউ!” মহিলা কাঁপতে কাঁপতে বললো, “কুয়ে ইস্ত সে...”

“চুপ করুন ।”

মারকুইস দ্য শামফোর্ড সাদা চুলের মহিলার নগ্ন শরীরের উপর থেকে এক ঝটকায় পলি খেয়ে বিছানার শেষ প্রান্তে চলে গেলো । সেখান থেকে একেবারে মোঝাতে । তাকে দেখে কমিক বইয়ের চরিত্রের কথাই মনে পড়বে । এখনও শার্ট, হাটু পর্যন্ত মোজা আর টাই পরে আছে । এই পর্যন্তই । তার শরীরে এর বেশি আর কিছু নেই । মহিলা চাদর টেনে নগ্ন শরীরটা ঢেকে ফেললো । এই বাজে অবস্থাতে যতোদূর সম্ভব অদ্রষ্ট করার চেষ্টা করলো সে ।

রোগীটি সঙ্গে সঙ্গে একটা আদেশ জারি করলো। “জোরে কথা বলবে না। আমি যেমনটি বললাম ঠিক সেরকম করলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।”

“আমার বউ তোমাকে ভাড়া করেছে!” শামফোর্ড আর্তনাদ ক’রে বললো। তার গলা কাঁপছে, চোখ দুটো কুতকুত করছে। “আমি তোমাকে তার চেয়েও বেশি টাকা দেবো!”

“ভালোই বলেছো,” ডাঃ ওয়াশবার্নের রোগী জবাবে বললো। “তোমার শার্ট আর টাইটা খুলে ফেলো। মোজাগুলোও।” সে মারকুইসের হাতে চকচকে সোনার একটা ব্যান্ড দেখতে পেলো সে। “হাত ঘড়িটাও।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদলবদলের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। মারকুইসের পোশাক-আশাকগুলো একেবারে ফিট না হলেও ওগুলো যে খুব দামি সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ঘড়িটা গিরার্দ পেরেগোয়া কোম্পানির, আর শামফোর্ডের পকেটে তেরো হাজার ফ্রাঁ আছে। গাড়ির চাবিটা আরো বেশি চমৎকার।

“ঈশ্বরের দোহাই, তোমার কাপড়গুলো আমাকে দাও!” মারকুইস বললো।

“আমি দুঃখিত, এটা আমি করতে পারবো না,” অনুপ্রবেশকারী জবাব দিলো। সাদা চুলের মেয়েটির আর নিজের কাপড়চোপড়গুলো এক সঙ্গে জড়ো করলো সে।

“তুমি আমারগুলো নিতে পারো না!” চিৎকার ক’রে বললো মহিলা।

“আমি তো বলেছিই, জোরে কথা বলবে না।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে,” মহিলা আবার বলতে লাগলো, “কিন্তু তুমি এসব নিতে...”

“অবশ্যই আমি এসব নিতে পারি।” রোগী ঘরের ভেতরটা তাকিয়ে দেখলো। জানালার পাশে একটা টেলিফোন রাখা আছে। ফোনটা হাতে নিয়ে তারটা বিচ্ছিন্ন ক’রে ফেললো এক টানে। “এখন আর কেউ তোমাদের বিরক্ত করতে পারবে না,” কথাটা বলেই তার ঝোলাটা তুলে নিলো সে।

“তুমি আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, বুঝলে!” শামফোর্ড ক্ষেপে বললো। “তুমি এসব নিয়ে পালাতে পারবে না! পুলিশ তোমাকে খুঁজে বের করবেই!”

“পুলিশ?” অনুপ্রবেশকারী জানতে চাইলো। “তুমি কি আসলেই মনে করো তুমি পুলিশকে জানাবে? তাহলে তো এসবই জানাতে হবে তাদেরকে। আমার মনে হয় না এটা ভালো কোনো কাজ হবে। আমার মনে হয় তোমার উচিত হবে ঐ লোকটার জন্যে অপেক্ষা করা, যে তোমাকে একটু পরে নিতে আসবে। আমি তার কাছ থেকে এরকমটিই বলতে শুনেছি। সব কিছু বিবেচনা ক’রে আমার মনে হচ্ছে তোমার উচিত হবে না পুলিশ-টুলিশ ডাকা। যা ঘটেছে তার চেয়ে অনেক ভালো গল্প তুমি বানিয়ে নিতে পারবে।”

অজ্ঞাত পরিচয়ের চোরটি ঘর থেকে চলে যাবার সময় ভাঙা দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলো ।

তুমি অসহায় নও । তুমি তোমার পথ খুঁজে নেবে ।

এ পর্যন্ত সে তাই করেছে আর সেটা একটু ভীতিকরই । ওয়াশবার্ন কি বলেছিলেন? তার দক্ষতা আর প্রতিভা ফিরে আসবে...তবে আমার মনে হয় না সেগুলো দিয়ে তুমি তোমার অতীতকে কিংবা অতীতের সাথে কোনো রকম সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে । অতীত । বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় সে যে ধরণের দক্ষতা দেখিয়েছে তাতে কী ধরণের অতীতকে নির্দেশ করে সেটা? নিজের পা আর হাত দুটোকে হাতুড়ির মতো করে চমৎকার ব্যবহার ক’রে তোলার শিক্ষাটা সে কোথেকে অর্জন করেছে? ঠিক কোথায় ঘুমি মারতে হবে সেটাই বা সে জানলো কী করে? হিংসাত্মক কাজ করার শিক্ষাটা তাকে কে দিলো? কি করেছে বা সে দ্রুত হিসেব কষে ঘটনা ঘটাতে পারছে? কসাইয়ের দোকানে গিয়ে অন্যদের কথাবার্তা আঁড়ি পেতে শোনার শিক্ষাটাই বা কে তাকে দিলো? তার চেয়েও বড় কথা, অপরাধ করার সিদ্ধান্ত চট ক’রে নেবার ব্যাপারটা । হায় ঈশ্বর, সে কিভাবে করতে পারে এসব?

তুমি যতো বেশি জোর ক’রে মনে করতে চাইবে, ততো বেশি ক্ষতি হবে । খুবই বাজে হবে সেটা ।

সে পথঘাট আর মারকুইস দ্য শামফোর্ডের জাওয়ারের ড্যাশবোর্ডের দিকে মনোযোগ দিলো । সামনের যন্ত্রপাতিগুলো তার কাছে অপরিচিত নয় । তার অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে এরকম কোনো গাড়ির সম্পর্ক নেই । সে ধারণা করলো এটা তাকে একটা কিছু বলছে ।

এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সে প্রশস্ত খালের উপর একটা বৃজ অতিক্রম ক’রে ফেললো, সে জানে মার্সেই’তে পৌঁছে গেছে সে । চারকোনা পাথরের বাড়িঘর সব । মনে হচ্ছে পানির উপর থেকে মাথা উঁচু ক’রে দাঁড়িয়ে আছে সর্বত্রই সংকীর্ণ পথঘাট আর দেয়াল—পুরনো হারবারের প্রান্তসীমা । সে এটার সবই জানে, তারপরও সে এটা চেনে না । দূরের এক পাহাড়ের চূড়ায় একটা ক্যাথেড্রাল দেখা যাচ্ছে, ভার্জিন মেরির একটি মূর্তিও দৃশ্যমান । নতরদেম দালা গার্দে । নামটা তার মনে পড়লো । এটা সে আগেও দেখেছে—তারপরও এটা সে দেখে নি ।

ওহু, ঈশ্বর! এটা থামাও!

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে শহরের কেন্দ্রে এসে পড়লে জনাকীর্ণ পথঘাট দিয়ে গাড়িটা চলতে লাগলো । দামি দামি সব দোকানপাট । দু’পাশের মূল্যবান কাঁচে বিকেলের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে । ফুটপাথের একপাশে অসংখ্য ক্যাফে আছে । সে বায়ে হারবারের দিকে মোড় নিলো । ওয়্যারহাউজ আর ছোটো ছোটো কারখানা অতিক্রম করলো একে একে । দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ।

সহজাত প্রবৃত্তি। সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করো। প্রতিটি জিনিসেরই তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার উপযোগীতা রয়েছে। যদি ছোড়া হয় তো একটা পাথরেরও ব্যবহার আছে। অথবা একটা যানবাহন, যদি কেউ চায় সেটা। যেখানে নতুন আর পুরনো গাড়ি পার্ক ক'রে রাখা আছে সেরকম একটি জায়গায় সে গাড়িটা পার্ক ক'রে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো।

বেড়ার পেছনে একটা গ্যারাজ দেখা গেলো, যন্ত্রপাতি হাতে মেকানিকের দল ছোট্টাছুটি করছে। বেশ অনায়াস ভঙ্গীতে ভেতরে হটতে লাগলো সে; হালকা পাতলা স্ট্রাইপ শার্ট পরা এক লোককে সে দেখতে পেয়ে তার সহজাত প্রবৃত্তি বলছে সেই লোকটার সাথে কথা বলতে হবে।

গাড়ির চাবিটার বিনিময়ে পাওয়া গেলো ছয় হাজার ফ্রাঁ। এটা শামফোর্ডের গাড়িটার পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাম। এরপর ডাক্তার ওয়াশবার্নের রোগী একটা ট্যাক্সি নিয়ে ড্রাইভারকে বললো কোনো বন্ধকী দোকানে নিয়ে যেতে—তবে প্রতিষ্ঠিত কোনো দোকানে নয়। ঐসব দোকানে খুব বেশি প্রশ্ন করা হয়। আঘাট পরেই গিরার্দ পেরেগৌয়া ঘড়িটা তার হাতে আর শোভা বর্ধন করলো না। তার বদলে পাওয়া গেলো একটা সিকো ঘড়ি আর সেই সঙ্গে নগদ আটশো ফ্রাঁ। বাস্তবতার নিরিখে সব কিছুই মূল্য রয়েছে। এই ঘড়িটা শক্ প্রফ।

পরবর্তী গন্তব্য হলো লা ক্যানাবিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটা মাঝারি গোছের ডিপার্টমেন্ট স্টোর। জামা-কাপড় পছন্দ করা হলে মূল্য পরিশোধ ক'রে ফিটিংরুমে গিয়ে সেগুলো পরাও হলো। বাজেভাবে ফিটিং হওয়া একটা রেজার আর ফুলপ্যান্ট ফেলে দেয়া হলো পরিষ্ঠ্যাক্ত অবস্থায়।

আরেক তলায় গিয়ে একটা নরম চামড়ার সুটকেস কিনে তাতে বাড়তি কাপড় আর আগের কাপড়ের ঝোলাটা রেখে দিলো সে। রোগীটি তার নতুন ঘড়ির দিকে তাকালো, বিকেল পাঁচটা বাজে প্রায়। একটা আরামদায়ক হোটেল খুঁজে বের করতে হবে এখন। সে কয়েক দিন ধরে সত্যিকার অর্থে ঘুমায় নি। রুই সারাসিনের ক্যাফে লো চোখ দ্য মারের মিটিংয়ের আগে তাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। এই মিটিংটা সফল হলেই সে জুরিখে যেতে পারবে।

বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে আছে সে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের বাতির আলো জানালা দিয়ে ঢুকে ছাদে বিভিন্ন ধরনের আলোর নাচন হচ্ছে। মার্শেই'তে রাত নামতেই রোগীর মনে হতে লাগলো তার মুক্তিও ঘনিয়ে আসছে। সে নিজের সম্পর্কে ভিন্ন কিছুও জানতে পারছে; রাতের বেলায় বেশি স্বস্তি বোধ করে সে। অর্ধ ক্ষুধার্ত বেড়ালের মতো রাতকেই খাবার অন্বেষণের জন্যে বেশি সুবিধাজনক মনে করে। তারপরও স্ববিরোধীতা আছে, আর সে নিজেও সেটা জানে। পোর্ত নোয়ে'র

কয়েক মাসের সময়টাতে সে সূর্যালোকের জন্যে ব্যাকুল ছিলো। প্রতি ভোরে তার জন্যে অপেক্ষা করতো সে। কেবল কামনা করতো অন্ধকার যেনো বিতারিত হয়।

তার মধ্যে কিছু একটা ঘটছে। বদলে যাচ্ছে সে।

কিছু একটা ঘটেছে। চার ঘণ্টা আগে সে ভূ-মধ্যসাগরে একটা মাছ ধরার ট্রালারে ছিলো, পকেটে ছিলো দু'হাজার ফ্রাঁ আর মনে ছিলো একটা উদ্দেশ্য। দু'হাজার ফ্রাঁ হোটেল লবিতে এক্সচেঞ্জ ক'রে পাওয়া গেলো পাঁচশ'রও কম আমেরিকান ডলার। এখন সে মোটামুটি দামি পোশাক পরে, দামি একটা হোটেলে শুয়ে আছে, তার পকেটে আছে মারকুইস দ্য শামফোর্দের কাছ থেকে নেয়া তেইশ হাজার ফ্রাঁ। তার মানে ছয় হাজার আমেরিকান ডলার।

সে কোথেকে এসেছে যে, এরকম কাজ করতে সক্ষম হলো?

এটা ভেবো না! এসব ভাবা বন্ধ করো!

রুই সারাসিন শহরটা খুবই পুরনো। ইটের প্রশস্ত পথঘাটগুলো বড় বড় সড়কের সাথে গিয়ে মিশেছে, সবই শত বছরের পুরনো। কিন্তু এটা হলো মার্সেই। প্রাচীন সহাবস্থান করে পুরনোর সাথে। রুই সারাসিন দুইশত ফিটের বেশি দীর্ঘ হবে না। পাথরের দেয়ালে সময় জমে আছে। হারভার থেকে ভেসে আসা কুয়াশায় ল্যাম্পপোস্টের বাতির আলো ম্রিয়মান হয়ে গেছে।

একমাত্র যে শব্দ আর আলো দেখা যাচ্ছে সেটা আসছে লো চোখ দ্য মার থেকে। প্রশস্ত গলির মাঝখানে ক্যাফেটা অবস্থিত। এটা উনিশ শতকীয় একটি অফিস ভবনের অংশ। চেয়ার টেবিলের জায়গা দখল করেছে সুদীর্ঘ বার আর টুল। অনেকগুলো টেবিল চেয়ার রাখা হয়েছে মিটিং করার জন্যে। একটা বড় পর্দা দিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। কোনো দরজা নেই।

জনাকীর্ণ টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে রোগীটি ঘন ধোয়া আর মাতাল লোকদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো। মদে মত্ত সৈনিক আর মৎস্যজীবীরা হৈ হল্লা করছে। এক মুঠো ফ্রাঁ'র বিনিময়ে বিছানায় যেতে মুখিয়ে আছে লাল মুখের বেশ্যারা। চারপাশে খোঁজাখুঁজি ক'রে অবশেষে ক্যান্টেনের দেখা পাওয়া গেলো। তার সঙ্গে টেবিলে আরেকজন লোক বসে আছে। হালকা-পাতলা, ফ্যাকাশে মুখের, ছোটো ছোটো চোখে সে কৌতুহলী বাচ্চা ছেলের মতো চেয়ে আছে।

“বসো,” ক্যান্টেন বললো। “আমি ভেবেছিলাম একটার আগেই তুমি এখানে এসে পড়বে।”

“আপনি বলেছিলেন নয়টা থেকে এগারোটার মধ্যে। এখন তো পৌনে এগারোটা বাজে।”

“তুমি বেশি সময় নিয়েছো, সুতরাং হুইস্কির পয়সা তুমিই দেবে।”

“খুশি মনে দেবো, তাদের কাছে আরো ভালো কিছু থাকলে অর্ডার দিন ।”

হালকা পাতলা লোকটি হাসলো । কাজটা বেশ ভালো মতোই হবে মনে হচ্ছে । তাই হলো । এই পৃথিবীতে পাসপোর্ট এদিক ওদিক করাটাই সবচাইতে কঠিন কাজ, তবে বেশ যত্ন নিয়ে, ভালো যন্ত্রপাতি আর দক্ষ হাতে করতে পারলে সেটা করা যেতে পারে ।

“কতো লাগবে?”

“এইসব কাজ খুব একটা সস্তায় করা যায় না । পঁচিশশ’ ফ্রাঁ ।”

“সেটা আমি কখন পাবো?”

“যত্নসহকারে, ভালো মতো করতে গেলে সময় লাগবে । তিন থেকে চারদিন তো লাগবেই । তারপরও কাজটা যে করবে তার উপর বেশ চাপ পড়ে যাবে । সে আমাকে রীতিমতো গালাগালি করতে শুরু ক’রে দেবে ।”

“আগামীকাল দিতে পারলে বাড়তি আরো এক হাজার ফ্রাঁ দেবো ।”

“সকাল দশটার মধ্যে,” ফ্যাকাশে মুখের লোকটা খুব দ্রুত বললো । “আমি তাহলে গালাগালিটা সহ্য ক’রে নিলাম ।”

“সেই সঙ্গে এক হাজার ফ্রাঁ,” ঘোৎঘোৎ ক’রে ক্যান্টেন বললো । “পোর্ট নোয়ে থেকে তুমি কি নিয়ে এসেছো? ডায়মন্ড নাকি?”

“প্রতিভা,” রোগীটি জবাব দিলো, যদিও শব্দটার মানে সে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না ।

“আমার একটা ছবির দরকার হবে,” পাশের লোকটা বললো ।

“আসার পথে সেটা তুলে এনেছি,” রোগীটি বললো । পকেট থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি বের করলো সে । “আমি নিশ্চিত মহামূল্যবান যন্ত্রপাতির সাহায্যে আপনি এটা আরো ভালো করতে পারবেন ।”

“পোশাকটা চমৎকার,” ক্যান্টেন কথাটা বলেই ছবিটা তুলে নিয়ে পাশের লোকটার কাছে দিয়ে দিলো ।

“দর্জি খুব ভালো ছিলো,” রোগীটি একমত হয়ে বললো ।

সকালে দেখা করবার জায়গাটি ঠিক করা হলো, চুকানো হলো মদের মূল্যও, আর টেবিলের নিচ দিয়ে ক্যান্টেনকে দেয়া হলো পাঁচশ’ ফ্রাঁ । আলোচনা পর্বের সমাপ্তি হলে ক্রেতা টেবিল ছেড়ে উঠে ভীড় ঠেলেঠেলে দরজার দিকে চলে গেলো ।

এতো দ্রুত, এতো আচম্কা আর অপ্রত্যাশিতভাবে এটা ঘটলো যে, ভাববার কোনো সময়ই পেলো না । কেবল প্রতিক্রিয়া ।

ধাক্কাটা আচম্কা লাগলো, কিন্তু যে চোখটা তার দিকে চেয়ে আছে সেটা মনে হচ্ছে অন্য কিছু । মনে হচ্ছে চক্ষু দুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসবে । অবিশ্বাসে হিস্টিরিয়াথ্রস্টের মতো গোল গোল হয়ে আছে সেটা ।

“না! হায় ঈশ্বর, না! এটা হতে পারে না—”

রোগীটি সামনের দিকে এগিয়ে গেলে লোকটা ভীড়ের মধ্যেই ঘুরে চলে যেতে উদ্যত হলে জেসন পেছন থেকে লোকটার কাঁধে হাত রাখলো ।

“একটু দাঁড়ান!”

লোকটা তার কাঁধ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবারো সামনের দিকে পা বাড়াতে বাড়তে বললো, “তুমি! তুমি মরে গেছো! তুমি বেঁচে থাকতে পারো না ।”

“আমি বেঁচে আছি । তুমি কি জানো?”

মুখটা এবার বিকৃত হয়ে গেলো । প্রচণ্ড ভয় জেঁকে বসলো তার চোখে-মুখে । চোখ দুটো কুচকে আছে । মুখটা হা করা । লোকটার হলুদ রঙের নোংরা দাঁত দেখা যাচ্ছে । আচমকা একটা ছুরি বের ক’রে রোগীর পেটের দিকে মারতে উদ্যত হলো লোকটি । “আমি জানি, আমাকেই এটা শেষ করতে হবে ।” লোকটা আপন মনে বিড়বিড় ক’রে কথাটা বললো । রোগীটি তার ডান হাত দ্রুত পেটুলামের মতো ঘুরিয়ে দিলে তার সামনে তেড়ে আসা হাতটাকে সরিয়ে দিলো ।

ঘুরে তার বাম পা-টা শূন্য ভাসিয়ে দিয়ে আক্রমণকারীকে কষে একটা লাথি মারলো সে । আঘাতটা লাগলো মূলত গোপনাঙ্গে ।

“সি-সাহ্ !” কথাটা তার কানে প্রতিধ্বনি করলো ।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে তিনজন মাতালের উপর গিয়ে পড়লে হাতের ছুরিটাও ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেলো । অস্ত্রটা সবাই দেখতে পেয়ে হৈ হল্লা শুরু ক’রে দিলো । কয়েক জন লোক একসঙ্গে এগিয়ে এসে তাদের দু’জনকে মারামারি করা থেকে বিরত রাখলো । “বেরিয়ে যাও এখান থেকে!”

“বাইরে গিয়ে ইচ্ছেমতো ঝগড়াঝাটি করো!”

“আমরা চাই না পুলিশ এখানে আসুক, শালার মাতালের দল । বানচোত কোথাকার!”

ক্ষুব্ধ মার্সেই’র গালাগালি লো চোখ দ্য মারের হৈহল্লা ছাপিয়ে শোনা গেলো । রোগীটি ফিরে তাকিয়ে দেখলো তার আক্রমণকারী নিজের বিচি ধরে কোনো মতে বের হয়ে যাচ্ছে । দরজা খুলে গেলে রুই সারাসিনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো লোকটা ।

তাকে মারতে চাইছিলো যে লোকটা সে জানতো সে মরে গেছে । কিন্তু এখন জেনে গেছে সে বেঁচে আছে ।

অধ্যায় ৪

কারাতেল থেকে জুরিখের এয়ার ফ্রাসের ইকোনোমি ক্লাশের সেকশনটা একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ। সংকীর্ণ আসনগুলো পুনের ঝাঁকিতে আরো বেশি অস্বস্তিকর লাগছে। মায়ের কোলে শুয়ে চিৎকার ক'রে কাঁদছে একটা বাচ্চা। বাকি বাচ্চা দুটোপয়ে ফুঁপিয়ে নিজের কান্না দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে; বাবা মার ভয়ে অথবা কোনো কিছুর আশ্বাসে। বেশিরভাগ যাত্রীই চুপচাপ আছে। কেউ কেউ পান করছে মদ। কতিপয় লোক চেষ্টা করছে জোর ক'রে হাসার যা তাদের ভীতিটাকেই প্রকাশ করছে। বিমান যাত্রা অনেকের কাছেই ভীতিকর, কিন্তু কেউই এই ভীতিটাকে জয় করতে পারে না। যখন মানুষ নিজেকে মাটি থেকে ত্রিশ হাজার ফিট উপরে ধাতব কোনো বাক্সে আবদ্ধ করে তখন সে যারপরনাই হুমকীর মুখে পড়ে যায়। কোনোভাবে নিচে পড়ে গেলে তার শরীরটা মাংসের দলা হয়ে যাবে। সে সময়ে একজন মানুষের মনে কী ধরনের প্রশ্ন ঘুরপাক খাবে? কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে?

রোগীটি সেই জবাব খোঁজার চেষ্টা করলো। এটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে বসে আছে জানালার পাশে, তার চোখ বিমানের ডানার দিকে, প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাসের আঘাতে সেই ধাতব ডানাটি কাঁপছে। বাতাসের স্রোত একে অন্যকে ধাক্কা দিচ্ছে। মনুষ্য তৈরি খোলনলচেটাকে আঘাত করছে আর বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির অসীমতায় এই মনুষ্যসৃষ্ট জিনিসটা একেবারেই তুচ্ছ। বাইরে থেকে এক আউপের একটা আঘাতেই বিমানটা ভেঙে পড়তে পারে। বিক্ষোভিত হয়ে লোকগুলোসহ ডিটিকে পড়তে পারে খোলা আকাশেই।

সে কি করবে? কি করার কথা ভাববে? মৃত্যুর সীমাহীন ভীতি ছাড়া কি সে অন্যকিছু ভাবতো? এটা নিয়েই তাকে আরো ভাবতে হবে। পোর্ট নোয়ে'তে ডাঃ ওয়াশবার্ন এটাই তার মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করেছেন। ডাক্তারের কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেলো তার।

যখনই তুমি খুব চাপযুক্ত পরিবেশে পড়বে—নিজেকে তার মধ্যে প্রোথিত করবে, কোনোভাবেই বিযুক্ত করবে না। যতোটা মুক্তভাবে সম্ভব মানিয়ে নেবার চেষ্টা করবে; কথা আর ছবিগুলো তোমার মাথায় প্রবেশ করতে দেবে। সেগুলোর মধ্যেই তুমি কু ঝুঁজে পাবে।

রোগী জানালা দিয়ে চেয়ে রইলো। সচেতনভাবেই নিজের অবচেতন মনটাকে আগিয়ে তোলার চেষ্টা করলো সে। কাঁচের বাইরে প্রকৃতির হিংস্রতার দিকে চোখ দুটো স্থির ক'রে রাখলো যাতে ছবি আর শব্দ তার স্মৃতিতে ভরে উঠে।

তারা এলো—আস্তু আস্তু । আবারো অঙ্ককার দেখা যাচ্ছে । বিক্ষুব্ধ বাতাসের শব্দ ক্রমাগতভাবে বাড়তে লাগলো যতঃক্ষণ না সে ভাবলো তার মাথাটা বুঝি বিক্ষোবিত হয়ে যাবে । তার মাথা...বাতাস তার মাথা এবং মুখের বাম দিকে এসে ঝাপটা মারছে । তার শরীরের চামড়া পুড়িয়ে ফেলছে । বাম কাঁধটাকে রক্ষা করার জন্যে তুলতে বাধ্য হলো সে...বাম কাঁধ । বাম হাত । তার হাতটা উঠে গেলো । তার বাম হাতের আঙুলগুলো একটা সোজা ধাতব জিনিসের প্রাপ্ত ধরে রেখেছে । ডান হাতটা ধরে রেখেছে...একটা স্ট্র্যাপ । স্ট্র্যাপটা ধরে কিছু একটার জন্যে অপেক্ষা করছে সে । একটা সিগনাল, একটা ফ্লাশিং লাইট অথবা কাঁধে একটা মৃদু চাপড়, অথবা দুটোই । একটা সিগনাল । সেটা এলো । ডুবে গেলো সে অঙ্ককারের মধ্যে । একটা শূন্যতার মধ্যে তার শরীরটা উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে রাতের আকাশে । সে...প্যারাসুট পরে আছে ।

“ইতেভু মালাদে?”

পাশে বসা নার্তাস প্যাসেঞ্জার তার বাম হাতটা স্পর্শ করলে ভেঙে গেলো তার উন্মাদগ্রস্ত দিবাম্বলুটা—হাতটা একটু উপরে তোলা ছিলো । হাতের আঙুলগুলো এমনভাবে ছড়ানো ছিলো যেমন সেগুলো কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করছে । তার ডান হাতটার বাহু তার বুক চেপে আছে । সেই হাতের আঙুলগুলো ধরে আছে কলারটা, কাপড়টাকে খামচে ধরে রেখেছে সে । তার কপাল বেয়ে দরদর ক’রে ঘাম বরছে । এটা ঘটছে । অল্প সময়ের জন্যে অন্য কিছুর উদয় হলো ।

“ক্ষমা করবেন,” হাতটা নামিয়ে বললো সে । “উ মভোয়া রেভে,” সে অর্থহীনভাবেই বললো কথাটা ।

ছেদ পড়লো একটা । এজন স্টুয়ার্ডসের হাসি হাসি মুখটা দেখা গেলো আবার । বিব্রতকর যাত্রীরা একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে ।

রোগীটি তার চারপাশে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না । তার চোখ আর কানে যেসব ছবি আর শব্দ এসেছিলো সেগুলো নিয়ে ভাবছে সে । একটা প্লেন থেকে লাফ দিচ্ছে...রাতের বেলা...নীল, ধাতব, আর স্ট্র্যাপ তার বুকে কোমরে জড়িয়ে আছে । প্যারাসুট পরে আছে সে । কোথায়? কেন?

নিজেকে অত্যাচার করা বন্ধ করো!

নিজের এই ভাবনাটা দূর করার জন্যে বুক পকেট থেকে বদলে ফেলা পাসপোর্টটা বের করলো সে । যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিলো, ওয়াশবার্ন নামটি উদয় হলো আবার । জিওফ্রে আর. বদলে জর্জ পি. করা হয়েছে দক্ষতার সাথেই । অক্ষরগুলো তুলে নতুন নামটি বসানো হয়েছে । ছবিটা ঢোকানো হয়েছে আরো দক্ষতায় । এটাকে আর রাস্তার পাশে সস্তা কোনো আর্কেড থেকে তোলা ছবি ব’লে মনে হচ্ছে না । আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা অবশ্যই একদম ভিন্ন, নিশ্চয়তা দেয়া আছে কোনো ইমিগ্রেশনের কম্পিউটারে এটা ধরা পড়বে না । যতঃক্ষণ না আসল মালিক তার পাসপোর্টটা সাবমিট করছে ইন্সপেকশনের জন্যে । সেই সময় থেকে

এটা হয়ে যাবে ক্রেতার দায়িত্ব। বেশ ভালো পরিমাণ টাকা দেয়া হয়েছে কাজটা নিখুঁতভাবে করার জন্যে। ইন্টারপোল আর ইমিগ্রেশনের সাথে কানেকশান না থাকলে এটা করা সম্ভব নয়। ইউরোপিয়ান সীমান্তগুলোর কাস্টমস্ অফিসার আর কম্পিউটার ক্লার্কদেরকে এজন্যে নিয়মিত টাকা দেয়া হয়। তারা খুব কমই ভুল করে।

জর্জ পি. ওয়াশবার্ন। এই নামটিতে মোটেও অভ্যস্ত নয় সে। নামটি পাসপোর্টের সত্যিকারের মালিকের। যে কিনা নিজের পরিচয় লুকিয়ে পালিয়ে আছে প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে। কিন্তু সে চাচ্ছে নিজের পরিচয় উদঘাটন করতে। জানতে চাচ্ছে সে কে।

অথবা সে কি করেছে?

যাইহোক, প্রশ্নের জবাবটা নিহত আছে জুরিখে। আর জুরিখে আছে...

“মেদামে এত মঁসিয়ে। নু কমেকোয়ঁ নতর দিসেস্তে পোর লায়ারোপোর্তে দ্য জুরিখ।”

সে হোটেলের নামটি জানে : ক্যারিলন দুলাক। ট্যান্সি ড্রাইভারকে সে কোনো রকম না ভেবেই এই নামটি বলেছিলো। কোথাও কি সে এই নামটি পড়েছে? এই নামটি কি সে প্লেনের সামনের সিটগুলোতে স্বাগতম জুরিখ লেখাটার নিচে দেখেছে?

না। লবিটা সে চেনে। যেভাবেই হোক না কেন, ভারি পালিশ করা কালো রঙের কাঠটা তার কাছে পরিচিত। আর বিশাল কাঁচের জানালা, যেটা দিয়ে লোক জুরিখ দেখা যায়, সেটাও। এখানে এর আগেও এসেছে সে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেও এর আগে এসেছে—মার্বেলের কাউন্টারের সামনে—অনেক দিন আগে।

ডেস্কে বসা ক্লার্কের কথায়ও সেটা আরো নিশ্চিত করে বোঝা গেলো। সেটা যেনো আঘাত হানলো বিস্ফোরণের মতো।

“আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে, স্যার। অনেক দিন পরে এলেন।”

তাই নাকি? কতোদিন পরে? আরে বাবা, তুমি আমার নাম ধরে ডাকছো না কেন? ঈশ্বরের দোহাই লাগে। আমি তোমাকে চিনি না। আমি আমাকেও চিনি না। আমাকে সাহায্য করো। দয়া ক’রে সাহায্য করো!

“হ্যা, অনেক দিন পরে,” সে বললো। “একটু সাহায্য করুন তো। আমার হাতটা একটু মচকে গেছে, লিখতে খুব সমস্যা হচ্ছে। আপনি যদি রেজিস্ট্রেশনটা ক’রে দেন, তাহলে আমাকে কেবল স্বাক্ষর ক’রে দিলেই হবে।” রোগীটি তার নিঃশ্বাস বন্ধ ক’রে রাখলো।

হয়তো কাউন্টারের এই ভদ্রলোক তার নামটা আবারো বলতে বলবে, অথবা নামের বানানটি কি সেটা জানতে চাইবে?

“অবশ্যই।” ক্লার্ক একটা কার্ডে লিখতে লাগলো। “আপনি কি হোটেলের ডাক্তারকে দেখাবেন?”

“পরে দেখাবো। এখন না।”

ক্লার্ক লিখে কার্ডটা উল্টো করে তার সামনে তুলে ধরলো স্বাক্ষর করার জন্যে।

মি: জে. বর্ন। নিউইয়র্ক, ইউ.এস.এ।

সে কার্ডটার দিকে সম্মোহিতের হয়ে রইলো। তার একটা নাম আছে—নামের একটা অংশ। একটা দেশ এবং যে শহরের সে থাকে তার নামও।

জে. বর্ন। জন? জেমস? জোসেফ? জে-তে কি হয়?

“কোনো ভুল হয়েছে কি, হের বর্ন?” ক্লার্ক জানতে চাইলো।

“ভুল? না, মোটেও না।” কলমটা তুলে নিলো সে। তাকে কি তার নামের প্রথম অংশটা লিখতে হবে? না। ক্লার্ক যেমনটি লিখেছে সে ঠিক তেমনটিই লিখবে।

মি: জে. বর্ন।

সে নামটা যতোটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে লিখলো, নিজের মনটাকে একেবারে মুক্ত করে, যে ছবি আর শব্দ আসতে পারে সেটার সুযোগ করে দিয়ে। কিন্তু কিছুই এলো না। সে অনেকটা অপরিচিত একটা নামই স্বাক্ষর করলো। তার কোনো অনুভূতিই হলো না।

“আপনি আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন, মেইন হের,” ক্লার্ক বললো। “আমি ভাবছিলাম, হয়তো আমি কোনো ভুল করে ফেলেছি। খুব ব্যস্ত একটা সপ্তাহ গেছে। দিনটা ছিলো আরো ব্যস্ততম। কিন্তু তারপরও আমি খুবই নিশ্চিত ছিলাম।”

সে যদি ভুল করতো? যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির মি: জে. বর্ন ভাবতেই পারলো না সম্ভাবনাগুলোর কথা। “আপনার স্মরণ শক্তির ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না...হের স্টসেল,” রোগীটি ক্লার্কের পেছনের দেয়ালে লেখা নামটি পড়ে বললো। কিন্তু লোকটা ক্যারিলন দুলাকের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার।

“আপনার দয়া, স্যার।” অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার একটু সামনে ঝুঁকে বললো। “আমার মনে হয় আপনি এখানে সচরাচর যেরকম রুম আর সার্ভিস পেতেন সেরকম কিছুই আজকে চাচ্ছেন?”

“কিছু হয়তো বদলে যাবে,” জে. বর্ন বললো। “এর আগে আপনাকে কি বলা হয়েছিলো?”

“ডেস্কে যেই ফোন করুক অথবা খোঁজ করুক, তাকে যেনো বলা হয় আপনি হোটеле নেই। আর আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আপনাকে সেটা জানিয়ে দিতে হবে। কেবল আপনার নিউইয়র্কের ফার্মটি বাদে। ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান, কর্পোরেশন, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে।”

আরেকটা নাম! এটা সে ওভারসিস কল ক'রে জেনে নিতে পারে। টুকরো টুকরো তথ্য জড়ো হচ্ছে। উত্তেজনা আর আনন্দ ফিরে এলো।

“ঠিক আছে। আমি আপনার কর্মতৎপরতার কথা ভুলবো না।”

“এটা জুরিখ,” লোকটি জবাব দিলো। “আপনি সব সময়ই খুব উদার, হের বর্ন। পেইজ—হিয়ার হের, বিত্তে!”

পেইজের পেছন পেছন লিফটের দিকে যাওয়ার সময় কয়েকটা বিষয় বেশ পরিস্কার হয়ে গেলো বর্নের কাছে। তার একটা নাম আছে, আর হোটেলের ম্যানেজার কেন এতো দ্রুত তার নামটি স্মরণ করতে পারলো সেটাও বুঝতে পারছে সে। তার একটা দেশ আছে, শহর আছে এবং একটা ফার্মও আছে যেখানে সে চাকরি করে—অথবা করতো। আর যখনই সে জুরিখে আসতো তখনই তাকে অপ্রত্যাশিত এবং অযাচিত ভিজিটরদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্যে কিছু ব্যবস্থা নেয়া হতো। এই ব্যাপারটাই সে বুঝতে পারলো না। কেউ নিজেকে পুরোপুরি রক্ষা করবে নাহয় একদমই রক্ষা করবে না। এতো ঢিলেঢালা প্রক্রিয়ায়, এরকম একটি হোটеле নিজেই কতোটুকুই বা রক্ষা যাবে? মুহূর্তেই তার মনে হলো, এটা যেনো বাচ্চা-ছেলেপুলের চোর-পুলিশ খেলা। আমি কোথায়? চেষ্টা করো আমাকে খোঁজার। আমি উচ্চস্বরে কিছু বলে তোমাদের একটা ইঙ্গিত দেবো।

তবে এটা কোনো পেশাদার কাজ নয়। কিন্তু বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টায় সে যা শিখেছে তাতে তার মনে হচ্ছে সে একজন পেশাদার লোক। এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই, তারপরও এ নিয়ে কোনো তর্ক করা চলে না।

নিউইয়র্কের অপারেটরের কণ্ঠটা ক্ষীণ শোনালো। মেয়েটির বক্তব্য খুব পরিস্কার আর চূড়ান্ত। “এ ধরনের কোনো কোম্পানি আমাদের তালিকায় নেই, স্যার। আমি সব তালিকা চেক ক'রে দেখেছি, একেবারে সাম্প্রতিক তালিকাটাও, ট্রেডস্টোন নামের কোনো কোম্পানি নেই—নামের পরে যে সংখ্যাটা উল্লেখ করেছেন, তারও কোনো হদিস পাওয়া যায় নি।”

“হয়তো তারা একটু সংক্ষেপে লিখে দিয়েছে...”

“এই নামে কোনো ফার্ম বা কোম্পানি নেই, স্যার। আমি আবাবো বলছি, আপনার কাছে যদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় কোনো নাম থাকে, অথবা প্রতিষ্ঠানটি যেধরনের কাজ করে সেটা যদি বলতেন তো সাহায্য করতে পারি।”

“নাম ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই, ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান, নিউইয়র্ক, সিটি।”

“এটা খুবই অদ্ভুত নাম, স্যার। আমি নিশ্চিত, তালিকায় নামটা থাকলে খুব সহজেই আমি খুঁজে দিতে পারতাম। আমি দুঃখিত।”

“আপনাকে কষ্ট দিলাম, ধন্যবাদ।” জে. বর্ন ফোনটা রেখে দিলো। এরকম দিকবিহীনভাবে এগোনো যাবে না। নামটা এক ধরনের কোডের মতো। এ দিয়ে হয়তো কোনো ঠিকানা বোঝানো হয় নি।

বুরোর দিকে এগোলো সে, ওখানে তার মানিবাগ আর সিকো ঘড়িটা রেখেছিলো। মানিবাগটা পকেটে রেখে সিকো ঘড়িটা হাতে পরে নিলো বর্ন। আয়নায় তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, “তুমি জে. বর্ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, নিউইয়র্কের বাসিন্দা, আর ‘০৭১৭১২০১৪২০৬০’ সংখ্যাটা তোমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস।”

রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে অভিজাত ব্যাংক ব্যানহফস্ট্রাসের ভবনটা দারুণ দেখাচ্ছে। ডাঃ ওয়াশবার্নের রোগী সেই ব্যাংকে প্রবেশ করলো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারলো এখানে এর আগেও সে এসেছে। তবে অন্যসব ছবির মতো এই জায়গার ছবিটা ততোটা শক্তিশালী নয়। তার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তির ভাব উদ্ভূত হলো, কিন্তু এরকম গেইমেনশেফ্ট ব্যাংকে ঢুকে এইসব বাজে অনুভূতি বাদ দিতে হবে, নইলে উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে যাবে।

কিন্তু এখন আর এটা বাদ দেয়া গেলো না।

“বর্জুং মঁসিয়ে। ভু দিসাইরেজ...?” ব্যাংকের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা এক ভদ্রলোক জানতে চাইলো। ফরাসিতে বলার কারণ হয়তো ক্লায়েন্টের পোশাক আশাক।

“আমাকে একটা ব্যক্তিগত আর গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে হবে,” জে. বর্ন জবাব দিলো ইংরেজিতে। নিজের স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজি উচ্চারণ শুনে আরেক বার সে নিজেই চমকে গেলো। ইংরেজি ব্যবহার করা হয়েছে দুটো কারণে : সে ব্যাংকের কর্মচারিটির ধারণা ভুল প্রমাণ ক’রে দিতে চায়, আর পরবর্তী ঘটনায় কোনো কিছু ভুলবোঝাবুঝি হোক সেটা চায় না।

“ক্ষমা করবেন, স্যার,” লোকটা বললো। তার ভুরু কিছুটা কুচকে আছে। ক্লায়েন্টের টপকেটিটা ভালো ক’রে দেখছে সে। “আপনার বাম দিকের লিফটে স্যার, তৃতীয় তলা। ওখানকার রিসেপশনিস্ট আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।”

যে রিসেপশনিস্টের কথা বলা হলো সে মধ্য বয়স্ক, ছোটো ছোটো ক’রে চুল কাটা আর চশমা পরা এক লোক। “আপনি কি সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের সাথে কোনো গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িত, স্যার?” জানতে চাইলো সে। ক্লায়েন্টের বলা কথাটাই সে প্রতিধ্বনিত করলো।

“হ্যা।”

“আপনার স্বাক্ষর, গুজ,” ব্যাংকের একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললো পোকটা। সেখানে দুটো স্বাক্ষর করার ঘর রয়েছে।

ক্লায়েন্ট বুঝতে পারলো কোনো নামের দরকার নেই। হাতে লেখা সংখ্যাটা একজনের...সেটি একাউন্টের মালিকের। এটাই সাধারণ নিয়ম। ওয়াশবার্ন বলেছিলেন।

রোগী সংখ্যাগুলো লিখলো। নিজের হাত দুটো রিলাক্স করলো যাতে লিখতে সুবিধা হয়। কাগজটা ফিরিয়ে দিলে সেটা ভালো ক’রে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কতোগুলো কাঁচের দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো রিসেপশনিস্ট।

“আপনি যদি চতুর্থ ঘরটিতে অপেক্ষা করেন তাহলে খুব জলদি একজন এসে আপনাকে সাহায্য করবে।”

“চতুর্থ রুম?”

“বাম দিক থেকে চতুর্থ দরজা। ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই লক্ হয়ে যাবে।”

“তার কি খুব একটা দরকার আছে?”

রিসেপশনিস্ট চমকে তার দিকে চেয়ে রইলো। “এটা তো আপনার অনুরোধেই করা হচ্ছে, স্যার,” ভদ্রভাবে বললো সে। নিজের বিস্মিত হওয়ার ভাবটা সৌজন্যতার আড়ালে লুকিয়ে ফেললো। “এটা হলো থ্রি-জিরো একাউন্ট। এই একাউন্ট হোল্ডাররা ফোন ক’রে আগেই একটা প্রাইভেট প্রবেশদ্বারের ব্যবস্থা করার কথা বলতে পারেন।”

“আমি সেটা জানি,” ওয়াশবার্নের রোগী মিথ্যে বললো, তবে খুবই দক্ষতার সাথে। “আসলে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি।”

“তাহলে ভেরিফিকেশন ক’রে দিচ্ছি, স্যার।”

“ভেরিফিকেশন?” আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের মি: জে. বর্ন কথাটা না বলে পারলো না। কথাটার মধ্যে আঁকে ওঠার একটা ভাব আছে।

“স্বাক্ষর ভেরিফিকেশন, স্যার,” লোকটা চশমা ঠিক করতে করতে বললো। “এক কাজ করেন, স্যার। চার নাম্বার রুমে গিয়ে অপেক্ষা করেন।” কথাটা অনুরোধের মতো নয় আদেশের মতোই শোনালো।

“অবশ্যই। কেবল একটু তাড়াতাড়ি করতে বলুন, বুঝলেন?” রোগীটি বলেই চতুর্থ রুমে ঢুকে পড়লো। দরজাটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেলে দরজার খোলা কাঁচের দিকে তাকালো সে। এটা সাধারণ কোনো কাঁচ নয়। ভাঙতে গেলে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠবে আর তার ঠিকানা হবে চৌদ্দ শিকের ভেতরে। ঘরটা খুব ছিমছাম। দুটো চামড়ার চেয়ার আর একটা ছোটো টেবিল রয়েছে। বিপরীত দিকে আছে দ্বিতীয় আরেকটা দরজা। সেটা অবশ্য লোহার তৈরি। তার পাশেই তিনটি ভাষায় ম্যাগাজিন আর পত্রিকা রাখা আছে। রোগী চেয়ারে ব’সে হেরাল্ড ট্রিউন-এর প্যারিস সংস্করণটি হাতে তুলে নিলো। ছাপা অক্ষরগুলো পড়লেও সেগুলো তার

মাথায় ঢুকলো না। যেকোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে। সে কেবল কৌশলটা নিয়ে ভাবছে। স্মৃতিবিহীন কৌশল। কেবলমাত্র প্রবৃত্তির তাড়ণায়। অবশেষে লোহার দরজাটা খুলে গেলে একজন লম্বা আর পরিপাটী পোশাক পরা লোককে দেখা গেলো। হাত বাড়িয়ে সুইস টানে ইংরেজি বললো লোকটা।

“আপনার সাথে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হয়েছি। দেরির জন্যে ক্ষমা করবেন। সত্যি বলতে কি, এটা একটু হাস্যকর হয়ে গেছে।”

“কি রকম?”

“আমার মনে হয় আপনি হের কোয়েনিগকে ভড়কে দিয়েছেন। থু-জিরো একাউন্ট হোল্ডাররা আগেভাগে না জানিয়ে খুব একটা আসেন না তো। সে আবার ব্যতিক্রম কিছু প্রত্যাশা করে না। সবসময় রুটিনমাসিক কাজ ক’রে অভ্যস্ত। ব্যতিক্রম কিছু হলেই তার দিনটা মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে এরকম ব্যাপার ভালোই লাগে। আমি ওয়াল্টার এপফেল। পিজ, আসুন।” ব্যাংকের অফিসার রোগীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে লোহার দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করলো। দরজার ওপাশে ঘরটা ইংরেজি ‘ভি’ অক্ষর আকৃতির। কালো রঙের ছাদ, দামি দামি সব আসবাব আর প্রশস্ত একটি ডেস্ক। ডেস্কের পাশেই একটা জানালা।

“তাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত,” জে. বর্ন বললো। “আমার আসলে হাতে সময় খুব কম, তাই এমনটি করেছি।”

“হ্যা, সে এ কথা বলেছে।” এপফেল ডেস্কের ওপাশে গিয়ে চেয়ারে বসার জন্যে ইঙ্গিত করলো তাকে।

“বসুন। দুয়েকটা ফরমালিটিজের পরই আমরা কাজের কথায় আসবো।” তারা দু’জনেই ব’সে পড়লো। অফিসার এবার সাদা রঙের ক্রিপবোর্ড ফাইল বাড়িয়ে দিলো গ্রাহকের উদ্দেশ্যে। ফাইলে যে কাগজ আছে তাতে দুটো স্বাক্ষরের জায়গায় দশটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। “আপনার স্বাক্ষর, পিজ। কমপক্ষে পাঁচটি হলেই হবে।”

“আমি বুঝতে পারছি না। এইমাত্র তো দিলাম।”

“হ্যা, তা দিয়েছেন। সেটা ঠিকই আছে। এটা ভেরিফিকেশন কনফার্ম করার জন্যে।”

“তাহলে আবার কেন?”

“বার বার স্বাক্ষর নেয়া হয় এজন্যে যে, যদি সেটা আসল মালিকের না হয় তবে সহজেই বোঝা যাবে। একটা গ্রাফোকোলজিক্যাল স্ক্যানার সঙ্গে সঙ্গে এটা ধরতে পারবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, এ নিয়ে আপনার কোনো দৃষ্টিস্তা করার দরকার নেই।” এপফেল একটা কলম বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো। “সত্যি বলতে কি, আমি না, কোয়েনিগই এরকমটি করতে বলেছে।”

“সে খুবই সতর্ক একজন লোক,” রোগীটি বললো। কলমটা নিয়ে লিখতে

লাগলে চতুর্থ স্বাক্ষরের সময় অফিসারটি তাকে থামিয়ে দিলো ।

“এতেই হবে, আর তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না । খামোখাই সময় নষ্ট করা ।” এপফেল কাগজটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো । “ভেরিফিকেশন বলছে সব ঠিক আছে । এটার ভিত্তিতে দেয়া রিসিস্ট পেলেই একাউন্টটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ।” কাগজটা একটা লোহার ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললো সে । ডেস্কের একপাশে একটা বোতাম চাপলে উজ্জ্বল একটি আলো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেলো । “এটা স্বাক্ষরটাকে সরাসরি স্ক্যানারে পাঠিয়ে দেবে ।” অফিসার বলতে লাগলো । “প্রোগ্রাম করা আর কি । সত্যি বলতে কি, আবারো বলছি, তার আসলে কোনো দরকারই নেই । আমরা যদি একেবারে গদর্ভ না হই তবে কেউই আমাদেরকে বোকা বানাতে পারবে না ।”

“কেন পাবে না? কেউ যদি এতো দূর পর্যন্ত এসে পড়ে তাহলে সুযোগ নেবে না কেন?”

“এই অফিস থেকে বের হবার একটাই মাত্র দরজা আছে । আমি নিশ্চিত আপনি ওয়েটিং রুমের লক করার শব্দটি শুনতে পেয়েছেন?”

“কাঁচের মধ্যে অ্যালার্মের তারও দেখেছি,” রোগীটি আরো বললো ।

“তাহলে তো আপনি বুঝেছেনই । কেউ উল্টাপাল্টা করলেই ফাঁদে পড়ে যাবে ।”

“কারো কাছে যদি অস্ত্র থাকে?”

“আপনার কাছে সেরকম কিছু নেই ।”

“কেউ তো আমাকে তল্লাশী করে নি ।”

“লিফটেই কাজটা করা হয়েছে । চারটা ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে । আপনার কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে লিফটটা প্রথম আর দ্বিতীয় তলার মাঝখানেই থেমে থাকতো ।”

“আপনারা সবাই খুব সতর্ক ।”

“আমরা সর্বোত্তম সেবা দেয়ার চেষ্টা করি, স্যার ।” ফোনটা বেজে উঠলে এপফেল জবাব দিলো, “হ্যা?...আসছি ।” ব্যাংকের অফিসার তার গ্রাহকের দিকে তাকালো । “আপনার একাউন্ট ফাইলগুলো আসছে ।”

“খুব জলদি হলো দেখছি ।”

“হের কোয়েনিং কয়েক মিনিট আগে স্বাক্ষর ক’রে দিয়েছেন । সে স্ক্যানারের ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করছিলো কেবল ।” এপফেল একটা ড্রয়ার খুলে চাবি বের করলো । “আমি নিশ্চিত সে হতাশ হয়েছে । সে খুব নিশ্চিত ছিলো কিছু একটা ঘাপলা আছে ।”

লোহার দরজাটা খুলে গেলে রিসেপশনিস্ট একটা ধাতব বাক্স নিয়ে প্রবেশ করে বাক্সটা ডেস্কের উপর রাখলো সে, পাশেই আছে এক বোতল পেরিয়ার মদ

আর দুটো গ্রাস ।

“আপনি কি জুরিখে আপনার সময় উপভোগ করছেন?” অফিসার জিজ্ঞেস করলো নিরবতা ভাঙার জন্যেই ।

“খুব । আমার রুম থেকে লেক দেখা যায় । চমৎকার দৃশ্য, খুবই প্রশান্তি ।”

“দারুণ,” এপফেল বললো, এক গ্রাস মদ টেলে দিলো গ্রাহকের জন্যে । “আপনার একাউন্ট, স্যার,” রিং থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে বললো । “আমি কি কেস্টা খুলবো, নাকি আপনি নিজেই সেটা খুলবেন?”

“খুলুন । আপনিই খুলুন ।”

অফিসার চেয়ে রইলো । “খুলবো বলতে আমি তালা খোলার কথা বলছি, বাস্তব খুলতে নয় । এটা তো আমার খোলার কথা নয় । এটা আপনাকেই খুলতে হবে ।”

“কেন নয়?”

“আপনার বাস্তব খোলার দায়িত্ব আমার নয় ।”

“ধরুন আমি ব্যবসায়িক কাজে লেনদেন করবো? টাকা ট্রান্সফার করবো, কারো কাছে পাঠাবো, তো আমাকে কি করতে হবে?”

“সেটা উইথড্রল ফর্মে আপনার সংখ্যা আর স্বাক্ষর নিয়ে করা যাবে ।”

“অথবা অন্য কোনো ব্যাংকে পাঠালে—সুইজারল্যান্ডের বাইরে?”

“তাহলে একটা নামের দরকার হবে । সে ক্ষেত্রে এসব পরিচয় আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে ।”

“খুলুন ।”

অফিসার খুলতে লাগলে ওয়াশবার্নের রোগীটি নিঃশ্বাস বন্ধ ক’রে রাখলো । তার পেটে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে । এপফেল একটা কাগজ বের ক’রে একাউন্টের মালিককে দিলো ।

গেইমেনশেফট লেটারহেডের এবং টাইপ করা অক্ষরে নিচের কথাগুলো ইংরেজিতে লেখা । এটা যে গ্রাহকের মাতৃভাষা সেটা নির্ঘাত বলা যায় ।

একাউন্ট : ০১৭১৭১২০১৪২০৬০

নাম : মালিকের নির্দেশে গোপন করা হলো ।

একসেস : আলাদা আলাদা কভারে সিল করা আছে ।

ডিপোজিটের বর্তমান জমা : ৭৫০০০০০ ফ্রাঁ

আপ্তে ক’রে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রোগী । অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে । এরকমটি কোনোভাবেই প্রত্যাশা করে নি । বিগত পাঁচ মাসে তার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এটা তার মধ্যে সবচাইতে বেশি ভীতিকর । অঙ্কটার পরিমাণ আমেরিকান ডলারে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন!

৫০০০০০০!

কিভাবে? কেন?

কাঁপতে থাকা হাতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে স্টেটমেন্টের এন্ট্রিটা হাতে তুলে নিলো। সংখ্যাটা অনেক, অঙ্কটা অভাবনীয়। ৩০০,০০০ ফ্রাঁ'র কম হবে না। তেইশ সপ্তাহ আগে পাঁচ থেকে আট সপ্তাহ অন্তর অন্তর টাকা তোলা হয়েছে। সবচাইতে শেষ স্টেটমেন্টটার দিকে তাকালো সে। প্রথমে এটা সিঙ্গাপুরের একটি ব্যাংক থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বিশাল অঙ্কের টাকা। দুই মিলিয়ন, সাত লক্ষ মালয়েশিয়ান ডলার। সেটা ৫১৭৫৫০০০ সুইস ফ্রাঁ'তে বদলে নেয়া হয়েছে।

স্টেটমেন্টটার নিচে সে টের পেলো দুটো আলদা খাম আছে। কাগজটা তুলে নিলো। খামটাতে কালো বর্ডার দেয়া আছে। উপরে টাইপ করা কিছু লেখা :

আইডেন্টি :

কেবলমাত্র মালিকের প্রবেশাধিকার।

আইনী বিধিনিষেধ :

প্রবেশ-রেজিস্টার্ড অফিসার, ট্রেডস্টোন

সেভেনটিওয়ান কর্পোরেশন, প্রাপক

প্রেরকের কাছ থেকে লিখিত আদেশ

পাবেন। ভেরিফিকেশনের বিষয়।

“এটা আমি একটু চেক ক’রে দেখতে চাই,” গ্রাহক বললো।

“এটা আপনার সম্পত্তি,” জবাব দিলো এপফেল। “আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, এটা একেবারে অক্ষত ছিলো।”

রোগী এনভেলপটা হাতে নিয়ে উল্টে দেখলো। ফ্ল্যাপে ব্যাংকের সিল দেয়া আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খামটা কেউ খোলে নি। খামটা ছিঁড়ে কার্ডটা বের ক’রে পড়লো সে :

মালিক :

জেসন চার্লস বর্ন

ঠিকানা :

তালিকাভুক্ত নয়।

নাগরিকত্ব :

ইউ.এস.এ

জেসন চার্লস বর্ন। জেসন। ‘জে’তে তাহলে জেসন! তার নাম জেসন বর্ন। বর্ন দিয়ে কিছুই বোঝায় না, ‘জে. বর্নও অর্থহীন, কিন্তু জেসন বর্ন-এর সম্মিলিত রূপটি পূর্ণতা পেলো। সে এটা মেনে নিতে পারে। এটা সে মেনেই নিয়েছে। সে হলো জেসন চার্লস বর্ন, একজন আমেরিকান; নিজের হৃদস্পন্দনটা শুনতে পাচ্ছে। স্পন্দনের শব্দে তার কানে তালা লাগবার যোগাড় হলো। পেটের যন্ত্রণাটা আবারো শুরু হলো। এটা কি? তার কেন অন্ধকারে তলিয়ে যাবার অনুভূতি হচ্ছে?

“আপনার কি কিছু হয়েছে?” এপফেল জিজ্ঞেস করলো। “কিছু হয়েছে কি,

হের বর্ন?”

“না । সব ঠিক আছে । আমার নাম বর্ন । জেসন বর্ন ।”

সে চিৎকার করছে? ফিস্‌ফিস্‌ করছে? সে বলতে পারবে না ।

“আপনার নাম জানতে পারাটা আমার সৌভাগ্য, মি: বর্ন । আপনার পরিচয়টা গোপন থাকবে । আপনাকে গেইমেনশেফট ব্যাংকের একজন অফিসার কথা দিচ্ছে ।”

“ধন্যবাদ । আমাকে প্রচুর পরিমাণের টাকা ট্রান্সফার করতে হবে, আপনার সাহায্য লাগবে আমার ।”

“এটা তো আমার সৌভাগ্য । আপনার কি ধরণের সাহায্য লাগবে বলুন কেবল । আমি খুশি মনে ক’রে দেবো সেটা ।”

মদের গ্রাসটা তুলে নিলো বর্ন ।

এপফেলের অফিসের লোহার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে পাশের ঘরে চলে যাবে, তারপর রিসেপশন রুম এবং লিফটের কাছে । কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ব্যানহফস্ট্রাসে রেজিস্টার্ড হবে ।

অবশেষে সে পেরেছে । ডা: জিওফ্রে ওয়াশবার্ন একটি অসম্ভব মূল্যবান জীবন বাঁচিয়েছেন । ৫০০,০০০০ সুইস ফ্রাঁ মার্সেই’র একটা ব্যাংকে ট্রান্সফার হয়ে গেলো । ওয়াশবার্নের নাম উল্লেখ না করেই একটা কোডের মাধ্যমে তার ব্যাংক একাউন্টে টাকাটা চলে যাবে । ডাক্তার মার্সেই’তে গিয়ে কোডটা বললেই টাকাগুলো তার হয়ে যাবে । টাকাগুলো পাবার পর ডাক্তারের কি রকম অবস্থা হবে সেই ছবিটা বর্ন কল্পনা করলো । এই বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে ডাক্তার কী করবে সেটা ডাক্তারের ব্যাপার ।

দ্বিতীয় ট্রান্সফারটা হলো প্যারিসের রুই মেদেলিনে, জেসন সি. বর্নের নামে একটা একাউন্টে, ৪৫০০,০০০ ফ্রাঁ । বর্নের স্বাক্ষর সংবলিত একটি কার্ডও সেইসাথে ঐ নির্দিষ্ট ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়া হলো যাতে সে ওখান থেকে টাকাটা তুলতে পারে । কোয়েনিগ আশ্বস্ত করলো তিন দিনের মধ্যেই এসব কাগজপত্র প্যারিসে পৌছে যাবে ।

তৃতীয় ট্রান্সফারটা সেই তুলনায় খুবই ছোটোখাটো বলা চলে । এক লক্ষ ফ্রাঁ নগদে তোলা হলো এপফেলের অফিস থেকে স্বাক্ষর ক’রে ।

ব্যাংকে ডিপোজিটের পরিমাণ রইলো ১৪০০,০০০ সুইস ফ্রাঁ, সেটাও যেকোনো বিচারে কম বলা যাবে না ।

কিভাবে? কেন? কোথেকে এলো এসব টাকা ?

মাত্র এক ঘণ্টা বিশ মিনিটেই পুরো কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেলো। কোয়েনিগ সব শেষে এপফেলকে ফোন করলে সে একটা ছোট্ট কালো বর্ডার দেয়া খাম নিয়ে এলো।

“উনে ফিশে,” সে ফরাসিতে বললো।

এপফেল খামটা খুলে একটা কার্ড বের ক’রে কার্ডটা ভালো ক’রে দেখে কোয়েনিগের কাছে দিয়ে দিলো। “কাজ শুরু করা হোক,” বললো সে।

চলে গেলো কোয়েনিগ।

“কি হলো?” জানতে চাইলো বর্ন।

“কেবলমাত্র বিরাট অঙ্কের টাকা ছাড় করবার ব্যাপারে এরকমটি করা হয়। আমাদের ব্যাংকের নিয়ম আর কি।” অফিসার একটু হেসে আশ্বস্ত করলো তাকে।

তারাটা ক্লিক ক’রে খুলে গেলে বর্ন ঘোলাটে কাঁচের দরজাটা খুলে হের কোয়েনিগের ব্যক্তিগত এলাকা থেকে বের হয়ে এলো। অন্য দু’জন লোক এসে বসে পড়লো রিসেপশন রুমের ডেস্কের বিপরীত দিকে। যেহেতু তারা ভিন্ন ভিন্ন রুমে বসে নি তাই বর্ন ধারণা করলো তাদের কেউই থ্রি-জিরো একাউন্টের মালিক নয়। সে অবাক হয়ে ভাবলো তারা কোনো নাম অথবা সংখ্যা লিখছে কি না। তবে লিফটের কাছে আসতেই এইসব ভাবনা বাদ দিয়ে বোতাম চাপলো। চোখের কোণে তাকিয়ে কারোর নড়াচড়া টের পেলো সে। কোয়েনিগ মাথা নেড়ে দু’জন লোকের দিকে তাকিয়ে সায় দিলো। লিফটের দরজাটা খুলতেই তারা উঠে দাঁড়ালে বর্ন ঘুরে তাকালো তাদের দিকে। ডানপাশের লোকটি তার ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ওয়্যারলেস বের ক’রে খুব সংক্ষেপে দ্রুত কিছু বললো।

বাম পাশের লোকটি তার ডান হাত রেইন কোটের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। হাতটা যখন বের করলো দেখা গেলো হাতে একটা অস্ত্র, কালো রঙের একটা পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তল, ব্যারেলে সাইলেন্সার লাগানো।

বর্ন লিফটে ঢুকতেই পেছন থেকে ছুটে এলো ঐ লোক দুটো।

শুরু হয়ে গেলো ভয়ংকর এক উন্মাদনা।

অধ্যায় ৫

লিফটের দরজা বন্ধ হতে শুরু করলো। ওয়্যারলেস হাতে লোকটা ইতিমধ্যেই লিফটের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, অস্ত্র হাতে তার সঙ্গী বন্ধ হতে থাকা দরজার মাঝখানে কাঁধটা ঢুকিয়ে দিলো। তার হাতের অস্ত্রটা বর্নের মাথার দিকে তাক করা।

হঠাৎ ভয় পেয়ে জেসন ডান দিকে ঝুঁকে গেলো, তারপর আচম্কা কোনো রকম পূর্বসতকর্তা ছাড়াই বাম পাটা শূন্যে তুলে হাটু দিয়ে অস্ত্র ধরা লোকটার হাতে আঘাত করলো সে। এর ফলে লোকটা একটু পেছন দিকে হেলে পড়লে অস্ত্রটা একটু উপরে উঠে গেলো। শোনা গেলো দুটো ভোঁতা গুলির শব্দ। দরজার ফাঁক দিয়ে লিফটের ছাদের মোটা কাঠে গিয়ে বিঁধলো গুলি দুটো। এবার এক ঝটকায় ঘুরে দ্বিতীয় লোকটার পেটে কাঁধ দিয়ে সজোরে আঘাত করে বসলো বর্ন। এক হাতে ওয়্যারলেস ধরা লোকটাকে কাঁধে তুলে চেপে ধরলো লিফটের দেয়ালে। হাতের ওয়্যারলেসটা ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেলে ওটা থেকে একটা কষ্ট ভেসে এলো।

“হেনরি? ক্যাভা? কুয়েসে কুইজে পাসি?”

জেসনের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো আরেকজন ফরাসি লোকের ছবি। একেবারে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ। চব্বিশটা ঘণ্টা আগে রুই সারাসিনের লো বুক দ্য মার-এর ঘটনা সেটি। সেই লোকটা জুরিখে মেসেজ পাঠাতে কোনো সময়ই নষ্ট করে নি। তারা যাকে মৃত ভেবেছিলো সে বেঁচে আছে। খুব ভালোভাবেই বেঁচে আছে। তাকে খুন করো!

বর্ন তার সামনের লোকটাকে ফরাসিতেই বললো। “কতোজন এসেছে? কোথায় আছে তারা?”

“তুই নিজেই খুঁজে বের কর, ওয়োরের বাচ্চা!”

লিফটটা দোতলার লবির মাঝামাঝি এসে পড়েছে। জেসন লোকটার কান প্রায় ছিঁড়েই ফেললো। তার মাথাটা দেয়ালে সজোরে আঘাত করলে ফরাসি লোকটা চিৎকার দিয়ে ব’সে পড়লো মেঝেতে। বর্ন তার হাঁটু দিয়ে লোকটার বুকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে লোকটার হোলস্টার টের পেলো। ওভারকোটটা এক ঝটকায় দু’হাতে খুলে বগলের নিচ থেকে হোলস্টারে রাখা ছোটো পিস্তলটা হাতে তুলে নিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেলো, কেউ এই লিফটের স্ক্যানারটা বন্ধ ক’রে রেখেছে। *কোয়েনিগ*। মনে পড়লো তার। লোকটার হা-করা মুখের ভেতরে পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিলো। “আমাকে বলো, না হলে তোমার মাথার খুলি উড়ে যাবে!” লোকটা জিভ দিয়ে ঠেলে নলটা বের ক’রে দিলে জেসন অস্ত্রটা তার গালে

ঠেকালো ।

“দু’জন । একজন লিফটের পাশে, অন্যজন নিচের রাস্তায়, গাড়ির কাছে ।”

“কি ধরনের গাড়ি?”

“পিয়াজিও ।”

“রঙ?” লিফটটা ধীরগতির হয়ে থামতে যাচ্ছে ।

“বাদামী ।”

“লবিতে থাকা লোকটা, সে কি রঙের পোশাক পড়েছে?”

“আমি জানি না ।”

জেসন অস্ত্রটা এবার লোকটার মাথায় ঠেকালো । “তোমাকে জানতেই হবে!”

“কালো রঙের কোট!”

লিফট থেমে গেলে বর্ন ফরাসি লোকটাকে তার নিজের পায়ে দাঁড় করালো । দরজা খুলে যেতেই বাম দিক থেকে এগিয়ে এলো কালো রঙের রেইনকোট আর অদ্ভুত এক গোল্ডরিমের চশমা পরা এক লোক । চশমার পেছনে থাকা চোখ জোড়া পরিস্থিতি বুঝে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে । ফরাসি লোকটার গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে । পকেটে ঢোকানো হাতটা যখন বের হলো দেখা গেলো সেই হাতে আরেকটা সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক পিস্তল । সেটা তাক করলো মার্সেই থেকে আসা লোকটার দিকে । জেসন ফরাসি লোকটাকে দরজার সামনে ঠেলে দিতেই পরপর তিনটি ভোঁতা শব্দ শোনা গেলো । চিৎকার ক’রে উঠলো ফরাসি লোকটি, তার হাত দুটো শেষবারের মতো উঠলো বাঁধা দেবার জন্যে । একটু পিছিয়ে মার্বেল ফ্লোরে পড়ে গেলো সে । গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটার ডান পাশে থাকা এক মহিলা চিৎকার দিয়ে উঠলো । তার সঙ্গে যোগ দিলো আরো কয়েকজন । তারা প্রাণপণে পুলিশকে ডাকতে শুরু ক’রে দিলো!

বর্ন জানতো ফরাসি লোকটার কাছ থেকে নেয়া রিভলবার সে ব্যবহার করতে পারবে না । এটার কোনো সাইলেন্সার নেই । গুলির শব্দ হলে সে ধরা প’ড়ে যাবে । অস্ত্রটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো সে । চিৎকাররত মহিলাকে পাশ কাটিয়ে লিফটম্যানের ইউনিফর্মের কাঁধটা খামচে ধরলো । অস্ত্র হাতে কালো রেইনকোট পরা খুনির দিকে ছুড়ে মারলো বিস্মিত হতভম্ব লোকটাকে ।

জেসন মূল প্রবেশদ্বারের কাঁচের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার সময় লবিতে হেইউগোল আর ভীতিকর অবস্থাটা চরমে পৌঁছালো । যে লোকটা আধ ঘণ্টা আগে জেসনকে প্রথম অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলো ফরাসি ভাষায়, দেয়ালে রাখা একটা ফোনে চিৎকার ক’রে কী যেনো বলছে সে । তার ঠিক পাশেই পোশাক পরা এক রক্ষী অস্ত্র হাতে দরজার সামনে বাঁধা দিতে উদ্যত হলো । হেইউগোলের মধ্যেও সবার চোখ তার দিকে । বের হওয়াটা মুহূর্তেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । বর্ন রক্ষীর চোখের দিকে তাকালো না । টেলিফোনে কথা বলতে থাকা লোকটার দিকে

তাকালো সে ।

“গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা!” চিৎকার ক’রে বললো বর্ন । “সে-ই, আমি দেখেছি তাকে!”

“কি? আপনি কে?”

“আমি ওয়ালথার এপফেলের বন্ধু! আমার কথা শোনো! ঐ যে, কালো রেইনকোট আর গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা!”

আমলাতাত্ত্বিক মানসিকতা কয়েক হাজার বছরেও বদলায় না । একজন উচ্চ পদস্থ অফিসারের নাম উল্লেখ করাতে দ্রুত কাজ হলো ।

“হের এপফেল!” লোকটা এবার রক্ষীর দিকে ফিরলো । “তুমি তার কথা শুনেছো! গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা ।”

“জি, স্যার!” রক্ষী সামনের দিকে ছুটে গেলো ।

জেসন আস্তে ক’রে কাঁচের দরজা দিয়ে বের হয়ে পেছনে ফিরে বুঝতে পারলো তাকে দৌড় দিতে হবে, কিন্তু জানে রাস্তায় যদি গাড়ির কাছে কেউ থেকে থাকে তবে তাকে দৌড়াতে দেখলে চিনে ফেলবে, হয়তো তার মাথায় গুলি করবে সে ।

রক্ষী কালো রেইনকোট পরা লোকটাকে অতিক্রম ক’রে দৌড়ে চলে গেলো । লোকটা তার চারপাশের হৈহট্টগোল আর লোকজনের ছোট্টাছুটির মধ্যেও খুব ধীরে সুস্থে হাটছে । কোনো চশমা প’রে নেই এখন । মূল প্রবেশ পথের দিকে এবার পা বাড়ালো সে, বর্নের পেছন পেছন । হাটার গতিও বাড়িয়ে দিয়েছে ।

বাইরের ফুটপাথে হৈ হট্টগোলটা জেসনকে রক্ষা করলো । ব্যাংকের ভেতরের অবস্থা বাইরে চাউড় হয়ে গেছে । কয়েকটা পুলিশের গাড়ি ব্যাংকের দিকে ছুটে আসছে সাইরেন বাজিয়ে ।

ডান দিকে মোড় নিয়ে লোকজনের ভীড়ে মিশে গেলো জেসন । একটা দোকানের সামনে এসে আশ্রয় নিলো সে । মোড়ে রাখা গাড়িটা তার টার্গেট । সে পিয়াজিও গাড়িটা দেখতে পেলো । পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকেও । তারও একটা হাত ওভারকোটের পকেটে ঢোকানো । পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই পিয়াজিও গাড়ির ড্রাইভার কালো রেইনকোট পরা লোকটার সাথে যোগ দিলো । এবার গোল্ডরিম চশমাটা পরে নিজের দৃষ্টিটা ঠিক ক’রে নিলো সে । লোক দু’জন সামনে এগোতে এগোতে চারপাশে তাকাচ্ছে । বিশেষ ক’রে ব্যানহফস্ট্রাস ব্যাংকের দিকেই তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ।

তাদের এই বিভ্রান্ত হওয়াটা বুঝতে পারলো বর্ন । সে ব্যাংকের কাঁচের দরজা দিয়ে বের হবার সময় কোনো রকম ভয়ানক ছিলো না । নির্বিকারভাবে বের হয়ে লোকজনের সাথে মিশে গেছে । তাই পিয়াজিও’র ড্রাইভার তাকে দেখে নি, চিনতে পারে নি ।

গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা তার চশমা খুলে পিয়াজিও গাড়ির জানালার

ভেতর ছুড়ে ফেলতেই ঘটনাস্থলে পুলিশের প্রথম গাড়িটা এসে হাজির হলো। সে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তেই গাড়িতে ব'সে ইনজিন স্টার্ট ক'রে দিলো ড্রাইভার। এরপর খুনি যে কাজটা করলো সেটা জেসন কোনোভাবে কল্পনাও করতে পারে নি। ব্যাংকের কাঁচের দরজার সামনে জড়ো হওয়া পুলিশের যে দলটা ব্যাংকের ভেতরে যেতে উদ্যত তাদের সাথে যোগ দিলো সে।

বর্ন দেখতে পেলো পিয়াজিও গাড়িটা ঘটনাস্থল থেকে চলে যাচ্ছে। আশেপাশের সব লোক আস্তে আস্তে ব্যাংকের সামনে জড়ো হতে লাগলো। কৌতুহলী হয়ে ব্যাংকের ভেতরে উঁকি মারছে তারা, কথা বলছে একে অন্যের সাথে।

একজন পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এসে কৌতুহলী লোকজনদেরকে সরিয়ে দিতেই একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে এলো ঘটনাস্থলে। অ্যাম্বুলেন্সটা এসে থামলো ঠিক যেখানটায় পিয়াজিওটা ছিলো। জেসন আর দেখলো না। তাকে ক্যারিলিয়ন দুলাকে গিয়ে সব কিছু গোছাতে হবে। জুরিখ ছাড়তে হবে। সুইজারল্যান্ড ছাড়তে হবে। যেতে হবে প্যারিসে।

প্যারিস কেন? সে কেন তার টাকা-পয়সা প্যারিসে ট্রান্সফার করলো? এই কথাটা তার তখন মনে হয় নি যখন সে এপফেলের অফিসে ব'সে ছিলো। সবই একটা ঘোরের মধ্যে করা হয়েছে। তার সহজাত প্রবৃত্তি এই কাজটা করিয়েছে। যেনো প্যারিস কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কেন?

আবারো, সময় নেই...সে দেখলো অ্যাম্বুলেন্সের ড্রু'রা একটা স্ট্রচার নিয়ে ব্যাংকের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। একটা দেহ, মাথা ঢাকা, তার মানে মারা গেছে। সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

রাস্তার মোড়ে একটা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে দৌড়ে গেলো জেসন। তাকে জুরিখ থেকে পালাতে হবে। মার্সেই থেকে একটা খবর পাঠানো হয়েছে, মৃত লোকটি এখনও বেঁচে আছে। জেসন বর্ন বেঁচে আছে। তাকে হত্যা করো। জেসন বর্নকে হত্যা করো!

হায় ঈশ্বর, কেন?

সে আশা করেছিলো ক্যারিলিওন দুলাকের সহকারী ম্যানেজার ফ্রন্ট ডেস্কেই থাকবে। কিন্তু সে ওখানে নেই। তারপর বুঝতে পারলো। লোকটার নাম কি—স্টোসেল? হ্যা, স্টোসেল। একটা নোট লিখতে হবে। তার আচম্কা চলে যাওয়ার জন্যে কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। পাঁচশ' ফ্রাঁ খুব সহজেই কাজটা ক'রে দেবে। স্টোসেলকে এই প্রস্তাবটাই দেবে সে।

নিজের ঘরে এসে তার শেভিং যন্ত্রপাতিগুলো একটা সূটকেসে রেখে ফরাসি লোকটার কাছ থেকে নেয়া পিস্তলটা পরীক্ষা ক'রে ডেস্কে ব'সে হের স্টোসেলের

কাছে একটা নোট লিখলো। তাতে একটা বাক্য যোগ করলো, যা খুব সহজেই তার ভেতর থেকে চলে এসেছে—একেবারে সহজে।

...আমি আপনার সাথে খুব শীঘ্রই যোগাযোগ করবো, আমার পরিচিত কেউ মেসেজ দিয়ে গেলে সেটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আপনার উপর আস্থা রাখছি, আপনি তাদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, তাদেরকে আমার হয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন।

যদি তথাকথিত ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান থেকে কোনো রকম যোগাযোগ হয় তো সে সেটা জানতে চাইবে।

সে খামের ভেতর পাঁচশ' ফাঁর একটা নোট ঢুকিয়ে খামের মুখ বন্ধ ক'রে সুটকেসটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে হলুয়ে দিয়ে লিফটের কাছে চলে এলো। লিফটের সামনে চারজন আছে। একটা বোতাম চেপে পেছনে তাকালো সে। গেইমেনশেফট ব্যাংকের কথাটা মনে পড়ে গেলো তার। একটা বেল বাজলে তৃতীয় লিফটটার বাতি জ্বলে উঠলো। চমৎকার। তাকে যতো দ্রুত সম্ভব এয়ারপোর্টে যেতে হবে। জুরিখ থেকে, এই সুইজারল্যান্ড থেকে তাকে পালাতে হবে। তার খবরটা জায়গামতো পৌছে গেছে।

লিফটের দরজাটা খুলে গেলো। দু'জন লোক এক লাল চুলের মেয়ের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের মধ্যে কথাবার্তা থামিয়ে নতুন আগতকে মাথা নেড়ে আমন্ত্রণ জানালো। সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে একটু সরে দাঁড়ালো, তারপর দরজাটা বন্ধ হতেই আবার কথা বলতে শুরু করলো তারা। তাদের বয়স হবে মধ্য ত্রিশ, ফরাসিতে কথা বলছে। মেয়েটা পালাক্রমে দু'জন পুরুষের দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে তাদেরকে।

“আগামীকালের কনফারেন্সের পর তুমি তাহলে দেশে ফিরে যাচ্ছে?” বাম দিকের লোকটা জানতে চাইলো।

“আমি নিশ্চিত নই। অপেক্ষা করছি, দেখি অটোয়া থেকে কি বলে তারা,” মেয়েটি জবাব দিলো। “লিওঁতে আমার আত্মীয়স্বজন আছে; তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভালোই লাগতো।”

“এটা অসম্ভব,” ডান দিকের লোকটা বললো। “একদিনে এই কনফারেন্সের সারসংক্ষেপ করার জন্যে স্টিয়ারিং কমিটিকে দশজন লোক খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের সবাইকে আরো এক সপ্তাহ থাকতে হবে এখানে।”

“ব্রাসেলস্ এটা অনুমোদন করবে না,” প্রথমজন হেসে বললো। “হোটেলটা খুবই ব্যয়বহুল।”

“তাহলে যেভাবেই পারি অন্য কোথাও চলে যাই,” দ্বিতীয়জন মেয়েটির দিকে চোখ টিপে বললো। “আমরা অপেক্ষা করছি তুমি ঠিক এই কাজটাই করো, তাই না?”

“তুমি একটা বন্ধ উন্মাদ,” মেয়েটি বললো। “তোমরা দু’জনেই পাগল, এটাই আমার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।”

“তুমি তা নও, মেরি,” প্রথমজন বললো। “মানে পাগল। গতকালের তোমার প্রেজেন্টেশনটা ছিলো অসাধারণ।”

“সেটা এমন কোনো আহামরি কিছু ছিলো না। রুটিনমাসিক কাজ, একেবারেই বিরজিকর।”

“না, না!” দ্বিতীয় জন ভিন্নমত পোষণ করলো। “খুবই দারুণ ছিলো। আমি তো একবর্ণও বুঝতে পারি নি। তবে মনে রেখো, আমারও কিছু প্রতিভা আছে।”

“পাগলামী...”

লিফটটা থামতে শুরু করলে প্রথম লোকটা আবারো কথা বললো। “চলো, হলের পেছনে গিয়ে বসি। আমরা বেশ দেরি ক’রে ফেলেছি, বার্তেনেলি লেকচার শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য এতে খুব কোনো কিছু হবে না। তার চক্রাকারে প্রয়োগ করার তত্ত্বটি বার্জিয়ার অনুদানের টাকার সাথে ওঠানামা করে।”

“তার আগে,” মেয়েটি হাসতে হাসতে বললো। “সিজারের ট্যাক্স। যদি না সেটা পুনিকের যুদ্ধ হয়ে থাকে।”

“তাহলে পেছনেই যাচ্ছি,” মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দ্বিতীয় লোকটি বললো। “ওখানে গিয়ে আমরা ঘুমাতে পারি। সে স্লাইড প্রজেক্টর ব্যবহার করে; খুবই স্বাক্ষর থাকবে।”

“না, তোমরা দু’জন যাও, আমি তোমাদের সাথে কিছুক্ষণ পরে যোগ দিচ্ছি। আমাকে কিছু টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে, আর এক্ষেত্রে আমি টেলিফোন অপারেটরকে মোটেও বিশ্বাস করি না।” দরজা খুলে গেলে তিনজন চলে গেলো। দু’জন একসাথে লবির দিকে গেলেও মেয়েটি চলে গেলো ফ্রন্ট ডেস্কের কাছে। বর্ন চললো তার পেছন পেছন। কয়েক ফিট দূরে একটা সাইনবোর্ড উদাস হয়ে পড়তে লাগলো সে।

স্বাগতম :

ষষ্ঠ বিশ্ব অর্থনৈতিক কনফারেন্সের সদস্যগণকে

আজকের আলোচ্যসূচী :

বেলা ১ টায় : মাননীয় জেসন ফ্রেজিয়ার, এম.পি ইউনাইটেড কিংডম।

সুট : ১২

সন্ধ্যা ৬টায় : ড. ইউজিনো বার্তেনেলি,

ইউনিভার্সিটি অব মিলান, ইতালি।

সুট : ৭

রাত ৯টায় : চেয়ারম্যানের বিদায়ী ডিনার ।
হসপিটালিটি সুট :

“রুম ৫০৭ । অপারেটর বললো আমার জন্যে নাকি একটা ক্যাবলগ্রাম এসেছে ।”

ইংরেজি । লালচে চুলের মেয়েটি এখন তার পাশে কাউন্টারের সামনে এসে ইংরেজিতে কথা বলছে । কিন্তু মেয়েটি তো বলেছিলো ‘অটোয়া থেকে খবরের জন্যে অপেক্ষা করছে সে ।’ তাহলে সে একজন কানাডিয়ান ।

ডেস্ক ক্লার্ক শ্লুটলো চেক্ ক’রে ক্যাবলটা নিয়ে ফিরে এলো । “ড. সেন জ্যাক?” সে জানতে চাইলো খামটা হাতে নিয়ে ।

“হ্যা । ধন্যবাদ ।”

ক্লার্ক বর্নের দিকে ফিরতেই মেয়েটি ঘুরে খামটা খুলে ফেললো । “জি, স্যার?”

“আমি এই নোটটা হের স্টোসেলের জন্যে রেখে যেতে চাচ্ছি,” সে ক্যারিলিয়ন দুলাকের খামটা কাউন্টারে রেখে দিয়ে বললো ।

“হের স্টোসেল আগামীকাল সকাল ছয়টার আগে ফিরবেন না, স্যার । বিকেল চারটায় তিনি চলে যান । আমি কি আপনার সাহায্যে আসতে পারি?”

“না, ধন্যবাদ, শুধু এটা তাকে দিলেই চলবে ।” এরপরই জেসনের মনে পড়ে গেলো : এটা জুরিখ । “তেমন জরুরি কিছু না,” সে আরো বললো । “তবে আমার জবাব পাওয়ার দরকার আছে । সকালে দিলেই হবে ।”

“অবশ্যই, স্যার ।”

বর্ন সুটকেসটা হাতে নিয়ে লবিটা অতিক্রম করতে লাগলো । হোটেলের বাইরে কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে । সূর্য ডুবে গেছে এখন । জুরিখে রাত নেমেছে । এখনও এখান থেকে ইউরোপের যেকোনো জায়গায় যাওয়ার জন্যে ফ্লাইট রয়েছে । মধ্যরাত পর্যন্ত এটা থাকবে...

হাটা থামিয়ে দিলো সে । তার দম বন্ধ হয়ে আসছে । যেনো সমস্ত শরীর জুড়ে এক রকম অবশ একটা ভাব বিরাজ করছে । কাঁচের দরজার ওপাশে যা দেখতে পেয়েছে তা একেবারেই অবিশ্বাস্য । বাইরে দাঁড় করানো ট্যাক্সিওয়ালার সামনে বাদামী রঙের পিয়াজিও গাড়িটা এসে থেমেছে । এবার দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে এলো—কালো রেইন কোট আর গোল্ডরিম চশমা পরা এক খুনি । অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো আরেক জন লোক, তবে এই লোকটা গাড়ির ড্রাইভার নয় । আরেকজন খুনি । সেও রেইনকোট পরা । বড় পকেটটাতে একটা শক্তিশালী অস্ত্র আছে বোঝাই যাচ্ছে । এই লোকটা গেইমেনশেফট ব্যাংকের রিসেপশনরুমে বসেছিলো । এই লোকটাই সাইলেন্সার লাগানো একটা পয়েন্ট ৩৮ রিভলবার বের ক’রে দুটো বুলেট ছুড়ে দিয়েছিলো তার মাথা লক্ষ্য করে ।

কিভাবে? তারা কিভাবে তাকে খুঁজে পেলো?...তারপরই মনে পড়ে গেল একটু অসুস্থ বোধ করলো সে। কতোই না অসতর্ক ছিলো, কতোই না হালকাভাবে নিয়েছিলো!

আপনি কি জুরিখে থাকাকালীন সময়টা উপভোগ করছেন? ব্যাংকের ভেতর অপেক্ষা করার সময় ওয়ালথার এপফেল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো।

খুবই। আমার ঘর থেকে লেকটা দেখা যায়। চমৎকার দৃশ্য, খুবই প্রশান্তি, শান্তি।

কোয়েনিগ! কোয়েনিগকে সে বলেছিলো তার রুম থেকে লেক দেখা যায়। জুরিখের কতোগুলো হোটেল থেকে লেক দেখা যায়? বিশেষ করে থ্রি-জিরো একাউন্টের মালিক থাকার মতো কোনো হোটেল থেকে, দুটো? তিনটে?... কোথেকে যেনো নামগুলো তার মাথায় চলে এলো : ক্যারিলিয়ন দুলাক, বোর অলাক, ইদেন অলাক। আরো কি আছে? না, আর কোনো নাম এলো না। খুঁজে বের করাটা কতোই না সহজ! কতো সহজেই না সে কথাটা বলেছিলো। কতো বোকাই না সে!

সময় নেই। খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। কাঁচের দরজা দিয়ে সে দেখতে পেলো। ঠিক একইভাবে খুনিরাও দেখতে পেলো তাকে। দ্বিতীয় লোকটা প্রথম দেখতে পেলো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটাকে ইশারা করলে সে পকেট থেকে অস্ত্র বের করতে উদ্যত হলো। দু'জনেই অস্ত্র বের করে এক সঙ্গে দরজা দিয়ে ঢুকতে লাগলো। শেষ দিকে এসে আলাদা হয়ে গেলো তারা। একজন কাঁচের থাকলো দরজার সামনে। ফাঁদ পাতা হলো। তাকে বাইরে যেতে দেবে না।

তারা কি এরকম একটা জনাকীর্ণ হোটেল লবিতে ঢুকে একজনকে খুন করতে পারবে বলে ভাবছে?

অবশ্যই তারা সেটা করতে পারবে। লোকজনের ভীড় আর হৈহুল্লা তাদেরকে আড়াল করবে। দুটো, তিনটে ভোঁতা গুলির শব্দ হবে, লোকজনের দৌড়াদৌড়ি আর হাউকাউয়ের মধ্যে নির্বিঘ্নে বের হয়ে যেতে পারবে তারা।

সে তাদেরকে তার কাছাকাছি আসতে দেবে না। পিছু হটে গেলো সে। তার চিন্তাভাবনায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কতো সাহসী তারা? তারা কি ক'রে ধরে নিলো সে সাহায্যের জন্যে, বাঁচার জন্যে লোকজনকে চিৎকার করে ডাকবে না? তারপরও জবাবটা পাওয়া গেলো পরিষ্কার। খুনিরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত : সে এ ধরনের সাহায্য কামনা করতে পারবে না—পুলিশেরও দ্বারস্থ হতে পারবে না। জেসন বর্নের জন্যে সমস্ত কর্তৃপক্ষই নিষিদ্ধ...কেন? তারা কি তাকে খুঁজছে?

হায় ঈশ্বর, কেন?

বিপরীত দিকের দুটো দরজা খুলে ফেলা হলো। ঘুরে দাঁড়ালো বর্ন। লিফট

আছে, দরজা আছে, আছে করিডোর-হাদ আর অনেকগুলো ঘর। এই হোটেল থেকে বের হবার রাস্তা আছে কমপক্ষে এক ডজন।

অথবা আছে কি? নাকি ক্যারিলিয়ন দুলাকের কেবলমাত্র দুটো অথবা তিনটে বের হবার পথ রয়েছে? লোকজনের সাহায্যে খুব সহজেই তাহলে সেগুলো আটকে রাখা যাবে। একজন লোককে আটকানো খুব সহজ কাজ।

একজন। নির্ঘাত একজন লোকই টার্গেট। কিন্তু ধরা যাক সে একা নয়? ধরা যাক তার সাথে আরো লোক রয়েছে? দু'জন লোক আর একজন লোক তো এক কথা নয়। তবে একজন লোক সবার মাঝে মিশে থাকতে পারবে—বিশেষ ক'রে মানুষের ভীড়ে, এই রাতের বেলায়। দৃঢ় প্রতীজ্জ খুনি ভুল কাউকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। খুব বেশি ভয়াব্র্ত অবস্থার সৃষ্টি হলে আসল টার্গেট হয়তো ফস্কে যেতে পারে।

নিজের পকেটের অস্ত্রটার ওজন টের পেলো সে। তবে জিনিসটা তার সাথে আছে ব'লে কোনো স্বস্তি বোধ করলো না। ব্যাংকে এটা ব্যবহার করা এমনকি দেখানোটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো—এখনও এটা ব্যবহার করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সে লবির মাঝখানে চলে এসে ডান দিকে মোড় নিলো, সেখানে আরো বেশি লোকজন রয়েছে। এটা একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রাক সাঙ্ক্যাকালীন সেশন। হাজার হাজার লোভনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, তর্কবিতর্ক হবে। দেনদরবারও চলবে সামনে। দেয়ালের পাশে একটা মার্বেলের কাউন্টার আছে। একজন ক্লার্ক ব'সে ব'সে হলুদ রঙের কাগজ হাতে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে কী যেনো করছে। *ক্যাবল গ্রাম*। কাউন্টারের সামনে দু'জন লোক। একজন বয়স্ক, আর অন্যজন গাঢ় লাল রঙের পোশাক পরা, লাল চুলের এক মেয়ে...লাল চুলের। লিফটের সেই মেয়েটি।

বর্ন পেছনে তাকালো। খুনিরা লোকজনের ভীড় ঠেলে বেশ ভদ্র আর মার্জিতভাবেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। একজন ডানে, অন্যজন বাম দিক থেকে। তারা তাকে দেখলেই দিক বিদিক না তাকিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াবে। তারপরই শোনা যাবে সেই ভোঁতা শব্দগুলো। তাদের পকেটগুলো গান পাউডারের উভাপে একটু পুড়ে যাবে কেবল...

সে কি তাদের নজরদারীতে রয়েছে?

তাহলে পেছনের আসনগুলোতেই যেতে হবে...আমরা ওখানে ঘুমাতে পারবো। সে স্লাইড প্রজেক্টর ব্যবহার করে, খুব অস্বস্তিকার থাকবে।

জেসন ঘুরে আবারো লাল চুলের মেয়েটার দিকে তাকালো। ক্যাবলটা শেষ ক'রে ক্লার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে চোখ থেকে হর্নরিমের চশমাটা খুলে পার্সে রেখে দিলো সে। মেয়েটা তার থেকে আট ফুটেও কম দূরে আছে।

বার্তেনেলি এখন লেকচার দিচ্ছে...

কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গেছে। সময়ক্ষেপন করা যাবে না। বর্ন তার

সুটকেসটা বাম হাতে নিয়ে মহিলাকে অনুসরণ করতে করতে পেছন থেকে এসে মহিলার বাহুটা ধরে ফেললো ।

“ডক্টর?...”

“ক্ষমা করবেন?”

“আপনি একজন ডক্টর না?”...সে মেয়েটার হাত ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকালো ।

“সেন জ্যাক,” মেয়েটা বললো, সেন্ট শব্দের ফরাসি উচ্চারণটা ব্যবহার করলো সে । “আপনিই তো লিফটে ছিলেন ।”

“আমি বুঝতে পারি নি আপনিই সেই লোক,” জেসন বললো । “আমাকে বলা হয়েছে বার্তেনেলি কোথায় লেকচার দিচ্ছে সেটা আপনি জানেন ।”

“ডান দিকের হলে । সুট নাম্বার সাত ।”

“আসলে, সেটা কোথায় আমি চিনি না । জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন কি? আমি দেরি ক’রে ফেলেছি, তার বক্তব্যের উপরে আমাকে নোট নিতে হবে ।”

“বার্তেনেলির বক্তব্যের উপরে? কেন? আপনি কি কোনো মার্কসবাদী সংবাদপত্রের সাথে আছেন নাকি?”

“নিরপেক্ষ কোনো প্রতিষ্ঠানে,” জেসন বললো । অবাক হয়ে ভাবলো কথাটা কোথেকে এলো । “আমি বেশ ক’জন লোকের বক্তব্য নেবো । অবশ্য আমার বসেরা মনে করে না তার কথার কোনো দাম আছে ।”

“হয়তো নেই, তবে তার কথাও শোনা দরকার । তার বক্তব্যে কিছু নিমর্ম সত্যও রয়েছে ।”

“আমি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তাকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে । হয়তো আপনি তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ।”

“আমার মনে হয় না আমি আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দিতে পারবো । আমাকে একটা ফোন করতে হবে ।” মেয়েটি তার পার্স বন্ধ ক’রে ফেললো ।

“প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন!”

“কি?” তার দিকে তাকালো মেয়েটা, তবে দয়াপরবশ হয়ে নয় ।

“দুঃখিত, আমার খুব তাড়া আছে ।” সে ডান দিকে তাকালো, দু’জন লোক তার থেকে বিশ ফুটেরও কম দূরে আছে এখন ।

“আপনি তো দেখছি খুবই অভদ্র একজন,” সেন জ্যাক নামের মেয়েটি শীতল কণ্ঠে বললো ।

“প্লিজ ।”

“এই যে, এখান দিয়ে ।” একটা প্রশস্ত করিডোর দেখিয়ে সেটার পেছনে ইঙ্গিত করলো সে ।

ওখানে লোকজনের ভীড়টা একটু কম । তারা পৌছে গেলো লাল ভেলভেট মোড়ানো দরজাগুলোর দিকে । প্রতিটি দরজার উপরে লাল রঙের সাইন দেখা

যাচ্ছে। সাইনগুলো নির্দেশ করছে কনফারেন্স রুম এক, দুই, তিন, ইত্যাদি। হলওয়ারে শেষ মাথায় ডাবল-ডোরের একটা দরজা, সেটার উপরে লেখাটা বলছে এটা সুট নাম্বার সাত।

“ঐ যে, ওখানে,” সেন মেরি জ্যাক বললো। “সাবধানে যাবেন, খুবই অন্ধকার। বার্তেনেলি শ্লাইডের সাহায্যে লেকচার দিচ্ছে।”

“সিনেমা হলের মতো,” মন্তব্য করলো বর্ন। পেছনে তাকিয়ে দেখলো গোল্ডরিমের চশমা পরা লোকটা করিডোর দিয়ে আসছে। তার সঙ্গীটি তার পেছনেই।

“...তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন। সে মঞ্চের নিচে ব’সে আছে, পর্দার দিকে মুখ ক’রে কথা বলছে।” সেন জ্যাক নামের মেয়েটি বলেই চলে যেতে উদ্যত হলো।

“কি বললেন, মঞ্চ?”

“মানে, উঁচু একটা জায়গা। প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়।”

“ওখানে কি বের হবার কোনো পথ আছে? কোনো দরজা?”

“আমার কোনো ধারণা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই, আমাকে আবার একটা ফোন করতে হবে। প্রফেসরের লেকচার উপভোগ করুন।” কথাটা বলে ঘুরে চলে যেতে উদ্যত হতেই বর্ন হাতের সুটকেসটা মেঝেতে রেখে মেয়েটার একটা হাত খপ্প ক’রে ধরে ফেললো। মেয়েটা কটমট চোখে তাকালো তার দিকে। “হাত ছাড়ুন।”

“আমি আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাই না, কিন্তু এ ছাড়া আমার কিছু করারও নেই।” খুব শান্ত কণ্ঠে বললো সে, তার চোখ মেয়েটার কাঁধের পেছনে। খুনিরা তাদের হাটার গতি শ্রুত ক’রে দিয়েছে। নিশ্চিত একটা ফাঁদ। “আপনাকে আমার সাথে আসতে হবে।”

“পাগল নাকি!”

সে মেয়েটার কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে তার মুখোমুখি করলো। তারপর পকেট থেকে অস্ত্রটা বের ক’রে আড়াল ক’রে রাখলো মেয়েটার পেছনে, যাতে ত্রিশ ফিট দূরে থাকা লোকগুলো সেটা দেখতে না পায়। “এটা আমি ব্যবহার করতে চাই নি। আপনাকে আঘাত করারও কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু প্রয়োজন হলে দুটোই আমি করবো।”

“হায় ঈশ্বর...”

“চুপ করুন। যেমন বলছি তেমন করুন। তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। আমাকে এ হোটেল থেকে বের হতে হবে, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। বের হলেই আপনাকে আমি ছেড়ে দেবো। তার আগে নয়। আসুন। আমরা ভেতরে যাবো।”

“আপনি এটা করতে পারেন না।”

“হ্যা, অবশ্যই পারি।” পিস্তলটা দিয়ে মেয়েটার পেটে খোঁচা মেরে তাকে ধাক্কা মারলো সে। “চলুন।” দরজাটা খুলে ফেলতেই করিডোর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলো।

“শ্লে!”

অন্ধকারে প্রবেশ করলো তারা, কিন্তু সেটা সাময়িক। চারকোনা একটা পর্দার আলোর কারণে ঘরে একটু আলো আছে। শ্রোতাদের মাথাগুলোও দেখা যাচ্ছে। ঠিক সিনেমা হলের মতো অবস্থা।

স্পিকারের একটা ভারি কণ্ঠের শব্দ শোনা গেলো এবার।

“আপনারা খেয়াল করবেন, সন্তর এবং একাত্তর সালে কতিপয় নেতা বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী স্লাইড, প্লিজ।” ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেলো। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই আরেকটা স্লাইড ভেসে উঠলো পর্দায়।

“স্লাইড নাম্বার বারো, প্লিজ!”

জেনসন মেয়েটিকে সামনের দিকে ধাক্কা দিলো। শেষ সারির দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে সে। লেকচার হলটার আকার কতোটুকু সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো। একটা লাল বাতির খোঁজ করছে : বের হবার পথ। দেখতে পেলো সেটা! মঞ্চের পেছনে, পর্দারও পেছনে। এ ছাড়া আর কোনো বের হবার পথ নেই। সুট নাম্বার সাত-এ মূল প্রবেশদ্বার ছাড়া আর কোনো দরজাও নেই। তাকে বের হবার পথের দিকেই যেতে হবে। মঞ্চের উপর দিয়ে।

“মেরি—পার ইসি!” পেছনের সারির একটা আসনের বাম দিক থেকে একটা চাপা কণ্ঠ ডাকলো।

“নন, শেরি। রেস্টে আভেক মোয়ে।” দ্বিতীয় ফিসফিসানিটা এলো ঠিক মেরির সামনে থেকে। মেরির সামনে এসে গতিরোধ করলো লোকটা।

“অন নু এ সেপেয়ার। ইর নি এ প্লাস দ্য শেইজে।”

বর্ন মেয়েটার পাজরের কাছে চেপে ধরলো অস্ত্রটা। বার্তাটা খুব পরিষ্কার। জেনসন হাফ ছেড়ে বাঁচলো কারণ মেয়েটার চেহারা খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। “প্লিজ, আমাদেরকে যেতে দাও,” মেয়েটা ফরাসিতে বললো। “প্লিজ।”

“এটা কি? এটা কি তোমার ক্যাবলগ্রাম, মাই ডিয়ার?”

“একজন পুরনো বন্ধু,” বর্ন বললো।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। “স্লাইড বারো কি দেয়া হবে না! পার ফাভোর!”

“আমাদেরকে শেষ সারিতে বসা কারো সাথে দেখা করতে হবে,” জেনসন বলতে লাগলো। পেছনে ফিরে তাকালো আরেকবার। প্রবেশদ্বারটি খোলা। তার

মান্থানে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। চোখের গোল্ডরিমের চশমাটা কেবল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জেসন মেয়েটার হতবাক হওয়া বন্ধুটিকে পাশ কাটিয়ে তাকে দেয়ালের পাশে নিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইলো।

“দুঃখিত, আমাদের খুব তাড়া আছে।”

“তুমি খুবই বাজে ব্যবহার করছো!”

“হ্যা, আমি জানি।”

“স্লাইড বারো! মা চে ইনফামিয়া!”

প্রজেক্টরে কোনো সমস্যা হচ্ছে। আরেকটা ছবি পর্দায় ভেসে উঠলে জেসন মেয়েটাকে নিয়ে অন্যপ্রান্তের দেয়ালের কাছে চলে এলো। ওখান থেকে একটা সংকীর্ণ পথ চলে গেছে মঞ্চের দিকে। মেয়েটাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে এক কোণে নিয়ে গিয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে মেয়েটাকে চেপে ধরলো সে। তার মুখের সামনে মুখ রাখলো বর্ন।

“আমি চিৎকার করবো,” মেয়েটা চাপা কণ্ঠে বললো।

“তাহলে আমি সোজা গুলি করবো,” বললো সে। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলো খুনি দু’জন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তারা দু’জন নিজেদের মাথা দুটো স্প্রিংয়ের মতো চারপাশে ঘোরাচ্ছে। নিজেদের টার্গেট খুঁজে বেড়াচ্ছে শ্রোতাদের মাঝে।

লেকচারারের কর্ণটা কিছুটা ক্ষুদ্র শোনাচ্ছে এখন। “একো! সন্দেহগ্রস্তদের জন্যে আমি আজকে সন্ধ্যায় বক্তব্য দিচ্ছি—এখানে পরিসংখ্যানগত প্রমাণ রয়েছে! আরো শতশত বিশ্লেষণ আমি প্রস্তুত করেছি। বাজার যারা চালায় তাদের হাতেই বাজার ছেড়ে দাও।”

কিছু হাত তালি পড়লো। স্পষ্টতই বক্তার পক্ষে রয়েছে সংখ্যালঘু শ্রোতা। বার্তেনলি আবারো পর্দার দিকে পয়েন্টার দিয়ে কিছু বলতে শুরু করলো। আবারো পিছু হটে গেলো জেসন। চশমা পরা খুনি কিছু একটা দেখতে পেয়ে তার সঙ্গীটিকে বাম দিকে ইশারা তল্লাশী করতে বললো। সে ডান দিকটা দেখবে। তল্লাশীটা শুরু হয়ে গেলো। গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা তাদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। খুনিকে থামাতে এখন গুলি করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। যদি সিটগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন সরে যায়, অথবা যে মেয়েটাকে সে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে রেখেছে সে যদি ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে, কিংবা তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালায়...অথবা সে যদি খুনিকে মিস্ করে তবে সে একেবারে ফাঁদে পড়ে যাবে। যদি খুনিকে মিস্ নাও করে, গুলি করতে সক্ষমও হয়, তাহলেও আরেকজন খুনি রয়ে যাবে এ ঘরে। সে নির্ঘাত একজন দক্ষ গুটারই হবে।

“দয়া ক’রে তেরো নাম্বার স্লাইড।”

এই তো সময় হয়েছে। এখনই!

প্রজেক্টরের আলো নিভে গেলে ঘরটা একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেলো।

মেয়েটাকে ধরে মুখোমুখি করলো বর্ন। “কোনো রকম শব্দ করলে আমি তোমাকে খুন করবো!”

“আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি,” খুব ভয় পেয়ে নিচু কণ্ঠে মেয়েটা বললো। “তুমি একটা উন্মাদ।”

“চলো এবার!” মেয়েটাকে নিয়ে মঞ্চের দিকে যাবার সংকীর্ণ পথটার দিকে ছুটলো সে। প্রজেক্টরের আলো জ্বলে উঠলো আবার। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার ঘাড় ধরে তাকে হাটু মুড়ে বসতে বাধ্য করলো সে, নিজেও সেভাবে ব’সে পড়লো। দু’পাশের চেয়ারের সারির আড়ালে খুনিদের কাছ থেকে লুকিয়ে পড়লো তারা। আঙুল দিয়ে মেয়েটাকে খোঁচা মেরে তাকে হামাগুড়ি দেবার ইঙ্গিত করলো জেসন...আস্বে আস্বে এগোও। মেয়েটা বুঝতে পারলো। হাটু মুড়েই সে কাঁপতে কাঁপতে এগোলো।

“এই বক্তৃতার উপসংহার হলো একেবারেই তর্কাতীত,” লেকচারার উচ্চকণ্ঠে বললো। “মুনাফা করার প্রবণতা উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। কিন্তু শ্রুতামূলক ভূমিকাকে এর সাথে কখনও গুলিয়ে ফেলবেন না। সত্রেটিসের মতে, মূল্যের বা মূল্যবোধের অসমতা ধ্রুব। স্বর্ণ কোনো লোহা বা পিতল নয়। আপনাদের মধ্যে কে এটাকে অস্বীকার করতে পারে? স্লাইড চৌদ্দ। দয়া ক’রে দেবেন কি!”

আবারো অঙ্কার নেমে এলো।

মেয়েটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে মঞ্চের দিকে ছুটলো সে। তারা মাত্র তিন ফিট দূরে আছে এখন।

“কোসা সাকসিদ? ব্যাপারটা কি, প্রিজ? স্লাইড চৌদ্দ!” আবারো ঘটলো ব্যাপারটা! প্রজেক্টরটা ফেঁসে গেছে। অঙ্কারটা প্রলম্বিত হবে। জেসন মেয়েটাকে ধরে মঞ্চের পেছনে ‘এক্সিট’ লেখাটার দিকে ছুটে চললো। “মঞ্চ উঠে এক্সিট দিয়ে বের হয়ে যাও। আমি তোমার পেছনেই আছি। থামলে অথবা চিৎকার করলে সোজা তোমাকে আমি গুলি করবো।”

“ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে যেতে দাও!”

“এখন নয়।” সে জোর দিয়ে বললো। বের হবার অন্য কোনো দরজা আছে। সেখানে লোকজন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। “যাও!”

সেন জ্যাক নামের মেয়েটি দৌড়ে চলে গেলো মঞ্চের কাছে। ওখানেই পৌছাতেই মেয়েটাকে ধরে মঞ্চের উপর তুলে দিলো বর্ন। প্রজেক্টরের আলো আবারো জ্বলে উঠলে মঞ্চটা একেবারে আলোর বন্যায় ভেসে গেলো যেনো। মঞ্চ দু’জন মানুষ দেখে শ্রোতাদের মধ্যে হৈহল্লা শুরু হয়ে গেলো ক্ষুব্ধ বার্তেনেলির কণ্ঠটাও শোনা গেলো।

“ই ইনসোফরিবাইল। সি সোনো কমিউনিষ্টি কুই!”

অন্যরকম শব্দও শোনা গেলো—তিনটি—মারাত্মক, তীক্ষ্ণ, আচম্কা, একটা

অস্ত্র থেকে বের হওয়া ভোঁতা শব্দ—একটা নয়, দুটো। মঞ্চের পাটাতনের কাছে এসে লাগলো গুলিগুলো। মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিলো জেসন। সে নিজেও নিচু হয়ে উইং স্পেসের দিকে ছুটলো, তার সঙ্গে টেনে নিলো মেয়েটাকেও।

“দা ইস্তার! দা ওবেন!”

“শ্লে! দার প্রজেক্টর!”

হলের মাঝখান থেকে চিংকারটা ভেসে এলে প্রজেক্টর ঘুরে গেলো ডান দিকে, উইংয়ের দিকে—তবে পুরোপুরি নয়। শেষে এক্সিট-এর দিকে প্রজেক্টরের আলোটা প্রক্ষেপন করা হলো।

কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেলে দেখা গেলো দক্ষ নিশানায় ‘এক্সিট’ সাইনের লাল বাতিটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। সে দরজার হাতলটা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে।

লেকচার হলে নেমে এলো চরম বিশৃঙ্খলা। বর্ন মেয়েটার জামারুকলার ধরে দরজার দিকে ছুটে চললো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেয়েটা প্রতিরোধ করলে বর্ন সজোরে একটা চর মারলো তার গালে।

দরজার কাছে পৌঁছাতেই ডান দিকের দেয়ালের পাশে এসে কয়েকটা বুলেট এসে বিঁধলো। খুনিরা দৌড়ে কাছে চলে আসছে তাদের নিশানা অব্যর্থ করার জন্যে। তারা মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে, গুলিও করবে সঙ্গে সঙ্গে। তাদের কাছে এখনও যথেষ্ট গুলি রয়ে গেছে, এটা বর্ন জানে। তবে কিভাবে এটা জানে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

বাহু দিয়ে দরজায় সজোরে আঘাত করতেই সেটা খুলে গেলো। সেন জ্যাক নামের মেয়েটিকে টেনে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলো সে।

“থামো!” মেয়েটি চিংকার করে বললো। “আমি আর যাবো না! তুমি একটা উন্মাদ! আমি জানি ওগুলো গুলির শব্দ!”

জেসন খোলা দরজাটা পা দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করে দিলো। “উঠে দাঁড়াও!”

“না!”

“দুঃখিত, তুমি আমার সঙ্গেই আসছো।” হাতটা বাড়িয়ে বললো সে, “উঠে দাঁড়াও। একবার বের হতে পারলেই তোমাকে ছেড়ে দেবো, কথা দিচ্ছি।” কিন্তু যাবেটা কোথায়? আরেকটা টানেল দেখা যাচ্ছে। তবে সেখানে কোনো কার্পেট দেখা যাচ্ছে না। কোনো পালিশ করা দরজা বা বাতি জ্বলা সাইনও নেই। এটা হলো লোডিং এলাকা। মেঝেটা কংক্রিটের। দু’পাশের দেয়ালে পাইপ লাগানো। সে ঠিক পথেই আছে; প্রদর্শনীর জন্যে অনেক বড় বড় জিনিস আনা নেয়ার সুবিধার্থে এই রকম জায়গা থাকারই কথা।

দরজাটা! তাকে সেটা আঁটকাতে হবে! মেরি উঠে দাঁড়িয়েছে। সে মেয়েটাকে এক হাতে ধরে এক্সিট দরজাটার লক করে দিলো।

মেয়েটা এবার আশ্রয় চেষ্টা করতে লাগলো তার হাত থেকে ছোটোর জন্যে।

মেয়েটার হাত ধরে সে মোচড় দিলে মেয়েটা একটা আর্ত চিৎকার দিলো। তার চোখে জল এসে গেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। মেয়েটাকে ধরে দৌড়াতে লাগলো সে।

কয়েকটা আঘাতের শব্দ হলো পর পর। খুনিরা মঞ্চের দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু লকটা খুবই শক্ত।

মেয়েটা নিজের শরীর একেবারে ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলো। একেবারে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে। বর্নের কোনো উপায়ই রইলো না। সে মেয়েটার বাহু ধরে এমন জোরে চাপ দিলো যে, যন্ত্রণার চোটে মেয়েটার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। মেয়েটা কেঁদে ফেললো আবার। উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগোতে লাগলো সে। তারা সিমেন্টের একটা সিঁড়ির কাছে এসে পড়েছে। সেটা শেষ হয়েছে নিচের একটা লোহার দরজার কাছে। এটাই হলো লোডিং ডক এলাকা। দরজার পেছনেই হোটেলের পার্কিংলট। সে প্রায় পৌছেই গেছে। কেবল বের হওয়া বাকি।

“আমার কথা শোনো,” ভয়ে কাঠ হয়ে থাকা মেয়েটাকে বললো সে।

“তুমি কি চাও আমি তোমাকে ছেড়ে দেই?”

“হায় ঈশ্বর, হ্যা! দয়া ক’রে তাই করো!”

“তাহলে আমি যা বলছি তাই করবে। আমরা বাইরে একেবারে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বের হবো। তুমি আমার বাহু ধরে রাখবে, আমি আস্তে আস্তে হাটবো। পার্কিংলটের শেষ প্রান্তে রাখা গাড়িগুলো পর্যন্ত নিচু কণ্ঠে কথা বলবো আমরা। দু’জনেই হাসবো—খুব উচ্চশব্দে নয়। স্বাভাবিকভাবে। যেনো আমরা কোনো মজার কথা মনে ক’রে হাসছি। বুঝেছো?”

“আরে পনেরো মিনিট ধরে আমার সঙ্গে কোনো মজার জিনিসই ঘটছে না,” সে প্রায় বিড়বিড় ক’রে কথাটা বললো।

“এরকমটি ভান করবে। আমি হয়তো ফাঁদে পড়ে গেছি। যদি পড়ে থাকি তো সেটা আমি পরোয়া করি না। তুমি বুঝেছো?”

“আমার মনে হয় আমার হাতের কজিটা ভেঙে গেছে।”

“ভাঙে নি।”

“আমার বাম কাঁধ, বাম হাত। নড়াতে পারছি না। ওগুলো অবশ্য হয়ে গেছে।”

“কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কিছুই হয় নি। সব ঠিক আছে।”

“তুমি একটা পণ্ড।”

“আমি বাঁচতে চাই,” সে বললো। “আসো। মনে রেখো, আমি দরজাটা খুললে আমার দিকে তকিয়ে হাসবে, মাথা দোলাবে।”

“এটা হবে আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন কোনো কাজ।”

“মরার চেয়ে এটা অনেক বেশি সহজ।”

মেয়েটা তার আহত হওয়া হাত জেসনের হাতের নিচে রেখে দরজা খুলে বের হয়ে এলো। বর্ন তার পকেটে থাকা পিস্তলটা ধ’রে রেখেছে। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে। লোভিং ডকের দরজার উপরে একটা বাধ জ্বলছে। সেটা নির্দেশ করছে বাম দিকে নিচের পেভমেন্টের প্রতি। সে তার জিম্মিকে ওখানে নিয়ে গেলো।

মেয়েটা তার কথা মতোই কাজ করলো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই দেখা গেলো তার ভয়ার্ত চেহারাটা। জেসন তার দিকে তাকাতেই সে জোর ক’রে হাসার চেষ্টা করলো। চোখের জল গালে শুকিয়ে গেছে, কাছ থেকে সেটা বোঝা যায়। মেয়েটার চেহারা ঠিক কোনো মুখোশের মতোই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এখন। বাতাসের ঝাপটায় চুলগুলো দুলে উঠলে সেই মুখোশে একমাত্র জীবন্ত জিনিসটা চোখে পড়লো যেনো।

একটা কাঠ হাসি মেয়েটার গলা দিয়ে বের হলো। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে যাবার থেকে খুব বেশি দূরে নেই। তবে জেসন এটা ভাবতে চাইছে না। তাকে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এখন। ডটা ৩০ বাজে। এই জায়গাটা কর্মচারীরা ব্যবহার করে। নাইট শিফটের কর্মচারীরা ডিউটিতে চলে গেছে ব’লে সব কিছু স্থির হয়ে আছে। কতোগুলো গাড়ি পার্ক করা আছে। তীব্র আলোর কাছে পোকারা উড়ছে।

একটা খ্যাচ্ খ্যাচ্ শব্দ হলো। লোহার উপর লোহার ঘর্ষণের। ডান দিক থেকে আসছে শব্দটা, সামনের সারি সারি কোনো গাড়ি থেকে। কোন্ গাড়ি থেকে? কোন্ গাড়ি থেকে? সে এমনভাবে মাথাটা পেছন দিকে হেলালো যেনো তার সঙ্গী কোনো জোক্ বলেছে। এই ফাঁকে আশপাশের গাড়িগুলোর জানালার দিকে তাকালো সে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না।

কিছু একটা? ওখানে, কিন্তু খুবই ছোটো, চোখে পড়ার মতো নয়...খুবই অবাধ করার মতো। ছোট্ট একটা সবুজ রঙ, জ্বলজ্বল ক’রে জ্বলছে। ওটা নড়লো... ওগুলো নড়ে গেলো।

সুবজ। ছোট্ট...বাতি? আচম্কা তার অতীতের কোনো স্মৃতি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। সে চেয়ে আছে দুটো আড়াআড়ি চিকন লাইনের দিকে—একটা ইনফারেড স্কোপ রাইফেলের স্কোপ দিয়ে।

খুনিরা কিভাবে জানলো? অসংখ্য জবাব আছে। এর আগে গেইমেনশেফট ব্যাংকে ওয়্যারলেস ব্যবহার করা হয়েছিলো। এখানেও কেউ এরকম কিছু ব্যবহার করেছে হয়তো। সে একটা টপকোট পরে আছে, তার জিম্মি পরে আছে পাতলা সিল্কের পোশাক। রাতটা খুবই ঠাণ্ডা। কোনো মেয়ে এরকম পোশাকে বাইরে বের হবে না।

সে সঙ্গে সঙ্গে বাম দিকে ঘুরে ঝুঁকে পড়লো সেন মেরি জ্যাকের দিকে। তার কাঁধটা চাপ দিলো মেয়েটার পেটে। আবার সিঁড়ির ওখানে নিয়ে গেলো মেয়েটাকে।

এক নাগারে ছোটো ছোটো ভোঁতা শব্দ হতে লাগলে তাদের চারপাশে পাথরের গুঁড়ো ছটকে পড়তে শুরু করলো। সে ডান দিকে ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে প'ড়ে সেই অবস্থায়ই পকেট থেকে পিস্তলটা বের ক'রে ফেললো। তারপর সোজা সামনের দিকে থাকা গাড়ির জানালা বরাবর গুলি চালালো; রাইফেলটা ওখান দিয়েই বের হয়ে আছে। পর পর তিনটা গুলি করলো সে।

গাড়ি থেকে একটা আত্ননাদ ভেসে এলো। আত্ননাদটা প্রচণ্ড জোরে কান্নায় বদলে গেলো, তারপর ঘোংঘোং একটা শব্দ হবার পরই থেমে গেলো সেটা। বর্ন যেভাবে ছিলো সেভাবেই শুয়ে রইলো। অপেক্ষা করছে, শুনছে, দেখছে। আবারো গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হলো সে।

সব কিছু চুপচাপ। উঠে দাঁড়াতে গেলো সে...কিন্তু পারলো না। কিছু একটা হয়েছে। নড়তে পারছে না। তারপরই বুকে তীব্র ব্যথাটা অনুভূত হলো। স্পন্দনটা এতো জোরে হচ্ছে যে, সে কুঁকড়ে গেলো। দু'হাতে মেঝেটা ধরে কোনো রকম সামলে নিয়ে মাথাটা ঝাঁকালো। নিজের দৃষ্টি সংহত করার চেষ্টা করলো সে। যন্ত্রণাটা ভুলে থাকার চেষ্টাও করলো। তার বাম কাঁধ, তার পাঁজরের নিচে—তার বাম উরু—হাটুর উপরে, কোমরের নিচে, তার আগের আহত হওয়ার জায়গাগুলো, যেখান থেকে মাত্র একমাস আগে কয়েক ডজন সেলাই খোলা হয়েছে। এই নাজুক জায়গাগুলোতে চোট লেগেছে। তার জয়েন্ট আর পেশীগুলো এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠে নি। ওহ্ ঈশ্বর!

তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। খুনির গাড়ির কাছে যেতে হবে। খুনিকে ওখান থেকে বের ক'রে পালাতে হবে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে সেন মেরি জ্যাকের দিকে তাকালো সে। মেয়েটা এক হাতে পাশের দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মুহূর্তেই সে দৌড় দেবে। চলে যাবে। সে তাকে যেতে দেবে না! মেয়েটা হোটেলের ঢুকে চিৎকার চেষ্টামেচি করবে। লোকজন জড়ো করবে, আর কেউ এসে খুন করবে তাকে। মেয়েটাকে থামাতেই হবে।

সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মেঝেতে গড়িয়ে দেয়ালের পাশে চলে এলো সে। উঠে দাঁড়িয়েই মেয়েটার মাথা বরাবর তাক করলো অস্ত্রটা।

“আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করো,” বললো সে। নিজের দুর্বল আর কম্পিত কণ্ঠটা শুনতে পেলো।

“কি?”

“আমাকে সাহায্য করো!”

“তুমি বলেছিলে আমি যেতে পারবো। কথা দিয়েছিলে কিন্তু।”

“সে কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।”

“না, দয়া ক'রে সেটা কোরো না।”

“অস্ত্রটা তোমার মাথার দিকে তাক করা আছে, ডক্টর। তুমি আমাকে উঠে

দাঁড়াতে সাহায্য করো, নইলে গুলি ক'রে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।”

গাড়ি থেকে মৃতলোকটাকে টেনে বের ক'রে মেয়েটাকে হুইলে বসতে বললো সে। তারপর পেছনের দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে পেছনের সিটে শুয়ে পড়লো যাতে বাইরে থেকে তাকে দেখা না যায়।

“গাড়ি চালাও,” সে বললো। “আমি যেভাবে বলবো সেভাবেই গাড়ি চালাবে।”

অধ্যায় ৬

যখনই তুমি কোনো চাপের মধ্যে থাকবে নিজের মনটাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেবে, যে চিন্তা এবং ছবি আসুক তোমার মধ্যে, আসতে দাও। কোনো ধরনের জোর ক'রে ভাবতে যেয়ো না। একটা স্পঞ্জ হয়ে যাও। সবকিছুর উপরে কিংবা কোনো কিছুর উপরেই মনোযোগ দিও না। তাহলে হয়তো নিদিষ্ট কিছু তোমার মনে আপনা আপনিই এসে পড়বে।

গাড়ির পেছনের সিটে কুঁকড়ে প'ড়ে থেকে ডাক্তার ওয়াশবার্নের কথাগুলো মনে করলো বর্ন। কিছু নিয়ন্ত্রণ পুণরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছে সে। তার আগের আঘাতের জায়গাগুলোতে হাত দিয়ে মেসেজ করলো। ব্যথাটা এখনও আছে তবে আগের মতো অতো তীব্র নয়।

“তুমি আমাকে গাড়ি চালানোর কথা বলতে পারো না!” চিৎকার ক'রে মেরি বললো, “আমি জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি। তুমি আমাকে আঘাতও করেছো।” এবার সে একটু নরম কণ্ঠে বললো, “এটা তো অপহরণ, গুণামি...এসব কিন্তু মারাত্মক ধরনের অপরাধ। তুমি এখন হোটেলের বাইরে আছো। এটাই তো তুমি চেয়েছিলে। এখন আমাকে যেতে দাও। আমি কাউকে কিছু বলবো না। তোমাকে কথা দিলাম।”

“মানে, আমার কাছে প্রতীজ্ঞা করছো?”

“হ্যাঁ!”

“আমিও তো তোমার কাছে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম, আবার সেটা ভেঙেছিও। তুমিও তাই করতে পারো।”

“তোমার ব্যাপার আলাদা। আমি সেটা করবো না। আমাকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করেছে না, হায় ঈশ্বর! প্লিজ!”

“গাড়ি চালাতে থাকো।”

একটা জিনিস তার কাছে খুব পরিস্কার। খুনিরা তাকে তার সুটকেসটা ফেলে পালাতে দেখেছে। সেই সুটকেস থেকে তারা নিশ্চিত কিছু তথ্য জানতে পারবে : সে জুরিখের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের বাইরে। বিমানবন্দর আর রেল স্টেশনগুলোতে কড়া নজরদারী করা হবে। আর খুনির কাছ থেকে সে যে গাড়িটা নিয়ে পালাচ্ছে সেটাও খোঁজা হবে।

বিমান বন্দর অথবা রেল স্টেশনে যেতে পারবে না। এই গাড়িটা ছেড়ে তাকে অন্য আরেকটা গাড়িও যোগাড় করতে হবে। তার কাছে অবশ্য টাকা-পয়সা আছে।

সঙ্গে রয়েছে ১০০,০০০ সুইস ফ্রাঁ আর ১৬০০ ফরাসি ফ্রাঁ; সুইস টাকাগুলো আছে পাসপোর্ট কেসে। ফরাসি নোটগুলো মানিব্যাগে। যে মানিব্যাগটা মারকুইসের কাছ থেকে নিয়েছে সে। এই টাকা দিয়ে খুব সহজেই প্যারিসে চলে যেতে পারবে।

প্যারিস কেন? যেনো এই শহরটা চুম্বকের মতো তাকে কেবলই টানছে।

তুমি অসহায় নও। তুমি তোমার পথ খুঁজে নেবে...নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করো, যুক্তিসঙ্গতভাবে।

প্যারিসে।

“তুমি কি এর আগে কখনও জুরিখে এসেছিলে?” সে তার জিম্মিকে জিজ্ঞেস করলো।

“কখনই না।”

“তুমি আমাকে মিথ্যে বলবে না, বলবে কি?”

“বলার তো কোনো কারণ দেখছি না! দয়া ক’রে আমাকে যেতে দাও!”

“কতোদিন ধরে এখানে আছো?”

“এক সপ্তাহ। কনফারেন্সটা এক সপ্তাহের।”

“তাহলে তোমার সময় আছে, আমাকে একটু শহর ঘুরিয়ে দেখাও।”

“আমি হোটেল থেকে খুব একটা বের হই নি। সময় পাই নি।”

“বোর্ডে তোমাদের যে শিডিউল দেখেছি তাতে তোমাদের খুব একটা ব্যস্ততা তো দেখলাম না। পুরো দিনে মাত্র দুটো লেকচার।”

“তারা অতিথি বক্তা। দিনে দুটোর বেশি বক্তৃতা দেয় না। আমাদের কাজ হলো...বিভিন্ন দেশ থেকে আসা দশ থেকে পনেরো জন প্রতিনিধি নিয়ে ছোটো ছোটো কনফারেন্স করা।”

“তুমি কানাডা থেকে এসেছো?”

“আমি কানাডা গভর্নমেন্টের বোর্ড অব রেভেনু’র ট্রেজারি বোর্ডে কাজ করি।”

“তাহলে তোমার ‘ডক্টর’ পদবীটা মেডিকেল ডাক্তারের নয়।”

“ইকোনোমিক্স। অক্সফোর্ডের পেমব্রকের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।”

“দারুণ ব্যাপার। খুশি হলাম।”

আচমকা একটু দৃঢ়ভাবে মেয়েটা বললো, “আমার বসেরা আমার সাথে রাতে যোগাযোগ ক’রে আমাকে না পেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবে। তারা জুরিখ পুলিশকেও খবর দেবে।”

“আচ্ছা,” সে বললো। “তাহলে এ নিয়ে তো একটু ভাবতে হয়, তাই না?” বর্নের মনে হলো বিগত আধঘণ্টা ধরে এতো সব বিপদ আর মারামারির মধ্যেও মেরি তার পার্সটা হাতছাড়া করে নি। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বললো সে, “তোমার পার্সটা আমাকে দাও তো।”

“কি?” মেয়েটা দ্রুত এক হাত হুইল থেকে সরিয়ে পার্সটা হাতে নিয়ে নিলো যেনো জেসনের কাছ থেকে ওটা রক্ষা করছে সে।

সে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো মেয়েটার কাঁধের উপর দিয়ে। তারপর পেছন থেকেই পার্শটা খপ্ ক'রে ধরে বললো, “গাড়ি চালাও, ডক্টর।”

“তোমার কোনো অধিকার নেই...” সে আর কিছু বলতে পারলো না। বুঝতে পারলো, বলে কোনো লাভ নেই।

“আমিও জানি সেটা,” পার্শটা খুলতে খুলতে সে বললো। গাড়ির ছাদে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ব্যাগের ভেতরটা দেখলো। পার্সের মালিকের মতোই পার্শটার ভেতরও সাজানো গোছানো। পাসপোর্ট, ওয়ালেট, চাবি এবং কিছু কাগজপত্র। সে নির্দিষ্ট একটা মেসেজ খুঁজে দেখলো। হলুদ রঙের একটা খাম ক্লার্ক তাকে দিয়েছিলো। হোটেল। সে দেখেছে। ওটা খুঁজে পেয়ে বাতিটার কাছে তুলে ধরলো সে। এটা অটোয়া থেকে আসা একটা ক্যাবলগ্রাম।

দৈনিক রিপোর্ট দেয়াটা অগ্রাধিকারমূলক কাজ। ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তোমার সাথে দেখা হবে ২৬ তারিখ বুধবার, বিমান বন্দরে। কল করো, অথবা ক্যাবল। লিও'র বেলে মুঁইয়ে'তে যেতে ভুলো না। খাবারগুলো অসাধারণ।

পিটার, ভালোবাসা রইলো।

জেসন ক্যাবলটা পার্সে রেখে ভেতর থেকে একটা ছোট্ট দেয়াশলাই বের করলো। ওটার গায়ে একটা নাম লেখা আছে, সেটা পড়লো সে : ক্রোনেনহেইল। একটা রেস্টোরাঁ। কিছু একটা ভাবিয়ে তুললো তাকে। সে জানে না সেটা কি। একটা রেস্টোরাঁর ব্যাপার, শুধু এটুকুই বুঝতে পারছে। দেয়াশলাইটা নিজের কাছে রেখে পার্শটা বন্ধ ক'রে সামনে ঝুঁকে সেটা ড্রাইভারের পাশের সিটে রেখে দিলো সে। “এটাই খালি দেখতে চেয়েছিলাম,” পেছনের সিটে আরাম ক'রে ব'সে দেয়াশলাইটা দেখতে দেখতে বললো বর্ন। “মনে হয় তুমি বলেছিলে অটোয়া থেকে একটা খবর এসেছে। সেটা দেখছি ঠিকই বলেছো। ছাব্বিশ তারিখ আসতে এখনও এক সপ্তাহের বেশি দেরি।”

“প্রিজ...”

একটা সাহায্যের আর্তনাদের মতো শোনালো। কথটা শুনলেও কোনো জবাব দিলো না সে। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা এই মেয়েটাকে তার প্রয়োজন আছে, একজন খোঁড়া লোকের তো ক্রাচের দরকার পড়ে, অথবা যে গাড়ি চালাতে সক্ষম নয় তার তো একজন ড্রাইভারও লাগে। তবে এই গাড়িটা নয়।

“গাড়ি ঘোরাও!” সে আদেশ করলো। “ক্যারিলিয়ন দুলাক'র দিকে ফিরে যাও।”

“হোটলে?”

“হ্যা,” বললো সে। ঐ ছোট্ট দেয়াশলাইটার দিকেই চেয়ে আছে। “আমাদের অন্য আরেকটা গাড়ি লাগবে।”

“আমরা? না, তুমি এটা করতে পারো না! আমি আর কোথাও—” আবারো সে কথাটা পুরোপুরি বলতে পারলো না। তার আগেই হুইলটা ঘুরিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে ফেললো। এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে হুইলটা শক্ত করে ধরে রেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো মেরি।

বর্ন দেয়াশলাই থেকে মুখ তুলে মেরির মাথার পেছনে তাকালো। তার লম্বা লাল চুল আলোতে ঝলমল করছে। আবারো তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মেরির মাথার পেছনে তাক করলো সে। “আমার কথা বুঝতে পেরেছো। তুমি ঠিক তাই করবে যা আমি বলবো। আমার কথা শুনলে অস্ত্রটা পকেটেই থাকবে! বুঝতেই তো পারছো, আমি জীবন বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। এই অস্ত্রটা ব্যবহার করতে আমি মোটেও দ্বিধা করবো না। আমি চাই তুমি সেটা বোঝো।”

“বুঝছি।” তার জবাবটা এলো খুবই নিচু কণ্ঠে। মেয়েটার মুখ দিয়ে একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে এলে পিস্তলের নলটা সরিয়ে ফেললো জেসন। সে সম্ভ্রষ্ট।

তোমার মনটাকে মুক্ত করে দাও...দেয়াশলাইটা। এই ব্যাপারটা কি? তবে সেটা দেয়াশলাই সংক্রান্ত নয়। একটা রেস্টোরাঁ সংক্রান্ত—কিন্তু ক্রোনেনহেইল নয়। তবে সেটাও একটা রেস্টোরাঁ। খুবই ভারি বিম, মোমবাতি, আলো...বাইরে একটা ত্রিভুজ। সাদা পাথর আর কালো রঙের ত্রিভুজ। তিনটি?...তিনটি কালো ত্রিভুজ। ওখানে কেউ একজন ছিলো...সামনে তিনটি ত্রিভুজ আছে এমন একটা রেস্টোরাঁয়। ছবিটা একেবারে পরিষ্কার, খুবই নিখুঁত...খুবই যত্নগাদায়ক। সেটা কি? এরকম কোনো জায়গা কি আসলেই আছে?

নির্দিষ্ট কোনো বিষয় তোমার মনে আসতে পারে...

সেটাই কি এখন হচ্ছে? ওহ, ঈশ্বর, আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

কয়েকশ’ গজ দূর থেকেই হোটেল ক্যারিলিয়ন দুলাকের ঝলমলে বাতিগুলো দেখতে পেলো সে। নিজের পরিকল্পনাটা পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে নি। তবে এখানে ফিরে আসার দুটো কারণ রয়েছে। খুনিরা আর ওখানে নেই। অন্যথায় বর্ন নিজেই নিজের তৈরি ফাঁদে পড়ে যাবে। সে দু’জন খুনিকে চেনে। কিন্তু তারা ছাড়া যদি আরো কেউ থেকে থাকে তো সে তাদের দেখে চিনতেও পারবে না।

হোটেলের বাম দিকে প্রধান পার্কিং এলাকাটা অবস্থিত। “গাড়ির গতি কমিয়ে দাও,” জেসন আদেশ করলো। “বাম দিকে রাখো।”

“এটা তো বের হবার পথ,” মেয়েটি প্রতিবাদে সুরে বললো। “আমরা ভুল পথে যাচ্ছি।”

“কেউ আসছে না, যাও! পার্কিংলটে ঢোকো, বাতিগুলো অতিক্রম করো।” হোটেলের প্রবেশদ্বারের সামনের দৃশ্যটা বলে দিলো কেন তাদেরকে কেউ লক্ষ্য

করছে না। চারটা পুলিশের গাড়ি সেখানে জড়ো হয়েছে। এখনও গাড়িগুলোর ছাদে বাতি জ্বলছে। সে পোশাক পরা পুলিশ দেখতে পেলো। তাদের পাশে আছে হোটেলের কর্মচারীরা। আর চারপাশে লোকজনের ভীড়। তারা প্রায় সবাই হোটেলের গেস্ট। নানা রকম প্রশ্ন করছে তারা, কথা বলছে। যেসব লোক গাড়ি নিয়ে চলে গেছে তাদের তালিকা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মেরি গাড়িটা পার্কিংলট পেরিয়ে ডান দিকের একটা খালি জায়গায় এনে ইনজিন বন্ধ করে সোজা সামনের দিকে চেয়ে রইলো।

“খুব সাবধানে থেকো,” বর্ন বললো। জানালাটার কাঁচ নামিয়ে দিলো সে। “আস্তে করে দরজাটা খুলে বের হও, তারপর আমার পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করো। মনে রাখবে জানালা খোলা আছে, আর অস্ত্রটা আমার হাতেই ধরা। গুলি কিন্তু একদম ব্যর্থ হবে না।” সে যেমনটি বললো মেয়েটি ঠিক তাই করলো, অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। জেসন দরজা খুলে বের হয়ে এলো। নিজের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে রাখলে পায়ের রক্ত সঞ্চালন ফিরে এলো। হাটতে পারবে এখন। ভালোভাবে নয় তবে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কিন্তু পারবে।

“তুমি কী করবে?” সেন জ্যাক নামের মেয়েটি জানতে চাইলো। যেনো জবাবটা শুনতে সে ভয় পাচ্ছে।

“দাঁড়াও। একটু পরে কেউ না কেউ একটা গাড়ি এনে পার্ক করবে এখানে। হোটেলে যাই ঘটে থাকুক না কেন এটা তো ডিনারের সময়। রিজার্ভেশন আগেই করা হয়েছে। বেশির ভাগই ব্যবসা সংক্রান্ত। ঐসব লোকেরা তাদের পরিকল্পনা বদলাবে না।”

“কোনো গাড়ি যদি আসে তো তুমি কিভাবে সেটা নেবে?” মেয়েটা থেমে গেলো। তারপর নিজেই জবাব দিলো প্রশ্নটার। “হায় ঈশ্বর, যে গাড়িটা চালাবে তুমি তাকে খুন করবে!”

মেয়েটার হাত ধরে ঝটকা মারলে মেয়েটা তার সাদা ফ্যাকাশে মুখটা সরিয়ে ফেললো। তাকে ভয়ের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে সে, কিন্তু বেশি করলে, বেশি ভয় দেখালে মেয়েটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। “যদি করতেই হয় তাই করবো, তবে আমি মনে করি না সেটা করার দরকার হবে। পার্কিং অ্যাটেন্ডেন্টরা গাড়িগুলো এখানে নিয়ে আসে। চাবিগুলো সাধারণত ড্যাশবোর্ডের উপরে অথবা সিটের নিচে রাখা থাকে। কাজটা খুবই সহজ হবে।”

একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়লো তাদের উপর। তাদের দিকেই আসছে গাড়িটা।

ডাইনিং রুমের জন্যে রিজার্ভেশন...একটা রেস্টোরাঁ। জেসন তার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে। সময়টা কাজে লাগাবে সে।

গাড়ি থেকে অ্যাটেন্ডেন্ট বের হয়ে এলো চাবিটা সিটের নিচে রেখে। লোকটা তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের দিকে মাথা নাড়লো। কৌতুহল ব্যতীত নয়। বর্ন ফরাসিতে কথা বললো।

“এই ছেলে! হয়তো তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারো।”

“স্যার?” অ্যাটেন্ডেন্ট তাদের কাছে চলে এলো। তবে একটু সতর্কভাবে।
হোটেলের ঘটেছে তাতে এরকম করাটা স্বাভাবিক।

“আমার খুব একটা ভালো লাগছে না, তোমাদের চমৎকার সুইস মদ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি মনে হয়।”

“বেশি খেলে এমনই হয়, স্যার,” ছেলেটি হেসে বললো, সে এখন একটু স্বস্তি পেলো মনে হচ্ছে।

“আমার বউ বলছিলো শহর ছাড়ার আগে একটু খোলামেলা জায়গায় যেতে।”

“ভালো আইডিয়া, স্যার।”

“ভেতরে কি এখনও হৈহল্লা চলছে নাকি? আমার মনে হয় না পুলিশের জামার উপর বমি ক’রে দেবার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে বাইরে যেতে দেবে।”

“এখনও হট্টগোল চলছে, স্যার। সব জায়গাতেই পুলিশ আছে... আমাদেরকে বলা হয়েছে এ নিয়ে কোনো কথা বলতে না।”

“অবশ্যই। কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে। একজন সহকর্মী আজ বিকেলে ফ্লাই ক’রে এসেছে, আমাদের সাথে তার রেস্টোরাঁয় দেখা করার কথা, নামটা ভুলে গেছি। আমি সেখানে আগেও গেছি, কিন্তু নামটা ভুলে গেছি। সেটা কোথায় তাও জানি না। খালি মনে আছে রেস্টোরাঁটার সামনে ত্রিভুজ রয়েছে।”

“ওটা তো ড্রেই এলপেনহসার, স্যার। নামটা...থু শ্যালে। ফকেনস্ট্রাস সড়কের পাশেই।”

“হ্যা, তাই তো। এটাই তো! এখান থেকে ওখানে যেতে হলে...” বর্ন কথাটা শেষ করলো না। বেশি মদ খাওয়া লোকের পক্ষে এরকমটি করাই স্বাভাবিক।

“বাইরে বেরিয়ে বাম দিকে যান, স্যার। একশ’ মিটার যাবার পর ইউ-টার্ন নিয়ে একটা পাইয়ের কাছে এসে ডান দিকে মোড় নেবেন। সেটাই ফকেনস্ট্রাস। তারপর সিফেল্ড অতিক্রম করলেই রেস্টোরাঁটা দেখতে পাবেন। বিরাট বড় সাইনবোর্ড। সমস্যা হবে না।”

“ধন্যবাদ তোমাকে। এখন থেকে কয়েক ঘণ্টা পরে কি তোমাকে এখানে পাওয়া যাবে, মানে আমরা যখন ফিরে আসবো?”

“রাত দুটো পর্যন্ত আমি ডিউটিতে থাকবো, স্যার।”

“ভালো। তোমাকে একটু বখশিস দিতে হবে।”

“ধন্যবাদ, স্যার। আমি কি আপনার গাড়িটা এনে দেবো?”

“তুমি যথেষ্ট করেছো, ধন্যবাদ। আমার একটু হাটার দরকার।” ছেলেটা সেলুট দিয়ে হোটেলের ভেতরে চলে গেলে জেসন আর মেরি ছেলেটার রেখে যাওয়া গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো। জেসন একটু খোঁড়াচ্ছে।

“তাড়াতাড়ি করো। চাবিটা গাড়ির সিটের নিচেই আছে।”

“তারা যদি আমাদের থামায় তখন কি করবে? ঐ অ্যাটেন্ডেন্ট ছেলে গাড়িটা চলে যেতে দেখলেই বুঝে যাবে ওটা চুরি করা হচ্ছে।”

“আমার তাতে সন্দেহ আছে। আমরা যদি ঠিক সময়ে যেতে পারি তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। মানে, সে যখন লোকজনের ভীড়ে ঢুকবে তখনই কাজটা করতে হবে।”

“ধরো সে দেখে ফেললো?”

“তাহলে আমি আশা করবো তুমি খুব দ্রুত গাড়িটা চালাবে।” মেয়েটাকে গাড়ির দরজার সামনে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বললো সে। “গাড়িতে ওঠো এবার।”

অ্যাটেন্ডেন্ট ছেলেটা ঠিকই দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ছুটে আসতে লাগলো। পিস্তল হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো জেসন। এবার সে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলো। “ধ্যাত্তারিকা—চাবিটা নাও।”

“ঠিক আছে...আমি ভাবতেও পারছি না।”

“একটু বেশি ক’রে চেষ্টা করো।”

“হায় ঈশ্বর...” সিটের নিচে হাতরিয়ে চাবিটা খুঁজে পেলো মেরি।

“গাড়ি স্টার্ট করো, তবে আমার আদেশের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।” পার্কিংলটের বাইরে থেকে গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়লে জেসন দেখলো সেটা। হয়তো অ্যাটেন্ডেন্ট সেই গাড়িটা পার্ক করার জন্যেই দৌড়ে আসছে। তবে কারণটা অন্যকিছুও হতে পারে। পার্কিংলটে দু’জন অজ্ঞাত লোককে দেখা যাচ্ছে। “চলো। দ্রুত। এখান থেকে এক্ষুণি বের হও।” মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা চালিয়ে এক্সিট পয়েন্ট দিয়ে বের হয়ে গেলো। লেকের পাড়ে আসতেই জেসন বললো, “আস্তু। একটু গতি কমাও।” তাদের সামনে একটা ট্যান্ড্রি ইউ-টার্ন করছে।

বর্ন নিঃশ্বাস বন্ধ ক’রে জানালা দিয়ে হোটেল ক্যারিলিয়ন দুলাকের প্রবেশ দ্বারটি দেখলো। হোটেল অ্যাটেন্ডেন্টের তড়িঘড়ি ক’রে ছুটে আসার আসল কারণটা বোঝা গেলো এবার। একজন পুলিশের সাথে একদল হোটেল গেস্টের তর্কাতর্কি হচ্ছে। সবাইকে লাইন বেঁধে চেক ক’রে ঢোকানোর ফলে কারো কারো দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই এই বচসা।

“চলো,” জেসন বললো। “আমাদের কেউ দেখে নি।”

তিনটি ত্রিভুজ দেখে তার অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। রেস্তোরাঁর ছাদে বিশাল একটা সাইনবোর্ড। জার্মান ভাষায় লেখা : ড্রেই এলপেনহসার। রেস্তোরাঁর চারপাশে পুরনো দিনের কিছু সংকীর্ণ রাস্তা আছে। ওগুলোতে আধুনিক গাড়ি না চলে বরং ঘোড়ার গাড়ি চললেই বেশি মানাবে। পথের দু’ধারে সারি সারি ল্যাম্পবাতি। দৃশ্যটা দেখেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়, স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটা ভাবলো, যার কিনা ভুলে যাবার মতো কোনো স্মৃতিই নেই।

তারপরও তার একটা স্মৃতি ছিলো, বৈচিত্রময় আর উদ্বেগের। তিনটি কালো ত্রিভূজ, ভারি ভারি বিম। মোমবাতি। সে ঠিকই ধরতে পেরেছিলো। এটা জুরিখের স্মৃতি। তবে অন্য এক জীবনের।

“আমরা এসে গেছি,” মেয়েটি বললো।

“আমি জানি।”

“এবার বলো কী করতে হবে!” এবার চিৎকার ক’রে বললো মেয়েটি। “আমরা তো ওটা পার হয়ে যাচ্ছি।”

“পরের মোড়ে যাও, বাম দিকে মোড় নিও। ব্লকটা ঘুরে এখানে ফিরে আসো আবার।”

“কেন?”

“হায়, আমি যদি সেটা জানতাম!”

“কি?”

“যা বলছি তাই করো।” কেউ ওখানে আছে...রেস্তোরাঁয়। অন্য ছবিগুলো কেন আসছে না? আরেকটা ছবি। একটা মুখ।

তারা রেস্তোরাঁটা আরো দু’বার অতিক্রম ক’রে গেলো। দুই দম্পতি আর চারজন লোক ভেতরে ঢুকছে। বেরিয়ে আসছে এক লোক। দূর থেকে দেখে বোঝা গেলো হোটেলের ভীড় বাড়ছে। বেশিরভাগ জুরিখবাসী রাত আটটার বদলে সাড়ে দশটায় ডিনার করতে পছন্দ করে। সে ব’সে ব’সে অপেক্ষা করছে কিছু একটা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠবে এই আশায়। কিন্তু কিছুই এলো না।

“গাড়িটা শেষ গাড়ির পেছনে নিয়ে রাখো। বাকি পথ আমরা হেটে যাবো।” মেয়েটা কোনো কথা না বলে তার কথামতো কাজ করলো। মেয়েটার দিকে তাকালো জেসন। তার চেহারার মধ্যে উদাস একটা ভাব চলে এসেছে। এই হোটেলের ভেতরে যাই ঘটুকনা কেন এই মেয়েকে তার শেষ কাজেও দরকার হবে। তাকে গাড়িতে ক’রে জুরিখের বাইরে দিয়ে আসবে সে। গাড়িটা থামলে মেয়েটা ইনজিন বন্ধ ক’রে চাবি বের ক’রে হাতে নিয়ে নিলো। তার ভাবভঙ্গী একেবারে ধীরস্থির। মেয়েটার হাত খপ্ ক’রে ধরে ফেললো জেসন। আবছায়া অন্ধকারের মধ্যেই তার দিকে তাকালো সে। মেয়েটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। জেসন মেয়েটার হাত থেকে চাবিটা নিয়ে নিলো।

“এগুলো আমার কাছে থাক,” বললো সে।

“সেটাই ভালো,” সে জবাবে বললো। তার বাম হাতটা তার পাশে দরজার দিকে।

“এখন বের হয়ে হুডের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে,” বর্ন বললো তাকে। “কোনো রকম বোকামী করবে না।”

“কেন করবো? তুমি তো তাহলে খুন করবে আমাকে।”

“ভালো!” জেসন ঘুরে তার পাশের দরজাটা খুলতেই মেয়েটা দরজা খুলে যেই না দৌড় দিতে যাবে অমনি খপ্ ক’রে তার জামার কলারটা ধ’রে ফেললো সে। এরকম কিছু জন্যে জেসন প্রস্তুতই ছিলো। মেয়েটাকে টেনে গাড়িতে ঢুকিয়ে ফেললো সে। এবার তার চুলগুলো মুঠো ক’রে ধরলো। মাথাটা টেনে নিয়ে এলো তার মুখের কাছে।

“আমি আর এরকম করবো না!” চিৎকার ক’রে কঁদে বললো মেরি। “আমি, কসম খেয়ে বলছি, আর করবো না!”

বর্ন দরজাটা কোনোরকম ধরতে পেরে সেটা বন্ধ ক’রে দিলো। বোঝার চেষ্টা করলো সে। ত্রিশ মিনিট আগে অন্য একটা গাড়িতে সে যখন মেয়েটার ঘাড়ের অস্ত্র ঠেকিয়েছিলো তখন মেয়েটা বমি করতে উদ্যত হয়েছিলো। এখন অবশ্য সেরকম কিছু হলো না। মেয়েটা এখন শত্রু হয়ে উঠেছে, একটা হুমকীও বটে। দরকার হলে সে মেয়েটাকে খুনও করতে পারবে, কোনো রকম আবেগ ছাড়াই তাকে খুন করতে পারবে সে, কারণ এটাই বাস্তবসম্মত কাজ হবে তার জন্যে।

“কিছু একটা বলো!” চাপা কণ্ঠে বললো মেয়েটি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার সারা শরীরে কাটা দিয়ে উঠলো। তার স্তন জোড়া কালো সিল্কের পোশাকের সাথে চেপে আছে। ওঠা নামা করছে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে। মেয়েটা এবার আরেকটু ধাতস্থ হয়ে বললো, “আমি বললাম তো এটা আমি আর করবো না।”

“তুমি আবাবো চেষ্টা করবে,” শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো সে। “সময় আসবে যখন তুমি আবাবো এরকম করার চেষ্টা করবে, তুমি মনে করবে তুমি সফল হবে। তবে মনে রেখো, আবাব যদি চেষ্টা করো আমি তোমাকে খুন করবো। আমি এটা করতে চাই না। এরকম করার কোনো কারণও দেখি না। যদি না তুমি আমার জন্যে একটা হুমকী হয়ে ওঠো। আমি বের হবার আগেই তোমাকে ছেড়ে দেবো।”

“তুমি বলছো তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে,” মেয়েটা বললো। “কখন?”

“যখন আমি নিরাপদ বোধ করবো,” বললো সে।

“সেটা কখন হবে?”

“একঘণ্টা পরে। আমরা যখন জুরিখের বাইরে চলে যাবো, এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও। কোথায় এবং কিভাবে যাবো তুমি সেটা জানবে না।”

“আমি কেন তোমাকে বিশ্বাস করবো?”

“তুমি করো কি করো না তাতে আমার কিছু যায় আসে না।” সে মেয়েটাকে ছেড়ে দিলো। “ঠিক হয়ে নাও। চোখ মুছে চুলটা ঠিক ক’রে নাও। আমরা ভেতরে ঢুকবো।”

“ওখানে কি?”

“হায়, সেটা যদি আমি জানতাম!” রেস্টোরাঁটার দিকে তাকিয়ে সে বললো।

“এ কথা তো তুমি আগেও বলেছো।”

মেয়েটার চোখে চোখ রেখে বললো সে, “আমি জানি। তাড়াতাড়ি করো।”

রেস্তোরার ছাদে মোটা মোটা বিম। চেয়ার-টেবিলগুলো সব ভারি ভারি কাঠের। ডিপ বুথ আর মোমবাতি আছে সর্বত্রই। একজন একোর্ডিয়ান বাদক ক্রেতাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বাভারিয়ান সঙ্গীত বাজিয়ে চলছে।

বড় এই ঘরটা সে এর আগেও দেখেছে। ছাদের বিম, মোমবাতি আর ঘরের গুপ্তনটাও তার মনের কোথাও ছাপ মারা আছে। অন্য আরেকটা জীবনে সে এখানে এসেছিলো। মাইতরে দ্য স্টেশনের সামনে এসে তারা দাঁড়ালে একজন ওয়েটার তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো।

“হাবেন সি এইনেন টিশ স্কন রিজার্ভিয়েট, মেইন হের?”

“রিজার্ভেশন? না, নেই। তবে আপনাদের অনেক নামডাক শুনেছি। আশা করি আমাদের জন্যে একটা বুথের ব্যবস্থা ক’রে দিতে পারবেন।”

“নিশ্চয়, স্যার। এখনও অতো কাস্টমার আসে নি। এখানে আসুন, প্লিজ।”

কাছের একটা কর্নারের বুথে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। টেবিলের মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

জেসন মেরিকে ইশারা করলে সে ব’সে পড়লো।

“দেয়ালের পাশে বসো,” ওয়েটার চলে যাবার পর বললো সে। “মনে রেখো, আমার পকেটে পিস্তল আছে।”

“আমি তো বলেছি, আমি সে চেষ্টা করবো না।”

“আমিও আশা করি তুমি তা করবে না। একটা ড্রিংকের অর্ডার দাও। খাওয়াদাওয়া করার সময় আমাদের হাতে নেই।”

“আমি খেতে পারবো না।” মেয়েটা নিজের কাঁপতে থাকা হাতটা ধরে বললো। “সময় নেই কেন? তুমি কিসের জন্যে অপেক্ষা করছো?”

“আমি জানি না।”

“তুমি এ রকম কথা বলো কেন? ‘আমি জানি না।’ ‘হায়, যদি জানতাম।’ তুমি এখানে কেন এসেছো?”

“কারণ এর আগে আমি এখানে এসেছিলাম।”

“এটা কোনো জবাব হলো!”

“তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার তো কোনো কারণ আমি দেখছি না।” একজন ওয়েটার এসে হাজির হলে মেরি মদ আর বর্ন স্কচের অর্ডার দিলো, তার দরকার কড়া মদ। রেস্তোরার চারপাশে তাকিয়ে কিছু ভাবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কিছুই তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো না।

কিন্তু তারপরই চেহারাটা ঘরের মধ্যে দেখতে পেলো বর্ন। দরজার পাশে একটা বুথে ব’সে আছে। মোটাসোটা দেহের বড় মুখের মানুষটা। লোকটা জেসনের দিকে তাকাতেই বিস্ময় আর অবিশ্বাস তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো। বর্ন

মুখটা চেনে না। কিন্তু মুখটা তাকে চেনে। লোকটা তার ঠোঁটের কোণ মুছে ঘরের প্রতিটি টেবিলে চোখ ঘোরালো। তারপর আসতে লাগলো তাদের বুথের দিকেই।

“একজন লোক এখানে আসছে,” জেসন মোমবাতির শিখার ওপাশে বসা মেরিকে বললো। “মোটাসোটা এক লোক, আর সে খুব ভয় পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কিছু বলো না। সে যা-ই বলুক না কেন, মুখ বন্ধ রাখবে। তার দিকে তাকাবেও না। একহাত তুলে মাথাটা সেই হাতের উপর রেখে আরাম করছো এমন ভাব করো। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকো, তার দিকে নয়।”

মেয়েটা অবাক হলেও তার কথা মতোই কাজ করলো। যদিও তার হাত কাঁপছে। তার ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে প্রশ্ন। তবে মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। জেসনই সেই অব্যক্ত প্রশ্নের জবাব দিলো।

“তোমার ভালোর জন্যেই বলছি,” বললো সে। “সে তোমাকে চিনে রাখুক তার কোনো দরকার নেই।”

মোটো লোকটা তাদের কাছে আসতেই জেসন মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলে তাদের বুথটা একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচু আর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কথা বললো লোকটা।

“ডু লিয়েবার গট! তুমি এখানে এসেছো কেন? আমি তোমার কি করেছি যে, তুমি এরকম করলে?”

“এখানকার খাবার আমার খুব ভালো লাগে, তুমি সেটা জানো।”

“তোমার কি কোনো বোধশক্তি নেই? আমার একটা পরিবার আছে। বউ-বাচ্চা আছে। আমাকে যা বলা হয় আমি তাই করি। আমি তো তোমাকে খামটা দিয়ে দিয়েছি, ভেতরটা খুলেও দেখি নি, আমি কিছুই জানি না!”

“কিন্তু তোমাকে টারু দেয়া হয়েছিলো, তাই না?” জেসন আন্দাজে বললো।

“হ্যা। তবে আমি কিছু বলি নি। আমাদের কখনও দেখা হয় নি। আমি তোমার বর্ণনা কখনও কারো কাছে দেয় নি। কাউকে কিছু বলি নি!”

“তাহলে তুমি এতো ভয় পাচ্ছে কেন? আমি তো কেবল ডিনার করতে এসেছি।”

“তোমাকে অনুরোধ করছি, এখান থেকে চলে যাও।”

“এখন কিন্তু আমি রেগে যাচ্ছি। ঠিক আছে, কারণটা তাহলে বলো।”

মোটো লোকটা তার কপালের ঘাম মুছে দরজার দিকে তাকিয়ে বর্ণের দিকে ফিরলো। “অন্যেরা হয়তো এ নিয়ে কথা বলবে। তারা হয়তো তোমাকে চিনে ফেলবে। জেনে যাবে তুমি কে। পুলিশ অনেক ঝামেলা করেছে আমার সাথে, তারা সরাসরি আমার কাছেই আসবে।”

সেন জ্যাক মেরি তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। জেসনের দিকে তাকিয়ে মুখ ফসকে ব'লে ফেললো সে, “পুলিশ...তারা তাহলে পুলিশ ছিলো!”

মেয়েটার দিকে কটমট ক'রে তাকালো বর্ন, তারপর মোটা নার্ভাস হওয়া লোকটার দিকে ফিরে বললো, “তুমি কি বলতে চাচ্ছে, পুলিশ তোমার বউ-বাচ্চার ক্ষতি করবে?”

“ঠিক তারা নয়—তুমি তো ভালো করেই জানো। তাদের আগ্রহের কারণে আমার পরিবারের কাছে অন্যেরাও আসবে। তোমাকে কতো জন খুঁজছে, মেইন হের? তারা কি করবে জানো না? তারা সব করতে পারে—বউ-বাচ্চার খুন তো কিছুই না। আমার জীবনের জন্যে বলছি। আমি কিছুই বলবো না। বলিও নি। তুমি চলে যাও।”

“তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করছো,” জেসন মদে চুমুক দিয়ে বললো।

“ঈশ্বরের দোহাই, এটা কোরো না!” লোকটা তাদের টেবিলের দিকে ঝুঁকে এলো। “তুমি চাচ্ছে আমি যেনো চুপ থাকি। কথা দিচ্ছি চুপ থাকবো। কথাটা ভারব্রেক্সারওয়েল্ট-এ ছড়িয়ে পড়বে। কেউ কোনো খবর পেলেই তারা জুরিখ পুলিশে খবর দেবে। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকটা দেশের পুলিশ ইন্টারপোলের মাধ্যমে এজন্যে তহবিল পাঠিয়েছে।” লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবারো মুখ মুছলো হাত দিয়ে। “আমার মতো একজন লোক পুলিশের সাথে সম্পর্ক রেখে লাভবান হতে পারে, তারপরও আমি কিছুই করি নি। সবই গোপন রেখেছি!”

“অন্য কেউ কি করেছে? আমাকে সত্যি কথা বলো। তুমি মিথ্যে বললে আমি বুঝে ফেলবো।”

“আমি কেবল চারনাককে চিনি। তার সাথেই কেবল আমার কথা হয়েছে, সে স্বীকার করেছে তোমাকে নাকি দেখেছে সে। কিন্তু তুমি তো সেটা জানোই। খামটা তার মাধ্যমেই আমার কাছে এসেছিলো। সে কখনও কিছু বলে নি।”

“চারনাক এখন কোথায়?”

“যেখানে সে সবসময় থাকে। লয়েনস্ট্রাসে তার ফ্ল্যাটে।”

“সেখানে আমি কখনও যাই নি। নাম্বারটা যেনো কতো?”

“তুমি কখনও যাও নি?...” লোকটা চোখ কুচকে তাকালো। “তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছো?”

“প্রশ্নের উত্তর দাও।”

“৩৭ নাম্বার। তুমি তো জানোই, যেমন জানি আমি।”

“তাহলে তো আমি তোমাকে পরীক্ষাই করছি। চারনাককে খামটা কে দিয়েছিলো?”

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। “সেটা তো আমার জানা কথা নয়। কখনও জানানর চেষ্টাও করি নি আমি।”

“তুমি কৌতুহলীও হও নি কখনও?”

“অবশ্যই না। একটা ছাগল তো আর স্বেচ্ছায় নেকড়ের গুহায় ঢুকতে যাবে না।”

“ছাগলেরা কিন্তু নিখুঁত গন্ধ পায়।”

“তারা খুব সতর্কও হয়, মেইন হের। কারণ নেকড়েরা হয় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত আর আক্রমণাত্মক হয়। এক দৌড়েই শেষ হয়ে যাবে সে। ছাগল কখনও নেকড়ের সাথে পারে না।”

“ঝামের ভেতর কি ছিলো?”

“বললাম তো, আমি সেটা খুলি নি।”

“কিন্তু তুমি জানো তাতে কি ছিলো?”

“আমার ধারণা, টাকা ছিলো।”

“তোমার ধারণা?”

“ঠিক আছে। টাকা। প্রচুর পরিমাণের টাকা ছিলো। এর যদি কোনো অন্যথা হয়ে থাকে, তবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এবার দয়া ক’রে এখান থেকে চলে যাও!”

“শেষ একটা প্রশ্ন।”

“আচ্ছা করো। তারপরই চলে যেয়ো।”

“টাকাগুলো কিসের জন্যে ছিলো?”

মোটাকটা বর্ণের দিকে চেয়ে রইলো, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, এখন। কপালে ঘামও দেখা গেলো আবার। “তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলছো, মেইন হের। তবে আমি তোমাকে বিমুখ করবো না। এটাকে এক বেঁচে যাওয়া তুচ্ছ ছাগলের সাহস বলতে পারো। আমি প্রতিদিন তিনটি ভাষায় সংবাদপত্র পড়ি। হয় মাস আগে এক লোক খুন হয়েছিলো। তার হত্যার খবরটা এসব পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর হয়েছিলো।”

অধ্যায় ৭

ফকেনস্ট্রাস থেকে লিমাট কোয়ে'র গ্রসমুনস্টার ক্যাথেড্রালের সামনে এসে পড়লো তারা। লাওয়েনস্ট্রাস শহরটা নদীর ওপারে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মুনস্টার বৃজ দিয়েই ব্যানহফস্ট্রাসে সবচাইতে সহজ আর দ্রুত পৌঁছানো যায়। সেখান থেকে নাশেলস্ট্রাস;

মেরি চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। এতো কিছু'র পরও একটু স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে সে। বর্ন তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সেটা।

...একজন লোক খুন হয়েছে, তার হত্যার খবর প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিলো।

জেসন বর্নকে টাকা দেয়া হয়েছিলো খুন করার জন্যে, কয়েকটি দেশের পুলিশ ইন্টারপোলে ফান্ড পাঠিয়েছে তাকে ধরার জন্যে। তার মানে কিছু লোক খুন হয়েছে...

কতোজন তোমাকে খুঁজছে, মেইন হের? তারা কি করবে?...তারা কোনোভাবেই ক্ষান্ত দেবে না—বউ বাচ্চাকে খুন করা তো তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না!

পুলিশ নয়। অন্য কেউ।

গ্রসমুনস্টার চার্চের য়ম্মজ দুটো টাওয়ার দূর থেকেও রাতের আকাশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুরনো এই স্থাপত্যটার দিকে তাকালো জেসন। এ সম্পর্কে তার অনেক কিছুই মনে হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুই জানে না। এটা আগেও দেখেছে সে, তার পরও তার মনে হচ্ছে জীবনে প্রথমবারের মতো দেখছে এটা।

আমি কেবল চারনাককে চিনি...খামটা তার মাধ্যমেই আমাকে দেয়া হয়েছিলো...লাওয়েনস্ট্রাস। ৩৭ নাম্বার। তুমিও তো আমার মতোই জানো সেটা।

সে কি জানে? সে কি বলবে?

বৃজটা অতিক্রম করলো তারা। শহরে বেশ লোকজনের ভীড় দেখা যাচ্ছে। এটা অপেক্ষাকৃত নতুন শহর। লাল আর সবুজ বাতি জ্বলছে পালাক্রমে। বর্ন কোনো কিছু ভাবার চেষ্টা করলো না...আবার সবই ভাবতে চেষ্টা করলো।

সত্যের রূপরেখা তার সামনে উপস্থিত হচ্ছে, রহস্যজনক আকার ধারণ করছে সেটা। প্রতিটিই তার আগেরটার চেয়ে বিস্ময়কর আর চমকে দেবার মতো।

সে যে সক্ষম সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়—মানসিকভাবে সক্ষম—মানে, আরো বেশি কিছু সহ্য করার ক্ষেত্রে।

“থামো! ডাই ডাম ডা! ডাই শিনওয়ারফার সিভ অস্ অ্যান্ড সি হাবেন লিংকস সিগনালাইজার্ট। ডাস ইস্ট আইন ইনব্যানস্টাস!”

চোখ তুলে তাকালো জেসন, তার পেটে তীব্র একটা ব্যথা জেঁকে বসেছে। তাদের পাশে একটা টহলগাড়ি। জানালা দিয়ে এক পুলিশ চিৎকার ক’রে কী যেনো বলছে। আচম্কা সব কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠেছে...পরিষ্কার আর বিব্রতকর। মেরি সাইড মিরর দিয়ে পুলিশের গাড়িটা দেখেছে। সে গাড়ির হেডলাইটটা বন্ধ ক’রে দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডিরেকশনাল সিগনাল দেখিয়েছে বাম দিকে মোড় নেবার জন্যে। ওয়ানওয়ে রাস্তায় বাম দিকে মোড় নেয়াটা ট্রাফিক আইন বিরোধী। হেডলাইট না জ্বালানোটা আরো বড় অপরাধ। এক্ষেত্রে গাড়িটা নির্ধারিত থামানো হবে। আর মেয়েটা চিৎকার দিতে পারবে সাহায্যের আশায়।

বর্ন হেডলাইটটা তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে ঝুঁকে এক হাত দিয়ে ডিরেকশনাল সিগনাল দেয়া হাতটা ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে এলো।

“আমি তোমাকে খুন করবো,” শান্ত কণ্ঠে বললো সে। তারপর জানালা দিয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যে চিৎকার ক’রে বললো, “দুঃখিত! আমরা বুঝতে পারি নি! পর্যটক তো! আমরা পরের ব্লকে যেতে চাচ্ছি!” পুলিশের লোকটা মেরির কাছ থেকে বড়জোর দুই ফিট দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে, বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটার নির্বিকার আর ভাবলেশহীন মুখটা দেখে একটু হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

বাতিটা বদলে গেলো। “সামনের দিকে এগোও। বোকার মতো কিছু করবে না,” বললো জেসন। গাড়ির ভেতর থেকে পুলিশের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো সে। “দুঃখিত, আবারো বলছি!” চিৎকার ক’রে বললো সে। পুলিশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের সঙ্গীর দিকে ফিরে আবার কথা বলতে লাগলো।

“আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম,” কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো মেয়েটা। “অনেক গাড়ি তো...ওহ্ ঈশ্বর, আমার হাতটা ভেঙেই ফেলেছে...বানচোত।”

মেয়েটার হাত ছেড়ে দিলো বর্ন। তার রাগ দেখে দমে গেলো একটু। সে ভয় পছন্দ করে। “তুমি নিশ্চয় আশা করো না আমি তোমার কথা বিশ্বাস করবো?”

“আমার হাতটা!”

“তুমি গুলিয়ে ফেলেছিলে।”

“তুমিই তো বলেছিলে একটু পরেই আমরা বাম দিকে মোড় নেবো। আমি সেটাই মনে করেছিলাম।”

“এরপর থেকে রাস্তার দিকে চোখ রাখবে।” সে তার কাছ থেকে সরে আসলেও চোখ সরালো না।

“তুমি একটা জানোয়ার,” মেয়েটা বিড়বিড় ক’রে বললো।

লাউয়েনস্ট্রাসের প্রশস্ত একটা এভিনিউতে এসে পড়লো তারা। সেখানে আধুনিক ভবনের মাঝে মাঝে পুরনো দিনের ইট-কাঠের দালানগুলো স্যান্ডউইচ হয়ে আছে।

জেসন বাড়িরগুলোর নাম্বার দেখতে লাগলো । কিছু দূর যাওয়ার পর চোখে পড়লো চার তলার কতোগুলো ভবন । এইসব সারিসারি বাড়িগুলো দেখে একটা ছবি ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায় । সেই ছবিটার সাথে এই বাড়িগুলোর অনেক মিল আছে । তবে পার্থক্যও আছে । মলিন, পুরনো, খুব বেশি সাজানো গোছানো নয়, ঘষা মাজা নয়... জীর্ণশীর্ণ । জানালা, ভাঙা সিঁড়ি, অসমাপ্ত রেলিং—লোহালক্করের জঞ্জাল পড়ে আছে । জুরিখের একটা অংশ । হ্যা, তারা জুরিখে আছে । ছোট্ট একটা জেলা, শহর থেকে একটু দূরে ।

“স্টেপডেকস্ট্রাস,” আপন মনে বললো সে । নিজের মনের পর্দায় ভেসে ওঠা ছবিটা নিয়েই মগ্ন রইলো । একটা দরজা দেখতে পাচ্ছে । শ্রিয়মান লাল, তারই পাশে লাল রঙের সিল্কের মতো একটা পোশাক পরে আছে এক মহিলা । “স্টেপডেকস্ট্রাসের...একটা বোর্ডিং হাউজ ।”

“কি?” বর্নের কথাটা মেরিকে চম্কে দিলো । ভয়ও পেলো মেয়েটা ।

“কিছু না,” মেরির দিক থেকে চোখ সরিয়ে জানালার বাইরে তাকালো সে । “৩৭ নাম্বার,” সারির পঞ্চম বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে । “গাড়ি থামাও ।”

প্রথমে নিজে বেরিয়ে এসে মেয়েটাকে বের হতে ইশারা করলো সে । তার পাটা পরীক্ষা করতে চাচ্ছে বর্ন । গাড়ির চাবিটা নিয়ে নিলো মেয়েটার হাত থেকে ।

“তুমি হাটতে পারছো দেখছি,” বললো মেরি । “হাটতে যখন পারছো, গাড়িও চালাতে পারবে ।”

“হয়তো পারবো ।”

“তাহলে আমাকে যেতে দাও! তুমি যা চেয়েছো সবই তো করেছে ।”

“আরো কিছু বাকি আছে,” কথার পিঠে কথা বললো সে ।

“আমি যে কিছু বলবো না সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো না? তোমাকে আমি আর এই জীবনে দেখতে চাই না...আমি কোনো সাক্ষী হতে চাই না, অথবা পুলিশী কোনো ব্যাপারে জড়াতেও চাই না । কোনো রকম জবানবন্দী, কিংবা সেরকম কিছু দেবোও না! তোমার কোনো কাজের সাথেই আমি আর জড়াতে চাই না । আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি...এটাই তো তোমার সুরক্ষা, তুমি কি বুঝতে পারছো না? আমাকে এবার যেতে দাও, প্লিজ ।”

“সেটা তো দিতে পারছি না ।”

“তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না ।”

“সেটা নয় । তোমাকে আমার দরকার রয়েছে ।”

“কিসের জন্যে?”

“খুবই ফালতু একটা ব্যাপারে । আমার কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই । লাইসেন্স ছাড়া কোনো গাড়ি ভাড়া করা যায় না । অথচ আমাকে একটা গাড়ি ভাড়া করতেই হবে ।”

“এই গাড়িটা তো তোমার কাছে আছেই।”

“বড়জোর আর এক ঘণ্টা পর্যন্ত এটা ব্যবহার করা যাবে। হোটেলের এই গাড়ির মালিক গাড়িটার খোঁজ করবে। গাড়ির নাম্বার আর বর্ণনা জুরিখ পুলিশের কাছে দিয়ে দেয়া হবে। সব জায়গায় খোঁজা হবে এটা। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ট্রাফিক পুলিশেরাও জেনে যাবে।”

মেয়েটা তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলো। তার চোখে মুখে নতুন ক’রে ভীতি আর হতাশা জেঁকে বসলো যেনো। “আমি আর তোমার সাথে যেতে চাই না। রেস্টোরাঁয় লোকটা যা বলেছে সব আমি শুনেছি। আমি যদি আর বেশি কিছু শুনে ফেলি তবে তুমি আমাকে খুন ক’রে ফেলবে।”

“তুমি যা শুনেছো তা আমিও শুনেছি। কিন্তু এর মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝছে পারছি না। বরং মনে হচ্ছে তোমার চেয়ে আমি নিজেই কম বুঝছি। আসো।” মেয়েটার এক হাত ধরে টেনে নিয়ে আরেক হাতে সিঁড়ির রেলিংটা ধরলো যাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় খুব বেশি ব্যথা না পায়।

তার দিকে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো মেয়েটি।

মেইল বাক্সগুলোর দ্বিতীয় সারিতে এম. চারনাক নামটি লেখা আছে। নামটির নিচেই একটা কলিংবেল। সে রিং বাজালো না, পাশের চারটা বোতামে চাপ দিলে কয়েক সেকেন্ড পরেই পাশের ছোট্ট একটা স্পিকার থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। সুইস-জার্মান ভাষায় জানতে চাইলো কে। তবে কোনো জবাব দেয়া হলো না। কলিংবেলে চাপ দিলে লক্‌টা খুলে গেলে জেসন দরজাটা খুলে মেরিকে সামনে ঠেলে দিলো।

মেয়েটাকে দেয়ালের পাশে রেখে অপেক্ষা করলো সে। উপর থেকে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দও শোনা যাচ্ছে এবার।

“ওয়ের ইস্ট দা?”

“জোহান?”

“উ বিস্ট ডু ডেন?”

কোনো সাড়াশব্দ নেই। বিরক্ত হবার শব্দ শোনা গেলো, তারপরই সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দটা। দরজাগুলো বন্ধ।

এম. চারনাক থাকে তৃতীয় তলার ফ্ল্যাট ২সি-তে। বর্ন মেয়েটার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলো। মেয়েটা ঠিকই বলেছে, সে একা থাকলেই বেশি ভালো হতো। কিন্তু এ ব্যাপারে আর কিছুই করতে পারবে না সে। মেয়েটাকে তার দরকার আছে।

পোর্ট নোয়ে’তে থাকার সময় সে রাস্তার মানচিত্রগুলো ভালো ক’রে দেখেছে। লুসার্ন এখন থেকে এক ঘণ্টার পথ। আড়াই ঘণ্টা অথবা তিন ঘণ্টার পথ হলো বার্ন। যেকোনো এক জায়গায় যেতে পারে সে। পথের কোনো ফাঁকা জায়গায়

মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে যাবে। কেবল সময়ের ব্যাপার। শতশত কানেকশান কেনার মতো ক্ষমতা তার রয়েছে। তবে তাকে জুরিখ থেকে বের হতে হবে, আর এই মেয়েটা হলো তার বের হবার উপায়।

কিন্তু জুরিখ ছাড়ার আগে তাকে জানতে হবে। তাকে কথা বলতে হবে একলোকের সাথে, যার নাম...

এম. চারনাক। নামটা দরজার বেলের ডান দিকে লেখা আছে। সে দরজার সামনে থেকে সরে গেলো, মেয়েটাকেও টেনে নিলো তার পাশে।

“তুমি কি জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারো?” জেসন জানতে চাইলো।

“না।”

“মিথ্যে বোলো না।”

“মিথ্যে বলছি না।”

বর্ন একটু ভেবে হলওয়ার দিকে তাকিয়ে বললো : “বেল বাজাও। দরজা খুললে দাঁড়িয়ে থেকো কেবল। ভেতর থেকে যদি কেউ জবাব দেয় বলবে তোমার কাছে একটা মেসেজ আছে—খুবই জরুরি মেসেজ—ড্রেই এলপেনহসার থেকে এক বন্ধু পাঠিয়েছে।”

“ধরো ভেতর থেকে বললো দরজার নিচ দিয়ে দিয়ে দিতে, তাহলে?”

মেয়েটার দিকে তাকালো জেসন। “বেশ ভালো।”

“আমি আর কোনো মারামারি চাচ্ছি না। কিছু দেখতেও চাচ্ছি না, জানতেও চাচ্ছি না। আমি কেবল চাই—”

“আমি জানি,” সে বাধা দিয়ে বললো। “সিজারের ট্যাক্স আর পুনিক-এর যুদ্ধে ফিরে যাবে। কেউ যদি গুরুত্ব কিছু বলে, সংক্ষেপে বলবে মেসেজটা লিখিত নয়, মুখে মুখে বলতে হবে। যে লোকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কেবল সেই লোকের কাছেই বলতে হবে সেটা।”

“সে যদি বর্ণনাটা জানতে চায়?” মেরি বললো শীতল কণ্ঠে।

“তোমার মাথা দেখছি বেশ ভালো, ডক্টর,” বললো সে।

“আমি যুক্তিবাদী। আমি ভীতও বটে। আমি তোমাকে সেটা বলেছি। আমি কি করবো?”

“বলবে নরকে যাও। তারপর হেটে চলে যাবে।”

মেয়েটা বেল বাজালে অদ্ভুত এক শব্দ হলো। কিছু খামচানোর শব্দ। বাড়তে লাগলো সেটা। তারপর আচমকা থেমে গম্ভীর একটা কণ্ঠ শোনা গেলো।

“জা?”

“আমি তো জার্মান বলতে পারি না।”

“ইংলিশ। ব্যাপারটা কি? তুমি কে?”

“ড্রেই এলপেনহসার থেকে এক বন্ধুর মেসেজ নিয়ে এসেছি।”

“দরজার নিচ দিয়ে দাও।”

“সেটা করতে পারছি না। লিখিত বার্তা নয়। যেরকম লোকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কেবল তার কাছেই মেসেজটা দেবো।”

“তো, এটা কোনো কঠিন কাজ নয়,” কণ্ঠটা বললো। লক্ খোলার শব্দ হলে দরজাটা খুলে যেতেই বর্ন সঙ্গে সঙ্গে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

“তুমি একটা পাগল!” হুইল চেয়ার থেকে দুটো লাঠির উপর ভর দেয়া লোকটা বললো। “চলে যাও! এখান থেকে চলে যাও!”

“একথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি,” বলেই জেসন মেয়েটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলো।

মেরি সেন জ্যাককে একটা ছোট্ট জানালাবিহীন শোবার ঘরে থাকতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। তারা যখন কথা বলতে শুরু করলো তখন মেয়েটি স্বেচ্ছায় এটা করলো। পা বিহীন চারনাক ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। তার দোমড়ানো মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এখন। এলোমেলো ধূসর চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কপাল আর কাঁধের উপরে।

“আমার কাছে কি চাও?” জানতে চাইলো সে। “তুমি প্রতীজ্ঞা করেছিলে শেষ ট্রানজাকশনটাই হলো আমাদের শেষ কাজ! আমি আর কিছু করতে পারবো না। কোনো ঝুঁকি নিতে পারবো না। মেসেঞ্জাররা এখানে এসেছিলো। যতো সতর্কই থাকো তারা এখানে এসেছিলো। কেউ যদি ভুল সময়ে একটা ঠিকানা আমার কাছে রেখে যায় তো আমি শেষ হয়ে যাবো!”

“যে ঝুঁকি তুমি নিয়েছিলে সেটা কিন্তু ভালোভাবেই করতে পেরেছিলে,” বর্ন হুইলচেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে বললো। মনে মনে ভাবতে লাগলো কি বললে তথ্যগুলো সহজে বের করা যাবে। তারপরই খামটার কথা মনে পড়ে গেলো তার। যদি উল্টা পাল্টা কিছু হয়ে থাকে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ড্রেই এলপেনহসার-এ এক মোটা লোক।

“এই ঝুঁকির সাথে কোনো তুলনাই চরে না।” চারনাক মাথা নাড়লো। “তুমি আমার জীবনে আসার আগে আমি খুব ভালোই ছিলাম, মেইন হের। একজন বৃদ্ধি সৈনিক যে কিনা যুদ্ধে পা হারিয়েছে। আমি নিতান্তই তুচ্ছ একজন কিন্তু কিছু তথ্য জানি বলে আমার সাবেক কমরেডরা আমাকে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে টাকা দিতো। জীবনটা বেশ স্বচ্ছলই ছিলো। খুব জাঁকজমক হয়তো ছিলো না, তবে বেশ চলে যাচ্ছিলো। তারপরই তুমি আমাকে খুঁজে বের করলে...”

জেসন অধৈর্য হয়ে বললো, “খামটার ব্যাপারে বলো—যে খামটা তুমি ড্রেই এলপেনহসারে আমাদের এক বন্ধুর কাছে দিয়েছিলে। সেটা তোমাকে কে দিয়েছিলো?”

“একজন মেসেঞ্জার।”

“কোথেকে সেটা এসেছিলো?”

“আমি কি ক’রে জানবো? একটা বাস্তব ক’রে এসেছিলো সেটা, ঠিক যেভাবে এসেছিলো অন্যগুলো। আমি বাস্তবটা খুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমিই তো সেটা চেয়েছিলে। তুমি বলেছিলে তুমি আর এখানে আসতে পারবে না।”

“কিন্তু তুমি সেটা খুলেছিলে।” প্রশ্ন নয় এমন বললো জেসন।

“কখনই না!”

“ধরো আমি তোমাকে বলছি, সেখান থেকে টাকা খোয়া গেছে।”

“তাহলে সেটা কোনো পেমেন্ট ছিলো না। ধরে নিতে হবে খামে কোনো টাকাই ছিলো না!” পসু লোকটার কণ্ঠ চড়া হলো। “যাইহোক, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। যদি তাই হয় তো তুমি অ্যাসাইনমেন্টটা গ্রহন করতে না। কিন্তু তুমি সেটা গ্রহন করেছে। তাহলে এখন এখানে এসেছো কেন?”

কারণ আমাকে জানতে হবে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি এমন কিছু দেখছি আর শুনি যা আমি একটুও বুঝতে পারছি না। আমি বেশ দক্ষ আর স্বাবলম্বী... কিন্তু কুমড়াপটীশ... আমাকে সাহায্য করো।

বর্ন হুইলচেয়ার থেকে সরে লক্ষ্যহীনভাবে ঘরের মধ্যে পায়েচরী করতে লাগলো। পাশেই একটা বইয়ের সেল্ফ আছে। তার পাশে কতোগুলো ছবি টাঙানো। একদল জার্মান সেনা। কারো কারোর সাথে শেফার্ড কুকুর। কোনো ব্যারাকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। তাদের সামনে একটা বড় লোহার দরজা; তার উপরে কিছু লেখা আছে। পুরোটা ছবিতে নেই, কেবল ডাচ লেখাটা দেখা যাচ্ছে।

ডাচাও।

তার পেছনের লোকটা নড়ছে, টের পেয়েই জেসন ঘুরে দাঁড়ালো। পসু লোকটা তার হুইলচেয়ারের পাশে থাকা একটা ক্যানভাস ব্যাগ হাতে ধরে রেখেছে। তার চোখে মুখে আগুন জ্বলছে যেনো। মুখটা বিকৃত হয়ে আছে। হাতটা সরলে দেখা গেলো ছোটো ব্যারেলের একটা রিভলবার, কিন্তু বর্ন নিজের পিস্তলটা নেবার আগেই চারনাক গুলি ক’রে বসলো। গুলিগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠলে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভূত হলো তার বাম কাঁধে, তারপর মাথায়—ওহু, ঈশ্বর! সে তার ডান দিকে ঝাঁপ দিলো। কার্পেটের উপর গড়িয়ে একটা ফ্লোরল্যাম্প ছুঁড়ে মারলো খোঁড়া লোকটার দিকে। আবারো গড়িয়ে হুইল চেয়ারটার পাশে চলে এসে উঠে দাঁড়িয়ে ডান কাঁধ দিয়ে চারনাকের পেছনে এমন জোরে ধাক্কা মারলো যে, পসু লোকটা চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। নিজের অস্ত্রটা নেবার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালো জেসন।

“তারা তোমার লাশের জন্যে টাকা দেবে!” পসু লোকটা চিৎকার ক’রে বললো। মেঝে থেকে উঠে ব’সে নিজের অস্ত্রটা তাক করার চেষ্টা করলো সে। “তুমি আমাকে কফিনে ঢোকাতে পারবে না! কার্লোস আমাকে টাকা দেবে! ঈশ্বরের কসম, সে দেবে!”

জেসন বাম দিকে সরে গিয়ে গুলি চালালে চারনাকের মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়লো। গলগল ক'রে রক্ত বের হচ্ছে তার মুখ দিয়ে। মরে গেছে সে।

শোবার ঘরের দরজা থেকে একটা চিৎকার শোনা গেলে জেসন বুঝতে পারলো মেয়েটা চিৎকার দিচ্ছে। তার জিম্মি। জুরিখ থেকে বের হবার তার অবলম্বন। ওহ, ঈশ্বর, সে তার দৃষ্টি ঠিক করতে পারছে না। তার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে!

দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলো সে, চেষ্টা করলো যন্ত্রণাটা এড়ানোর। একটা বাথরুম দেখতে পাচ্ছে। দরজা খোলাই আছে, তোয়ালে আর সিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে, আর...আয়নাটা। দৌড়ে আয়নাটা ধরে টান দিলে সেটা খুলে মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেলো। আয়নার পেছনেই আছে একটা শেলফটা। গজ আর টেপগুলো হাতে নিলো সে। তাকে বের হতে হবে...গুলির শব্দ। গুলির শব্দ হয়েছে। তার জিম্মিকে নিয়ে বের হতে হবে এফুণি! শোবার ঘরে আছে সে। সেটা কোথায়?

কান্না, আর্তনাদ...কান্নাটা অনুসরণ করো! দরজাটার কাছে পৌছে লাথি মেরে খুলে ফেললো সেটা। মেয়েটা, তার জিম্মি মেয়েটা—তার নামটা যেনো কি? —দেয়ালের সাথে সঁটে আছে সে। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। চোঁট দুটো কাঁপছে। মেয়েটার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো সে।

“হায় ঈশ্বর, তুমি তাকে খুন ক'রে ফেলেছো!” চিৎকার ক'রে বললো মেয়েটা। “একজন বৃদ্ধ, যার কোনো—”

“চুপ করো!” তাকে দরজার কাছে টেনে নিয়ে গেলো। তার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে আসছে। দৌড়াতে শুরু করলো তারা। লোকজনের হৈহুল্লা আর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। মেয়েটার হাত ধরেছে বাম হাতে, তাই বাম কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে, তার ডান হাতে অস্ত্র। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে পড়লো তারা।

লবিতে পৌছে সামনের ভারি দরজাটা খুলতে বললো মেয়েটাকে। বাইরের রাস্তায় নেমে মেয়েটার হাত ছেড়ে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। চেষ্টা করলো সাইরেনের শব্দ শোনার। না, কোনো শব্দ শোনা গেলো না। মেয়েটাকে আবার হাত ধরে টেনে গাড়ির সামনে গিয়ে পকেট থেকে চাবিটা বের ক'রে দিলো। “গাড়িতে ওঠো!”

গাড়ির ভেতরে বসেই সে গজগুলো দলা পাকিয়ে মাথার পাশে চেপে ধরলো রক্ত বন্ধ করার জন্যে। তার মনের গভীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি বলছে ভয়ের কিছু নেই। গুলিটা মাথায় লাগে নি, কেবল ছুঁয়ে গেছে। মাথার ভেতরে ঢোকে নি। “আরে, গাড়ি স্টার্ট দাও! এখান থেকে সরে পড়তে হবে!”

“কোথায় যাবো? তুমি তো কিছু বলো নি?” মেয়েটা শান্ত কণ্ঠে বললো। এখন আর চিৎকার করছে না সে। একেবারে বিস্ময়করভাবেই শান্ত আছে। চেয়ে আছে তার দিকে...তার দিকেই কি চেয়ে আছে?

আবারো দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে এলো। “স্টেপডেকস্ট্রাস...” বললো সে।

হয়েছেটা কি? গাড়ি চলছে না কেন? গাড়িটা সামনে এগোচ্ছে না কেন? তার কথা কি মেয়েটি শুনতে পায় নি?

তার চোখ বন্ধ। এবার চোখ খুলে তাকালো। অস্ত্রটা। সেটা তো তার কোলে ছিলো। ওটা নামিয়ে রেখেছিলো ব্যাডেজ লাগানোর সময়...মেয়েটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। অস্ত্রটা ফ্লোরে পড়ে গেছে। নিচু হয়ে নিতে যেতেই মেয়েটা তাকে এমন জোরে ধাক্কা মারলো যে, জানালার কাঁচে মাথাটা গিয়ে ঠোকার খেলো। দরজা খুলে মেয়েটি রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো এবার। মেয়েটা পালিয়ে যাচ্ছে! তার জিম্মি, তার একমাত্র অবলম্বন! লাওয়েনস্ট্রাসের দিকে চলে যাচ্ছে!

সে আর গাড়িতে থাকতে পারলো না। গাড়ি চালানোর দুঃসাহসও দেখালো না। অস্ত্রটা পকেটে রেখে গজগুলো মাথায় চেপে ধরলো রক্ত বন্ধ করার জন্যে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনোমতে দৌড়াতে শুরু করলো সে।

কোথাও না কোথাও একটা মোড় আছে, একটা ট্যাক্সিও আছে। স্টেপডেকস্ট্রাস।

মেরি সেন জ্যাক প্রশস্ত আর ফাঁকা অভিনুটা দিয়ে দৌড়াচ্ছে। হাত নেড়ে চলমান গাড়ি থামাতে চাচ্ছে সে, কিন্তু গাড়িগুলো তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার পেছনে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়লে সে হাত তুলে গাড়িটা থামাতে চাইলো। কিন্তু গাড়িটা আরো দ্রুত গতিতে অতিক্রম ক’রে গেলো তাকে। জুরিখে কেউ রাতের বেলায় এরকম ফাঁকা আর অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি থামায় না। পাশেই সিল নদী আর ফাঁকা একটা পার্ক রয়েছে।

একটা গাড়ি অবশ্য তার ডাকে সাড়া দিলো। ওটার হেডলাইট বন্ধ আছে, ড্রাইভার মেয়েটাকে দেখে তার পাশে বসা সঙ্গীকে সুইস-জার্মান ভাষায় কথা বললো।

“সেই মেয়েটাই হতে পারে, চারনাক এক ব্লক দূরে অথবা পাশের রাস্তায় বসবাস করে।”

“থামাও, মেয়েটাকে কাছে আসতে দাও। তার তো সিন্কেস পোশাক প’রে থাকার কথা...হ্যা, সেই মেয়েটাই তো!”

“অন্যদের ওয়্যারলেসে জানানোর আগে চলো নিশ্চিত হয়ে নিই।”

দু’জন লোক গাড়ি থেকে বের হয়ে এলে যাত্রীটিও পেছন থেকে বের হয়ে ড্রাইভারের সাথে যোগ দিলো।

তারা পরে আছে বিজনেস স্টুট। চোখেমুখে তাদের হাসির ঝিলিক। ভীত মেয়েটি তাদের দিকে এগিয়ে এলো। তারা রাস্তার মাঝখানে আসতেই ড্রাইভার তাদের উদ্দেশ্যে বললো, “ওয়াজ ইস্ট ল্যাসিয়েট, ফ্রলেইন?”

“আমাকে সাহায্য করুন!” মেয়েটা চিৎকার ক’রে বললো। “আমি...আমি জার্মান বলতে পারি না। নিশ্চেষ্ট প্রেশন। পুলিশ ডাকুন! পোলিজি।”

ড্রাইভারের সঙ্গী কর্তৃত্বের সুরে মেয়েটাকে শান্ত হতে বললো। “আমরা পুলিশেরই লোক,” ইংরেজিতে বললো সে। “জুরিখের পুলিশ। আমরা নিশ্চিত নই, মিস্। আপনি কি কারিলিওন দূলাক থেকে এসেছেন?”

“হ্যাঁ!” চিৎকার ক’রে বললো সে। “ও আমাকে যেতে দিচ্ছিলো না! আমাকে মারধর করেছে, অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়েছে! ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটে গেছে!”

“সে এখন কোথায়?”

“আহত হয়েছে। ও গুলি খেলে আমি গাড়ি থেকে দৌড়ে পালিয়েছি...তখনও গাড়িতেই ছিলো!” সে লাওয়েনস্ট্রাসের দিকে হাত তুলে দেখালো। “ওখানে। মনে হয় দুই ব্লক দূরে। একটা ধূসর রঙের ক্যু গাড়ি! তার কাছে অস্ত্র আছে।”

“আমাদের কাছেও আছে, মিস্,” ড্রাইভার বললো। “গাড়ির কাছে চলুন। আপনি এখন নিরাপদ। আমরা খুব সতর্ক আছি। জলদি আসুন।”

তারা ধূসর রঙের ক্যু গাড়িটার কাছে চলে এলো। গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করা আছে। ভেতরে কেউ নেই। ৩৭ নাম্বার বাড়িটার সামনে লোকজন আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলছে। ড্রাইভার পেছনে ঘুরে ভয়াব্র মেয়েটিকে বললো, “এটা হলো চারনাক নামের এক লোকের বাড়ি। সে কি তার কথা বলেছে কিছু? তার সাথে দেখা করার কথা বলেছে?”

“সে ওখানে গিয়েছিলো। আমাকেও জোর ক’রে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো। লোকটাকে খুন করেছে সে! ঐ বৃদ্ধ আর পশু লোকটাকে খুন করেছে!”

“ডার সেভার—শ্লেস,” ড্যাশবোর্ডে থেকে একটা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ড্রাইভারকে তার সঙ্গী বললো। “উইর সিভ জুই স্ট্রাসেন ফন ডা।” গাড়িটা দ্রুতবেগে সামনের দিকে ছুটতে থাকলে মেয়েটা সামনের সিট ধরে রাখলো।

“আপনারা করছেনটা কি? একটা লোক ওখানে খুন হয়েছে!”

“খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে,” ড্রাইভার বললো। “যেমনটি বললেন, সে আহত। হয়তো এখনও আশেপাশেই আছে। এই গাড়িটা সে চেনে না, তাকে আমরা সহজেই খুঁজে পাবো। আমাদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তদন্তকারী দলটি পৌছানোর আগ পর্যন্ত। তবে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।” ৩৭ নাম্বার বাড়িটা থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটা মোড়ে এসে গাড়ির গতি কমে এলো।

সহকারিটি মাইক্রোফোনে যখন কথা বলতে লাগলো তখন ড্রাইভার তাদের অফিশিয়াল অবস্থাটি ব্যাখ্যা করলো। ড্যাশবোর্ডের স্পিকার থেকে ঘরঘর শব্দ হতেই একটা কণ্ঠ বলে উঠলো, “উইর কোমেন বিলেন জেয়ানিং। মিনিটেন। ওয়ার টেট।”

“আমাদের বড় কর্তারা খুব জলদিই এসে পড়বে,” সহকারি বললো। “আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করবো। সে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে।”

মেরি সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো । “ওহ্, ঈশ্বর—যদি একটু ড্রিংক করতে পারতাম!”

ড্রাইভার হেসে তার সঙ্গীকে ইশারা করলো । গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা মদের বোতল বের ক'রে মেয়েটার দিক বাড়িয়ে দিলো সে । “আমাদের কাছে অবশ্য কোনো গ্লাস কিংবা কাপ নেই । তবে ব্র্যান্ডি আছে । অবশ্যই মেডিকেলের জরুরি প্রয়োজনে । পিজ, পান করুন ।”

হেসে বোতলটা হাতে নিলো মেরি । “আপনারা দু'জন খুবই চমৎকার মানুষ, আপনারা জানেন না আমি কতোটা কৃতজ্ঞ । যদি কখনও কানাডায় আসেন তো ফরাসি খাবার আমি নিজে রুঁধে খাওয়ানো আপনাদেরকে ।”

“ধন্যবাদ, মিস্,” ড্রাইভার বললো ।

বর্ন তার কাঁধের ব্যান্ডেজ পরীক্ষা ক'রে দেখলো । নোংরা আর স্বল্প আলোর ঘরে ময়লা লেগে থাকা আয়নাটার দিকে চোখ কুচকে তাকালো সে । স্টেপডেকস্ট্রাসের ব্যাপারে তার ধারণাই ঠিক । লাল রঙের দরজার ছবিটা একেবারে মিলে গেছে । উপরে ভাঙাচোরা জানালার ছাউনি আর জংধরা লোহার রেলিং । ঘরটা যখন সে ভাড়া নিলো তখন তাকে কোনো প্রশ্নই করা হয় নি । যদিও তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট । তবে বর্ন যখন টাকা পরিশোধ করতে গেলো তখন বিল্ডিংয়ের ম্যানেজারের কথাটা ছিলো উল্লেখ করার মতো ।

“মুখ বন্ধ রাখবে এমন একজন ডাক্তার পাওয়া যাবে এখানে ।”

“আমি আপনাকে পরে জানাবো ।”

আঘাতটা মারাত্মক নয় । একজন ডাক্তার পাওয়ার আগ পর্যন্ত লাগিয়ে রাখা টেপগুলোই কাজ করবে ।

কোনো আঘাতের কারণে যদি প্রচণ্ড চাপের অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে ঘাবড়ে যেয়ো না, মানিয়ে নেবার চেষ্টা করো । ভয় পেয়ো না...

সে ভয় পেয়ে গেছে । তার শরীরের কিছু অংশ জমে গেছে ঠাণ্ডায় । যদিও কাঁধের বুলেটটা আর মাথার চামড়া কেটে যাওয়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে । তবে ওগুলো অতো মারাত্মক নয় যে, তাকে থামিয়ে দেবে । অবশ্য খুব দ্রুত চলাফেরা করতে পারছে না সে, যদিও তাকে এখন দ্রুত চলাফেরা করতে হবে । বার্তা দেয়া হয়েছে আর সেটা গৃহীত হয়েছে মস্তিষ্কে । চলাফেরা করতে পারবে সে ।

একটু বিশ্রাম নিলে ভালোভাবে কাজ করা যাবে । দিন হবার আগেই তাকে রওনা দিতে হবে, জুরিখ থেকে বের হবার অন্য আরেকটা পথ খুঁজে নিতে হবে । দ্বিতীয় তলার ম্যানেজার টাকা-পয়সা খুব পছন্দ করে । এক ঘণ্টার মধ্যে বেখেয়ালী জমিদারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে সে ।

শক্ত বিছানাতে শুয়ে ছাদের বাল্ভের দিকে চেয়ে রইলো সে। বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করলেও ভাবনাগুলো চলে এলো হাতুড়ি পেটার মতো শব্দ ক'রে।

একজন লোক খুন হয়েছে...

কিন্তু তুমি তো অ্যাসাইনমেন্টটা গ্রহন করেছো...

দেয়ালের দিকে ফিরে চোখ দুটো বন্ধ ক'রে ফেললো সে। কথাগুলো থামাবার চেষ্টা করলো। তারপর অন্য কথাগুলোও চলে এলে উঠে বসলো সঙ্গে সঙ্গে। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে এখন।

তারা তোমার লাশের জন্যে টাকা দেবে...কার্লোস টাকা দেবে। ঈশ্বরের কসম, সে দেবেই।

কার্লোস।

ক্যু গাড়িটার সামনে এসে থামলো একটা বড়সড় সিডান। তাদের পেছনেই ৩৭ নাম্বার লাওয়েনস্ট্রাস। টহল গাড়িগুলো পনেরো মিনিট আগে এসে পৌছেছে। অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা পাঁচের কম হবে না। আশে পাশে বাড়িঘরের লোকজন এসে বাড়িটার সামনে জড়ো হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। একটা খুন হয়েছে, এক লোক তার নিজের ঘরেই খুন হয়েছে। উদ্ভিগ্নতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে সবার। ৩৭ নাম্বারে যা ঘটছে সেটা ৩২ অথবা ৪০, কিংবা ৫৩ নাম্বারেও হতে পারতো। পৃথিবীতে এসব কী হচ্ছে। জুরিখেও এসব শুরু হয়ে গেলো!

“আমাদের কর্তারা এসে পৌছেছে, মিস্। আপনাকে তাহলে তার কাছে নিয়ে যাই?” সহকারী গাড়ি থেকে নেমে মেরির জন্য দরজা খুলে বললো।

“অবশ্যই।” গাড়ি থেকে নামতেই লোকটা তাকে হাত ধরে সাহায্য করলো। রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলো গোল্ডরিম চশমায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

“আপনি!...আপনি তো হোটেলের ছিলেন! আপনি তো তাদেরই একজন!”

লোকটা দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে বললো, “ঠিক। আমরা জুরিখ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। আর কথাবার্তা বলার আগে একটা বিষয় আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, হোটেল ক্যারিলিওন দুলাকে যাই ঘটুক না কেন, আপনার কিছুই হোতো না। আমরা এ ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলাম। কিছু গুলি হয়তো আপনার খুব কাছ দিয়ে গেছে, তবে সেটার কারণ আপনি ওর খুব কাছাকাছি ছিলেন।”

মেয়েটার আতঙ্ক একটু কমে এলো। “সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।”

“এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়,” লোকটা বললো। “তো, আমি যতোটুকু বুঝি, আপনি তাকে শেষ দেখেছেন গাড়িটার সামনের সিটে বসে থাকতে।”

“হ্যাঁ। সে আহত হয়েছে।”

“কতোটা মারাত্মক?”

“বেশ ভালোই। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে রেখেছে। তার কাঁধ থেকে রক্ত ঝরতে দেখেছি। সে কে?”

“নামে কি আসে যায়। তার তো অনেক নাম। তবে দেখেছেন তো, সে একজন খুনি। খুবই ভয়ংকর খুনি। আর অন্য কেউ খুন হবার আগেই তাকে ধরতে হবে। তাকে আমরা কয়েক বছর ধরেই খুঁজছি। অনেক দেশের অনেক পুলিশই তাকে খুঁজছে। এখন আমাদের সামনে যে সুযোগ এসেছে সেটা আর কারোর পক্ষে কখনও আসে নি। আমরা জানি সে জুরিখে আছে। আহত হয়েছে। এই এলাকায় থাকবে না সে। তবে কতদূর যেতে পারবে? সে কি বলেছে এই শহর ছেড়ে কিভাবে যাবে?”

“একটা গাড়ি ভাড়া করবে। আমার নামে। তার কাছে কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।”

“সে মিথ্যে বলেছে। ভূয়া কাগজপত্র নিয়ে ভ্রমণ করছে সে। আপনি তার কাছে অপ্রয়োজনীয় একজন জিম্মি ছিলেন। এখন একেবারে শুরু থেকে বলেন, সে আপনাকে কি কি বলেছে। কোথায় আপনারা গিয়েছেন, কাদের সাথে দেখা করেছেন, যা যা হয়েছে সব বলুন।”

“ড্রেই এলপেনহসার নামের এক রেস্টোরাঁয় গিয়েছিলো। মোটাসোটা একলোক তাকে দেখে ভয়ে মরে যাচ্ছিলো...” সেন জ্যাক মেরি যা যা তার মনে আসলো বলতে লাগলো। বিশ মিনিট ধরে চললো এই পর্ব।

তারপর অন্য একজন অফিসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। ড্রাইভারকে বললো সে, “ড্রেই এলপেনহসার। শ্লেল!” মেরির দিকে ফিরে বললো। “আমরা সেই লোকটার কাছ থেকেও শুনবো। লোকটা অনেক কিছুই জানে ব’লে মনে হচ্ছে।”

“অনেক কিছু জানে...” মেয়েটা আপন মনে বললো। তার একটা কথা মনে পড়ে গেলো। “স্টেপডেকস্ট্রাস—স্টেপডেকস্ট্রাস। ভাঙা জানালা, ঘরবাড়ি!”

“কি?”

“‘স্টেপডেকস্ট্রাসের একটা বোর্ডিং হাউজ,’ এটাই সে বলেছিলো। এর পরই আমি গাড়ি থেকে নেমে পালাই।”

ড্রাইভার বললো, “ইচকেনে ডিজে স্ট্রাসে। ফ্রুয়ের গ্যাব এস্ ট্যাক্সটিলফাবরিকেন ডা।”

“আমি বুদ্ধিতে পারছি না,” মেরি বললো।

“পুরনো কাপড়ের কারখানাগুলো হবে,” বললো লোকটা। “অভাগাদের স্বর্গরাজ্য... আরো অনেকের জন্যেও। লস!” সে আদেশ করলো।

গাড়ি ছুটিয়ে চলতে লাগলো তারা।

অধ্যায় ৮

খ্যাচ্ ক'রে একটা শব্দ হলো ঘরের বাইরে। কোনো কিছু ভাঙার শব্দ, খুব দূর থেকে। আবার থেমেও গেলো সেটা। চোখ খুলে তাকালো বর্ন।

সিঁড়িটা। ঘরের বাইরে সিঁড়িটা আছে। কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেছে। শরীরের ওজনের কারণে ভাঙা কাঠে শব্দ হয়েছে বলেই সচেতন হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু সাধারণ কোনো বোর্ডার হলে এরকমটি করতো না।

সব চুপচাপ।

আবারো খ্যাচ্ খ্যাচ্ ক'রে শব্দটা হলো। এবার খুব কাছ থেকে। জেসন বিছানা থেকে নিমেষে নেমে মাথার কাছে রাখা অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে দেয়ালে সঙ্গে সঁটে রইলো। পায়ের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে এখন—একজন মানুষের—সে আর শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। কেবল গন্তব্যে পৌঁছাতে চাচ্ছে। বর্নের কোনো সন্দেহ নেই কী সেটা; তার ধারণাই ঠিক।

দরজাটা দুম ক'রে খুলে গেলে বর্ন সেটা সজোরে ধাক্কা মেরে আবার বন্ধ ক'রে দিলো। তারপর নিজের সমস্ত ওজন দরজায় প্রয়োগ ক'রে আটকে রাখলো অনুপ্রবেশকারীকে। লোকটার শরীরের অর্ধেক অংশ দরজার মাঝখানে। সে চাচ্ছে দরজাটা আরেকটু ফাঁক ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়তে। বর্ন এবার আচম্কা দরজা খুলে সঙ্গে সঙ্গে লোকটার গলা বরাবর ডান পায়ে লাগি মারলো। বাম হাত দিয়ে লোকটার সোনালী চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে লোকটাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললো সে। লোকটার হাতের অস্ত্র মেঝেতে পড়ে গেলে বর্ন দেখতে পেলো সেটার নলে সাইলেন্সার লাগানো।

জেসন দরজা বন্ধ ক'রে সিঁড়ি থেকে আরো শব্দ আসছে কিনা শুনলো। আর কেউ নেই। অজ্ঞান হওয়া পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালো সে। চোর? খুনি? কে সে?

পুলিশ? বোর্ডিং হাউজের ম্যানেজার কি পুরস্কারের লোভে এ কাজ করেছে? বর্ন লোকটাকে উল্টিয়ে তার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের ক'রে হাতে নিলো। ব্যাগের টাকাগুলো সরিয়ে ফেললো সে। জানে, এটা অর্থহীন। তার কাছে খুব বেশি টাকা নেইও। কয়েকটি ক্রেডিটকার্ড আর ড্রাইভিং লাইসেন্সের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে, কিন্তু পরক্ষণেই তার হাসিটা উবে গেলো। হাসির কোনো ব্যাপার নেই। ক্রেডিটকার্ডের নামগুলো আলাদা আলাদা লোকের, ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও

অন্য নামে । অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা লোকটা কোনো পুলিশ অফিসার নয় ।

একজন পেশাদার লোক, স্টেপডেকস্ট্রাসের আহত এক লোককে খুন করতে এসেছে । কেউ তাকে ভাড়া করেছে । কে? সে যে এখানে এ কথাটা কে জানে?

মেয়েটা? সে কি মেয়েটার কাছে এই জায়গার কথা বলেছিলো? না, মেয়েটার কাছে নয় । সে হয়তো কিছু বলেছিলো, তবে মেয়েটি সেকথা বোঝে নি । যদি বুঝতো তাহলে এখানে কোনো পেশাদার খুনি আসতো না । তার বদলে বরং বোর্ডিং হাউজটা পুলিশ ঘিরে ফেলতো চারদিক থেকে ।

মোট লোকটার কথা মনে পড়লো বর্নের । সে কি স্টেপডেকস্ট্রাস সম্পর্কে কিছু জানতো? ঐ লোকটা কি তার অভ্যাস আর ধারণ-ধারণ সম্পর্কে জানে? সে নিজেও কি এখানে ছিলো? এখানেই খামটা তার কাছে দিয়েছিলো?

জেসন কপালে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করলো । আমি কেন মনে করতে পারছি না? কখন এই কুয়াশা কাটবে? কখনও কি কাটবে?

নিজেকে কষ্ট দিও না...

জেসন চোখ খুলে সোনালী চুলের লোকটার দিকে তাকালো । ক্ষণিকের জন্যে প্রায় হেসেই ফেলছিলো সে । তার সামনে জুরিখ থেকে বের হবার ভিসাটা পড়ে আছে, আর সে কিনা তার বদলে উল্টাপাল্টা ভেবে সময় নষ্ট করেছে । মানিব্যাগটা পকেটে রেখে অস্ত্রটা কোমরে গুজে নিলো । তারপর অচেতন লোকটাকে টেনে তুলে বিছানার উপর রাখলো সে ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে ঘরের মেঝেতে রাখা জীর্ণশীর্ণ একটা ম্যাট্রেস পেচিয়ে বিছানার চাদর ছিঁড়ে সেটা দিয়ে মুখ বেঁধে ফেললো । কয়েক ঘণ্টা এখানে সে থাকবে । আর এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জুরিখ ছেড়ে চলে যাবে জেসন ।

নিজের পোশাকটা পরে নিলো । কোনো কিছুই নেয়ার মতো নেই, শুধু তার টপকোটটা ছাড়া । পাটা এখনও ব্যথা করছে, অনেকটা অবশ হয়ে আছে যেনো, তবে সেটা তাকে হাটতে বা চলতে ফিরতে বাঁধা দিচ্ছে না । তাকে একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে । তার মাথাটা...সে তার মাথাটা নিয়ে ভাবতে চাচ্ছে না ।

মৃদু আলোর হলওয়ায়ে দিয়ে হেটে গেলো সে । শেষ দরজাটা বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো । উপর থেকে হাসির রোল শোনা যাচ্ছে । দেয়ালে স্টেট অস্ত্রটা তুলে নিলো হাতে । হাসিটা এবার মিলিয়ে গেলো । মাতালের হাসি ছিলো সেটা—অর্থহীন ।

সিঁড়ি দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে নামতে শুরু করলো সে । চারতলার ভবনের তৃতীয় তলায় আছে । ঘরটা নেবার সময় সবচাইতে উপর তলাটা চেয়েছিলো । কেন? এক রাতের জন্যে একটা নোংরা ঘর ভাড়া নেবার মানেরটা কি? আশ্রয় নেয়া?

বন্ধ করো!

দ্বিতীয় তলার ল্যান্ডিংয়ে এসে পড়লো। প্রতিটি ধাপে পা রাখতেই ভাঙা কাঠের খ্যাচ্ খ্যাচ্ শব্দ হচ্ছে। ম্যানেজার যদি কৌতুহলবশত নিচের তলায় তার ঘরে এসে থাকে তবে সেটা হবে তার জন্যে উটকো একটা ঝামেলা।

আরেকটা শব্দ হলো। কোনো কিছুর আঁচরের। কোনো কাঠের উপর কাপড় টেনে নেয়ার শব্দ। সিঁড়ির শেষ মাথায় কেউ লুকিয়ে আছে। নিজের হাটার ছন্দপতন না ঘটিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে গেলো অন্ধকারে। ডান দিকের দেয়ালে তিনটি দরজা আছে। উপর তলার প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে। তাদের একটাতেই...

আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলো সে। প্রথমটা নয়, সেটা খালি আছে। শেষটাও নয়, ওটা দিয়ে কোনো ঘরে যাওয়া যায় না। দ্বিতীয়টিই হবে। হ্যা, দ্বিতীয় দরজাটাই।

বর্ন ডান দিকে সরে এসে অস্ত্রটা বাম হাতে নিয়ে কোমর থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা হাতে তুলে নিলো। দরজা থেকে যখন দুই ফিট দূরে তখনই সে দেয়ালের দিক থেকে ঘুরে গেলো।

“ওয়াজ ইস্ট?...” একটা হাত বের হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো জেসন। “আহ্!” অবয়বটা হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে গেলো। নিজের অস্ত্রটা তাক করতে সক্ষম হলো না সে। বর্ন আবারো গুলি চালালো। এবার লোকটার উরুতে। লোকটা মাটিয়ে গড়িয়ে কুঁকড়ে উঠলে জেসন সামনে এগিয়ে এসে হাটু মুড়ে বসলো। লোকটার বুকের উপর হাটু রেখে অস্ত্রটা মাথা বরাবর তাক করলো সে। নিচু কণ্ঠে কথা বললো বর্ন।

“নিচে কি আরো কেউ আছে?”

“নেইন!” তীব্র যন্ত্রণায় চোখমুখ কুচকে বললো সে। “জুই...কেবল আমরা দু’জন। আমরা ভাড়াটে লোক।”

“কে ভাড়া করেছে?”

“তুমি জানো সেটা।”

“কার্লোস নামের এক লোক?”

“আমি এ প্রশ্নের জবাব দেবো না। আমাকে খুন করলে করতে পারো।”

“আমি যে এখানে আছি সেটা তুমি কিভাবে জানতে পারলে?”

“চারনাক বলেছে।”

“সে তো মারা গেছে।”

“এখন। কিন্তু গতকালকে তো জীবিত ছিলো। জুরিখে খবর পাঠানো হয়েছে : তুমি বেঁচে আছো। আমরা সব জায়গায় সবার কাছেই গেছি...চারনাক জানতো।”

বর্ন একটু জুয়া খেললো। “তুমি মিথ্যে বলছো!” লোকটার মুখে অস্ত্র ঠেকালো। “আমি চারনাককে কখনও স্টেপডেকস্ট্রাসের কথা বলি নি।”

লোকটা আবারো চোখ কুচকালো। “হয়তো সেটা তোমার করার দরকারও

ছিলো না । ঐ নাথসি গুয়োরটার সবখানেই ইনফরমার ছিলো । এই জায়গাটাই বা কেন বাদ যাবে? সে তোমার বর্ণনা দিতে পেরেছে । সে ছাড়া আর কে পারতো, বলো?”

“ড্রেই এলপেনহসারের এক লোক ।”

“এরকম নাম আমরা কখনও শুনি নি ।”

“আমরা কারা?”

লোকটা ঢোক গিললো । “ব্যবসায়ীরা... শুধু ব্যবসায়ীরা ।”

“আর তোমাদের ব্যবসাটা হলো খুন করা ।”

“তোমার সাথে কথা বলাটা অদ্ভুতই বটে । না । তোমাকে তুলে নেয়া হতো, খুন করা হতো না ।”

“কোথায় নেয়া হতো?”

“আমাদের গাড়ির গুয়ারলেসে সেটা জানিয়ে দেয়া হতো ।”

“চমৎকার,” জেসন নির্বিকার কণ্ঠে বললো । “তুমি কেবল দ্বিতীয় সারিরই নও, একেবারে কামলা ধরণের । তোমার গাড়িটা কোথায়?”

“বাইরে ।”

“চাবিটা দাও আমাকে ।”

“না!”

“তোমাকে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে,” জেসন লোকটার মাথায় অস্ত্র তাক করতই লোকটা জ্ঞান হারালো ।

চাবিটা বর্ন খুঁজে পেলে অস্ত্রটা পকেটে রেখে দিলো । এই অস্ত্রটা আরো ছোটো । তবে এতে কোনো সাইলেন্সার লাগানো নেই । বোঝা যাচ্ছে তাকে হত্যা করতে নয়, তুলে নেবার জন্যেই ওরা এসেছিলো । উপরে যে লোকটি গিয়েছিলো সে আসলে সুরক্ষার জন্যে সাইলেন্সার ব্যবহার করেছে । বড়জোর তাকে আহত করতো । কিন্তু একটা তথ্য কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি করলো । দ্বিতীয় তলার লোকটা ছিলো ব্যাক-আপে ।

তাহলে সে দ্বিতীয় তলায় ছিলো কেন? সে কেন তার সহকর্মীকে অনুসরণ করলো না? সিঁড়িতে তো থাকতে পারতো? একটু অদ্ভুত লাগছে । তবে এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই । বাইরে একটা গাড়ি আছে, আর সেটার চাবি এখন তার হাতে ।

কোনো কিছুই ফেলে রাখা যাবে না । তৃতীয় অস্ত্রটা । সে উঠে দাঁড়িয়ে সেই রিভলবারটা খুঁজে পেলো যেটা ফরাসি লোকটার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলো । বাম পায়ের প্যান্টটা একটু তুলে ইলাস্টিকের মোজার মধ্যে আঁটকে রাখলো অস্ত্রটা ।

একটু থেমে নিজের শ্বাস আর ভারসাম্যটা ঠিক ক’রে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো সে । টের পেলো কাঁধের ব্যথাটা আবার বাড়ছে । ক্রমশ অবশ হয়ে উঠছে সেটা । আশা করলো গাড়িটা যেনো কোনো মতে চালাতে পারে ।

সিঁড়ির পাঁচ নাম্বার ধাপে এসে চম্কে থেমে গেলো সে । শব্দ শোনার চেষ্টা

করলো, কিন্তু না, এবার কিছুই শুনতে পেলো না। জেসন তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিয়ে নেমে গেলো। যেভাবেই হোক তাকে গাড়ি চালিয়ে জুরিখে যেতে হবে—কোথাও না কোথাও একজন ডাক্তার খুঁজে বের করতে হবে।

বড়সড় সিডান গাড়িটা খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারলো। গাড়িতে বসে একটু স্বস্তি বোধ করলো সে, কারণ গাড়িটার অটোমেটিক শিফট গিয়ার আছে। তার কোমরে থাকা বড় অস্ত্রটার কারণে বসতে অসুবিধা হচ্ছে তাই জিনিসটা পাশের সিটে রেখে দিলো। চাবি ঢুকিয়ে স্টার্ট দিলে গাড়ির ইনজিন চালু হলো না। আরেকটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করলো, সেটাতেও কাজ হলো না। ট্রান্সকের চাবি হয়তো, ধারণা করলো। এবার তৃতীয় চাবিটা দিয়ে চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই চাবিটা ঢুকলোই না। কোনো চাবিতেই কাজ হচ্ছে না! ধাত্তারিকা!

তার বাম দিক থেকে শক্তিশালী একটা আলো এসে তার চোখ দুটোকে একেবারে ঝলসে দিলে অস্ত্রটা তুলে নিলো সে। কিন্তু ডান পাশে দ্বিতীয় আলোটা এসে পড়লে তার দরজাটা ধপাস করে খুলে ভারি একটা ফ্লাশলাইট দিয়ে তার হাতে আঘাত করা হলো, আরেকটা হাত সিট থেকে ছিনিয়ে নিলো তার অস্ত্রটা।

“বের হও!” বামপাশ থেকে বলা হলো। তার ঘাড়ের একটা অস্ত্র ঠেকালো কেউ একজন।

সে বের হয়ে এলে চোখে হাজার হাজার আলোর বিন্দু দেখতে পেলো। আশ্বে আশ্বে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এলে প্রথমে তার নজরে পড়লো দুটো বৃত্ত। সোনালী রঙের। সারা রাত ধরে যে খুনি তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তার চশমাটা। লোকটা কথা বললো। “পদার্থ বিজ্ঞান বলে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি বিপরীত এবং সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট মানুষ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একই রকম আচরণ করে। তোমার মতো লোককে ধরতে কি করতে হবে সেটা আমরা জানি।”

“খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এটা,” জেসন বললো। “বিশেষ করে যারা এ কাজে নেমে পড়েছে।”

“তাদেরকে বেশ ভালো টাকা দেয়া হয়। আরো কিছু ব্যাপারও আছে—কোনো নিশ্চয়তা না থাকলেও সেটা আছে। রহস্যময় বর্ন নির্বিচারে হত্যা করে না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সে হত্যা করে হাত নষ্ট করে না। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি।”

“তোমরা হলে ঘোড়ার পাছা।” কেবল এ কথাটিই তার মাথায় এলো। “তবে তোমাদের দু’জন লোকই বেঁচে আছে। যদি জানতে চাও তো কথাটা বললাম।”

আরেক জনকে দেখা গেলো। বেটে লোকটা আরেকজনকে নিয়ে বের হয়ে এলো অন্ধকারাচ্ছন্ন এক কোণ থেকে। মেয়েটা। মেরি সেন জ্যাক।

“হ্যাঁ, এই লোকটাই,” মেয়েটা আশ্বে করে বললো। তার চোখে মুখে দৃঢ়তা।

“হায় ঈশ্বর...” অবিশ্বাসে বর্ন মাথা ঝাঁকালো। “এটা তুমি কিভাবে করতে পারলে, ডক্টর?” গলা উঁচিয়ে জানতে চাইলো সে। “ক্যারিলিওন থেকে কি কেউ

আমার ঘরটা লক্ষ্য রাখছিলো? তুমি খুবই চমৎকার কাজ করেছে। আর আমি ভাবছিলাম তুমি কোনো পুলিশের গাড়ির সাথে হয়তো ধাক্কা খেয়েছো।”

“এরাই পুলিশের লোক।”

জেন্সন তার সামনে থাকা খুনির দিকে তাকালো। লোকটা নিজের চশমা ঠিক করছে। “আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি,” বললো সে।

“সামান্য প্রতিভা,” খুনি জবাব দিলো। “পরিস্থিতিটা যথার্থ ছিলো। তুমিই সেগুলো ক’রে দিয়েছো।”

“এখন কি হবে? ভেতরে লোকটা আমাকে বলেছে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, খুন করা হবে না।”

“ভুলে গেছো। তাকে কি বলতে হবে সেটাই কেবল বলা হয়েছে।” সুইস লোকটি থামলো। “তাহলে তুমি দেখতে এরকম। আমরা অনেকেই বিগত দু’তিন বছর ধরে ভেবেছি এ নিয়ে। কতো অনুমানই না করা হয়েছে! সে লম্বা, না, সে মাঝারি আকৃতির। তার চুল সোনালী, না, কালো। নীল চোখ, না, একেবারে বাদামী। তার মুখটা খুব তীক্ষ্ণ, না একেবারেই সাধারণ। ভীড়ের মধ্যে চেনা যাবে না। কিন্তু কোনো কিছুই সাধারণ নয়। সবই অসাধারণ।”

তোমার চেহারাটা বদলে ফেলা হয়েছে। চরিত্রটা ঢেকে গেছে। চুলটা বদলে ফেলো, তাহলে দেখবে তোমার চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে...কিছু কিছু কনট্রাস্ট লেন্স আছে। যা চোখের রঙ বদলে দেয়...চশমা পরো, দেখবে তুমি একেবারে আলাদা একজন হয়ে গেছো।

সবকিছুই খাপ খেয়ে যাচ্ছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি, তবে যতোটুকু জানতে চেয়েছে তার চেয়ে বেশি জেনে গেছে।

“আমি এসব ঝামেলা শেষ করতে চাচ্ছি,” মেরি বললো। “আপনাদের অফিসে গিয়ে যা যা সাইন করতে হবে আমি সাইন করবো। আমাকে আমার হোটলে ফিরতে হবে। আমাকে তো আর বলতে হবে না আমি কিসের মধ্যে ছিলাম।”

গোল্ডরিম চশমার মধ্য দিয়ে সুইস লোকটা তার দিকে তাকালো। মেয়েটাকে বেটে মতো যে লোক অস্বাভাবিক থেকে বের ক’রে নিয়ে এসেছিলো সে তার হাতটা ধরে ফেললে তাদের দু’জনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো মেরি।

তারপর বর্নের দিকে তাকালো। মেয়েটার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ভয়ংকর একটা ব্যাপার তার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠলে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো।

“তাকে যেতে দাও,” জেন্সন বললো। “সে কানাডায় ফিরে যাচ্ছে। তোমরা তাকে আর কখনও দেখতে পাবে না।”

“একটু বাস্তববাদী হও, বর্ন। সে আমাদেরকে দেখে ফেলেছে। আমরা দু’জন পেশাদার লোক। এই ধান্দায় কিছু নিয়মকানুন আছে।” লোকটা জেন্সনের খুঁতনীর নীচে অস্ত্র ঠেকিয়ে তার পকেট হাতেরে অস্ত্রটা নিয়ে নিলো। “যেমনটি ভেবেছিলাম,”

কথাটা বলেই বেটে লোকটার দিকে ফিরলো, “একে অন্য গাড়িতে নিয়ে যাও । লিমাটে ।”

বর্ন জমে গেলো । মেরিকে খুন ক’রে তার দেহ লিমাট নদীতে ফেলে দেয়া হবে ।

“দাঁড়াও!” জেসন একটু সামনে এগিয়ে বললো, কিন্তু অস্ত্রের মুখে গাড়ির হুডের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হলো সে । “তোমরা বোকামি করছো! সে কানাডার সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা । তারা পুরো জুরিখ চষে বেড়াবে ।”

“সেটা নিয়ে তুমি এতো ভাবনায় পড়লে কেন? তুমি তো আর বেঁচে থাকছো না । তোমাকে তারা খুঁজবে না ।”

“এটা একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ!” বর্ন চিৎকার ক’রে বললো । “আমরা পেশাদার, মনে আছে কথাটা?”

“তুমি দেখছো কি, যাও,” বেটে লোকটার দিকে ফিরে বললো খুনি । “গেহ! শ্বেল! গুইসান কুয়ে!”

“আরে চিৎকার করো, যতো জোরে পারো চিৎকার করো!” চিৎকার ক’রে মেরিকে বললো জেসন । “চিৎকার করো! থেমো না!”

মেয়েটা চেষ্টা করলো চিৎকার দেবার জন্যে কিন্তু প্রচণ্ড জোরে তার গলায় একটা ঘুষি দেয়া হলে চিৎকারটা গলার মাঝ পথেই যেনো আঁটকে গেলো । মেয়েটি রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে তার সম্ভাব্য খুনি টানতে টানতে তাকে নাম্বারবিহীন কালো রঙের সিডান গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগলো ।

“খুবই নির্বোধের মতো কাজ করলে,” বর্নের দিকে চেয়ে বললো খুনি । “তুমি কেবল কাজটাকে আরেকটু ত্বরান্বিত করলে । বলতে গেলে, এখন কাজটা আরো বেশি সহজ হয়ে গেলো । সব কিছুই খুব সামরিক কায়দায় হচ্ছে, তাই না? এটা আসলেই একটা যুদ্ধক্ষেত্র ।” টর্চ হাতে লোকটার দিকে ঘুরলো সে । “জোহানকে সিগনাল দাও ভেতরে যাবার জন্যে । আমরা আসছি ।”

টর্চটা একবার জ্বললো নিভলো । চতুর্থ লোকটি যে কিনা মৃত্যুদণ্ড পাওয়া মেয়েটাকে গাড়িতে ঢোকাবার জন্যে দরজা খুলেছে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে । মেরিকে গাড়ির পেছনের সিটে ছুড়ে ফেলে দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক’রে দেয়া হলো । ঘাতককে মাথা নেড়ে ইশারা করলো জোহান নামের লোকটি ।

গাড়িটা রওনা দিলে প্রচণ্ড অসুস্থ বোধ করলো জেসন । গাড়ির ভেতরে একটি মেয়ে আছে যাকে সে তিন ঘণ্টা আগেও দেখে নি । মেয়েটাকে সে খুন ক’রেই ফেললো । “তোমরা আসলেই সৈনিক,” সে বললো ।

“একশ” জন লোককেও যদিও বিশ্বাস করতে পাতাম, আমি তাদেরকে টাকা দিয়ে কিনে নিতাম খুশি মনে । যেমনটি বলা হয়, তোমার সুনামই তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ।”

“ধরো, আমি তোমাদেরকে টাকা দিলাম। তুমি তো ব্যাংকে ছিলে, ভালো করেই জানো আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে।”

“সম্ভবত কয়েক মিলিয়ন, তবে আমি একটা ফ্রাঁও স্পর্শ করবো না।”

“কেন? ভয় পাচ্ছে?”

“অবশ্যই। সম্পদ অনেকটা সময়ের সাথে সম্পর্কিত। কার কতোটুকু সময় আছে তার উপর সম্পদের মূল্য নির্ধারিত হয়। আমার হাতে তো পাঁচ মিনিটও নেই।” খুনি তার অধীনস্তের দিকে ফিরলো। “তাকে গাড়িতে নিয়ে যাও। কাপড়-চোপড় সব খুলে রেখো। আমি তার নগ্ন ছবি তুলতে চাই—আগে আর পরে। তোমরা তার বিনিময়ে প্রচুর টাকা পাবে। গাড়ি আমিই চালাবো।” আবারো বর্নের দিকে তাকালো সে। “ছবিগুলো প্রথমে পাবে কার্লোস। আর বাকি প্রিন্টগুলো খোলাবাজারে বিক্রি ক’রে বেশ ভালো দাম পাবো ব’লে আশা করছি। ম্যাগাজিনগুলো তো এরকম ছবির জন্যে চড়া দাম দেয়।”

“কার্লোস কেন তোমাকে বিশ্বাস করবে? কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন? তুমিই তো বললে : কেউ জানে না, আমি দেখতে কেমন।”

“সেটা আমি করাতে পারবো,” লোকটা বললো। “জুরিখের দু’জন ব্যাংকার তোমাকে জেসন বর্ন হিসেবে চিহ্নিত করতে এগিয়ে আসবে। সেটাই যথেষ্ট। আমি তো আড়ালে থাকবো।” অস্ত্রধারী লোকটাকে সে বললো, “জলদি করো! আমাকে ক্যাবল পাঠাতে হবে। কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হবে।”

একটা শক্ত হাত এসে আঘাত করলো বর্নের কাঁধে। তার গলাটা টিপে ধরলো আঙুটার মতো। তার কোমরে, স্পাইনে ঠেকানো হলো অস্ত্র। গাড়িতে টেনে তোলার সময় সারা শরীরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো সে। যে লোক তাকে ধরে রেখেছে সে একজন পেশাদার। সে যদি আহত নাও থাকতো লোকটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারতো না। অস্ত্রধারী লোকটা ছইলের পেছনে ব’সে আরেকটা আদেশ করলো। “তার হাতের আঙুলগুলো ভেঙে ফেলো।”

অস্ত্রটার বাট দিয়ে পরপর কয়েকটা আঘাত করা হলো তার হাতে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বর্ন বাম হাতটা ডান হাতের উপর রাখলো আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তার বাম হাতে রক্ত ঝড়ে পড়তে লাগলে হাতটা মুষ্টিবদ্ধ ক’রে একটা চিৎকার দিলো সে।

“আমার হাত! ভেঙে গেছে!”

কিন্তু তার হাত ভাঙে নি। বাম হাতে আঘাত লেগে রক্ত ঝরলেও ডান হাতটা অক্ষত আছে। বাম হাতের যেখানে আঘাত লেগেছে সেটা উল্লেখযোগ্য কোনো জায়গা নয়।

অন্ধকারে সে তার আঙুলগুলো নড়াচড়া করলো। তার হাত অক্ষতই আছে। গাড়িটা স্টেপডেকস্ট্রাস থেকে একটা ছোটো রাস্তায় চলে এসেছে। দক্ষিণ দিকে

চলতে শুরু করলো এবার। জেসন পেছনের সিটে পড়ে গোঙাচ্ছে। অস্ত্রধারী লোকটা তার জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে মুহূর্তে তার উর্ধ্বাংশ নগ্ন হয়ে গেলো। পাসপোর্ট, কাগজপত্র, কার্ডগুলো, আর সব টাকা-পয়সা নিয়ে নেওয়া হলো তার কাছ থেকে— এগুলো জুরিখ থেকে বের তার হবার অনিবার্য জিনিস। হয় এখনই করতে হবে, নয়তো আর কখনই করা হবে না। জোরে চিৎকার দিলো সে।

“আমার পা! আহ, আমার পা-টা?” সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো বর্ন। অন্ধকারে তার ডান হাতটা উদভ্রান্তের মতো কাজ করছে। পায়ের মোজাটা হাতের অটোমেটিক অস্ত্রটার বাট পেয়ে গেলো সে।

“না!” তার সামনে থাকা পেশাদার লোকটা গর্জে উঠলো। “তাকে ধরো!” বুঝে ফেলেছে সে।

কিস্ত দেরি হয়ে গেছে। বর্ন অন্ধকারে গাড়ির ফ্লোরে অস্ত্রটা ধরে রাখলে শক্তিশালী সৈনিকটি তাকে জোরে ধাক্কা মারলো। আঘাতের ফলে পড়ে গেলো সে। রিভলবারটা এখন সরাসরি তার আক্রমণকারীর বুকের দিকে তাক করা।

পরপর দুটো গুলি করলে লোকটা পেছন দিকে হেলে পড়লো। আবারো জেসন গুলি চালানো, তার নিশানা অব্যর্থ। গুলিগুলো হৃদপিণ্ড ফুটো ক’রে ফেলেছে। লোকটা সিটের উপর মুখ খুবরে পড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

“অস্ত্রটা নামিয়ে রাখো,” সামনের সিটে বসা লোকটার মাথার দিকে অস্ত্র তাক ক’রে বর্ন বললো। “ফেলে দাও!”

তার শ্বাস দ্রুত পড়ছে। খুনি অস্ত্রটা ফেলে দিলো। “আমাদের কথা বলতে হবে,” স্টিয়ারিংটা ধরে রেখে বললো সে। “আমরা পেশাদার লোক। আমরা কথা বলবো।” গাড়িটা সামনের দিকে ছুটে চলছে, গতি বেড়ে যাচ্ছে সেটার। এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার।

“গতি কমাও!”

“তোমার জবাবটা কি?” গাড়িটা আরো দ্রুত ছুটতে লাগলো। সামনে গাড়ি গুলোর হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। স্টেপডেকস্ট্রাস জেলাটা ছেড়ে আরো ব্যস্ততম শহরের দিকে প্রবেশ করছে তারা। “তুমি জুরিখ থেকে বের হতে চাও, আমি তোমাকে বের ক’রে দিতে পারি। আমাকে ছাড়া তুমি যেতে পারবে না। আমি স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে গাড়িটা ক্র্যাশ ক’রে দেবো। আমার হারানোর কিছু নেই, হের বর্ন। সামনে সবখানে পুলিশ আছে। আমার মনে হয় না তুমি পুলিশের দেখা পেতে চাও।”

“আমরা কথা বলবো,” জেসন মিথ্যে বললো। চলন্ত গাড়িতে দু’জন খুনি, এটা একটা ফাঁদ। কোনো খুনিকেই বিশ্বাস করা যায় না। তারা কেউ কাউকে বিশ্বাস করছেও না। দু’জনেই সেটা জানে। বাড়তি আধ সেকেন্ড সময় একজনকে ব্যবহার

করতে হবে। “ব্রেক করো,” জেসন বললো।

“আমার পাশের সিটে অস্ত্রটা রাখো।”

জেসন অস্ত্রটা ছেড়ে দিলে খুনির উপর গিয়ে পড়লো সেটা। ভারি লোহার শব্দ হলো। “ফেলে দিয়েছি।”

খুনি এক্সপ্লেটের থেকে পা সরিয়ে ব্রেকের উপর রাখলে গাড়িটা সামনে পেছনে ঝাঁকি খেলো। বুঝতে পারলো বর্ন। এটা ড্রাইভারের কৌশল। স্পিডমিটারের কাটা বাম দিকে ঘুরছে : ৩০ কি.মি, ১৮ কি.মি, ৯ কি.মি:। গাড়িটা প্রায় থেমেই গেলো। এখনই সময় বাড়তি আধ সেকেন্ড ব্যবহার করার।

পেছন থেকে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে তার সিট থেকে তুলে ফেললো জেসন। তারপর রক্তাক্ত বাম হাতটা দিয়ে লোকটার দু’চোখ পেছন থেকে খামচে ধরলো। এবার গলা ছেড়ে পাশের সিট থেকে অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো বর্ন। বাট দিয়ে লোকটার হাতে আঘাত করলে লোকটা চিৎকার দিলো। তার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে আসছে। হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে অস্ত্রটা। জেসন সামনের দিকে ঝুঁকে লোকটার বুক জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে ধাক্কা মারলো। বাম হাত দিয়ে আবার খুনির গলাটা জড়িয়ে ধরলো সে। রক্তাক্ত হাতে স্টিয়ারিংটা ধরে ফেললো জেসন। উইন্ডশিল্ডের দিকে তাকিয়ে ডান দিকে ঘোরালো হুইলটা। গাড়িটা রাস্তার একপাশে রাখা ডাস্টবিনের সামনে থামালে ময়লা আবর্জনার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো সেটা।

তার হাতে আঁটকে থাকা লোকটা প্রাণপনে ছোট্টা চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে যখন সে প্রায় ছুটে যাবে তখনই জেসন অটোমেটিক অস্ত্রটা দিয়ে গুলি চালালো।

অন্ধকারে নিরব নিখর হয়ে গেলো তার সম্ভাব্য খুনি। তার কপালে একটা লাল বৃত্ত দেখা যাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে কয়েকজন লোক ছুটে এলো তাদের গাড়ির দিকে—একটা দূর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতদেহটা সিটের উপর ফেলে রেখে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলো জেসন। গিয়ারটা ব্যাকে দিয়ে জানালার কাঁচ নামিয়ে সম্ভাব্য উদ্ধারকারীদের উদ্দেশ্যে বললো।

“দুঃখিত! সবকিছু ঠিক আছে! একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলাম।”

লোকজনের ছোট্ট দলটা খুব দ্রুতই যে যার কজে চলে গেলে বর্ন গভীর ক’রে একটা নিঃশ্বাস নিলো। তার শরীরে যে কাঁপুনিটা হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো সে। গাড়িটা সামনের দিকে ছুটিয়ে চললো এবার। স্মৃতি থেকে জুরিখের পথঘাটের ছবিটা হাতরানোর চেষ্টা ক’রে ব্যর্থ হলো সে।

অস্পষ্টভাবে জানে সে কোথায় আছে—কোথায় ছিলো—আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কোথায় গুইসান কুয়ে, যার সাথে লিমাটের সম্পর্ক আছে, সেটা আরো বেশি স্পষ্ট ক’রে জানে সে।

গেহ্! শ্লে! গুইসান কুয়ে!

গুইসান কুয়ে'তে মেরি সেন জ্যাককে খুন করা হবে। লিমাট নদীতে ফেলে দেয়া হবে তার মৃতদেহ। গুইসান আর লিমাট একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে : সেটা লেক জুরিখের মুখে, পশ্চিম তীরের পাদদেশে। হয়তো ইতিমধ্যে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেটা জানার কোনো উপায় নেই। তবে জেসন জানে তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে যেই হোক না কেন, এটা সে এড়িয়ে যেতে পারে না।

তার ভেতরের পেশাদার সত্তাটা চাইছে সামনের অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়তে। গাড়িতে দুটো লাশ আছে। তারা তার জন্যে বোঝা আর বিরাট একটা ঝুঁকি যা সে সহিতে পারছে না। এদেরকে গাড়ি থেকে না সরালে যেকোনো সময় পুলিশ পথে গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারলেই বিপদ নেমে আসবে।

তার ধারণা বত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই লাশ দুটো গাড়ি থেকে সরাতে পারবে সে। কিন্তু এক মিনিটের মতো লেগে গেলো ওগুলো সরাতে। গলির ভেতর একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালের পাশে তাদের ফেলে দেয়া হলো।

গাড়িতে উঠে গলি থেকে গাড়িটা বের ক'রে আবার প্রধান সড়কের উপর চলে এলো জেসন বর্ন।

গেহ্! শ্লে! গুইসেন কুয়ে!

অধ্যায় ৯

ট্রাফিক লাইটে লাল বাতি জ্বলে থাকা চার রাস্তার একটা মোড়ে এসে পড়লো সে। বাম দিকে কয়েক ব্লক দূরে আকাশে রঙধনুর মতো বাতির আলো উঠতে দেখলো। একটা বৃজ! লিমাট নদী! সিগনালটা সবুজ হলে বাম দিকে মোড় নিলো জেসন।

ব্যানহফস্ট্রাসে আবার ফিরে এসেছে সে। গুইসান কুয়ে এখান থেকে কয়েক মিনিটের পথ। প্রস্তুত এভিনিউ নদীর তীরে অবস্থিত। কিছু দূর যাবার পর একটা পার্ক দেখতে পেলো। গ্রীষ্মে এখানে জুরিখবাসী ভীড় করে। গাড়ি রাখার জায়গাটাতে প্রবেশ করলে সাদা মেঝেতে ভারি শেকল দেখতে পেলো সে। দুটো পাথরের পোস্টের সাথে ঝুলানো আছে সেগুলো। কিছু দূর যাবার পর আরেকটা শেকলের কারণে তার গতিরোধ হলো। তবে এই শেকলটা আগেরটার মতো নয়। একটু আলাদা, একটু অদ্ভুত। গাড়ি থামিয়ে কাছে এসে দেখলো। তাকে খুন করতে আসা একজনের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া টর্লাইটটা নিয়ে নিলো গাড়ির সিট থেকে। ভারি শেকলটার উপর আলো ফেললো সে। এটা আবার কি? পার্থক্যটা কি?

শেকলটা নয়। শেকলটার নিচে যেটা আছে সেটা। চাকার দাগ। এখানকার পরিষ্কার জায়গায় একমাত্র দাগ।

বর্ন টর্টটা বন্ধ ক'রে গাড়িতে রেখে দিলো। তার শার্ট ছিঁড়ে গেছে। সে তার শার্ট থেকে আরেকটু ছিঁড়ে নিয়ে সেই ছেড়া কাপড়টা দিয়ে নিজের বাম হাতের ক্ষতস্থান বেধে ফেললো। এখন সে প্রস্তুত।

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সেটার ক্লিপ পরীক্ষা ক'রে দেখলো। গুলি ভরা আছে। দুটো গাড়ি তাকে অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। তারপর হেডলাইট বন্ধ ক'রে একটা ইউ-টার্ন নিয়ে শেকলের পাশেই পার্ক করলো গাড়িটা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে কাছের শেকলটা নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে গাড়িতে ফিরে এলো আবার।

আগুস্তে ক'রে গাড়িটা চালিয়ে বাতিবিহীন একটি পার্কিং এরিয়াতে ঢুকে পড়লো সে। সেখান থেকে দুশো গজ দূরেই সমুদ্রের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। এই দেয়াল কোনো সমুদ্রের পানি আটকে রাখে না, আটকে রাখে লিমাট নদীর জলস্রোত। ওপাড়ে পুরনো শহরের উপকূল দেখা যাচ্ছে। বাতিগুলো স্পষ্ট ক'রে দিচ্ছে শহরটার অবস্থান।

ডান দিকে। ডান দিকটায় একটা কালো রেখা দেখা যাচ্ছে—অস্পষ্ট, ক্ষীণ, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। একশ' গজ...এখন নব্বই, পঁচাশি; গাড়ি থামালো সে। খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকারে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। আরো ভালো ক'রে দেখার চেষ্টা করলো। নদী থেকে আসা বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন।

শব্দ। একটা চাপা আর্তনাদ। ক্ষীণ, চাপা কণ্ঠের...ভয়ের গোঙানী। তারপরই রুম্ম একটা চপেটাঘাতের শব্দ। তারপর আরেকটা। আরো কয়েকটা। একটা চিৎকার হলো এবার। এরপর যেনো একটা মুখ চাপা দেয়া হলো। চুপ হয়ে গেলো একেবারে।

গাড়ি থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়লো বর্ন। ডান হাতে অস্ত্র আর রক্তাক্ত বাম হাতে একটা টর্চ। অন্ধকারে খুব সতর্ক পদক্ষেপে সে এগোতে লাগলো। প্রথমেই তার নজরে পড়লো ছোট্ট সিডান গাড়ির দোমড়ানো মোচড়ানো বাম্পারটা। স্টেপডেকস্ট্রাসে এই গাড়িটাই দেখেছিলো সে। রাতের বেলায়ও সেটার ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পরপর চারটা চাপড় মারার শব্দ হলো। উন্মাদের মতো চড়থাপের দেয়া হচ্ছে, চাপা আর্তনাদ আর গোঙানী ভেসে এলো গাড়ির ভেতর থেকে!

অনেক কষ্টে একটু নিচু হয়ে গাড়ির পেছনের জানালার দিকে চুপিসারে চলে এলো জেসন। আশু আশু উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর আচমকাই টর্চের আলো ফেলে শব্দ করলো ভড়কে দেবার জন্যে।

“নড়েছো তো মরেছো!”

ভেতরের দৃশ্যটা দেখে গা গুলিয়ে উঠলো তার। মেরির গায়ের জামা কাপড় ছিড়ে ফেলা হয়েছে। সে প্রায় নগ্ন। তার অর্ধনগ্ন দেহে দুটো হাত থাবার মতো বিচরণ করছে। তার স্তন দুটো দলাই মলাই করছে, পা দুটোকে ফাঁক ক'রে রাখা হয়েছে। ফুলপ্যান্টের জিপার থেকে উদ্যতভাবে বের হয়ে আছে ঘাতকের লিঙ্গ। খুন করার আগে সে চূড়ান্ত অবমাননা করছে মেয়েটাকে।

“বের হ, শূয়োরের বাচ্চা!”

ঝন্ ঝন্ ক'রে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। মেরিকে ধর্ষণ করতে উদ্যত লোকটা বুঝতে পেরেছে। মেয়েটা খুন হয়ে যাবে এই ভয়ে বর্ন গুলি করলো না। সে মেয়েটাকে সরিয়ে গাড়ির জানালায় জুতো পায়ে লাথি মারলে কাঁচের টুকরো জেসনের চোখে মুখে এসে লাগলো। চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে একটু পিছু হটে গেলো সে।

দরজাটা ধপাস ক'রে খুলতেই একটা বিস্ফোরণ হলো। সুতীব্র আর উষ্ণ যন্ত্রণা হলো বর্নের ডান দিকটায়। তার কোটের কিছু অংশ ছিঁড়ে গেছে। রক্তে ভিজে একাকার হয়ে গেছে তার ছেঁড়া ফাড়া শার্টটা। ট্গার টানলেও মাটিতে গড়িয়ে থাকা অবয়বটা আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে। আবারো গুলি করলো সে। কিন্তু বুলেটটা

শক্ত মেঝেতে লেগে ছিটকে গেলো। ঘাতক গড়িয়ে চলে গেলো দৃষ্টি সীমার বাইরে... অদৃশ্য হয়ে গেলো অন্ধকারে।

জেসন জানে এখন যেখানে আছে সেখানে থাকতে পারবে না। যদি থাকে তো নির্ঘাত মৃত্যু। নিজের খোড়া পা টেনে খোলা দরজাটার আড়ালে চলে গেলো সে।

“ভেতরেই থাকো!” মেরির উদ্দেশ্য বললো চিৎকার করে। মেয়েটা প্রচণ্ড ভয়ে গাড়ি থেকে বের হতে যাচ্ছিলো। “উফ্! ভেতরেই থাকো!”

একটা গুলির শব্দ হলে বুলেটটা গাড়ির দরজায় বিদ্ধ হলো। দেয়ালের উপর দিয়ে আবছায়া মূর্তিটাকে দৌড়ে যেতে দেখেই দু’বার গুলি করলো বর্ন। দূর থেকে একটা উফ্ ধ্বনি শোনা গেলে আশ্বস্ত হলো সে। লোকটাকে আহত করতে পেরেছে, খুন করতে পারে নি। তবে ঘাতক এখন আর আগের মতো কর্মক্ষম থাকবে না।

আলো। মৃদু আলো... চারকোনা। এটা আবার কি? তারা কারা? সে বাম দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পেলো সেটা সে আগে কখনও দেখে নি। একটা ছোট্ট ইন্টার কাঠামো সমুদ্র দেয়ালের পাশে দু’লছে। ভেতরে বাতি জ্বালানো আছে। ওয়াচম্যানের স্টেশন। ভেতরে কেউ গুলির শব্দটা শুনতে পেয়েছে হয়তো।

“ওয়াজ ইস্ট লস? ওয়ের ইস্ট ডা?” একটা লোক চিৎকার করে বললো—এক কুঁজো লোক—আলোকিত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই একটা টর্চের আলো অন্ধকারে এসে পড়লে বর্ন সেখানে তাকালো। আশা করলো আলোটা ঘাতকের উপর গিয়ে পড়বে।

তাই হলো। দেয়াল ধরে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে। জেসন উঠে দাঁড়িয়েই গুলি করলো। গুলির শব্দ হতেই টর্চের আলোটা এসে পড়লো তার ওপর। সে এখন টার্গেট। অন্ধকার থেকে দুটো গুলি ভেসে এলো, একটা বুলেট জানালার গুলে গিয়ে লাগলে ছোট্ট লোহার টুকরো বিদ্ধ হলো তার ঘাড়। রক্ত পড়তে লাগলো সেখান দিয়ে।

এবার দৌড়ানোর শব্দ শোনা গেলো। ঘাতক আলোর উৎসটার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

“নেইন!”

সে ওটার কাজে পৌছে গেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে এক হাত দিয়ে ধাক্কা মারলে আলোটা নিভে গেলো। জানালার আলোতে জেসন দেখতে পেলো ঘাতক ওয়াচম্যানকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে, বৃদ্ধলোকটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে।

বর্ন দেখলো। অসহায়ের মতো গাড়ির হুডের উপর রেখে দিলো অস্ত্রটা। তার সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

চূড়ান্ত একটা গুলির শব্দ হলো, তার সঙ্গে চাপা একটা আত্ননাদ। আবারো দৌড়ানোর শব্দ। ঘাতক বৃদ্ধলোকটাকে খুন ক'রে পালাচ্ছে। পালাতে সক্ষম হলো সে।

বর্ন আর দৌড়াতে পারলো না। তীব্র যন্ত্রণাটা অবশেষে তাকে চলৎশক্তিহীন ক'রে ফেলেছে। দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো সে। কেউ নেই। তাই কোনো কিছু পরোয়া করলো না।

সে যেই হোক না কেন, পালাতে দাও। পালাক সে। মেরি গাড়ি থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে বের হয়ে এলো। তার হাতে তার জামা-কাপড়গুলো। চোখে মুখে তীব্র আতঙ্ক। অবিশ্বাসে জেসনের দিকে চেয়ে আছে সে। তার চোখে মুখে এখন বিস্ময় আর দ্ব্যর্থতা।

“চলে যাও,” চাপা কণ্ঠে বললো সে, আশা করলো মেয়েটা যেনো তার কথা শুনতে পায়। “ওখানে একটা গাড়ি আছে, চাবিটাও আছে ভেতরে। এখান থেকে চলে যাও। সে হয়তো অন্যদেরকে নিয়ে ফিরে আসবে। আমি জানি না।”

“তুমি আমার জন্যে ফিরে এসেছো!” তার কণ্ঠে বিস্ময়।

“চলে যাও! গাড়িটা নিয়ে চলে যাও, ডক্টর। কেউ যদি তোমার গাড়ির পথ আটকায় তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে দেবে। পুলিশের কাছে চলে যাও...সত্যিকারের পুলিশ। বোকা মেয়ে, বুঝলে।” তার কণ্ঠটা শুকিয়ে এলো। পেটে শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে। আগুন আর বরফ। আগেও তার এরকম হয়েছে। একসঙ্গে। কোথায় যেনো?

“তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো,” তার কণ্ঠটা বেশ কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছে। “তুমি আমার জন্যে ফিরে এসেছো। আমার জন্যেই এসেছো, আমার...জীবন... রক্ষা করেছো।”

“কথা বাড়িয়ে না।”

“তুমি মুক্ত। তুমি চলে যেতে পারতে, কিন্তু তুমি তা করো নি। ফিরে এসেছো আমার জন্যে।”

মেয়েটা হামাগুঁড়ি দিয়ে তার কাছে আসছে, ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখতে পেলো সে। মেয়েটা তার মুখ স্পর্শ করলো, মাথায় হাত দিলো। থামো! আমার মাথায় হাত দেবে না! আমাকে ছেড়ে চলে যাও!

“তুমি কেন এটা করলে?” মেয়েটার কণ্ঠ শোনা গেলো।

মেয়েটা তাকে প্রশ্ন করছে। সে কি বুঝতে পারছে না? সে তো তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না।

মেয়েটা করছে কি? সে একটা কাপড় ছিঁড়ে তার ঘাড়টা পেঁচিয়ে দিচ্ছে। এরপর জেসনের কোমরের বেল্ট আলগা ক'রে তার পোশাকের বড় অংশ দিয়ে ডান ঠোঁটটা চেপে ধরলো।

“তোমার জন্যে নয়।” অবশেষে সে শব্দ খুঁজে পেলো। অন্ধকারের মধ্যে শান্তি চাচ্ছে—এর আগেও যেমনটি সে চেয়েছিলো, তবে কখন, কোথায় সেটা মনে করতে পারলো না। মেয়েটা তাকে ছেড়ে গেলে সে প্রশান্তি খুঁজে পাবে। “ঐ লোকটা...সে আমাকে দেখে ফেলেছে। সে আমাকে চিনতে পারবে। ঐ লোকটাই। আমি তাকে চাই। এখন চলে যাও!”

“আরো আধডজন লোকও তোমাকে চিনতে পারবে,” মেয়েটা জবাব দিলো। তার কণ্ঠে অন্য একটা সুর। “আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।”

“আমাকে বিশ্বাস করো!”

এখন সে তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই দেখা গেলো সে আর নেই। চলে গেছে। তাকে ছেড়ে চলে গেছে। প্রশান্তিটা খুব দ্রুত চলে এলো। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে নিজের ভাবনাগুলোকে মুক্ত ক’রে দিলো সে।

একটা শব্দ। কোনো গাড়ির শব্দ। সে আমলে নিলো না। এটা তার স্বাধীনতাভাবে ভাবনার জগতে ডুবে থাকাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এরপরই টের পেলো একটা হাত তার শরীর স্পর্শ করছে। আরেকটা। আস্তে ক’রে তাকে তুলে ওঠালো। “আসো,” কণ্ঠটা বললো। “আমাকে সাহায্য করো।”

“আমাকে ছেড়ে দাও!” বেশ জোরেই বললো সে। কিন্তু তার কথাটা আমলে নেয়া হলো না বলে একটু ভড়কে গেলো।

আবারো চোখে মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগলো, তবে এই বাতাসটা জুরিখের বাতাস নয়। অন্য কোনো জায়গার। একটা সিগনাল এলো, একটা বাতি জ্বলে উঠলে উঠে দাঁড়ালো সে।

“ঠিক আছে। তুমি ঠিকই আছো,” যে কণ্ঠতা তার কথা শোনে নি সে-ই বললো। “তোমার পা তোলো। তোলো!... হ্যা, ঠিক আছে। এবার গাড়ির ভেতরে ঢোকো। আস্তে আস্তে। ঠিক আছে।”

সে পড়ে যাচ্ছে। ঘন কালো আকাশ থেকে! তারপরই পতনটা থেমে গেলো, সব কিছুই থেমে গিয়ে স্থির হয়ে পড়লো যেনো। নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে সে। পায়ের শব্দও। সে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে...আর দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপরই চারপাশ থেকে কিছু হৈহল্লা।

নিজের ভারসাম্য হারিয়ে আবারো পড়তে লাগলো কিন্তু একটা হাত তাকে ধরে ফেললো। নিচে নামিয়ে রাখলো তাকে। তার মুখে ঠাণ্ডা কিছু অনুভূত হলো এবার। তারপর আর কিছুই টের পেলো না। আবারো তলিয়ে যেতে লাগলো সে। একেবারে নিকষ কালো অন্ধকারে।

একটু দূরে, তবে খুব বেশি দূরে নয়, একটা কপ্ত শোনা যাচ্ছে। দৃষ্টি শক্তি আস্তে আস্তে ফিরে এলে দেখতে পেলো একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। বড়সড় একটা ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে সে। গায়ে একটা চাদর। ঘরে দু'জন মানুষ, একজন ওভারকোট পরা, তার পাশে এক মহিলা...পরে আছে গাঢ় লাল রঙের স্কাট আর সাদা ব্লাউজ। তার চুলের রঙের লাল।

মেরি সেন জ্যাক? হ্যা, সে-ই তো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চামড়ার ব্যাগ হাতে এক লোকের সাথে ফরাসিতে কথা বলছে।

“মূলত বিশ্রাম নিতে হবে,” লোকটা বললো।

“আমি যদি নাও থাকি, যে কেউ সেলাইগুলো খুলে দিতে পারবে। এক সপ্তাহ পরে খুলতে হবে।”

“ধন্যবাদ, ডাক্তার।”

“আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনি বেশ উদারতা দেখিয়েছেন। আমি এখন যাবো। হয়তো আপনার সাথে দেখা হবে, হয়তো হবে না।” ডাক্তার এ কথা বলে চলে যেতেই মেয়েটা দরজার ছিটকিরি লাগিয়ে ঘুরে দেখতে পেলো বর্ন তার দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে সতর্কভাবে বিছানার কাছে চলে এলো সে।

“আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছে?” মেয়েটা জানতে চাইলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

“তোমার অনেক জায়গায় চোট লেগেছে,” সে বললো, “খুবই বাজেভাবে। তবে তুমি শান্ত থাকলে হাসপাতালে আর যাবার দরকার হবে না। উনি ডাক্তার ছিলেন...তোমার টাকা থেকে আমি তাকে টাকা দিয়েছি। একটু বেশিই দিয়েছি কারণ সে মুখ বন্ধ রাখবে। এটা অবশ্য তোমারই আইডিয়া, গাড়ি চালানোর সময় তুমি বলছিলে তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, কিন্তু টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখতে হবে। তোমার কথাই ঠিক। কাজটা তেমন কঠিন কিছু না।”

“আমরা কোথায়?” সে জানতে চাইলো।

“জুরিখ থেকে বিশ মাইল দূরে লেন্জবুর্গ নামের একটা গ্রামে। ডাক্তার লোকটি পাশের শহর ওলেনের। সে তোমাকে আবার এক সপ্তাহ পরে দেখতে আসবে। অবশ্য তুমি যদি এখানে থাকো তো।”

“কিভাবে?” সে উঠে বসার চেষ্টা করলেও শক্তির অভাবে কুলোতে পারলো না। মেয়েটা তার কাঁধ ধরলো, যার অর্থ শুয়ে পড়ো।

“আমি বলবো কি হয়েছে, আর তাতে হয়তো তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে তুমি। তেমনটিই আমি আশা করি, কারণ তা যদি না হয় তবে আমি কোনো ওষুধ দেবো না।” সে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, তার কণ্ঠে নিয়ন্ত্রনের ভাপ স্পষ্ট। “একটা পশু আমাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিলো—এরপরই সে আমাকে খুন করতো। আমার বাঁচার কোনো আশাই ছিলো না। স্টেপডেকস্ট্রাসে

তুমি তাদেরকে থামাতে চেষ্টা করেছিলে, আর যখন পারছিলে না, আমাকে চিৎকার করতে বললে। তুমি তখনও আমাকে বাঁচানোর জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিলে। পরে, কিভাবে জানি তুমি তাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেলে—আমি জানি না। তবে আমি জানতাম তুমি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছো। তুমি আমাকে খোঁজার জন্যে ফিরে এলে।”

“তোমাকে না, তাকে খোঁজার জন্যে,” জেসন কথার মাঝখানে বললো। “আমি তাকে খুঁজছিলাম।”

“তুমি আমাকে একথা আগেও বলেছো, আমি তোমাকে তার জবাব দিয়েছি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। এজন্যে নয় যে, তুমি একজন যাচ্ছেতাই ধরনের মিথ্যুক। বরং তোমার এ কথাটা বাস্তবের সাথে খাপ খায় না। আমি পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করি। মি: ওয়াশবার্ন অথবা মি: বর্ন, কিংবা তোমার নাম যাই হোক না কেন। আমি তথ্য আর যুক্তিতে বিশ্বাস করি। সেগুলো দিয়ে বিচার করি। দু’জন লোক তোমাকে খোঁজার জন্যে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিলো, আমি শুনেছি তারা বেঁচে আছে। তারা তোমাকে চিনতে পারবে। আরো আছে ড্রেই এলপেনহসারের মালিক। সেও পারবে। তুমিও আমার মতো জানো, এটা সত্যি। না, তুমি আমাকে বাঁচানোর জন্যেই ফিরে এসেছিলে।”

“বলে যাও,” সে বললো, তার কণ্ঠে শক্তি ফিরে আসছে। “কি হলো?”

“আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। খুব কঠিন সিদ্ধান্ত। ঠিক করেছি তোমাকে সাহায্য করবো। কিছু সময়ের জন্যে—কয়েক ঘণ্টার জন্যে হয়তো—তবে আমি তোমাকে বের হতে সাহায্য-করবো।”

“তুমি পুলিশের কাছে গেলে না কেন?”

“তাই তো করতে যাচ্ছিলাম, তবে আমি বুঝতে পারছি না, কেন যাই নি সেটা তোমাকে বলবো কিনা। হয়তো ধর্ষণের কারণে, তবে আমি জানি না। আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি। সব সময়ই জেনেছি, ধর্ষণ হলো একজন নারীর জন্যে সবচাইতে ভয়ংকর একটি অভিজ্ঞতা। সেটা এখন আমি বিশ্বাস করি। তুমি যখন ঐ লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড রাগে ফেঁটে পড়লে...আমি তোমার চেহারাটা দেখেছি। যতোদিন বেঁচে থাকবো সেটা আমি কোনো দিনও ভুলবো না।”

“পুলিশ?” সে আবারো বললো।

“ড্রেই এলপেনহসার সেই লোকটা বলেছিলো পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।” সে একটু থামলো। “তোমাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি না। তখনও পারি নি। এখনও পারবো না।”

“আমি কে এটা জেনেও?” জানতে চাইলো সে।

“আমি কেবল জানি আমি কি শুনেছি, কি দেখেছি। একজন আহত লোক নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বাঁচাতে ফিরে এসেছিলো, এটাই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”

“এটা তো বুদ্ধিমানের কথা হলো না।”

“আমি বুদ্ধিমানই, মি: বর্ন। আমার ধারণা তারা এ নামেই তোমাকে ডেকেছে। আমি খুবই বুদ্ধিমতি।”

“আমি তোমাকে মেরেছি। তোমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছি।”

“তোমার জায়গায় আমি হলে, মানে লোকজন আমাকে খুন করার জন্যে হন্যে হয়ে পিছু নিলে—আমিও একই কাজ করতাম।”

“তাই তুমি জুরিখের বাইরে আমাকে নিয়ে এলে?”

“হুট ক’রে নয়। আগে নিজেকে আমার শাস্ত করতে হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আমি খুব হিসেব ক’রে চলি।”

“আমিও সেটা দেখতে পাচ্ছি।”

“আমি খুব বিধবস্ত আর বিপর্যস্ত ছিলাম। আমার জামাকাপড়ের দরকার ছিলো, চিকরুপী আর মেকআপও। আমি কোথাও যেতে পারছিলাম না। নদীর তীরে একটা টেলিফোন বুথ খুঁজে পেলাম। আশেপাশে কেউ ছিলো না। তাই আমি হোটেলে আমার এক কলিগকে ফোন করলাম—”

“ঐ ফরাসি আর বেলজিয়ানটাকে?” জেসন জানতে চাইলো।

“না, তারা বার্তেনেলির লেকচার শুনছিলো। আর তারা যদি আমাকে তোমার সাথে মঞ্চের উপর দেখে চিনে থাকে তো আমার নামটা তারা পুলিশে দিয়ে দিয়েছে। আমি আমাদের দলের এক মহিলাকে ফোন করেছি। সে বার্তেনেলিকে ধৃণা করে। নিজের ঘরেই ছিলো সে। আমরা এক সঙ্গে অনেক বছর ধরে কাজ করছি। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তাকে বললাম সে যদি আমার সম্পর্কে কোনো কিছু শুনে থাকে তবে সেটা যেনো আমলে না নেয়, আমি একদম ঠিক আছি। কেউ যদি আমার খোঁজ করে তবে যেনো বলে দেয়, আমি আমার এক বন্ধুর সাথে আছি—সারা রাত তার সাথেই থাকবো। আমি বার্তেনেলির লেকচার থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছি।”

“খুবই হিসেবি,” বর্ন বললো।

“হ্যাঁ,” মেরি একটা বাঁকা হাসি হাসলো। “আমি তাকে আমার ঘরে যেতে এলাম—তার পাশেই আমার ঘরটা আর হোটেলের লোকজনও জানে সে আমার গাধাবী। আমার জামাকাপড়, মেকআপ একটা সুটকেসে নিয়ে তার ঘরে রাখতে এলাম, তারপর পাঁচ মিনিট পর ফোন করবো বলে তাকে জানালাম।”

“তুমি যা বললে সে সব মেনে নিলো?”

“বললাম না সে আমার বান্ধবী । হয়তো জানতে চাচ্ছিলো, তবে আমি ঠিক আছি ভেবে আর জানতে চায় নি । তার বিশ্বাস, আমি সত্যি কথা বলছি ।”

“বলে যাও ।”

“আমি তাকে ফোন করলে ওগুলো নিয়ে আসা হলো ।”

“তার মানে বাকি দু’জন ডেলিগেট তোমার নাম পুলিশকে জানায় নি । তোমার ঘরটার দিকে তো তাদের নজর রাখার কথা ।”

“আমি জানি না, সেটা তারা করেছে কিনা । তবে সেরকম কিছু করলে আমার বান্ধবীকে তারা ঘরে ঢোকার আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করতো ।”

“সে আছে ক্যারলিওনে, আর তুমি নদীর তীরে । তাহলে তুমি তোমার জিনিসগুলো কিভাবে পেলো?”

“খুব সহজ । একটু কৌশল করেছি । সে রাত্রিকালীন একজন ওয়েটারকে বলেছে আমি হোটেলের একজন লোককে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছি । বাইরে কোথাও আছি । আমার রাতের জামাকাপড়গুলো খুব দরকার । সে ওগুলো আমার কাছে পৌছে দিতে পারবে কিনা । তারপরই একটা গাড়িতে ক’রে হোটেলের একজন ওয়েটার সুটকেসটা নদীর পাড়ে নিয়ে এলো ।”

“সে কি তোমাকে দেখে অবাক হয় নি?”

“সে খুব বেশি কিছু দেখার সুযোগ পায় নি । আমি গাড়ির পেছনের ডালাটা খুলে গাড়ির ভেতর থেকেই বলেছি সুটকেসটা ওখানে রেখে যেতে । স্প্যায়ার চাকাটার পাশে আমি একশ’ ফরাসি ফ্রাঁ রেখে দিয়েছিলাম ।”

“তুমি কেবল হিসেবিই নও, একেবারে অসাধারণ একজন ।”

“হিসেবীরা অসাধারণই হয় ।”

“ডাক্তার কিভাবে খুঁজে পেলো?”

“এখানেই । মনে আছে, আমি তোমাকে বেশ ভালোভাবে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে । তোমার জামাকাপড় বদলানোর সময় টাকাগুলো পেলাম । তখন আমার মনে পড়লো তুমি বলছিলে ডাক্তার দেখাবে, টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখবে । তোমার কাছে হাজার হাজার ডলার আছে ।”

“এটা তো ভগ্নাংশ মাত্র ।”

“কি?”

“না, কিছু না ।” সে ওঠার চেষ্টা করলো আবার । কিন্তু খুবই কষ্ট হলো । “তুমি কি আমাকে ভয় পাও না? তুমি যা করেছো তার জন্যে ভয় পাও না?”

“অবশ্যই, তবে আমি এও জানি তুমি আমার জন্যে কি করেছো ।”

“যা ঘটেছে সেসব বিচার করলে তুমি খুবই বিশ্বস্ত একজন ।”

“তাহলে তুমি পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নও। তুমি এখনও খুব দুর্বল। আর অস্ত্রটা আমার কাছে আছে। তাছাড়া তোমার কাছে কোনো কাপড় চোপড়ও নেই।”

“কিছুই নেই?”

“এক জোড়া মোজাও নেই। আমি সব ফেলে দিয়েছি। একটা প্লাস্টিকের মানি ব্যাগ নিয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তায় বের হলে তোমাকে খুবই বোকা বোকা দেখাবে।”

বর্ন তীব্র যন্ত্রণায়ও হেসে ফেললো। লা সিওতাত আর মারকুইস দ্য শ্যামফোর্দের কথা মনে পড়ে গেলো তার।

“খুবই হিসেবী,” সে বললো।

“খুউব।”

“তারপর কি হলো?”

“আমি ডাক্তারের নাম লিখে হোটেলের বয়কে দিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে ঘরটা ভাড়া নিলাম। হোটেল বয় দুপুরে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসবে। আমি এখানে সকাল পর্যন্ত থাকবো। এখন প্রায় ছ’টা বাজে। একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে। তখন আমি হোটেলে ফিরে যাবো আমার বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আসার জন্যে, বিমানের টিকেট সংগ্রহ করার জন্যে। আর তোমার কোনো কথা না বলার আশ্রয় চেষ্টা করবো আমি।”

“ধরো তুমি তা করতে পারলে না? ধরো তোমাকে চিনে ফেললো কেউ?”

“আমি সেটা অস্বীকার করবো। রাতের বেলা ছিলো। পুরো হোটেলে আতঙ্ক আর হৈচৈ হচ্ছিলো।”

“এখন আর তোমাকে হিসেবী ব’লে মনে হচ্ছে না। অন্তত জুরিখ পুলিশের মতো নয়। আমার কাছে আরো ভালো উপায় আছে। তোমার বন্ধুকে ফোন ক’রে বলো তোমার সব জিনিসপত্র গোছগাছ ক’রে সুটকেসে ভরে তোমার বিল-টিল সব চুকিয়ে দিতে। আমার কাছ থেকে যতো বেশি সম্ভব টাকা নিয়ে কানাডার প্রথম প্লেনটা ধরো।”

মেয়েটা তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। “খুবই প্রবলুদ্ধকর।”

“এটা আসলে খুবই যুক্তিযুক্ত।”

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মেয়েটা জানালার কাছে চলে গেলো। ভোরের প্রথম আলোর দিকে তাকালো সে। জেসন তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সে কিছুই করতে পারবে না। মেয়েটা যা অনুভব করবে তাই করবে, কারণ ভীতি থেকে সে এখন মুক্ত। এমন একটা ভীতিকর ব্যাপার থেকে যা কোনো পুরুষ কখনই বুঝবে না। মৃত্যু থেকে। আর সে যা করেছে, তাতে সে সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙেছে। মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে নিচু কণ্ঠে কথা বললো, তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে এখন।

“তুমি কে?”

“তুমি তো শুনেছো তারা কি বলেছে।”

“আমি শুধু জানি আমি কি দেখছি! কি অনুভব করছি!”

“তুমি যা করেছো সেটার বৈধতা দেবার চেষ্টা করো না। তুমি করেছো। এই যা।”

ওহ ঈশ্বর, তুমি আমাকে মুক্তি দিতে পারতে। তাহলে আমি একটু শান্তি পেতাম। কিন্তু এখন তুমি আমার জীবনের একটি অংশ ফিঁদিয়ে দিয়েছো, আমাকে আবারো লড়াই করতে হচ্ছে। সেটাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

আচম্কা মেয়েটি তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে অস্ত্র। সেটা তার দিকে তাক করা, তার কণ্ঠ কাঁপছে। “তাহলে কি আমি আমার ভুলগুলোকে শুধরে নেবো? আমি কি তবে পুলিশ ডেকে তোমাকে তুলে দেবো তাদের হাতে?”

“কয়েক ঘণ্টা আগে হলে আমি বলতাম তাই করো। এখন সেটা বলতে পারছি না।”

“তাহলে তুমি কে?”

“তারা বলেছে আমার নাম জেসন বর্ন। জেসন চার্লস বর্ন।”

“‘তারা বলেছে’ মানে কি?”

সে অস্ত্রটার দিকে তাকালো। সত্যি ছাড়া আর কিছুই বলার নেই—যেহেতু সে সত্যটা জানে। “মানে?” সে প্রতিধ্বনি করলো। “আমি যতোটুকু জানি, তুমিও ততোটুকু জানো, ডক্টর।”

“কি?”

“তুমি হয়তো আরো কিছু শুনবে। হয়তো তাতে তোমার ভালোই লাগবে। অথবা খারাপ। আমি জানি না। আমি জানি না তোমাকে আর কি বলবো আমি।”

অস্ত্রটা নামিয়ে রাখলো মেরি। “আমাকে বলো।”

“আমার জীবনটা শুরু হয়েছে আজ থেকে পাঁচ মাস আগে ভূমধ্যসাগরীয় ছোট্ট একটা দ্বীপ পোর্ট নোয়ে’তে...”

সূর্যের আলো উঁকি মারছে। জেসন বালিশে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সব কথা বিস্তারিত জানিয়েছে মেয়েটাকে। আর কিছুই বলার নেই। মেরি একটা হাতাওয়ালা চেয়ারে ব’সে চুপচাপ শুনে গেছে। তার বাম পাশে একটা টেবিলে সিগারেট আর অস্ত্রটা রাখা। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে। এমনকি সিগারেট টানার সময়ও তার চোখ খুব একটা নড়লো না। সে একজন টেকনিক্যাল এ্যানালিস্ট। সমস্ত তথ্য মূল্যায়ন করছে। সত্যটা বের করছে হেঁকে হেঁকে, যেমন গাছ সূর্যের আলোকে হেঁকে নেয়।

“তুমি খালি বলো, ‘আমি জানি না,’ ‘হায়, আমি যদি জানতাম।’ তোমার চোখে চোখ রেখে মাঝে মাঝে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। জিজ্ঞেস করতাম তুমি কি করবে। তুমি বলতে, ‘আমি যদি সেটা জানতাম।’ হায় ঈশ্বর, তুমি কতো ভয়ঙ্কর অবস্থার ভেতর দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছো...”

“তোমার সাথে আমি যা করেছি তারপরেও তুমি এরকমটি ভাবতে পারছো?”

“এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার,” সে একটু ভেবে বললো।

“আলাদা—”

“তুমি যখন আমাকে চারনাকের ঘরে নিয়ে গেলে তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার সাথে আমি যেতে চাই না। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমি যদি আরো বেশি কিছু জেনে যাই, তুমি আমাকে খুন করবে। তখনই তুমি সবচাইতে বিস্ময়কর আর অদ্ভুত কথাটা বলেছিলে। তুমি বলেছিলে, তুমি যা শুনেছো, সেটা আমার চেয়েও কম ঢুকছে তোমার মাথায়। এসবের মাথামুণ্ড তুমি আমার চাইতেও কম বুঝতে পারছো। আমি ভেবেছিলাম তুমি উন্মাদ হয়ে গেছো।”

“আমি তো একরকম উন্মাদই। একজন উন্মাদ স্মরণ করতে পারে, আমি তাও পারি না।”

“তুমি কেন আমাকে বলো নি, চারনাক তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো?”

“সময় ছিলো না, আর আমারও মনে হয় নি তাতে কিছু আসে যায়।”

“তখন তোমার কাছে সেটা মনে হয় নি—আমার মনে হয়েছে।”

“কেন?”

“কারণ আমার ধারণা, যে তোমাকে প্রথমে খুন করার চেষ্টা করবে না তাকে তুমি গুলি করবে না।”

“চারনাক তাই করেছিলো, আমাকে আহত করেছিলো সে।”

“আমি কিন্তু সেটা জানতাম না। তুমি আমাকে বলো নি।”

“বুঝতে পারছি না।”

মেরি একটা সিগারেট ধরালো। “এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে আমাকে জিম্মি ক’রে রাখার সময়, আঘাত করার সময়, কিংবা অস্ত্র ঠেকিয়ে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাবার সময়—ঈশ্বর জানে, আমি খুব ভড়কে গিয়েছিলাম। ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। তবে আমি তোমার চোখে অন্য কিছু দেখেছিলাম। এটাকে তুমি এক ধরনের অনীহা বলতে পারো।”

“তোমার বক্তব্যটা কি?”

“আমি নিশ্চিত নই। হয়তো এটা ড্রেই এলপেনহসারে বলা কথাতেই ফিরে যেতে হবে। মোটা লোকটা তোমার কাছে এলে তুমি আমাকে দেয়ালের দিকে মুখ ক’রে থাকতে বলেছিলে। হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে বলেছিলে আমার মুখ। ‘তোমার

নিজের ভালোর জন্যেই,’ তুমি বলেছিলে । ‘তোমাকে তার চেনার কোনো দরকার নেই ।’ ”

“আসলেই তাই ।”

“ ‘তোমার নিজের ভালোর জন্যেই,’ এটা তো কোনো পেশাদার খুনির আচরণ হতে পারে না ।”

“এখনও তোমার বক্তব্যটা বুঝতে পারলাম না ।”

“গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা আমাকে বুঝিয়েছিলো যে, তুমি হলে মারাত্মক একজন খুনি । তোমার হাতে আরো অনেক খুন হবার আগেই তোমাকে থামাতে হবে । চারনাকের ব্যাপারটা জানলে আমি তার কথাটা বিশ্বাস করতাম না । তাছাড়া, পুলিশের লোক ওরকম আচরণ করে না, তারা অন্ধকার আর জনাকীর্ণ জায়গায় অস্ত্র ব্যবহার করে না । তুমি তোমার জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তুমি খুনি নও ।”

বর্ন তার হাতটা তুলে ধরলো । “আমাকে ক্ষমা করবে, আমার কাছে এটা ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি ক’রে বিচার করা হচ্ছে ব’লেই মনে হচ্ছে । তুমি বলেছো, তুমি তথ্যকে সম্মান করো—তাহলে সেটাই করো । আবাবো বলছি : তারা কি বলেছে সেটা তুমি শুনেছো—তুমি কি দেখেছো, ভাবছো, সেটা বাদ দাও—তুমি কিছু কথা শুনেছো । টাকা ভর্তি খাম আমাকে দেয়া হয়েছে একটা কাজ করার জন্যে । সেই কাজটা আমি গ্রহণ করেছিলাম । গেইমেনশেফট ব্যাংকে আমার একটা একাউন্ট আছে, তাতে আছে পাঁচ মিলিয়ন ডলার । কোথেকে আমি সেগুলো পেলাম? আমার মতো একজন লোক—যার কিছু বিষয়ে দক্ষতা আছে—সে কিভাবে টাকাগুলো পেলো?” জেসন ছাদের দিকে চেয়ে রইলো । যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে । “এগুলো সত্য । ডক্টর মেরি সেন জ্যাক । তোমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে ।”

মেরি চেয়ার ছেড়ে উঠে সিগারেটটা মাটিতে পিষে ফেললো । অস্ত্রটা হাতে নিয়ে বিছানার কাছে চলে এলো সে । “নিজেকে নিন্দা করতে তুমি খুবই বিচলিত, তাই না?”

“আমি তথ্যকে সম্মান করি ।”

“তাহলে তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে আমারও কিছু বাধ্য বাধকতা রয়েছে । রয়েছে না? একজন আইনকানুন মানা সামাজিক মানুষ হিসেবে আমার উচিত জুরিখ পুলিশকে জানিয়ে দেয়া, তুমি কোথায় আছো ।” অস্ত্রটা তার দিকে তাক করলো মেরি ।

বর্ন তার দিকে তাকালো । “আমি ভেবেছিলাম—”

“কেন নয়?” সে একটু জোরে বললো । “তুমি একজন অপরাধী, যে কিনা এই ব্যাপারটা শেষ করতে চাচ্ছে, তাই না? তো, আমার মনে হয় তোমার কিছু বোঝা উচিত । আমি বোকা নই । আমি যদি মনে করতাম তারা যা বলেছে তুমি তা-ই, তাহলে আমি এখানে থাকতাম না, তুমিও থাকতে না । তোমার কোনো তথ্য নেই ।

তোমার কেবল আছে উপসংহার। তোমার নিজের ধারণা ঐসব লোকের বক্তব্যের উপর ভিত্তি ক'রে তৈরি হয়েছে, যারা একেবারেই যাচ্ছেতাই ধরণের।”

“ব্যাংকের একাউন্টে পাঁচ মিলিয়ন ডলার আছে। সেটার কথা ভুলে যেয়ো না।”

“কিভাবে ভুলবো? আমি তো অর্থনীতিরই মানুষ। সেই একাউন্টটার ব্যাপারে তুমি যা ভাবছো, হয়তো আসল ঘটনা তা নয়। ব্যাংকে নিশ্চয় কিছু বৈধ কাগজপত্র ছাড়া একাউন্ট খোলা যায় না। সেটা তো অনুসন্ধান করা যেতে পারে—হয়তো অনুপ্রবেশও করা হতে পারে—কোনো কর্পোরেশনের কোনো সার্টিফাইড ডাইরেক্টর, হয়তো তার নাম সেভেনটি ওয়ান। এটা তো কোনো ভাড়াটে খুনির বেলায় প্রযোজ্য নয়।”

“কর্পোরেশনটা হতে পারে নামমাত্র। সেটা তালিবন্ধ নয়।”

“টেলিফোন বুকে? তুমি খুবই আনাড়ী। তোমার ব্যাপারে ফিরে আসি এবার। আমি কি পুলিশকে ডাকবো?”

“তুমি আমার জবাবটা জানো। আমি তোমাকে থামাতে পারবো না, তবে আমি চাই না, তুমি তা করো।”

মেরি অস্ত্রটা নামিয়ে ফেললো। “আমি সেটা করবোও না। তারা যা বলেছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না।”

“তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করো?”

“বলেছি তো, আমি নিশ্চিত নই। আমি কেবল জানি এখন থেকে সাত ঘণ্টা আগে এক পশুর খপ্পরে ছিলাম, তার মুখ আমার পুরো শরীর চমকে বেড়িয়েছে। তার হাতের থাবা ছিলো আমার উপর... আমি জানতাম আমি মরে যাচ্ছি। তারপর এক লোক আমার কাছে ফিরে এলো—লোকটা পালিয়ে যেতে পারতো—কিন্তু নিজের জীবন বাজি রেখে ফিরে এলো সে। আমার ধারণা আমি তাকে বিশ্বাস করি।”

“ধরো, তোমার ধারণা ভুল?”

“তাহলে আমি মারাত্মক একটি ভুল ক'রে ফেলেছি।”

“ধন্যবাদ। টাকাগুলো কোথায়?”

“ব্যুরোতে। তোমার পাসপোর্ট কেস আর মানিব্যাগে আছে। তার সাথে ডাক্তারের নাম আর এই ঘর ভাড়ার রসিদটাও রয়েছে।”

“আমি কি আমার পাসপোর্টটা পেতে পারি? ওটাতে সুইস টাকাগুলো আছে।”

“জানি।” মেরি সেগুলো তাকে দিলো। “আমি ঘরটার জন্যে ‘তিনশ’ আর ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্যে ‘দুশ’ ফ্রাঁ দিয়েছি। ডাক্তারের বিল হয়েছিলো সাড়ে চারশ’, তার সঙ্গে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে আরো দেড়শ’ দিয়েছি। সব মিলিয়ে এগারোশ’ ফ্রাঁ।”

“তোমাকে টাকার হিসেব দিতে হবে না,” বললো সে।

“তোমার জানা দরকার আছে। আচ্ছা, তুমি এখন কি করবে?”

“তোমাকে টাকা দেবো, যাতে তুমি কানাডায় ফিরে যেতে পারো।”

“সেটা পরে হবে।”

“পরে আমার মত বদলেও যেতে পারে। যে ছেলেটাকে দিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছো তাকে কিছু টাকা দিয়ে আমার জন্যে কিছু জামাকাপড় কিনে আনতে বলো।” কতোগুলো টাকা মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিলো জেসন।

“এ তো পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ’রও বেশি।”

“আমি তোমাকে বিশাল ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি।”

মেরি সেন জ্যাক টাকাগুলোর দিকে তাকালো। তারপর বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠার দিকে। “আমি তোমার টাকা চাই না,” অঙ্গুষ্ঠা টেবিলের উপর রেখে সে বললো।

“কি বলতে চাচ্ছে?”

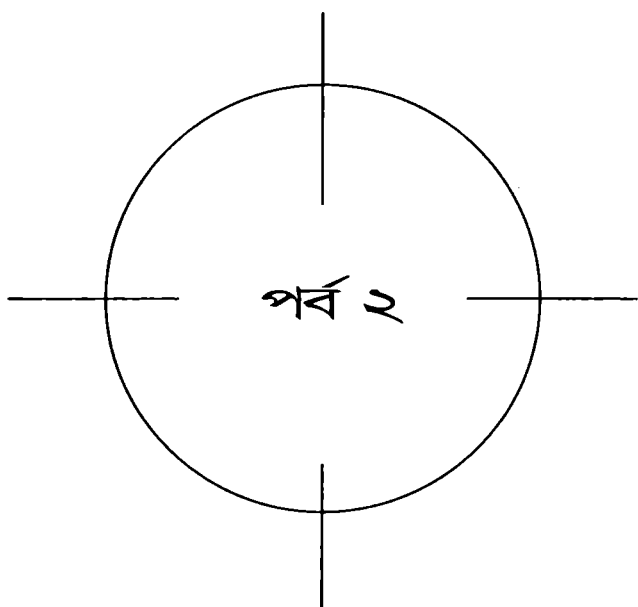
সে ঘুরে হাতাওয়ালা চেয়ারে ফিরে গেলো। চেয়ারে বসতে বসতে তার দিকে তাকালো আবার। “আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।”

“একটু দাঁড়াও—”

“প্রিজ,” মেয়েটা বাঁধা দিয়ে বললো। “আমাকে কোনো প্রশ্ন কোরো না। অন্তত এখন কিছু বোলো না।”

-

Scan & Edit by Mahmud Rakib



অধ্যায় ১০

তাদের দু'জনের কেউই জানলো না কখন সেটা ঘটলো, অথবা সত্যি বলতে কী, সেটা আসলেই ঘটেছে কিনা বুঝতে পারলো না। যদি ঘটেও থাকে, কতোক্ষণ এটা চলবে, অথবা কতো গভীরে যাবে তাও বুঝতে পারলো না তারা। শুরুতে কোনো নাটকীয়তা ছিলো না, ছিলো না বিজয়ী হবার জন্য কোনো বাঁধাও। কেবল দরকার পড়লো ভাব বিনিময়ের। কথা আর চাহ্নীর সাহায্যে আর অবশ্যই নিচু এবং মৃদু হাস্যরসের মধ্য দিয়ে।

তাদের ঘরটা একেবারে হাসপাতালের মতো। দিনের বেলায় মেরি কাপড়চোপড়, খাবার দাবার, মানচিত্র আর সংবাদপত্রগুলোর ব্যবস্থা করলো। চুরি করা গাড়িটা দশ মাইল দক্ষিণে রেইনাখ শহরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে লেনজবুর্গে ফিরে এলো সে নিজে। মেরি বাইরে গেলে একটু বিশ্রাম নিলো বর্ন। একটু আধটু হাটাচলাও করলো। তার বিস্মৃত অতীত থেকে কেবল বুঝতে পারলো সেরে ওঠার জন্যে এ দুটো জিনিসের দরকার আছে। আরো দরকার নিয়ম নিষ্ঠা আর ব্যায়ামের। সে এটা এর আগেও করেছে...পোর্ট নোয়ে'রও আগে।

তারা একসাথে থাকার সময় কথা বললো স্বাভাবিক জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে। ঠিক তখনই জেসন তার জীবন রক্ষাকারী মেয়েটার সম্পর্কে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানতে পারলো। মৃদু প্রতিবাদ ক'রে সে বললো তার সম্পর্কে মেরি প্রায় সব জানলেও সে নিজে মেরির সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। কোথেকে সে এসেছে? কেন একজন আকর্ষণীয়, লাল চুলের মেয়ে, যে কিনা একটা খামারে ছিলো, সে ইকোনোমিক্সে ডক্টরেট করলো?

“কারণ, সে খামারের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলো,” মেরি জবাব দিলো।

“ঠাট্টা করছো? একটা খামার, সত্যি খামারে ছিলে?”

“আসলে ছোট্ট একটা র‍্যাঙ্গের মতো। আলবার্টার বিশাল একটা খামারের তুলনায় সেটা ছোটোই বলা চলে। আমার বাবার সময়ে ফরাসিদের পক্ষে পশ্চিমে গিয়ে জমি কেনার ব্যাপারে কিছু অলিখিত বিধিনিষেধ ছিলো। তিনি প্রায়শই বলতেন তার নাম যদি সেন জ্যাক না হয়ে সেন জেসন হতো তবে তিনি আজ অনেক বড় ধনী হতে পারতেন।”

“তিনি একজন র‍্যাঙ্গের ছিলেন?”

মেরি হেসে ফেললো। “না, তিনি একজন একাউন্টেন্ট ছিলেন, তবে যুদ্ধের কারণে একজন র‍্যাঞ্চার হয়ে গেলেন। র‍্যাঞ্চাল কানাডিয়ান এয়ার ফোর্সে একজন পাইলট ছিলেন তিনি। আমার মনে হয় তিনি যখন আকাশ দেখতেন তখন তার কাছে একাউন্টিং অফিসটা অনেক বেশি বিরক্তিকর বলে মনে হতো।”

“সেই কাজের জন্যে খুবই নার্ভের জোর লাগে।”

“তুমি যা জানো তারচেয়েও বেশি। তিনি এমন সব গরু-বাছুর বিক্রি করলেন যা তার নিজের ছিলো না। র‍্যাঞ্চ কেনার আগে তার কাছে কোনো গরু-মহিষ ছিলো না। লোকজন বলতো জাতে একেবারে ফরাসি।”

“আমার মনে হয় আমি তাকে পছন্দ করতাম।”

“তাই করতে।”

আঠারো বছর বয়সের আগে সে তার বাবা-মা আর দুই ভায়ের সঙ্গে ক্যালগারি’তে বসবাস করতো। তারপর মন্ট্রিলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে এমন একটি জীবন শুরু করলো যার পরিকল্পনা সে কখনও করে নি। এক উদাস ছাত্রি, যে কিনা আলবার্তার কনভেন্ট স্কুলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাঠঘাট চষে বেড়াতে বেশি পছন্দ করতো, সে আবিষ্কার করলো তার নিজের মস্তিষ্কটা ব্যবহার করার ব্যাপারে দারুণ উত্তেজনা বোধ করে।

“এরকমই সহজ ছিলো সেটা,” মেরি তাকে বললো। “আমি বইকে খুবই শ্রদ্ধা জ্ঞান করতাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার চারপাশের লোকজন বই নিয়ে মজে আছে। দারুণ সময় উপভোগ করছে তারা। সারাক্ষণ শুধু কথা হতো। দিনে রাতে সব সময়। ক্লাশরুমে, সেমিনারে, জনাকীর্ণ ক্যান্টিনে, বিয়ারের সাথে চলতো আড্ডা। আমার মনে হয় সেইসব কথাবার্তাই আমাকে বদলে ফেলেছিলো। কিছু বুঝলে?”

“আমি কিছু মনে করতে না পারলেও বুঝতে পারছি ঠিক ঠিক,” বর্ন বললো। “কলেজ নিয়ে আমার কোনো স্মৃতি নেই। তবে আমি একদম নিশ্চিত, আমি ওখানে ছিলাম।” সে হাসলো। “বিয়ার হাতে আড্ডা মারাটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে।”

সেও হাসলো। “ডিপার্টমেন্টে আমি খুব উজ্জ্বল ছিলাম। ক্যালগারি থেকে আসা শক্তসামর্থ্য দীর্ঘাঙ্গী এক মেয়ে, মন্ট্রিল বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থেক ছেলের চাইতেও বেশি বিয়ার খেতে পারতো সে।”

“তোমাকে অবশ্যই অপছন্দ করতো।”

“না, ঈর্ষা করতো।”

মেরি সেন জ্যাকের সামনে নতুন এক দুনিয়ার দ্বার খুলে গেলো। সে আর তার পুরনো জগতে ফিরে গেলো না। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ছাটায় বাড়ি যেতো। আস্তে আস্তে সেটাও কমতে শুরু করলো। মন্ট্রিলে তার বন্ধুবান্ধব আর পরিধিও

বেড়ে গেলো। গ্রীষ্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কাজ করতো। প্রথমে সে ইতিহাসে আগ্রহী হলেও পরে বুঝতে পারলো বেশিরভাগ ইতিহাসই অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা আকার লাভ করে—তাই সে অর্থনীতিই বেছে নিলো। ডুব গেলো তাতে।

পাঁচ বছর ম্যাকগিলে ছিলো। ওখান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন ক'রে কানাডিয়ান সরকারের ফেলোশিপ নিয়ে অক্সফোর্ডে চলে এলো সে।

“আমার মনে হয় আমার বাবাকে দুরারোগ্য কোনো রোগে ধরেছিলো। একদিন তিনি নিজের দামি র‍্যাঞ্চটা ছেলের হাতে দিয়ে আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চলে এলেন আমার কাছে।”

“কথা বলার জন্যে? কেন? তিনি তো একজন একাউন্টেন্ট, আর তুমি ইকোনোমিস্ট্রে ডক্টরেট করছো।”

“ভুল কোরো না,” মেরি ঝটপট বললো। “একাউন্টেন্ট আর ইকোনোমিস্ট হলো একে অন্যের শত্রু। একজন গাছ দেখে, অন্যজন বন। তাছাড়া আমার বাবা কানাডিয়ান ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফ্রেন্স-কানাডিয়ান। আমার মনে হয় তিনি আমাকে ভার্সাইঁ'র একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই দেখতেন। কিন্তু আমি যখন তাকে বললাম, ফেলোশিপের একটা কমিটমেন্ট হলো সরকারের হয়ে তিন বছর কাজ করতে হবে, তখন বাবা একেবারে দমে গেলেন। তিনি বললেন আমি ‘ভেতরে থেকেই ভালো সেবা দিতে পারতাম।’ ভিভেকুইবেক লিবারে—ভিভা লা ফ্রান্স!”

তারা দু'জনেই হেসে ফেললো। অটোয়ার সাথে তিন বছরের কমিটমেন্টটা সম্ভব কারণেই বাড়ানো হলো। যখনই সে চলে যাবার কথা ভাবতো তার থ্রেড বাড়িয়ে দেয়া হতো। তাকে প্রমোশন দেয়া হতো। বড় অফিস আর স্টাফ দেয়া হতো তাকে।

“অবশ্যই ক্ষমতা দুর্নীতির জন্য দেয়,” সে হেসে বললো। “আর আমাদের চেয়ে এটা ভালো কেউ জানে না। তবে আমার মনে হয় নেপোলিওন এটা ভালো বলেছিলেন : ‘আমাকে যথেষ্ট মেডেল দাও, আমি তোমাদেরকে যেকোনো যুদ্ধে জয় এনে দেবো।’ তাই আমি থেকে গেলাম। নিজের কাজটা অসম্ভব পছন্দ করতাম আমি।”

জেসন তাকে কথা বলার সময় ভালো করে লক্ষ্য করলো। তার নিয়ন্ত্রিত একটা বহিরাবরণের নিচে শিশুসুলভ চপলতা রয়েছে। তবে সে যা করে বেশ দক্ষতার সাথেই করে। “আমি নিশ্চিত, তুমি খুব ভালো কাজ করতে, কিন্তু তাতে ক'রে তুমি অন্যকিছু করার সময় পেতে না, তাই না?”

“অন্যকিছু মানে?”

“স্বামী, সংসার, বাড়িঘর, এইসব।”

“সেগুলো হয়তো একদিন আসবে। আমি ওগুলো বাতিল ক'রে দিচ্ছি না।”

“কিন্তু ওগুলো তো আসে নি।”

“না। তবে খুব কাছাকাছি কয়েকবার পৌছে গিয়েছিলাম, কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গড়ায় নি।”

“পিটার কে?”

তার হাসিটা উবে গেলো। “আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি ক্যাবলটা পড়েছো।”

“আমি দুগুণিত।”

“দুগুণিত হয়ো না।...পিটার? আমি পিটারকে খুব পছন্দ করি। আমরা প্রায় দু'বছর ধরে একসঙ্গে থেকেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় নি।”

“বোঝাই যাচ্ছে সে কোনো কিছু বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না।”

“তা পারে না!” সে আবার হেসে ফেললো। “সে আমাদের সেকশনের পরিচালক, আশা করছে খুব জলদিই ক্যাবিনেটে ঠাঁই পাবে।”

“সে বলেছে সে তোমাকে ছাব্বিশ তারিখে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নেবে। তুমি তাকে ক্যাবল ক'রে দাও।”

“হ্যা, আমি জানি।”

মেরির চলে যাওয়া নিয়ে তারা কোনো কথা বললো না। তারা সেই কথাটা এড়িয়ে গেলো, যেনো সেটা দূরের কোনো বিষয়। কি ঘটেছে সেটার সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। এটা হচ্ছে এমন কিছু যা হতে যাচ্ছে। মেরি বলেছিলো সে তাকে সাহায্য করতে চায়। জেসন সেটা মেনে নিয়েছে। ধরে নিয়েছে মেয়েটা তাকে ভূয়া কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে, তার সাথে একটা দিন থাকার জন্যে—আর সে তার জন্যে কৃতজ্ঞই। তবে অন্য কিছু হওয়াটা একেবারেই অচিন্তনীয় ব্যাপার।

এজন্যেই তারা এ নিয়ে কথা বললো না। কথা আর চাহনি বিনিময় হলো কেবল। শান্ত আর মৃদু হাসির উদ্বেক হলো এক সময়। এক অদ্ভুত মুহূর্তে তারা খুবই ঘনিষ্ঠ আর উষ্ণ হয়ে উঠলে দু'জনেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে সরে গেলো। অন্য কিছু হওয়া একেবারেই অচিন্তনীয়।

তাই তারা স্বাভাবিকতায় ফিরে এলো। জেসনের কাছে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা একেবারেই অযৌক্তিক একটি ব্যাপার। সুইজারল্যান্ডের ছোট্ট একটা গ্রামে এক সঙ্গে আছে তারা। অস্বাভাবিক। নিয়মিত জীবনে অভ্যস্ত মেরির জন্যে এটা একেবারে অভাবনীয়। মেয়েটার জন্যে কোনো সময় হাতে নেই; মেয়েটাও তা জানে, আর এটাই তাকে কঠিন অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

“তুমি যখন সংবাদপত্র পড়ো তোমার তখন কি মনে হয়?”

“মিশ্র অনুভূতি। মনে হয় এটাই চিরন্তন।”

“সিরিয়াস হও। তোমার কাছে কি পরিচিত ব'লে মনে হয়?”

“প্রায় সবকিছুই, তবে আমি তোমাকে বলতে পারবো না কেন।”

“আমাকে একটা উদাহরণ দাও তো।”

“আজ সকালে গৃসে আমেরিকান একটি অস্ত্রের চালানের গল্প এবং সেটা নিয়ে জাতিসংঘে তর্কবিতর্কের খবর পড়লাম। রাশিয়া বিরোধীতা করেছে। আমি এর তাৎপর্যটা বুঝতে পারি, এটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে লড়াই, মানে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে।”

“আরেকটা উদাহরণ দাও।”

“আরেকটা গল্প আছে, ওয়ারশো’তে অবস্থিত বন সরকারের লিয়াজো অফিস নিয়ে পূর্ব জার্মানির নাক গলানো। ইস্টার্ন ব্লক, ওয়েস্টার্ন ব্লক। এগুলো আমি বুঝি।”

“তুমি সম্পর্কটা বোঝো, তাই না? রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি, সব তোমার কাছে খুবই চেনা।”

“অথবা সাম্প্রতিক বিশ্বের ব্যাপারে আমার বেশ ভালো জ্ঞান আছে বলতে পারো। আমার মনে হয় না আমি কখনও একজন কূটনৈতিক ছিলাম। গেইমেনশেফট ব্যাংকের টাকাগুলো সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যাপারটাকে বাতিল করে দেয়।”

“আমিও একমত। তারপরও, তুমি রাজনৈতিকভাবে বেশ সচেতন। মানচিত্রগুলোর ব্যাপারে কি বলবে? তুমি আমাকে মানচিত্র কিনতে বলেছো। সেগুলোর দিকে তাকালে তোমার মনে কি আসে?”

“কিছু কিছু ক্ষেত্রে নামগুলো শুনে বা দেখে আমার মনে অসংখ্য ছবি ভেসে ওঠে, যেমনটি হয়েছে জুরিখে। বিন্ডিং, হোটেল, পথঘাট...কখনও কখনও কতোগুলো মুখ। তবে কখনও কোনো নাম নয়। মুখগুলোর কোনো নাম থাকে না।”

“তারপরও বলতে হয়, তুমি প্রচুর ভ্রমণ করেছো।”

“আমারও তাই মনে হয়।”

“তুমিও সেটা জানো।”

“ঠিক আছে, আমি ভ্রমণ করেছি।”

“তুমি কিভাবে ভ্রমণ করেছো?”

“কিভাবে বলতে কি বোঝাচ্ছে?”

“সেটা কি সাধারণত পুনে করে হোতো, নাকি গাড়িতে করে?”

“আমার মনে হয় দুটোই। কেন?”

“বিমান মানে অনেক দূরের পথ। তোমার সাথে কি লোকজন দেখা করে? হোটেল বা এয়ারপোর্টে কোনো মানুষ?”

“পথঘাটে,” সে জবাব দিলো।

“পথঘাটে? পথঘাটে কেন?”

“আমি জানি না। পথঘাটে লোকজনের সাথে আমার দেখা হয়...নিরিবিলা

পরিবেশে । অন্ধকারে ।”

“রেস্তোরার? ক্যাফেতে?”

“হ্যা । আর ঘরে ।”

“হোটেলের ঘর?”

“হ্যা ।”

“অফিসে না? ব্যবসায়ীক অফিসে?”

“কখনও কখনও । সাধারণত নয় ।”

“ঠিক আছে, লোকজনের সাথে তোমার দেখা হয় । লোকগুলো কি মহিলা না পুরুষ? নাকি উভয়ই?”

“বেশিরভাগ সময়ই পুরুষ । কিছু মহিলাও আছে, তবে পুরুষই বেশি ।”

“তারা কি নিয়ে কথা বলে?”

“আমি জানি না ।”

“মনে করার চেষ্টা করো ।”

“আমি পারছি না । কোনো কণ্ঠস্বর নেই । কোনো শব্দও শোনা যায় না ।”

“কোনো শিডিউল থাকে? তুমি লোকজনের সাথে দেখা করো, তার মানে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে । তারা তোমার সাথে দেখা করার জন্যে প্রতীক্ষা করে । তুমিও তাই করো । কে এইসব অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো ঠিক করে? কাউকে তো করতেই হয়?”

“ক্যাবলের মাধ্যমে । টেলিফোনে ।”

“কার কাছ থেকে? কোথেকে?”

“আমি জানি না । তারা আমার কাছে আসে ।”

“হোটেল?”

“বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হোটেলই ।”

“তুমি আমাকে বলেছো ক্যারিলিওন হোটেলের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার তোমাকে বলেছে তুমি মেসেজ গ্রহণ করেছো ।”

“তাহলে তারা হোটেলই এসেছিলো ।”

“অন্য কেউ, অথবা সেভেনটি-ওয়ানের?”

“স্ট্রেডস্টোন ।”

“ট্রেডস্টোন । এটা তো তোমার কোম্পানি, তাই না?”

“এতে তো কিছুই বোঝা যায় না । অন্তত আমি কিছু খুঁজে পাই নি ।”

“মনোযোগ দাও!”

“মনোযোগ দিচ্ছি । সেটা তালিকায় নেই । আমি নিউইয়র্কে ফোন করেছিলাম ।”

“মনে হয় তুমি ভাবো এটা খুবই অস্বাভাবিক । কিন্তু আসলে তা নয় ।”

“কেন নয়?”

“এটা হতে পারে কোনো কোম্পানিরই আলাদা একটি ডিভিশন অথবা একটি ব্লাইন্ড সাবসিডিয়ারি—এতে ক’রে একটি কর্পোরেশন তার প্যারেন্ট কোম্পানির পক্ষে কিছু কেনার জন্যে দরদামের বেলায় বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। এরকমটি প্রতিদিনই করা হয়।”

“তুমি তাহলে কাকে বোঝানোর চেষ্টা করছো?”

“তোমাকে। এটা একেবারেই সম্ভব যে, তুমি আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্যে একজন ভ্রাম্যমান মধ্যস্থতাকারী। সব কিছুই এর সাথে খাপ খেয়ে যায়। তাত্ত্বিক পুঁজির জন্যে একটা তহবিল গঠন করা, কোর্পোরেট অনুমোদনের জন্যে গোপনীয়তা মুক্ত করা। একজন পারচেজিং এজেন্টকেই ইঙ্গিত করে সেটা। অথবা, প্যারেন্ট কোম্পানির বিশাল শেয়ার হোল্ডার, কিংবা সেই কোম্পানি একটি অংশের মালিক।”

“তুমি খুব দ্রুত কথা বলছো।”

“আমি এমন কিছু বলি নি যা অযৌক্তিক।”

“তোমার কথায় একটা বা দুটো ফাঁক আছে।”

“কোথায়?”

“একাউন্টটাতে কোনো টাকা ওঠানোর নজীর নেই। কেবল ডিপোজিট করা হয়েছে। এটা তো কেনাকাটা সংক্রান্ত হতে পারে না। এটা বিক্রি সংক্রান্ত হতে পারে।”

“তুমি সেটা জানো না। তুমি তো স্মরণ করতে পারো না। পেমেন্টটা শর্ট ফল ডিপোজিটের মাধ্যমে দেয়া হতে পারে।”

“আমি এমন কি জানিও না এটার মানে কি?”

“একজন ট্রেজারার এটা ভালো করেই জানবে। অন্য ফাঁকটা কি?”

“কোনো কিছু কম দামে কেনার জন্যে লোকজন খুনখারাবি ক’রে বেড়ায় না। তাতে ক’রে সমস্যাই বেশি হবে।”

“হবে, যদি বিশাল কোনো ভুল ক’রে থাকে। অথবা কোনো লোক যদি অন্য কারোর জন্যে ভুলটা ক’রে থাকে। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হলো তুমি যা নও তা তুমি হতে পারো না। কে কি বললো তাতে কিছু যায় আসে না।”

“তুমি এটাতে সন্তুষ্ট।”

“আমি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট। তোমার সাথে আমি তিন দিন ধরে আছি। আমার কথা বলেছি, শুনেছি। একটা বড়সড় ভুল হয়ে গেছে। অথবা এটা এক ধরনের ষড়যন্ত্র।”

“কে জড়িত? কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র?”

“ঠিক এটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।”

“ধন্যবাদ।”

“আমাকে বলো তো, টাকার কথা ভাবলে তোমার মনে কোন ভাবনাটা আগে

আসে?”

বন্ধ করো! এটা কোরো না। তুমি কি বুঝতে পারছো না? তুমি ভুল করছো। যখন আমি টাকার কথা ভাবি তখন আমার খুন করার কথাই মনে আসে।

“আমি জানি না,” সে বললো। “আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি ঘুমাতে চাই। সকালে তুমি তোমার ক্যাবলটা পাঠিয়ে দিও। পিটারকে বোলো তুমি আসছো।”

মধ্যরাত পেরিয়ে গেলে চতুর্থ দিনের শুরু হলো। তারপরও চোখে ঘুম আসছে না। বর্ন ছাদের দিকে চেয়ে আছে। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে মেরি।

সকালে মেয়েটা চলে গেলে তার নিজের পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন শুরু হবে। সে এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকবে। ওলেন থেকে ডাক্তারকে ডেকে সেলাই খোলানো হবে। তারপরই প্যারিসে চলে যাবে সে। টাকাগুলো প্যারিসেই আছে। অন্য কিছুও আছে সেখানে। এটা সে জানে, টেরও পাচ্ছে। একটা চূড়ান্ত জবাব নিহিত আছে ওখানে।

তুমি অসহায় নও। তুমি তোমার নিজের পথ খুঁজে পাবে।

কি খুঁজে পাবে সে? কার্লোস নামের এক লোককে? কে এই কার্লোস? জেসন বর্নের সাথে তার কি সম্পর্ক?

কাপড়-চোপড় ঝাড়ার শব্দ শুনে সে দেয়ালের পাশে রাখা সোফার দিকে তাকালো। মেরি ঘুমায় নি দেখে একটু চমকে গেলো সে। তার দিকেই চেয়ে আছে মেয়েটা।

“তোমার ধারণা ভুল, তুমিও সেটা জানো,” সে বললো।

“কিসের ধারণা?”

“তুমি যা ভাবছো।”

“আমি কি ভাবছি তা তুমি জানো না।”

“হ্যা, আমি জানি। আমি তোমার চোখ দেখে বুঝেছি।”

“হতে পারে,” সে জবাব দিলো। “স্টেপডেকস্ট্রাসের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করো। ড্রেই এলপেনহসারের মোটা লোকটার ব্যাপারেই বা কী বলবে?”

“আমি কিছু বলতে পারবো না, তুমিও পারবে না।”

“তবে তাদের আমি দেখেছি।”

“খুঁজে বের করো কেন। তুমি যা নও তা তুমি হতে পারো না, জেসন। খুঁজে বের করো।”

“প্যারিসে,” সে বললো।

“হ্যা, প্যারিসে,” মেরি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো। একটা হালকা হলুদ রঙের নাইট গাউন পরে আছে সে। তার পাশে এসে তার দিকে চেয়ে নিজের গাউনের বোতামগুলো আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করলো সে। গাউনটা তার শরীর থেকে খসে

পড়লে ব'সে পড়লো তার পাশে। দু'হাতে তার মুখটা ধরে চোখে চোখ রাখলো।
“আমাকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ,” ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো সে।

“আমার জীবন বাঁচানোর জন্যেও তোমাকে ধন্যবাদ,” সে বললো। জানে মেয়েটা কি ভাবছে। তার তো কোনো নারীসঙ্গের স্মৃতি নেই। হয়তো সে ছাড়া আর কাউকে সে কল্পনা করতে পারবে না। মেরি বাতি নিভিয়ে দিলো। তার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিলো সে।

মেরিকে কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছে সে। আর এখন কিনা সেই মেয়েটিই বলছে ঠিক আছে। সে তাকে একটা স্মৃতি দিচ্ছে মনে করার জন্যে, কারণ মেয়েটা নিজেও ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে উন্মুখ হয়ে আছে। সমস্ত দুশ্চিন্তা তিরোহিত হলো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলো স্বস্তি। এর বেশি তো সে চাইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর, মেয়েটাকে তার কতোই না দরকার!

দু'হাতে তার স্তন ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো সে। তার ঠোঁটের আদ্রতা উদ্দীপ্ত করলো তাকে। সরিয়ে দিলো সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

চাদর টেনে মেয়েটা চলে এলো তার কাছে।

মেয়েটা তার বাহুডোরে, বুকে মাথা রেখে তার কাঁধের ক্ষতস্থানটি সাবধানে এড়িয়ে গুয়ে আছে। বাহুর উপর ভর দিয়ে একটু উঠে বসলো সে। জেসন তার দিকে তাকালে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাদের দু'জনের চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললো দু'জনে। মেয়েটা তার বাম হাতের তর্জনী জেসনের ঠোঁটে রেখে মৃদু কণ্ঠে বললো।

“আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, আর আমি চাই না তুমি আমার কথার মাঝখানে কোনো কথা বলো। আমি পিটারকে ক্যাবল পাঠাচ্ছি না। আপাতত।”

“শোনো, আমার কথাটা শোনো,” মেয়েটার হাত ধরে বললো সে।

“প্রিজ কথা বোলো না। আমি বলেছি ‘আপাতত।’ তার মানে আমি পাঠাচ্ছি না তা নয়, তবে এখন পাঠাচ্ছি না। আমি তোমার সাথেই থাকছি। তোমার সাথে প্যারিসে যাচ্ছি আমি।”

সে জোর ক'রে বললো, “ধরো আমি তোমাকে চাই না।”

সে আরো কাছে এসে তার গালে ঠোঁট ঘষলো। “এতে কাজ হবে না। কম্পিউটার এটা রিজেক্ট করছে।”

“তোমার জায়গায় আমি হলে আমি এতোটা নিশ্চিত হতাম না।”

“কিন্তু তুমি তো আর আমি না। আমি হলাম আমি। আমি জানি তুমি আমাকে অনেক কথা বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছো না। মনে হয়, আমরা দু'জনেই একে অন্যকে অনেক কিছু বলতে চাচ্ছি। কি ঘটেছে সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না। হয়তো এটা কোনো পাগলামী, দু'জন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ এক সঙ্গে নিজেদেরকে নরকে নিক্ষেপ করছে। হয়তো ব্যাপারটা তাই। কিন্তু এ থেকে আমি

পালাতে পারি না। তোমার কাছ থেকে আমি পালাতে পারি না। কারণ আমাকে তোমার দরকার। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো।”

“কি ক’রে বুঝলে তোমাকে আমার দরকার?”

“তোমার জন্যে আমি এমন কিছু করতে পারি যা তুমি নিজে করতে পারো না। গত দু’ঘণ্টা ধরে আমি সেটাই ভাবছিলাম।” নগ্ন অবস্থায় সে উঠে বসলো। “তুমি বিপুল পরিমাণের টাকা-পয়সার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে পড়েছো। তবে আমি মনে করি না তুমি খরচের ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আগে হয়তো ছিলে, কিন্তু এখন নয়। আমি জানি। আরো কিছু ব্যাপার আছে। আমি কানাডিয় সরকারের র‍্যাঙ্কিং পজিশনে আছি। সব ধরনের ইনকোয়ারির জন্যে ক্লিয়ারেন্স আর প্রবেশাধিকার রয়েছে আমার। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পড়ে গেছে আর কানাডা হয়েছে ধ্বংস। আমরা আমাদের নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আমি সেটার অংশ। এজেন্সি আমি দেখতে এবং রিপোর্ট করতে জুরিখে এসেছি, কেবল বিস্মৃত সব তত্ত্ব কপচাতে নয়।”

“তুমি তোমার এই ক্ষমতা দিয়ে, অবস্থান দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে?”

“আমার মনে হয় পারবো। এবং অ্যাম্বাসির প্রোটেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তবে কোনো রকম মারামারি-খুনাখুনি দেখলে আমি ক্যাবল পাঠাবো, এখান থেকে চলে যাবো। আমার নিজের ভয়ের কথা বাদ দাও। সেরকম অবস্থায় আমি তোমার বোঝা হতে চাইবো না।”

“মারামারি দেখলেই,” বর্ন কথাটা আবার উচ্চারণ করলো। “সেটা কখন কোথায় হবে আমি ঠিক করি?”

“আমি এ নিয়ে তোমার সাথে কোনো তর্ক করবো না।”

তার চোখে চোখ রেখে আবারো বলতে লাগলো, “তুমি কেন এসব করছো? তুমি কেবল বলছো। আমরা দু’জনেই কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যারা নরক থেকে কোনো রকম জানটা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের কি কোনো মূল্য আছে?”

মেয়েটা স্থির হয়ে ব’সে রইলো। “আমি তো বলেছি আরো কিছু আছে। হয়তো তুমি ভুলে গেছো। চারদিন আগে এক লোক এসে নিজের জীবন বিপন্ন ক’রে আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি সেই লোকটাকে বিশ্বাস করি। সে আমাকে যতোটা বিশ্বাস করে তার চেয়েও বেশি। এটাই কেবল আমি বলতে চাচ্ছি।”

“আমি মেনে নিচ্ছি,” তার হাত দুটো ধরে বললো সে। “আমার এটা করা ঠিক হচ্ছে না, তবে আমি মেনে নিচ্ছি। তোমার এই বিশ্বাসটা আমার ভীষণ দরকার।”

“এখন তুমি কথা বলতে পারো,” ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বলে চাদরটা নামিয়ে তার

শরীরের কাছে চলে এলো সে। “আমার সাথে প্রেম করো, আমার এখন এটার খুব দরকার।”

আরো তিনরাত চলে গেলো। আরো ঘনিষ্ঠভাবে তারা খুঁজে পেলো নিজেদেরকে। তারা জানে যেকোনো সময় এসব কিছু বদলে যাবে। আর যখন এটা আসবে, খুব দ্রুতই আসবে। তাই কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার দরকার যা আর কোনোমতেই এড়ানো যাচ্ছে না।

টেবিলে ধোয়া উঠলো, সাথে গরম আর তেতো কফি। ওয়েটার ছেলেটা তাদের দেখে চলে গেছে কয়েক মিনিট আগে। পেতিত দিউয়ার আর জুরিখ সংবাদপত্রটি দিয়ে গেছে সে। ইংরেজি এবং ফরাসি দুটো ভাষায়। জেসন আর মেরি মুখোমুখি ব’সে পত্রিকাগুলো দেখে যাচ্ছে।

“কিছু পেলে?” বর্ন জানতে চাইলো।

“গুইসান কুয়ের সেই বৃদ্ধ ওয়াচম্যান গত পরশু সমাহিত হয়েছে। পুলিশ এখনও কোনো ক্লিকিগার ক’রে উঠতে পারে নি। ‘তদন্ত কাজে অগ্রগতি হচ্ছে,’ বলছে তারা।”

“এখানে আরো বেশি কিছু আছে,” ব্যাভেজ বাধা বাম হাতে পত্রিকাটা নিয়ে জেসন বললো।

“এখন কি অবস্থা?” হাতের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো মেরি।

“ভালো। আমি এখন আরো বেশি আঙুল ব্যবহার করতে পারবো, খেলার জন্যে।”

“জানি।”

“তুমি খুবই অশীল কিছু ভাবছো,” পত্রিকাটা ভাঁজ করে বললো সে। “এই যে এটা। অন্য দিন তারা যা বলেছে আবাবো সেটা বলছে। “টিসু আর রক্তগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে।” বর্ন চোখ তুলে তাকালো। “তবে তারা আরো কিছু যোগ করেছে। কাপড়ের টুকরোগুলো; এটা আগে উল্লেখ করা হয় নি।”

“এটা কি কোনো সমস্যা?”

“আমার জন্যে নয়। আমার কাপড়চোপড়গুলো মার্সেই থেকে কেনা হয়েছে। তোমারগুলো? সেটা কি বিশেষ কোনো ডিজাইনারের কাপড়?”

“তুমি আমাকে বিব্রত করছো, ওগুলো সেরকম কিছু ছিলো না। আমার সব জামা কাপড়ই অটোয়ার এক মহিলা বানিয়েছে।”

“তাহলে সেটা আর ট্রেস করা যাবে না?”

“আমি তো দেখতে পাচ্ছি না কিভাবে করবে। সিন্ধ কাপড়টা এসেছে হংকং থেকে।”

“তুমি কি হোটেলের দোকান থেকে কিছু কিনেছিলে? রুমাল, পিন, এরকম কিছু?”

“না। আমি খুব বেশি শপিং করি না।”

“ভালো। তোমার বন্ধু এইসব ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে নি?”

“ডেস্কে কিছু জিজ্ঞেস করে নি, আমি তোমাকে সেটা বলেছি। কেবল দু’জন লোক, যাদেরকে তুমি আমার সঙ্গে লিফটে দেখেছো।”

“ফরাসি আর বেলজিয়াম প্রতিনিধি দলের দু’জন।”

“হ্যাঁ।”

“চলো, পরীক্ষা করে দেখি।”

“পরীক্ষা করার কিছু নেই। পল—যে ব্রাসেলস্ থেকে এসেছে—সে কিছু দেখে নি। চোয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে এখানে রয়ে গেছে সে। রুদ—যে আমাদেরকে থামাতে চেষ্টা করেছিলো, মনে আছে?—আমি ছিলাম মঞ্চের উপর, আলোর মধ্যে। কিন্তু পুলিশের কাছে যাবার আগেই সে লোকজনের ভীড়ে আহত হয়, হাসপাতালে নেয়া হয়েছে তাকে—”

“তখন ওখানে হয়তো সে কিছু বলেছে,” জেনসন কথার মাঝখানে বললো।

“হ্যাঁ। তবে আমার ধারণা সে কনফারেন্সে আমার থাকার আসল উদ্দেশ্যটা জানতো। আমার প্রেজেন্টেশন তাকে বোকা বানায় নি। যদি তাই হতো তবে সে এটা থেকে দূরে থাকতে সিদ্ধান্ত নিতো।”

বর্ন তার কফির মগটা তুলে নিলো। “তুমি...মিত্র খুঁজছো?”

“সত্যি বলতে তাই। একটু আভাস পেতে চাচ্ছি আর কি। কেউ তো আর সরাসরি বলবে না, তারা তাদের তাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থটা দেখছে অথবা অন্য কোনো মার্কেট থেকে কানাডার জন্যে কাঁচা মাল কিনবে। তবে কারা কার সাথে দেখা করছে, একসাথে ডিনার করছে সবই তুমি দেখবে।”

“আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“বোঝা উচিত। তোমার নিজের দেশ এই বিষয়ে খুবই স্পর্শকাতর। কে কিসের মালিক? কতো সংখ্যক আমেরিকান ব্যাংক ওপেক-এর টাকায় চলে? কতো সংখ্যক শিল্পকারখানা ইউরোপিয়ান আর জাপানিদের মালিকানায় আছে? ইংল্যান্ড ইটালি আর ফ্রান্স থেকে উড়ে আসা টাকায় কতো হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে? আমরা সবাই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি।”

“আমরা?”

মেরি হেসে ফেললো। “অবশ্যই। কোনো পুরুষ যখন জানে, তার দেশ ক্রমাগত বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে তখন সে জাতীয়তাবাদী না হয়ে থাকতে পারে না। যুদ্ধে হেরে যাওয়াটা এক সময় মানিয়ে নিতে পারে—নিজেকে প্রবোধ দিতে পারে শত্রু খুব শক্তিশালী ছিলো—কিন্তু অর্থনীতি হারানো মানে শত্রু খুবই স্মার্ট। এক্ষেত্রে দখলদারিত্ব দীর্ঘমেয়াদী হয়, আর তার ক্ষতও হয় দীর্ঘস্থায়ী।”

“তুমি এনিয়ৈ অনেক ভাবো, তাই না?”

অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেরির চোখে হাস্যরসের প্রকাশটি তিরোহিত হলো। খুব সিরিয়াসলি জবাব দিলো সে, “হ্যা, তা ভাবি। আমার মনে হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

“জুরিখে কি তুমি কিছু শিখেছো?”

“চমকে ওঠার মতো কিছু না,” বললো সে। “সব জায়গায় টাকা ওড়ে। সিভিকিটগুলো যেখানে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ করার চেষ্টা করছে সেখানে আমলারা অন্য দিকে চেয়ে আছে।”

“ঐ ক্যাবলগ্রামে পিটার বলেছে তোমার দৈনিক রিপোর্টটা খুবই উঁচুমানের ছিলো। এটা দিয়ে সে কী বুঝিয়েছে?”

“আমি কিছু সংখ্যক ইকোনোমিক দালাল খুঁজে পেয়েছি আমার ধারণায় তারা কানাডিয়ান ক্ষমতাহীন কর্তাব্যক্তিদের ব্যবহার করছে কিছু কানাডিয়ান সম্পত্তি কেনার জন্যে। আমি একেবারে অজ্ঞ ছিলাম না; এটা হয়তো তোমার কাছে কোনো মানে রাখে না।”

“আমি কোনো কিছু জানতে করতে চাচ্ছি না,” জেসন পাল্টা বললো। “তবে আমার মনে হয় তুমি ভাবছো আমি তাই করতে চাচ্ছি।”

“আমি সেটা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। তুমি যদি অবৈধ কেনাবেচার করে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকো তবে সেটা আমি ট্রেস করতে পারবো। কিন্তু সেই কাজটা আমি টেলিফোনে করতে চাই। সেখানে কোনো কথা লেখা থাকে না।”

“এখন আমি জানতে চাচ্ছি। কিভাবে করবে সেটা?”

“ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান নামে যদি কোনো মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট থেকে থাকে তবে সেটা খুঁজে বের করা যাবেই। আমি পিটারকে প্যারিসের টেলিফোন স্টেশন থেকে ফোন করবো। তাকে বলবো জুরিখে ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান নামের একটি প্রতিষ্ঠান খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি, কিন্তু পাচ্ছি না। আমি তাকে সি.এস করতে বলবো—মানে গোপন তল্লাশী—তাকে বলবো আমি তাকে পরে ফোন করবো।”

“সে যদি ওটা খুঁজে পায়?”

“ওটা যদি ওখানে থাকে তবে সে খুঁজে পাবেই।”

“তারপর আমি সার্টিফাইড ডিরেক্টর হিসেবে যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবো, তাই না?”

“খুবই সাবধানে,” মেরি বললো। “মধ্যস্থতাকারীদের সাহায্যে। যদি বলো তো আমি নিজেই সেটা করবো।”

“কেন?”

“কারণ, তারা আমার সাথে যা করেছে তার জন্যে। অথবা যা করে নি তার জন্যে।”

“যেমন?”

“প্রায় ছয়মাস ধরে তারা তোমাকে ধরার চেষ্টা করে নি।”

“তুমি সেটা জানো না—আমি নিজেই তো সেটা জানি না।”

“ব্যাংক সেটা জানে। মিলিয়ন ডলার অক্ষত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। যেনো কোনো ভুলের কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছে তোমাকে।”

বর্ন চেয়ারে হেলান দিয়ে তার হাতের ব্যান্ডেজের দিকে তাকালো। “তুমি বলতে চাচ্ছে আমি যদি পরিত্যক্ত হয়ে থাকি, তার কারণ ট্রেডস্টেনের ডিরেক্টররা সেই ভুলটাকে সত্যি ব’লে ধরে নিয়েছে।”

“সম্ভবত। তারা ধরে নিয়েছে, তুমি তাদেরকে কোনো অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে ফেলেছো—তার সঙ্গে আছে অপরাধীদের সংযোগ—তাতে তাদের আরো মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হবে। ক্ষুদ্র সরকারের কাছে কোম্পানিটা প্রকাশিত হয়ে পড়লে ঝুঁকিটা আরো বেড়ে যাবে। অথবা তুমি আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের সঙ্গে যোগ দিয়েছো, সম্ভবত না জেনেই। যেকোনো কিছু হতে পারে। এজন্যে তারা ব্যাংকের ধারে কাছেও যায় নি। তারা সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হতে চাচ্ছে না।”

“তাহলে বলা যায়, তোমার বন্ধু পিটার যাই জানুক, আমি আমার আগের অবস্থাই থাকবো।”

“আমরা আগের অবস্থায় ফিরে আসবো, তবে সবকিছু আর আগের মতো থাকবে না। অনেকটা দশের মধ্যে সাড়ে চার পাঁচে উন্নীত হওয়া আর কি।”

“দশ না হয়ে নয় হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। লোকজন আমাকে খুন করতে চায় অথচ আমি জানি না কেন। অন্যেরা তাদেরকে থামাতে পারে, তবে তারা সেটা করছে না। ড্রেই এলপেনহাসারের লোকটা বলেছিলো ইন্টারপোল আমাকে ধরার জন্যে জাল পেতেছে। আমি যদি সেই জালে আটকা পড়ে যাই তবে আমি কোনো জবাবই খুঁজে পাবো না। আমি এমন একজন অপরাধী যে জানে না তার অপরাধটা কি। কোনো স্মৃতি না থাকাটাই আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর এটাও সম্ভব, আমি হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থন করার সময়ই পাবো না।”

“আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমারও তাই করা উচিত।”

“ধন্যবাদ।”

“আমি সত্যি বলছি, জেসন। এসব বলা বন্ধ করো।”

বন্ধ করো। কতোবার আমি নিজেকে এ কথা বলি? তুমি আমার ভালোবাসা, একমাত্র নারী যাকে আমি জানি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তাহলে আমি কেন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না?

নিজের পাঁটা পরীক্ষা করার জন্যে বর্ন উঠে দাঁড়ালো। তার পায়ে চলৎশক্তি ফিরে এসেছে। আঘাতটা ধারণার চেয়ে কম গুরুতর বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে এখন। সেই রাতে ওলেনের ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে দেখা ক'রে সেলাইগুলো খুলে ফেললো সে। পরিবর্তনটা আসবে আগামীকাল।

“প্যারিস,” জেসন বললো। “জবাবটা প্যারিসেই আছে। আমি কেবল জানি না কোথেকে শুরু করতে হবে। এটা খুবই পাগলামী ব'লে মনে হচ্ছে। আমি এমন একজন মানুষ যে কিছু ছবির জন্যে অপেক্ষা করে, কোনো শব্দ বা সংলাপের জন্যে মুখিয়ে থাকে—অথবা একটা দেয়াশলাইয়ের জন্যে—আমাকে কিছু ইঙ্গিত করবে সেজন্যে।”

“পিটারের কাছ থেকে খবর পাওয়ার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করছি না কেন? আমি তাকে আগামীকাল ফোন করবো। আমরা আগামীকালই প্যারিসে যেতে পারি।”

“কারণ তাতে কিছুই যায় আসে না। তুমি কি সেটা বুঝতে পারছো না? সে যে খবরই সংগ্রহ করুক না কেন, আমি যে জিনিস জানতে চাই সেটা তার কাছে পাবো না। ঐ একই কারণে ট্রেডস্টোন ব্যাংকের ধারে কাছেও যেবে নি। আমাকে জানতে হবে লোকজন কেন আমাকে খুন করতে চায়, কেন কার্লোস নামের একজন আমাকে খুন করার বিনিময়ে বিশাল অঙ্কের টাকা দেবে।”

এই পর্যন্তই সে বলতে পারলো, টেবিলে একটা শব্দ হতেই ছেদ পড়লো তার কথায়। মেরি হাতের কাপটা ফেলে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। ফ্যাকাশে হয়ে আছে তার মুখটা। যেনো তার মাথা থেকে সব রক্ত নেমে গেছে। “তুমি এইমাত্র কি বললে?” জানতে চাইলো সে।

“কি বলেছি? বলেছি আমাকে জানতে হবে...”

“নামটা। তুমি এইমাত্র কার্লোসের নামটা বলেছো।”

“হ্যাঁ।”

“এতো ঘণ্টা ধরে, এতো সময় ধরে আমরা কথা বলছি তুমি তো কখনও তার নাম উল্লেখ করো নি।”

বর্ন তার দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করলো। কথাটা সত্যি। সে তাকে সব বললেও কোনো না কোনোভাবে কার্লোসের নামটি বাদ দিয়ে গেছে... অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই, যেনো তথ্যটা গোপন করার জন্যেই করেছে সেটা।

“মনে হয় কথাটা বলি নি,” সে বললো। “আর এখন তো এও মনে হচ্ছে তুমি জানো কার্লোস কে?”

“তুমি কি ঠাট্টা করছো? যদি ক'রে থাকো তাহলে ঠাট্টাটা মোটেও ভালো হয় নি।”

“আমি ঠাট্টা করার চেষ্টা করছি না। আমার মনে হয় না এটা কোনো ঠাট্টার ব্যাপার। কার্লোস কে?”

“হায় ঈশ্বর—তুমি জানো না!” সে বিস্মিত হয়ে বললো, তার দিকে ভালো

ক'রে চেয়ে দেখছে এখন । “তোমার কাছ থেকে যা কেড়ে নেয়া হয়েছে এটা ভারই অংশই ।”

“কার্লোস কে?”

“একজন গুপ্তঘাতক । তাকে বলা হয় ইউরোপের গুপ্তঘাতক । এমন একজন লোক যাকে বিশ বছর ধরে খোঁজা হচ্ছে । বিশ্বাস করা হয় সে পঞ্চাশ থেকে ষাটজন রাজনীতিক আর সামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে । কেউ জানে না সে দেখতে কী রকম...তবে বলা হয় সে প্যারিসের বাইরে থেকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে ।”

বর্নের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল একটা প্রবাহ বয়ে গেলো ।

ওলেনের ট্যাক্সিটা ইংলিশ ফোর্ড, আর সেটার মালিক বোর্ডিংয়ের ওয়েটারের মেয়ের জামাইর । জেসন আর মেরি পেছনের সিটে ব'সে আছে । জানালার বাইরে অন্ধকারে ঢেকে থাকা গ্রামীণ এলাকাগুলো অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে তারা । সেলাইগুলো খোলা হয়েছে । সে জায়গায় হালকা ব্যাভেজ করা হয়েছে স্ফটপে দিয়ে ।

“কানাডায় ফিরে যাও,” খুব নরম ক'রে জেসন কথাটা বললে তাদের মধ্যে নিরবতা ভাঙলো ।

“যাবো, আমি তোমাকে বলেছি সেটা । আমার হাতে আরো কয়েকটা দিন আছে । আমি প্যারিস শহরটা দেখতে চাই ।”

“আমি চাই না তুমি প্যারিসে যাও । আমি তোমাকে অটোয়াতে ফোন করবো । তুমি ওখানে গিয়ে ট্রেডস্টোনের ব্যাপারে তন্নাশী ক'রে খবরটা আমাকে ফোনে জানাতে পারো ।”

“আমার মনে হয়, তুমি বলেছিলে এতে কিছুই যায় আসে না । তুমি জানতে চাও কেন । যতোক্ষণ না তুমি বুঝতে পারছো সব ততোক্ষণ কে এর পেছনে আছে সেটা জানা তোমার কাছে অর্থহীন ।”

“আমি একটা পথ খুঁজে নেবো । আমার কেবল দরকার একজন লোককে । তাকে আমি খুঁজে বের করবোই ।”

“কিন্তু তুমি তো জানো না কোথেকে শুরু করতে হবে । তুমি হলে এমন একজন, যে একটা ছবির জন্যে শব্দের জন্যে প্রতীক্ষায় থাকে । সেগুলো হয়তো আদতে নেই ।”

“কিছু না কিছু তো আছেই ।”

“কিছু আছে, তবে তুমি সেটা দেখছো না । আমি দেখছি । এজন্যেই আমাকে তোমার দরকার । আমি শব্দগুলো, পদ্ধতিগুলো জানি । তুমি জানো না ।”

বর্ন আবছায়ার মধ্যেই তার দিকে তাকালো। “আমার মনে হয় তুমি আরো পরিস্কার ক’রে বললে ভালো হয়।”

“ব্যাংক, জেসন। ব্যাংকের সঙ্গে ট্রেডস্টোনের একটা সংযোগ রয়েছে। তবে তুমি যেভাবে ভাবছো হয়তো সেভাবে নয়।”

কুঁজো বৃদ্ধলোকটি একটা ছেঁড়াফাঁড়া ওভারকোট পরে হাতে কালো রঙের টুপি নিয়ে আরপায়েন গ্রামের চার্চের পথ ধরে হেটে যাচ্ছে; জায়গাটা প্যারিস থেকে দশ মাইল দক্ষিণে। সন্ধ্যার ঘন্টা বেজে উঠলে লোকটা পঞ্চম সারিতে এসে ঘন্টা থামার জন্যে অপেক্ষা করলো। এটা তার সিগনাল। সে জানে কিছুক্ষণ আগে একজন তরুণ—জীবিত মানুষের মধ্যে সবচাইতে হিংস্র তার পৈশাচিক একজন—ছোট্ট চার্চটা ঘুরে দেখে গেছে, বাইরে এবং ভেতরের সবাইকে লক্ষ্য ক’রে গেছে সে। লোকটা যদি এমন কাউকে দেখতে পেতো যে তার জন্যে হুমকীস্বরূপ তবে কোনো প্রশ্ন না করেই তাকে হত্যা ক’রে ফেলতো। এটাই কার্লোসের ধরণ।

কার্লোস কোনো ঝুঁকি নেয় না। সেটা যাই হোক না কেন। একমাত্র সাবুনা হলো, যদি কোনো লোক তার কাজ করতে গিয়ে অথবা তার হাতে মারা যায় তবে বিধবার অথবা তার বাচ্চা-কাচ্চাদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পৌঁছে যাবে। বলা হয়ে থাকে : কার্লোসের জন্যে কাজ করাটা খুবই মর্যাদার একটি ব্যাপার। ঔদার্যের কোনো ঘাটতি থাকে না। এটাই তার ছোট্ট অথচ সুদৃঢ় সেনাবাহিনীকে গঠিত করতে সাহায্য করেছে। বৃদ্ধ লোকটাও সেটা বোঝে।

মেসেঞ্জার তার টুপিটা ধরে চার্চের ভেতরে হাটতে শুরু করলো আবার। বাম পাশের দেয়াল সংলগ্ন কনফেশনাল বুথগুলো আছে। পঞ্চম বুথের সামনে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। অন্যপাশে জুলতে থাকা একটা মোমবাতির আলোতে ভালো ক’রে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার চোখ এই স্বল্প আলোটা মানিয়ে নেবার জন্যে একটু সময় নিলো। ওপাশে আছে যাজক। যাজক আর পাপীর মধ্যে স্বচ্ছ একটা পর্দার আড়াল রয়েছে। সে ছোট্ট একটা কাঠের চেয়ারে ব’সে ওপাশের পবিত্র মূর্তিটার দিকে তাকালো। সব সময়ের মতো মাথায় হুড ফেলা একজন সন্ন্যাসীর বেশে ব’সে আছে অবয়বটা। লোকটা দেখতে কেমন সেটা ভাবতে চাইলো না মেসেঞ্জার। একরম ভাবটা তার মানায় না। তার অবস্থানও সেরকম নয়।

“অ্যাস্বেলাস দোমিনি” সে বললো।

“অ্যাস্বেলাস দোমিনি, ঈশ্বরের সন্তান,” হুড পরা লোকটি নিচু কণ্ঠে বললো। “আপনার দিনকাল কি ভালো যাচ্ছে?”

“আমার তো সময় শেষ। ক্রমশ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি,” বৃদ্ধলোকটি

জবাব দিলো। “তবে আরামে আছি বলা যায়।”

“ভালো। আপনার যা বয়স তাতে নিরাপত্তার জ্ঞান থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”
কার্লোস বললো। “আসল কথায় আসি। আপনি কি জুরিখ থেকে খবর পেয়েছেন?”

“পেঁচাটা মারা গেছে, সেই সাথে বাকি দু’জন। সম্ভবত তৃতীয়জনও।
আরেকজন হাতে মারাত্মকভাবে আহত পেয়েছে। সে কাজ করতে পারবে না।
কেইন উধাও হয়ে গেছে। তারা মনে করছে মেয়েটা তার সঙ্গেই রয়েছে।”

“ঘটনাগুলো অদ্ভুত এক দিকে মোড় নিয়েছে,” বললো কার্লোস।

“আরো আছে। মেয়েটাকে খুন করার অর্ডার যাকে দেয়া হয়েছে তার কোনো
খবর নেই। মেয়েটাকে গুইসান কুয়ে’তে নিয়ে যাবার কথা ছিলো তার; কেউ জানে
না কী ঘটেছে।”

“কেবল মেয়েটার বদলে ঐ ওয়াচম্যান খুন হয়েছে। সম্ভবত মেয়েটা মোটেই
কোনো জিম্মি ছিলো না। একটা টোপ ছিলো সে। সেই টোপ গিলেছে কেইন।
আমি সেটা নিয়ে ভাবতে চাই। এই ফাঁকে আমি কিছু নির্দেশনা দিচ্ছি : আপনি কি
প্রস্তুত?”

বৃদ্ধলোকটি পকেট থেকে একটা পেন্সিল আর কাগজের টুকরো বের করলো।
“বলুন।”

“জুরিখে ফোন করুন। কেইনকে দেখেছে এবং তাকে দেখে চিনতে পারবে
এমন একজন লোককে আমি আগামীকাল প্যারিসে চাই। জুরিখের গেইমেনশেফট
ব্যাঙ্কের কোয়েনিগের কাছে যান, তাকে বলবেন, তার টেপটা নিউইয়র্কে পাঠিয়ে
দিতে। সে যেনো ভিলেজ-স্টেশনের পোস্ট অফিস বক্স ব্যবহার ক’রে।”

“প্রিজ,” বৃদ্ধ লোকটি বাঁধা দিয়ে বললো। “এই বুড়োর হাত আগের মতো
অতো দ্রুত লিখতে পারে না।”

“ক্ষমা করবেন আমাকে,” কার্লোস নিচু কণ্ঠে বললো। “আমি খুব ব্যস্ত তাই
তাড়াহুড়া ক’রে ফেলেছি। দুঃখিত।”

“দুঃখিত হবেন না, একদমই না। বলে যান।”

“আমি চাই রুই মেদেলিনের ব্যাঙ্কের এক ব্লকের আশেপাশে আমাদের দলটি
কয়েকটা ঘর ভাড়া নেবে। এবার কেইন আর রক্ষা পাবে না। ভানকারী তার ভুল
অহংকারের কারণে ধ্বংস হবে। যদি না সে...অন্য কিছু হয়ে থাকে।”

অধ্যায় ১১

বার্ন বিমান বন্দরের কাস্টমস্ আর ইমিগ্রেশন পার হবার সময় জেসন দূর থেকে মেরিকে দেখতে লাগলো। এয়ার ফ্রান্সের ডিপার্চার এলাকায় আশেপাশে কেউ আছে কিনা সেই ইশারা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। বিকেল চারটা বাজে, প্যারিসের ফ্লাইটে ব্যস্ততম সময় এটা। গেট পার হবার সময় মেরি তার দিকে তাকালে সে মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। তারপর পা বাড়ালো সুইস এয়ার লাউঞ্জের দিকে। জর্জ বি. ওয়াশবার্নের জন্যে অরলির পুনে ৪টা ৩০ মিনিটে একটা রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে।

পরে তারা একটা ক্যাফেতে দেখা করবে। জায়গাটা মেরি অক্সফোর্ডে থাকার সময় থেকেই চেনে। এটাকে বলা হয় অউ কোঁয়ে দ্য ক্লানি, সরবোন থেকে কয়েক ব্লক দূরে সেন মিশেল বুলেভাদে অবস্থিত সেটা। যদি কোনো কারণে সেখানে তাকে না পায় তবে ক্লানি জাদুঘরে রাত নটা বাজে দেখা হবে তাদের।

বর্নের দেরি হবে। ইউরোপের সবচাইতে বড় লাইব্রেরিটা সরবোনে আছে। সেই লাইব্রেরিতে পুরনো সংবাদপত্র পাওয়া যায়। সরকারী কর্মচারীরা ওয়ার্কিং আওয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে না। ছাত্রছাত্রীরা সেটা রাতের বেলায় ব্যবহার করে। প্যারিসে পৌছে সেও তাই করবে। কিছু একটা তাকে জানতেই হবে।

প্রতিদিন আমি সংবাদপত্র পড়ি। তিনটি ভাষায়। ছয় মাস আগে এক লোক খুন হয়েছিলো। সেইসব পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটা ছিলো। জুরিখে মোটাসোটা লোক এ কথা বলেছিলো।

সে লাইব্রেরির চেকরুমে তার সুটকেসটা রেখে তৃতীয় তলায় চলে গেলো। সেখানে বড় একটা পড়ারঘর আছে; সল দ্য লেকচার এই ভবনেই অবস্থিত। সংবাদপত্রগুলো সারি সারি তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ছয়মাস আগের প্রথম দশ সপ্তাহের পত্রিকাগুলো তুলে নিয়ে কাছের একটা টেবিলে গিয়ে এক এক ক'রে পত্রিকাগুলো ঘাটতে শুরু করলো বর্ন।

মহান সব মানুষেরা নিজেদের বিছানায় মারা গেছে আর অন্যেরা সেই মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেছে। ডলারের মূল্যপতন হয়েছে, স্বর্ণের দাম গেছে বেড়ে। সরকার অনেকটা ধীরগতির হয়ে পড়েছে। কিন্তু গুপ্তহত্যার কোনো খবর সেখানে পাওয়া গেলো না—কোনো খবরই নেই।

জেসন আবার তাকগুলোর কাছে ফিরে গেলো। দুই সপ্তাহ, বারো সপ্তাহ, বিশ সপ্তাহ। প্রায় আট মাস ধরে কিছুই হয় নি।

তারপরই ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকলো। সে ছয় মাস আগের পত্রিকা দেখেছে, তারপরের কোনো পত্রিকা নয়। কয়েকটা দিন অথবা দু'য়েক সপ্তাহের মধ্যেও তো হতে পারে। এবার তাক থেকে চার এবং পাঁচ মাস আগের পত্রিকাগুলো তুলে নিলো সে। একে একে দেখতে লাগলো সব। পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি জুরিখের মোটা লোকটা মিথ্যে বলেছে? সবটাই মিথ্যে? সে কি এমন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছে যাতে ক'রে...

অ্যাম্বাসেডর লিল্যান্ড মার্সেই'তে নিহত!

বড়বড় অক্ষরে লেখা শিরোনামটা চোখে পড়ার মতোই। তার মাথায় চিন চিন ক'রে একটা ব্যথা শুরু হয়ে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে গেলো। লিল্যান্ড নামটাকে তার চোখ আটকে রইলো। এটা সে চেনে। লোকটার মুখ স্মরণ করতে পারলো। প্রশস্ত কপালের নিচে পুরু ক্র জোড়া। খাড়া নাক, গালের হাড় দুটো বেশ উঁচু। ধূসর গৌফের নিচে পাতলা ঠোঁট। সে চেহারাটা চেনে। লোকটাকে চেনে। আর লোকটাকে ওয়াটারফ্রন্টের জানালা থেকে শক্তিশালী একটা রাইফেলের একটি গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। অ্যাম্বাসেডর হাওয়ার্ড লিল্যান্ড মার্সেই'র ডকে সেই বিকেল পাঁচটায় হেঁটে যাচ্ছিলো। তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বর্ন দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটা পড়লো না, যাতে লেখা আছে হাওয়ার্ড লিল্যান্ড ছিলো আমেরিকান নেভির গ্র্যাডমিরাল এইচ. আর লিল্যান্ড। ওখান থেকে তাকে প্যারিসের আমেরিকান দূতাবাসের অ্যাম্বাসেডর ক'রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পদে পাঠানো হয়। লেখাটার যে জায়গায় হত্যার আসল কারণ সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে সেটাও সে পড়লো না। সে এসব জানে। লিল্যান্ডের আসল কাজ ছিলো ফরাসি সরকারকে আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধজাহাজ, মিরেজ ফাইটার প্লেনসহ যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা থেকে বিরত রাখা।

এ কাজে বেশ সফল হলেও এজন্যে মধ্যপ্রাচ্যের অনেককে ক্ষুব্ধও করেছিলো সে। ধারণা করা হচ্ছে তাকে এসব লোকই খুন ক'রে থাকতে পারে একটা শান্তি দেবার আশায়, যাতে বাকিরা সাবধান হয়ে যায়। তাকে যারা বা যে-ই খুন করেছে তাকে প্রচুর টাকা দেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনো আলামতই পাওয়া যায় নি।

জুরিখ। পা-বিহীন এক লোকের কাছে একজন মেসেঞ্জার। আরেকজন ফকেনস্ট্রাস রেস্টোরার মোটা লোকটার কাছে।

জুরিখ।

মার্সেই।

জেসন তার চোখ দুটো বন্ধ করলো। যন্ত্রটা এখন অসহ্য ঠেকছে। তাকে সমুদ্র থেকে পাঁচ মাস আগে উদ্ধার করা হয়েছিলো। ধারণা করা হয়েছিলো সে মার্সেই থেকেই এসেছে। যদি মার্সেই হয়ে থাকে তবে ওয়াটারফ্রন্ট ছিলো তার পালানোর রুট। একটা বোট ভাড়া ক'রে তাকে বিশাল ভূমধ্যসাগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সবই বেশ ভালোভাবে মিলে যাচ্ছে। যদি মার্সেই'র কোনো জানালা থেকে কাউকে সে খুন না ক'রে থাকে তবে কি ক'রে এসব জানতে পারলো?

চোখ খুললো সে, তীব্র যন্ত্রণা তার চিন্তাভাবনাকে ধীরগতির ক'রে ফেলছে। তবে সব চিন্তাভাবনাকে নয়। তার সীমিত স্মৃতিতে একটা সিদ্ধান্ত বেশ পরিষ্কার। প্যারিসে মেরি সেন জ্যাকের সাথে কোনো দেখা সাক্ষাত হবে না।

হয়তো একদিন সে তার কাছে চিঠি লিখবে। এখন যা বলতে পারছে না তা জানাবে। যদি সে বেঁচে থাকে এবং চিঠি লিখতে পারে তো। এখন সে কিছুই লিখতে পারবে না। ধন্যবাদ অথবা ভালোবাসার কোনো কথা এখন লেখা যাবে না। মেয়েটা তার জন্যে অপেক্ষা করবে কিন্তু তার কাছে সে যাবে না। তার সাথে দূরত্ব বাড়তে হবে। মেয়েটাকে কোনো ভাড়াটে খুনির সাথে জড়ানো ঠিক হবে না। মেয়েটার ধারণা ভুল। তার ধারণাই ঠিক।

হায় ঈশ্বর। সে হাওয়ার্ড লিল্যান্ডের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে। অথচ তার সামনে লোকটার কোনো ছবি নেই। প্রথম পাতার শিরোনামটাই তাকে সব কিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দিনটি বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৬। মার্সেই। এই দিনটি সে মনে রাখবে, তার এই জটিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এটা তার মনে থাকবে।

বৃহস্পতিবার, ২৬শে আগস্ট....

একটা ভুল হয়ে গেছে। সেটা কি? বৃহস্পতিবার?...বৃহস্পতি তার কাছে কোনো অর্থই বহন করে না। আগস্টের ছাব্বিশ তারিখ?...ছাব্বিশ? এটা ছাব্বিশ হতে পারে না! ছাব্বিশ তারিখটা ভুল! সে এ কথাটা বার বার শুনেছে। ওয়াশবার্নের ডায়রিতে—তার রোগীদের জার্নালে।

তোমাকে আমার এখানে নিয়ে আসা হয়েছিলো আগস্টের চব্বিশ তারিখের সোমবার সকালে। ঠিক সকাল আটটা বিশ মিনিটে। তোমার অবস্থা ছিলো খুবই...

সোমবার, চব্বিশে আগস্ট।

চব্বিশে আগস্ট।

ছাব্বিশ তারিখে সে মার্সেই'তে ছিলো না! সে কোনো লোককে ওয়াটারফ্রন্টের জানালা থেকে গুলি করতে পারে না। হাওয়ার্ড লিল্যান্ডকে সে খুন করে নি!

ছয় মাস আগে এক লোক খুন হয়েছে...তবে এটা ছয় মাস আগে নয়। এটা ছয় মাসের কাছাকাছি, একেবারে ছয় মাস নয়। সে ঐ লোকটাকে খুন করে নি। সে তখন পোর্ত নোয়ে'র মদ্যপ এক ডাক্তারের ঘরে প্রায় মৃত একজন।

কুয়াশা কাটছে। যন্ত্রণাটা তিরোহিত হচ্ছে। তার মধ্যে একরকম উচ্ছ্বাস জেঁকে বসলো। অকাটা একটা মিথ্যে খুঁজে পেয়েছে সে! এরকম একটা ঘটনা যদি মিথ্যে হয় তো অন্যগুলোও হতে পারে!

বর্ন তার হাত ঘড়ি দেখলো, সোয়া নটা বাজে। মেরি ক্যাফে থেকে চলে গেছে। সে এখন অপেক্ষা করছে ক্লানি জাদুঘরের সামনে। পত্রিকাগুলো রেখে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলো সে। তাকে এখন এমন একজনের কাছে যেতে হবে যাকে সে বলবে, এখনও আশা আছে। সে যা ভেবেছে আসলে হয়তো সে তা নয়। মেয়েটার কথাই হয়তো ঠিক।

জাদুঘরের সামনে মেরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। ঠাণ্ডাবাতাসের কারণে দু'হাত বকের কাছে রেখে কুঁকড়ে আছে সে। প্রথমে জেসনকে দেখতে পায় নি, তার চোখ সারি সারি বৃক্ষ সমৃদ্ধ রাস্তাটার দিকে। সে অস্থির হয়ে আছে। উদ্বিগ্ন আর অধৈর্য এক মেয়ে আশংকা করছে যার জন্যে অপেক্ষা করছে তাকে হস্ততো সে আর দেখতে পাবে না। এ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে আছে মেয়েটা।

দশ মিনিট আগেও এখানে আসার কথা ভাবে নি সে।

তাকে দেখতে পেলো মেরি! সঙ্গে সঙ্গে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দু'ঠোঁটে হাসির দেখা মিললো। এগিয়ে এলো তার দিকে। কাছাকাছি হলেও দু'জনের কেউই কিছুক্ষণের জন্যে কোনো কথা বললো না। সেন্ট মিশেলে তারা এখন একা।

“আমি কতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি,” দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো সে। “আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিছু হয়েছে নাকি? তুমি ঠিক আছো তো?”

“ঠিক আছি। আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি।”

“কি?”

সে তার দু'কাঁধ ধরলো। “হয় মাস আগে এক লোক খুন হয়েছিলো...মনে আছে?”

তার চোখমুখ থেকে আনন্দের ছটা হারিয়ে গেলো। “হ্যাঁ, মনে আছে।”

“আমি তাকে খুন করি নি,” জেসন বর্ন বললো। “আমি সেটা করতে পারি নি।”

জনাকীর্ণ বুলেভার্ড মঁতোপারোয়ায় একটা ছোট্ট ঘর তারা খুঁজে পেলো। লবি আর ঘরগুলো জরাজীর্ণ। তবে জায়গাটা খুব শান্ত আর কোলাহলমুক্ত।

জেসন দরজা বন্ধ করার সময় সাদা চুলের বেল ক্যান্টেনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। একটু আগে জেসন তাকে বিশ হ্রাঁ বখশিস দিলে লোকটার নির্বিকার ভাব মুহূর্তেই বদলে গদগদ হয়ে গেছে।

“সে তো তোমাকে একজন প্রাদেশিক ডিকন মনে করছে,” বললো মেরি। “আমি আশা করি তুমি খেয়াল করেছো আমি সোজা বিছানায় চলে এসছি।”

“তার নাম হার্ভে, সে আমাদের দরকারে কাজে লাগবে। সম্পদে ভাগ বসানোর কোনো উদ্দেশ্য তার নেই।” তাকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরলো সে। “আমাকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ,” বললো সে।

মেরিও তার মুখটা দু’হাতে ধরলো। “তবে আমাকে এভাবে অপেক্ষায় রেখো না আর। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি কেবল ভাবছিলাম কেউ বুঝি আমাকে দেখে চিনে ফেলবে...হয়তো ভীষণ খারাপ কিছু ঘটে গেছে তোমার।”

“তুমি ভুলে গেছো আমি দেখতে কি রকম সেটা কেউ জানে না।”

“এটাকে হিসেবের মধ্যে রেখো না, কথাটা সত্যি নয়। স্টেপডেকস্ট্রাসে চারজন আছে আর গুইসান কুয়ে’তে আছে ঐ বানচোতটা। তারা এখনও বেঁচে আছে, জেসন। তারা তোমাকে দেখেছে।”

“এটা ঠিক সত্যি নয়। তারা একজন কালো চুলের, ঘাড়ে-মাথায় ব্যান্ডেজ করা লোককে দেখেছে। যে আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে। কেবল দু’জন আমার কাছাকাছি এসেছিলো। তৃতীয় তলার ঐ লোকটা আর গুইসানের গুয়ারটা। প্রথম জন কিছু দিনের জন্যে জুরিখ ছাড়তে পারবে না। হাটতে পারবে না সে, তার হাতের অবস্থাও ভালো নয়। দ্বিতীয় জন চোখে টর্চলাইটের আলোর কারণে আমাকে ঠিক মতো দেখতে পারে নি। ধরে নাও, তারা আমাকে দেখে নি।”

মেয়েটা তাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বড় বড় ক’রে তার দিকে তাকালো। “তুমি নিশ্চিত হতে পারো না। তারা তোমাকে দেখেছে।”

তোমার চুল বদলে ফেলো...তাহলে বদলে যাবে তোমার মুখটা। পোর্ট নোয়ের ডক্টর জিওফ্রে ওয়াশবার্ন।

“আমি আবারো বলছি, তারা অন্ধকারে একজন কালো চুলের লোককে দেখেছে। চুল ডাই করার ব্যাপারে তুমি কি কিছু জানো?”

“আমি সেটা কখনও ব্যবহার করি নি।”

“তাহলে সকালে একটা দোকান থেকে কিনে আনতে হবে। এখানে ওসব ভালোই পাওয়া যাবে। যারা সোনালী চুলের তারা বেশি ফুর্তি করতে পারে, এটাই তো সবাই বলে, তাই না?”

মেরি তার মুখের দিকে ভালো ক’রে তাকালো। “আমি কল্পনা করার চেষ্টা করছি তোমাকে কি রকম দেখাবে।”

“অন্যরকম। খুব বেশি নয়, তবে সেটাই যথেষ্ট।”

“তোমার কথাই হয়তো ঠিক, আশা করি সেটাই যেনো সত্যি হয়।” জেসনের গালে চুমু খেলো সে। তার আলোচনার সূচনা এটি। “এবার আমাকে বলো কি হয়েছে? এ ব্যাপারে তুমি কি জানলে...ছয় মাস আগের ঘটনাটা?”

“এটা ছয় মাস আগের নয়, আর সেজন্যেই আমি তাকে খুন করি নি।” সে তাকে সবটাই খুলে বললো কেবল ক্ষণিকের জন্যে তাকে ছেড়ে চলে যাবার

ভাবনাটি বাদে । তাকে এটা বলার দরকারও ছিলো না । মেরি নিজেই সেটা বললো ।

“দিন তারিখটা যদি তোমার কাছে এভাবে পরিস্কার না হতো তবে তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে না, আসতে কি?”

সে মাথা নাড়লো । “সম্ভবত আসতাম না ।”

“অপেক্ষা করার সময় আমিও এটা আন্দাজ করেছিলাম । আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো তখন । তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো?”

“আমি বিশ্বাস করতে চাই না ।”

“আমিও না, তবে এটাই ঘটেছিলো ।”

তারা পাশাপাশি ব’সে আছে । মেরি বিছানায়, আর জেসন পাশেই একটা চেয়ারে । সে মেরির হাতটা ধরলো । “আমি এখনও নিশ্চিত নই, আমি ওখানে ছিলাম না...আমি লোকটাকে চিনি, তার মুখ আমি দেখেছি । তার খুন হবার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আমি মার্সেই’তে ছিলাম ।”

“কিন্তু তুমি তাকে খুন করো নি ।”

“তাহলে আমি কেন ওখানে ছিলাম? কেন লোকে মনে করে কাজটা আমি করেছি? হায় ঈশ্বর, আমি তো পাগল হয়ে যাবো!” সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো । তার চোখে যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এলো । “কিন্তু আমি পাগল নই, তাই না? কারণ, আমি ভুলে গেছি...ভুলে গেছি আমার আগের সব অতীত ।”

“সব প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে ।”

“সেটা হয়তো সম্ভব নয় । ওয়াশবার্ন বলেছিলো, এটা হলো ইটগুলোকে আবারো নতুন ক’রে সাজানোর মতো, অন্য কোনো সুড়ঙ্গ...অন্য কোনো জানালা ।” জেসন জানালার কাছে গিয়ে নিচে শহরের বাড়িগুলো দেখলো । “দৃশ্যগুলো একরকম নয় । কোথাও না কোথাও লোকজন আমাদের চেনে, আমি তাদেরকে চিনি । ওহ্ ঈশ্বর, হয়তো বউ-বাচ্চাও আছে—আমি জানি না । আমি বাতাসে ভাসছি, আর যখনই মাটিতে নেমে আসছি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শূন্য ছুড়ে ফেলা হচ্ছে আবার ।”

“আকাশে?” মেরি জানতে চাইলো ।

“হ্যাঁ ।”

“তুমি একটা প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছো,” সে বললো । প্রশ্ন নয়, যেনো এমনিতেই ।

বর্ন ঘুরে তাকালো । “আমি তোমাকে এ কথা কখনও বলি নি ।”

“অন্য এক রাতে ঘুমের মধ্যে তুমি বলেছিলো । তোমার শরীর ঘেমে মুখটা লাল হয়ে যাচ্ছিলো । তোয়ালে দিয়ে আমি তোমার মুখে দিয়েছিলাম তখন ।”

“তুমি কেন কিছু বলো নি?”

“বলেছি, অন্যভাবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কি একজন পাইলট ছিলে? অথবা আকাশে উড়তে তোমার কি অস্বস্তি লাগে। বিশেষ করে রাতের বেলায়।”

“আমি জানি না তুমি কি বলছো। তুমি আমাকে চাপাচাপি করো নি কেন?”

“আমি ভয়ে ছিলাম। তুমি তখন হিস্টিরিয়গ্গ ছিলে। এরকম কাউকে কিভাবে সামলাতে হয় আমি জানি না। আমি তোমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি, তবে আমি তোমার অচেতন অবস্থার ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। আমার মনে হয় না ডাক্তার ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে।”

“ডাক্তার? আমি প্রায় ছয় মাস একজন ডাক্তারের সাথেই ছিলাম।”

“তার সম্পর্কে তুমি আমাকে যা বলেছো তাতে আমার মনে হচ্ছে অন্য আরেকজনকে দেখানো দরকার।”

“দেখাবো না!” একটু রেগেই বললো। কিন্তু নিজের রাগের কারণটা নিজেই বুঝতে পারলো না সে।

“কেন দেখাবে না?” মেরি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। “তোমার সাহায্যের দরকার, ডার্লিং। হয়তো একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ—”

“না!” সে চিৎকার করে বললো। যেনো ঘাবড়ে গেছে। “আমি সেটা করবো না। আমি পারবো না।”

“আমাকে বলবে কি, কেন?” শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো সে।

“আমি...আমি এটা করতে পারবো না।”

“খালি বলো কেন, আর কিছু না।”

বর্ন তার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর মুখটা সরিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো জানালা দিয়ে। “কারণ আমি ভয় পাচ্ছি। কেউ মিথ্যে বলেছে। আর সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ধরো কোনো মিথ্যে বলা হয় নি, সবটাই সত্যি। তখন আমি কি করবো?”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে, তুমি খুঁজে বের করতে চাচ্ছে না?”

“ঠিক সেটা নয়!” সে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালো। তার চোখ এখনও বাইরের দিকে। “আমাকে বোঝার চেষ্টা করো,” বললো সে। “আমাকে কিছু জিনিস জানতে হবে...সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে যতোটুকু দরকার...তবে, হয়তো সবকিছু নয়। কিছু অংশ জানলেই চলবে। আমার কোনো স্মৃতি নেই। যে লোকের কোনো স্মৃতি নেই তার অস্তিত্বও নেই...অন্তত তার কাছে।” মেরির দিকে ফিরে তাকালো বর্ন।

“আমি তোমাকে যেটা বলার চেষ্টা করছি তাহলো, হয়তো এভাবেই এটা ভালো হয়ে যাবে।”

“তুমি আলামত চাও, কোনো প্রমাণ চাও না। এটাই কি তুমি বলছো?”

“আমি চাই একটা তীর এদিকে নয়তো ওদিকে নির্দেশ করা আছে, আমাদের বলবে আমি দৌড়াবো নাকি দৌড়াবো না।”

“তোমাকে বলবে। আমাদের ব্যাপারটার কি হবে?”

“সেটার জবাব তীরটার সাথেই পাওয়া যাবে। তাই না? তুমিও সেটা জানো।”

“তাহলে চলো খুঁজে বের করি,” মেরি জবাবে বললো।

“সাবধান। সত্যটা কি সেটার সাথে হয়তো খাপ খাওয়াতে পারবে না।”

“আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো। আমি আসলেই পারবো।” সে তার কাছে এসে তার মুখটা ধরলো। “আসো। এখন অনটারিও’তে পাঁচটা বাজে। পিটারকে অফিসেই পাওয়া যাবে। সে ট্রেডস্টোনের খোঁজ শুরু করতে পারবে... এখানকার অ্যাম্বাসির একজনের নামও সে দিতে পারবে, যে আমাদেরকে দরকারে সাহায্য করতে পারবে।”

“তুমি পিটারকে বলবে তুমি প্যারিসে আছো?”

“না বললেও অপারেটরের কাছ থেকে সে এটা জেনে নিতে পারবে। তবে কলটা ট্রেস ক’রে এই হোটেলের সন্ধান করা যাবে না। তাই এ নিয়ে ভাববে না। আমি সব কথাই গোপন রাখবো। আমি কয়েক দিনের জন্যে প্যারিসে এসেছি কারণ লিও’তে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা একেবারেই বিরক্তিকর লাগছে, সে এটা বিশ্বাস করবে।”

“সে কি এখানকার অ্যাম্বাসির কাউকে চিনবে?”

“পিটারের সব জায়গাতেই পরিচিত লোকজন রয়েছে। এটা তার সবচাইতে কার্যকরী তবে কম আকর্ষণীয় দিক।”

“কথা শুনে মনে হচ্ছে তার পরিচিত লোক আছে।” বর্ন তাদের দু’জনের কোটাটা হাতে তুলে নিলো। “তুমি কল করার পরই আমরা ডিনার করবো। মনে হয় আমাদের দু’জনের একটু ড্রিংক করা দরকার।”

“চলো রুই মেদেলিনের ব্যান্ডে যাই। একটা জিনিস দেখতে চাই আমি।”

“রাতের বেলায় তুমি কি দেখতে পাবে?”

“একটা টেলিফোন বুথ। আশা করি ব্যাংকের কাছেই ওরকম একটা আছে।”

“আছে। ঢোকান মুখেই আছে।”

টরন্টোয়েজ-শেল চশমা পরা লম্বা সোনালী চুলের লোকটা রুই মেদেলিনের রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত ঘড়িটা দেখলো। পেভমেন্টটা জনাকীর্ণ। পথঘাটের যানবাহনের আধিক্য একেবারে প্যারিসের মতোই। টেলিফোন বুথে ঢুকেই ফোনটা তুলে নিলো সে। ফোনটা ক্রেডল থেকে নামানো ছিলো ব’লে লাইনটা বন্ধ ছিলো। এটা অন্য কোনো ব্যবহারকারীকে বলে দিয়েছে ফোনটা খালি নেই। বুথটা দখল হবার সম্ভাবনাকে এটা কমিয়ে দিয়েছে। কাজ হয়েছে এতে।

আবারো তার ঘড়ির দিকে তাকালো সে। সময় শুরু হয়ে গেছে। মেরি আছে ব্যাক্সের ভেতরে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফোন করবে সে। তার কাছে থাকা কয়েকটা কয়েন ফোনের পাশে রেখে দিলো। তার চোখ রাস্তার ওপারে ব্যাক্সের দিকে। মেঘের কারণে রোদটা ম্রিয়মান হয়ে গেলে বুথের কাঁচে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো। মঁতাপারোয়ার হেয়ারড্রেসার তার চুল সোনালী রঙ ক'রে দিয়েছে। আয়নায় সেটা আবার দেখে সন্তুষ্ট হলো সে। মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঁকি মারতেই ফোনটা বেজে উঠলো।

“তুমি? মেরি সেন জ্যাক বললো।

“হ্যা, আমি,” বললো বর্ন।

“নাম আর অফিসের অবস্থানটি নিশ্চিত কোরো যাতে সে বুঝতে পারে তুমি একজন আমেরিকান। তুমি বলবে তুমি প্যারিসের ফোনের ব্যপারে অভ্যস্ত নও। তারপর যেটা যেটা করতে হবে করবে। আমি ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আবার ফোন করবো।”

“ঠিক আছে।”

“ও.কে...গুডলাক।”

“ধন্যবাদ।” জেসন লাইনটা কেটে দিয়ে স্মৃতি থেকে আরেকটা নাম্বার ডায়াল করলো।

“লা ব্যাক্স দ্য ভালোয়া। বর্জুঁখ।”

“আমার একটু সাহায্য লাগবে,” বর্ন বললো। “কিছুদিন আগে আমি সুইজারল্যান্ড থেকে বেশ মোটা অংকের টাকা ট্রান্সফার করেছি। আমি জানতে চাচ্ছি টাকাগুলো জমা হয়েছে কিনা।”

“এটা আমাদের ফরেন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট দেখে, স্যার। আমি আপনাকে সেখানে কানেক্ট ক'রে দিচ্ছি।”

একটা ক্লিক হবার পর আরেকটা মেয়ে বললো, “ফরেন সার্ভিস।”

জেসন তার অনুরোধটি আবারো জানালো।

“আপনার নামটা বলবেন কি?”

“এটা বলার আগে আমি ব্যাক্সের একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলাটাই বেশি পছন্দ করবো।”

“বেশ, তবে আমি আপনাকে ভাইস প্রেসিডেন্টের লাইনে সংযোগ দিয়ে দিচ্ছি।”

ভাইস প্রেসিডেন্ট মর্সিয়ে দামাকোর্তের সেক্রেটারি একটু কম সাহায্যকারী বলেই মনে হলো। ব্যাক্স অফিসারের স্ক্রিনিং প্রসেসটা চালু হয়ে গেছে, যেমনটি মেরি অনুমান করেছিলো। তাই বর্ন আরেকবার মেরির কথাগুলো ব্যবহার করলো। “আমি জুরিখ থেকে একটি ট্রান্সফারের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। ব্যানহফস্ট্রাসের

গেইমেনশেফট ব্যাংক থেকে করা হয়েছিলো। টাকার অঙ্কটা সাত সংখ্যার। মঁসিয়ে দামাকোর্ত, দয়া ক'রে একটু তাড়াতাড়ি করুন। আমার হাতে সময় কম।”

আর বেশি দেরি করাটা সেক্রেটারির পক্ষে সম্ভব হলো না। হতভম্ব ফাস্ট ভাইস প্রেসিডেন্টের কণ্ঠটা লাইলে শোনা গেলো।

“আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?”

“আপনি কি দামাকোর্ত?” জেসন জানতে চাইলো।

“আমি আঁতোয়া দামাকোর্ত বলছি। আপনি কে বলছেন?”

“বেশ! জুরিখেই আপনার নামটা আমার দেয়া উচিত ছিলো। পরের বার আমি অবশ্যই ভুল করবো না,” বর্ন বললো। তার বাচনভঙ্গীতে আমেরিকান টান।

“ক্ষমা করবেন, বুঝতে পারলাম না? আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে বেশি স্বস্তিবোধ করবেন, মঁসিয়ে?”

“হ্যা,” জবাব দিলো জেসন। “এই শালার ফোনটা নিয়ে আমি বেশ সমস্যায় পড়ে গেছি।” ঘড়ির দিকে তাকালো সে। তার হাতে দু’মিনিটেরও কম সময় আছে। “আমার নাম বর্ন, জেসন বর্ন। আট দিন আগে আমি সাড়ে চার মিলিয়ন ফ্রাঁ জুরিখের গেইমেনশেফট ব্যাংক থেকে ট্রান্সফার করেছিলাম। তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছিলো এই লেনদেনটা গোপন থাকবে।”

“সব ধরণের লেনদেনই গোপন থাকে, স্যার।”

“দারুণ। আমি জানতে চাচ্ছি, সব কি ঠিক আছে?”

“আমাকে একটু খুলে বলতে হবে,” ব্যাঙ্ক অফিসার বলতে লাগলো। “টেলিফোনে এইরকম লেনদেনের ব্যাপারে কথা বলাটা ঠিক হবে না।”

মেরি ঠিকই বলেছিলো। তার যুক্তিটা জেসনের কাছে পরিষ্কার হলো এখন।

“আমিও তাই আশা করি, তবে আমি আপনার সেক্রেটারিকে তো বলেছিই, আমার খুব তাড়া আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি প্যারিস ছাড়ছি। আমাকে সবকিছু ঠিক ক’রে যেতে হবে।”

“তাহলে আমি আপনাকে ব্যাঙ্কে আসতে বলবো, স্যার।”

“আমি জানি সেটা,” বর্ন সম্মত হয়ে বললো। কারণ মেরি যেমনটি বলেছিলো কথাবার্তা সেদিকেই যাচ্ছে। “আমি কেবল এসে সবকিছু প্রস্তুত দেখতে চাই। আপনার অফিসটা কোথায়?”

“মেইন ফ্লোরেই, মঁসিয়ে। গেটটা পেরিয়ে পেছন দিকে। মাঝখানের দরজাটা। একজন রিসেপশনিস্ট আছে ওখানে।”

“আমি কেবল আপনার সাথেই কথা বলবো, ঠিক আছে?”

“আপনি যেমনটি চান, যদিও অন্য অফিসার—”

“দেখুন মিস্টার,” কর্কশ আমেরিকানটি বললো, “আমরা সাড়ে চার মিলিয়ন ফ্রাঁ নিয়ে কথা বলছি।”

“ঠিক আছে। কেবল আমার সাথেই, মঁসিয়ে বর্ন।”

“চমৎকার,” জেসন ক্রেডলে হাত রেখে বললো। পনেরো সেকেন্ড রয়েছে তার। “দেখুন, এখন ২টা ৩৫ বাজে—” সে লিভারে দু’বার চাপ দিয়ে লাইনটায় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলো তবে বিচ্ছিন্ন করলো না।

“হ্যালো? হ্যালো?”

“এই তো আমি, মঁসিয়ে।”

“বালের ফোন! শুনুন, আমি—” সে আবারো চাপ দিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলো। এবার পরপর তিনবার। “হ্যালো? হ্যালো?”

“মঁসিয়ে, প্রিজ—আপনি যদি আপনার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতেন?”

“অপারেটর? অপারেটর?”

“মঁসিয়ে বর্ন, প্রিজ—”

“আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না!” চার সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড। “একটু দাঁড়ান। আপনাকে আমি পরে ফোন করছি।” সে ফোনটা রেখে দিলো। তিন সেকেন্ড পরে ফোনটা আবার বেজে উঠলে তুলে নিলো সে। “তার নাম দামাকোর্ট, মেইন ফ্লোরে তার অফিস, পেছনের দিকে। মাঝখানের দরজাটা।”

“ঠিক আছে,” কথাটা বলেই মেরি ফোনটা রেখে দিলো।

বর্ন আবারো ব্যাঙ্কে ফোন করলো।

“জো পারলে আভেক, মঁসিয়ে দামাকোর্ট, কোয়ানন্দ অন মা ক্যু...”

“জো রিগরেও, মঁসিয়ে।”

“মঁসিয়ে বর্ন?”

“দামাকোর্ট?”

“হ্যা—আপনার এ রকম সমস্যা হচ্ছে ব’লে আমি খুবই দুঃখিত। আপনি বলছিলেন, সময়ের ব্যাপারে?”

“ওহু, হ্যা। এখন প্রায় ২টা ৩০ বাজে। আমি ৩টার মধ্যে পৌঁছে যাবো।”

“আপনার অপেক্ষায় থাকবো আমি, মঁসিয়ে।”

জেসন ফোনটা ঝুলিয়ে রেখে বুথ থেকে বের হয়ে দ্রুত হাটতে লাগলো জনাকীর্ণ সামনের দোকানগুলোর দিকে। ঘুরে দেখলো সে। অপেক্ষা করলো। তার চোখ রাস্তার ওপারে ব্যাঙ্কের দিকে। সামনের বিশ মিনিট বলে দেবে মেরির কথা ঠিক না বেঠিক। তার কথা সত্যি হলে রুই মেদেলিনে কোনো সাইরেন বাজবে না।

হালকা পাতলা মেয়েটি, বড়সড় টুপির কারণে যার মুখের অনেকটা অংশ ঢেকে আছে, সে ব্যাংকের প্রবেশপথের পাশে পাবলিক ফোন বুথে ঢুকলো। পার্স থেকে

একটা বাস্‌ বের ক'রে মেকআপটা চেক ক'রে পার্সটা বন্ধ ক'রে বুথ থেকে আবার বের হয়ে ব্যাংকের মেইন ফ্লোরের দিকে পা বাড়ালো সে। মাঝখানের কাউন্টারে এসে একটা বল পয়েন্ট কলম তুলে নিয়ে ওখান থেকে একটা ফর্মে অর্থহীন কিছু সংখ্যা লিখতে শুরু করলো। দশ ফিট দূরে একটা ছোট্ট পিতলের দরজা। দরজার ওপাশে একটা ডেস্ক। সেখানে হিসাবরক্ষক আর কতিপয় লোক ব'সে আছে। তাদের পেছনে রয়েছে সেক্রেটারিদের ডেস্কগুলো—সব মিলিয়ে পাঁচটি—পেছনের পাঁচটি দরজার সামনে।

মাঝখানের দরজার উপরে সোনালী রঙের অক্ষরগুলোর দিকে তাকালো মেরি।

এম.এ. আর. দামাকোর্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কমতে অ্য লেতরোগা অত্‌ দিভাইসে

যেকোনো সময় এটা হবে—তার কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে। আর তার কথা ঠিক হলে তাকে জানতে হবে মঁসিয়ে এম. এ. আর. দামাকোর্ট দেখতে কেমন। ঐ লোকের কাছেই জেসন যাবে। তার কাছে যাও, কথা বলো। তবে ব্যাংকে নয়।

এটা ঘটলো। হিসেব মতোই সব হচ্ছে। দামাকোর্টের অফিসের সামনে বসা সেক্রেটারি মেয়েটা তাড়াহুড়া ক'রে নোটপ্যাড হাতে ভেতরে ঢুকলো। ত্রিশ সেকেন্ড পরে আবার বের হয়ে এসে ফোনটা তুলে নিলো সে। তিনটি নাম্বার ডায়াল করলো সে—ইন্টারকম নাম্বার—নিজের প্যাড থেকে দেখে কথা বললো।

দুই মিনিট পার হয়ে গেলো এভাবে। দামাকোর্টের অফিসের দরজা খুলে গেলে দেখা গেলো ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজে দেরি হবার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। সে মধ্যবয়সী এক লোক, কিন্তু মুখটা বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক। তবে হাটাচলা দেখে কম বয়সী ব'লে মনে হয়। তার মাথার পাতলা চুল সুন্দর ক'রে আঁচড়ানো। টাক অংশটা ঢেকে রাখা হয়েছে। তার চোখ দুটো ছোটো ছোটো। প্রচুর ভালো মদ খাওয়ার কারণে আরো ছোটো হয়ে গেছে। তবে চোখ দুটোতে কর্তৃত্বের বর্হিপ্রকাশ রয়েছে। সে তার সেক্রেটারিকে উচ্চস্বরে কী যেনো বললে মেয়েটা নিজের চেয়ারে ব'সে দ্রুত কম্পোজ করার চেষ্টা করতে লাগলো।

দামাকোর্ট তার অফিসের দরজা বন্ধ না করেই ফিরে গেলো নিজের অফিসে। রাগী বেড়ালটার খাঁচা খোলা থাকলো। পার হলো আরেক মিনিট। সেক্রেটারি বার বার তার ডান দিকে তাকাচ্ছে। কিছু একটার দিকে তাকাচ্ছে সে। যখন সে ওটা দেখতে পেলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ দুটো বন্ধ করলো।

দূরের বাম দিকের দেয়ালে একটা সবুজ বাতি আচমকা জ্বলে উঠেছে। একটা লিফট ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেলে বয়স্ক আর অভিজাত

দেখতে এক লোক বের হয়ে এলো। তার হাতে ছোট্ট একটা কালো কেস্। মেরি সেটার দিকে দিকে তাকালো। সম্ভব আর ভীতি একসঙ্গে অনুভব করছে সে। তার অনুমানই ঠিক। কালো কেস্টা থেকে একটা কনফিডেনশিয়াল ফাইল সরানো হয়েছে গার্ডরুমের ভেতর থেকেই। আর সেটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে এমন একজন লোকের মাধ্যমে যে সমালোচনা অথবা প্রলুব্ধের উর্ধে—বয়স্ক লোকটা দামাকোর্টের অফিসের দিকে পা বাড়ালো।

সেক্রেটারি তাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে দামাকোর্টের অফিসে নিয়ে গেলো তাকে। ঘরে পৌছে দিয়েই সে বের হয়ে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

মেরি এক পলকে তার হাত ঘড়িটা দেখে নিলো। আরেক টুকরো আলামত চাইছে সে। যদি এটা ঘটে, তো খুব জলদিই ঘটবে।

মেরি গেটের কাছে গিয়ে তার পার্সটা খুলে রিসেপশনিস্টের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে ফেললো। মেয়েটা ফোনে কথা বলছে। মেয়েটার কাছে দামাকোর্টের নাম বলে গেটের কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে খুব দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

“ক্ষমা করবেন, মাদাম—” রিসেপশনিস্ট ফোনে হাত চাপা দিয়ে ফরাসিতে বললো, “আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?”

মেরি আবারো নামটা বললো—এখন একজন ভদ্র ক্লায়েন্ট সে, অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে দেরি ক'রে ফেলেছে, আর ব্যস্ত কোনো কর্মচারীর জন্যে আরো দেরি হোক সেটা কোনোমতেই সে চাইছে না। “মঁসিয়ে দামাকোর্ট! আমার আশংকা আমার দেরি হয়ে গেছে। আমি তার সেক্রেটারির সাথে দেখা করবো।” বলতে বলতে সেক্রেটারির ডেস্কের দিকে এগোলো সে।

“প্লিজ মাদাম,” রিসেপশনিস্ট পেছন থেকে ডাকলো তাকে। “আমি—”

ইলেক্ট্রিক টাইপরাইটার আর মানুষের চাপা কণ্ঠস্বরের আড়ালে হারিয়ে গেলো কথাটা। মেরি হতভম্ব সেক্রেটারির দিকে এগোলো, সেও রিসেপশনিস্টের মতোই বিস্মিত।

“হ্যা? আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?”

“মঁসিয়ে দামাকোর্ট, প্লিজ।”

“উনি তো কনফারেন্সে আছেন, মাদাম। আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?”

“ওহ্ হ্যা, অবশ্যই,” নিজের পার্সটা আবারো খুলে বললো মেরি। সেক্রেটারি তার ডেস্কে টাইপ করা শিডিউলটার দিকে তাকালো। “আমি দুঃখিত, এই সময়ে তালিকায় কারো দেখা করার উল্লেখ নেই।”

“ওহ্, কী আজব দুনিয়া!” ভালোয়্যা ব্যাস্কের হতাশ ক্লায়েন্ট অবাক হয়ে বললো। “এইমাত্র খেয়াল করলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আসলে আগামীকালকে। আজকে নয়। আমি দুঃখিত।”

ঘুরে আবারো গেটের দিকে ফিরে গেলো সে। তার যা দেখার সেটা সে দেখে ফেলেছে। আলামতের শেষ অংশটা। দামাকোর্তের টেলিফোনের একটা বাতি জ্বলে উঠলো। সেক্রেটারির কাছে সেটা বাইপাস ক'রে দিয়ে বাইরে একটা কল করলো সে। জেসন বর্নের একাউন্টটার সাথে নির্দিষ্ট এবং গোপন নির্দেশ সংযুক্ত করা আছে। যা একাউন্ট হোল্ডারের কাছে প্রকাশ করা হবে না।

একটা দোকানের ছাউনীর নিচে দাঁড়িয়ে বর্ন তার হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো। ২টা ৪৯ বাজে। ব্যাক্সের সামনের টেলিফোন বুথে ফিরে আসবে মেরি। পরের কয়েক মিনিটই তাদেরকে প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবে। সম্ভবত মেয়েটা ইতিমধ্যেই সেটা জেনে গেছে।

সে দোকানটার বাম দিকের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো ব্যাক্সের দিকে চোখ রেখেই। একজন ক্লার্ক তার দিকে চেয়ে হাসলে তার মনে পড়ে গেলো সব ধরনের মনোযোগ এড়িয়ে যেতে হবে। সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে একটা সিগারেট ধরালো সে। নিজের ঘড়ির দিকে আবারো তাকালো। তিনটা বাজতে আট মিনিট বাকি।

এরপরই তাকে দেখতে পেলো সে। তাকে। তিনজন কেতাদূরন্ত পোশাক পরা লোক রুই মেদেলিনের দিকে একসঙ্গে হেটে আসছে। একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে তারা। তাদের চোখ সরাসরি সামনের দিকে। তারা তাদের সামনে ধীরেসুস্থে হাটতে থাকা লোকজনকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে আসছে। 'এক্সকিউজ মি' বলে সৌজন্যতা দেখাচ্ছে তারা, যা প্যারিসিয়ান ব'লে মনে হচ্ছে না। জেসন মাঝখানের লোকটার দিকে মনোযোগ দিলো। লোকটার নাম জোহান। এটাই সে-ই লোক।

জোহানকে ভেতরে যাবার ইশারা করা হলো। আমরা তাদের জন্যে ফিরে আসবো। একজন লম্বা আর শক্তসামর্থ্য লোক গোল্ডরিম চশমা পরে আছে। সেই লোকটা স্টেপডেকস্ট্রাসে কথা বলেছিলো। জোহান। তারা তাকে জুরিখ থেকে এখানে পাঠিয়েছে। সে জেসন বর্নকে দেখে ফেললো। আর এটাই তাকে কিছু একটা বললো : কোনো ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠলো না এবার।

তিনজন লোক প্রবেশপথের কাছে পৌঁছে গেলে জোহান এবং তার ডান পাশের লোকটা ভেতরে ঢুকে গেলো; তৃতীয় লোকটা থাকলো দরজার বাইরে।

বর্ন টেলিফোন বুথের দিকে পা বাড়ালো। তাকে আরো চার মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, তারপর তার শেষ কলটা করতে হবে আঁতোয়া দামাকোর্তকে।

সিগারেটটা বুথের বাইরে ফেলে পা দিয়ে পিষে দরজাটা খুললো সে।

"মঁসিয়ে," পেছন থেকে একজন বললো। জেসন ঘুরে তাকাতেই তার দম বন্ধ হবার জোগার। একলোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে চেনা চেনা লাগছে না।

"লো তেলিফোনে ইন লো মার্শে পা। রিগার্দেজ লা ফোর্দে।"

"মাখসি, ঝুয়ো। জো ভে ইসায়ে কোয়ান্দ মেমে।"

লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলে বর্ন ভেতরে ঢুকে পড়লো। চার মিনিট পার হয়ে গেছে। পকেট থেকে কয়েন বের ক'রে ডায়াল করলো সে।

“লা ব্যান্ক দা ভালোয়্যাঁ। বজুঁখ।”

দশ সেকেন্ড পরে দামাকোর্ট ফোনে এলো। তার কণ্ঠটা ফ্যাস্ফ্যাসে শোনাচ্ছে। “আপনি বলছেন, মঁসিয়ে বর্ন? আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন আপনি আমার অফিসে আসছেন।”

“পরিকল্পনায় একটু রদবদল হয়ে গেছে। আমি আপনাকে আগামীকাল ফোন করবো।” বুথের কাঁচ দিয়ে বর্ন দেখতে পেলো আচমকা একটা গাড়ি ব্যাংকের সামনে এসে থামলো। তৃতীয় যে লোকটা বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির ড্রাইভারকে মাথা নেড়ে ইশারা করলো সে।

“—আমি কি করতে পারি?” দামাকোর্ট জানতে চাইলো।

“কি বললেন?”

“না, মানে জানতে চাইছিলাম, আমি কি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি? আমার কাছে আপনার একাউন্টটা আছে। সব কিছু আপনার জন্যে প্রস্তুত ক'রে রাখা হয়েছে।”

আমিও সে ব্যাপারে নিশ্চিত, বর্ন ভাবলো। কৌশলটাতে কাজ হয়েছে। “দেখুন, আমাকে আজ বিকেলেই লন্ডনে যেতে হবে। আমি আগামীকাল ফিরে আসছি একটা শাটল ফ্লাইটে ক'রে। সব প্রস্তুত ক'রে রাখুন, ঠিক আছে?”

“লন্ডনে, মঁসিয়ে?”

“আমি আপনাকে আগামীকাল ফোন করবো। আমাকে অরলিতে যাবার জন্যে একটা ক্যাব খুঁজতে হবে।” ফোনটা রেখে ব্যাংকের প্রবেশপথের দিকে তাকালো সে। আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে জোহান আর তার সঙ্গী দৌড়ে ব্যাংক থেকে বাইরে চলে এলো। তারা তৃতীয় লোকটার সাথে কথা বলছে, তারপর অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে বসলো সবাই।

খুনিদের গাড়ির গন্তব্য এখন অরলি বিমানবন্দর। জেসন গাড়ির নাম্বার প্লেটটা দেখে নাম্বারগুলো মুখস্থ ক'রে রাখলো। এরপর দ্বিতীয় ফোনটা করলো সে। ব্যাংকের পে-ফোনটা যদি ব্যবহৃত না থাকে তবে রিং হতেই মেরি ফোন তুলে নেবে। তাই হলো।

“হ্যা?”

“কিছু দেখেছো?”

“অনেক। দামাকোর্ট হলো তোমার সেই লোক।”

অধ্যায় ১২

দোকানের দিকে গেলো তারা, কাউন্টার থেকে কাউন্টারে কথা বললো। মেরি অবশ্য জানালার পাশেই রইলো কিন্তু চোখ রাখলো রুই মেদেলিনের ব্যাক্সের প্রবেশদ্বারের দিকে।

“আমি তোমার জন্যে দুটো স্কার্ফ নিয়েছি,” বর্ন বললো।

“তার তো কোনো দরকার ছিলো না। এখানকার দাম অনেক বেশি।”

“এখন প্রায় চারটা বাজে। সে যদি এখন না বেরিয়ে আসে তবে অফিস আওয়ার শেষ হবার আগে বের হয়ে আসবে না।”

“হয়তো না। সে যদি কারো সাথে দেখা করতে যায়, ইতিমধ্যে সেটা সেরে ফেলেছে। তবে আমাদেরকে সেটা জানতে হবে।”

“আমার কথাটা মনে রেখো, তার বন্ধুরা এখন অরলিতে আছে। প্লেন থেকে প্লেনে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা কোনোভাবেই বলতে পারবে না আমি প্লেনে যাচ্ছি, নাকি যাচ্ছি না। কারণ তারা জানে না আমি কোন্ নামটা ব্যবহার করছি।”

“তারা জুরিখের লোকটার উপর নির্ভরশীল, কেননা সে-ই কেবল তোমাকে চেনে।”

“সে কালো চুলের খোঁড়া এক লোককে খুঁজবে, আমাকে নয়। আসো, ব্যাক্সে যাই। তুমি দামাকোর্টকে দেখিতে দিতে পারবে।”

“সেটা সম্ভব নয়,” মাথা দোলাতে দোলাতে মেরি বললো। “সিলিংয়ের ক্যামেরাগুলোর লেন্স ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের। তারা যদি টেপ চালিয়ে দেখে তো তোমাকে চিহ্নিত করতে পারবে।”

“আমাকে নয়, সোনালী চুলের চশমা পরা এক লোককে।”

“অথবা আমাকে। আমি ওখানে গেছি। রিসেপশনিস্ট অথবা সেক্রেটারি মেয়েটা আমাকে চিনতে পারবে।”

“তুমি বলছো ওখানে নিয়মিত ক্যামেরাগুলোর টেপ চেক করা হয়। আমার তাতে সন্দেহ আছে।”

“অনেক কারণেই তারা টেপটা চালিয়ে দেখতে পারে,” মেরি থেমে জেসনের হাতটা ধরলো। তার চোখ জানালার বাইরে ব্যাক্সের দিকে। “ঐ তো। ওভারকোট আর কালো ভেলভেটের কলার পরা দামাকোর্ট!”

“হাতা গোটাচ্ছে যে লোকটা?”

“হ্যাঁ।”

“ঠিক আছে। আমি তোমার সাথে হোটেল দেখা করছি।”

“সাবধানে থেকো। খুব সাবধানে।”

“কাউন্টারে স্কাফটার টাকা দিয়ে দিও।”

স্টোর থেকে বের হয়ে গেলো জেসন। দামাকোর্ত ডান দিকে মোড় নিয়ে হেলেদুলে হেটে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না কারো সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে। ব্যাংকারের পেছন পেছন চলতে লাগলো জেসন। দামাকোর্ত একটা সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে একটা পত্রিকা কিনলো। ঠিক পাশেই একটা খেলার সামগ্রীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো জেসন। তারপর আবারো ব্যাংকারকে অনুসরণ করতে শুরু করলো সে।

সামনে একটা ক্যাফে। জানালাগুলোতে কালো রঙের কাঁচ লাগালো। প্রবেশ দরজাটা ভারি কাঠের। ভেতরটা কেমন সেটা ভাবার জন্যে কল্পনা করার কোনো দরকার নেই। এটা হলো পুরুষদের ড্রিংক করার একটি জায়গা। এখানে নারীরা কেবল পুরুষ সঙ্গী নিয়েই আসতে পারে। জায়গাটা আতোয়া দামাকোর্তের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে উপযুক্ত জায়গা। জেসন দ্রুত হেটে দামাকোর্তের পাশে চলে এলো। ফোনে যে ভাষায় কথা বলেছিলো সেই ভাষা আর বাচন ভঙ্গীতে বললো সে।

“বজুঁখ মঁসিয়ে। জো...পঁয়া কুয়ে ভু...এত মঁসিয়ে দামাকোর্ত। আপনিই তো, তাই না?”

ব্যাঙ্কার থেমে গেলো। তার শীতল চোখ দুটোতে ভয় জেঁকে বসেছে। “বর্ন?” ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বললো সে।

“আপনার বন্ধুরা এখন খুবই গোলমালের মধ্যে পড়ে যাবে। আমি আশা করছি তারা এখন অরলি বিমান বন্দরটা চষে বেড়াচ্ছে। হয়তো ভাবছে আপনি তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই।”

“কি?” তার ভয়ার্ত চোখ দুটো আরো বড় হয়ে গেলো।

“আসুন ভেতরে ঢুকি,” দামাকোর্তের হাতটা শক্ত ক’রে ধরে জেসন বললো। “মনে হচ্ছে আমাদের কথা বলতে হবে।”

“আমি কিছুই জানি না! আমি কেবল একাউন্টের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করেছি। আমি এসবে জড়িত নই!”

“দুঃখিত। আমি যখন আপনার সঙ্গে প্রথমে কথা বলেছিলাম আপনি বলেছিলেন এরকম একাউন্টের বেলায় আপনারা টেলিফোনে কোনো তথ্য দেন না। আপনি যাকে চেনেন না তার সাথে এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করবেন না। কিন্তু বিশ মিনিট বাদে আপনি বললেন সব রেডি ক’রে রেখেছেন। এটা কি ঠিক হলো? ভেতরে চলুন।”

ক্যাফের ভেতরটা অনেকটা জুরিখের ড্রেই এলপেনহাসারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। পার্টিশনগুলো উঁচু উঁচু আর ভেতরের জ্বলছে ডিম লাইট।

বর্ন কর্নারের একটা বুথে গিয়ে বসলো ।

“ড্রিংক করবেন,” বললো জেসন । “এটা আপনার দরকার হবে ।”

“আপনার ধারণাই ঠিক,” ব্যাংকার শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো । “আমি হুইস্কি নেবো ।” ড্রিংক আসার আগে সংক্ষিপ্ত সময়টাতে দামাকোর্ত নার্ভাসভাবে একটা সিগারেট ধরালো । বর্নই ম্যাচ দিয়ে জ্বালিয়ে দিলো সিগারেটটা ।

“মাখসি ।” দামাকোর্ত সিগারেটে একটা টান দিয়ে এক চুমুক হুইস্কি পান করলো । “আমার সাথে আপনার কথা বলে কোনো লাভ হবে না,” বললো সে ।

“তাহলে কার সাথে বললে লাভ হবে?”

“হয়তো ব্যাংকের একজন মালিকের সাথে তবে আমি সেটা জানি না । আমি নই, সেটাই কেবল বলতে পারি ।”

“খুলে বলুন ।”

“সরকারী ব্যাংকের তুলনায় বেসরকারী ব্যাংকগুলো তার স্টক হোল্ডারদের সাথে অনেক বেশি যোগাযোগ রাখে ।”

“কি রকম?”

“এখানে অনেক বিষয়ে অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে । বিশেষ কোনো ক্লায়েন্ট কিংবা সিস্টার ব্যাংককে তালিকাভুক্ত কোম্পানির চেয়ে অনেক কম অনুসন্ধান করা হয় । গেইমেনশেফট ব্যাংক জুরিখ হলো এরকমই একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ।”

“গেইমেনশেফট থেকে এরকম ডিমান্ড করা হয়েছিলো?”

“ডিমান্ড...অনুরোধ...বলতে পারেন সেরকমই ।”

“ভালোয়ঁার মালিক কে?”

“কে? অনেকেই—এটা একটা কনসোর্টিয়াম । দশ থেকে বারোজন লোক এবং তাদের পরিবার পরিজন জড়িত এখানে ।”

“তাহলে আমি আপনার সাথেই কথা বলবো, তাই না? মানে, সারা প্যারিস চম্বে বেড়ানোটা তো আমার পক্ষে একটু বোকামীই হয়ে যাবে ।”

“আমি কেবল একজন এক্সিকিউটিভ । সামান্য কর্মচারী,” বাকি মদগুলো পান ক’রে দামাকোর্ত বললো । আরেকটা সিগারেট ধরানোর জন্যে ম্যাচ তুলে নিলো সে ।

“কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?”

“আমি আমার চাকরি হারাতে পারি, মঁসিয়ে ।”

“আপনি আপনার জীবনটাও হারাতে পারেন, মঁসিয়ে,” জেসন বললো । কথাটা খুব সহজেই তার মুখ দিয়ে বের হলো ব’লে একটু বিব্রতও হলো সে ।

“আপনি যেরকমটি ভাবছেন সে রকম কোনো কাজ আমি করি নি ।”

“আপনি নিজেকে যতোটা অজ্ঞ হিসেবে আমার কাছে তুলে ধরছেন সেটা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না,” বললো জেসন বর্ন । “আপনার মতো লোক সবখানেই আছে । আপনার মতো একজন লোক ভালোয়ঁা ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ তো

আর এমনি এমনি পাবে না। আপনি নিজেকে আড়াল করছেন। আপনি নিজের পাছা বাঁচানোর আগপর্যন্ত কোনো কিছু করেন না। এখন বলুন, কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? আপনি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। আমি কি পরিস্কার বোঝাতে পারছি?”

দামাকোর্ত ম্যাচ থেকে কাঠি বের ক’রে জেসনের দিকে তাকালো। “আমাকে কোনো হুমকী দেবার দরকার নেই আপনার। আপনি অনেক ধনী। আমাকে তাহলে এজন্যে টাকা দিচ্ছেন না কেন?” ব্যাংকার নাভাসভাবে হাসলো। “আপনি ঠিকই বলেছেন। প্যারিস তো আর জুরিখ নয়।”

বর্ন একটু পেছনে হেলে ব’সে চোখের চশমাটা খুলে ফেললো। “একটা নায্য দাম বলুন,” অবশেষে বললো সে, “আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করবো।”

“মূল্যটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম। সারা বিশ্বের ব্যাংকাররাই তাদের ক্লায়েন্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকে। আমি আপনাকে একজন ক্লায়েন্ট হিসেবেই দেখতে চাই।”

“আমিও নিশ্চিত আপনি তা করবেন,” বর্ন হেসে লোকটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। “তাহলে আমরা ঘুম থেকে সরে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় স্থানান্তরিত হলাম।”

দামাকোর্ত কাঁধ ঝাঁকালো। “আমি আপনার কথাটা মেনে নিচ্ছি। আপনি কি প্রশ্নটা আবার করবেন?”

“কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?”

“জুরিখ থেকে আমাদের ব্যাংকে কোনো তহবিল ট্রান্সফার করলে সেটা উনে ফিশে কনফিডেনতেইল—”

“উনে ফিশে?” জেসন বললো। গেইমেনশেফট ব্যাংকে এপফেলের অফিসের কথা মনে পড়ে গেলো তার। “কথাটা আগেও আমি শুনেছি। সেটা কি?”

“এটা আসলে পুরনো একটা শব্দ। এসেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ঐ সময় ব্যাংকিং হাউজগুলোতে এর চর্চা হতো।”

“ধন্যবাদ আপনাকে। এবার বলুন, এর বিশেষত্ব কি?”

“একাউন্টটার ব্যাপারে যখন কোনো প্রশ্ন তোলা হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন সিল করা তথ্যগুলো খোলা হয়।”

“প্রশ্ন তোলা?”

“তহবিল সরানো অথবা জমা করা।”

“ধরণে আমি একজন টেলারের কাছে গেছি, একটা ব্যাংক বই উপস্থিত ক’রে টাকা চাইলাম?”

“ট্রানজাকশান কম্পিউটারে একটা ডাবল তারকা চিহ্ন ভেসে উঠবে। আপনাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে আমার কাছে।”

“যেভাবেই হোক আমাকে আপনার কাছে পাঠানো হবে। অপারেটর আমাকে আপনারই নাম্বার দিয়েছিলো।”

“ফরেন সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে আরো দু’জন অফিসার আছে। যেকোনো একজনের সাথে আপনাকে যদি সংযোগ দেয়া হয় ফিশেটা ডিটেক্ট করতে যে, আপনাকে আমার কাছে পাঠানো হবে। আমি একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।”

“বুঝেছি,” কিন্তু বর্ন আসলে বোঝে নি। এই ব্যাপারটায় একটা ফাঁক রয়েছে। সেটা পূরণ করা দরকার। “দাঁড়ান। আপনার অফিসে কোনো একাউন্ট পাঠানো হলে আপনি ফিশের ব্যাপারে কিছু জানেন না।”

“আমি কেন সেটা জিজ্ঞেস করবো?” দামাকোর্ট একটা প্রশ্ন হবে অনুমান ক’রে বললো। “একটু যৌক্তিক হোন, মঁসিয়ে। নিজেকে আমার জায়গায় ভাবুন। এক লোক ফোন ক’রে নিজের পরিচয় দিলো, তারপর সে বললো চার মিলিয়ন ফ্রাঁ’র ব্যাপারে কথা বলবে। চার মিলিয়ন। আপনি কি উদ্বিগ্ন হবেন না? এখানে সেখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটাবেন?”

ব্যাক্সারের দিকে তাকিয়ে জেসন বুঝতে পারলো যে কথটা সে বলেছে সেটা কোনো চমকে দেয়ার মতো কথা নয়। “নির্দেশগুলো কি ছিলো?”

“তালিকাভুক্ত নয় এমন একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে ফোন করা হয়েছে, সব তথ্য রিলে করা হয়েছে।”

“আপনার কি নাম্বারটা মনে আছে?”

“এরকম স্মৃতিশক্তি আমার নেই।”

“আমি বাজি ধরে বলবো আপনি মনে রেখেছেন। সেটা কি, বলুন?”

“আমার নিজেকে রক্ষা করতে হবে, মঁসিয়ে।”

“তার মানে আপনার কাছে জবাবটা আছে। সেটা আমি কিভাবে পেতে পারি।”

“এই জুরিখে, কেবল ব্যানহফস্ট্রাস ব্যাংকেরই নয়, সুইজারল্যান্ডের সবচাইতে কঠিন আইনটি ভাঙার জন্যে আপনাকে অনেক টাকা দিতে হবে।”

“লোকটা কে, সেটা আমি জানি,” বর্ন বললো, কোয়েনিগের মুখটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। “সে ইতিমধ্যেই এই অপরাধটি করেছে।”

“গেইমেনশেফটে? আপনি ঠাট্টা করছেন?”

“মোটোও না। তার নাম কোয়েনিগ, তৃতীয় তলায় তার ডেস্ক।”

“আমার সেটা মনে থাকবে।”

“আমি নিশ্চিত তা থাকবে। নাম্বারটা?”

দামাকোর্ট তাকে সেটা দিলে জেসন পেপার ন্যাপকিনে নাম্বারটা লিখে রাখলো। “আমি কি ক’রে জানবো এটা সঠিক?”

“আপনার কাছে সেটার যথার্থ একটা ইস্যুরেঙ্গ আছে। আমাকে এখনও এর জন্যে কোনো টাকা দেন নি আপনি।”

“বেশ ।”

“যতোক্ষণ না আমাদের আলোচনায় টাকার ব্যাপারটা প্রধান আর মুখ্য বিষয় থাকবে, ততোক্ষণ আমি বলবো এটা হলো দ্বিতীয় টেলিফোন নাম্বার । প্রথমটা বাতিল করা হয়েছে ।”

“খুলে বলুন ।”

দামাকোর্ত সামনের দিকে ঝুঁকে এলো । “অরিজিনাল ফিশের একটা ফটোকপি একাউন্ট-কুরিয়ারের সাথে আসে । সেটা কালো রঙের একটা কেসে সিল মারা থাকে । সেই রেকর্ড সিনিয়র কিপারের কাছে গেলে তিনি স্বাক্ষর দিয়ে সেটা ছেড়ে দেন । ভেতরের কার্ডটা গেইমেনশেফট ব্যাংকের একজন অংশীদার কর্তৃক অনুমোদন করা থাকে । সুইস নোটারি কর্তৃক সাধারণ কাউন্টার সাইন করা হয় । নির্দেশগুলো খুব সহজ সরল । খুবই পরিষ্কার । সব কিছুই জেসন সি. বর্নের একাউন্ট সংশ্লিষ্ট । যুক্তরাষ্ট্রে একটা ট্রান্স আটলান্টিক কল করা হবে সঙ্গে সঙ্গে, সব কিছু রিলে করা হবে...এখানে কার্ডটা বদলে ফেলে নিউইয়র্কে নাম্বারটা মুছে ফেলা হবে । প্যারিসের একটা নাম্বার ঢুকিয়ে দিয়ে ইনিশিয়াল দেয়া হবে ।”

“নিউইয়র্ক?” বর্ন বাঁধা দিয়ে বললো । “আপনি কিভাবে জানলেন এটা নিউইয়র্কের?”

“টেলিফোনের এরিয়া কোডটা সংযুক্ত করা থাকে নাম্বারটার ঠিক আগেই । সেটা খোলা হয় না । অক্ষতই থাকে । এরিয়া কোডটা হলো ২১২ । ফরেন সার্ভিসের একজন প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে এরকম কল প্রতিদিন করতে হয় ।”

“বদলে ফেলাটা খুবই সহজ দেখছি ।”

“সম্ভবত । সেটা খুব দ্রুত করা হতে পারে । অথবা পুরোপুরি না বুঝেই । অন্যথায়, পুণরায় নোটারি করা ছাড়া নির্দেশগুলো মুছে ফেলার কোনো সুযোগ নেই । নিউইয়র্কের ফোনগুলোর নাম্বারের জন্যে একটা ছোট্ট ঝুঁকি নিতে হয় । যেভাবেই হোক, এরফলে আমার এক বা একাধিক প্রশ্ন করার অধিকার জন্মে যায় । যে কোনো ধরনের পরিবর্তন একজন ব্যাংকারের কাছে সবচাইতে অপছন্দের বিষয় ।” দামাকোর্ত তার বাকি মদটুকু খেয়ে ফেললো ।

“আরেকটু নেবেন?” জানতে চাইলো জেসন ।

“না, ধন্যবাদ আপনাকে । এতে ক’রে আমাদের আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে ।”

“আপনিই হলেন সেই ব্যক্তি যে এটা দ্রুত শেষ করতে পারে ।”

“আমি ভাবছি, মঁসিয়ে । আমি শুরু করার আগে আপনার মনে হয়তো অস্পষ্ট কোনো সংখ্যা উঁকি দিচ্ছে ।”

“এটা হতে পারে পাঁচ,” বললো বর্ন ।

“পাঁচ কি?”

“পাঁচ অঙ্কের।”

“আমি বলছি। এক মহিলার সাথে কথা বলেছি আমি—”

“একজন মহিলা? আপনি কিভাবে শুরু করলেন?”

“সত্যি সত্যি বলছি। আমি ভালোয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাকে জুরিখের গেইমেনশেফটের নির্দেশ অনুসরণ করতে হয়। এখানে আর কি বলার আছে?”

“বলে যান।”

“আমি বলেছি আমার সাথে জেসন বর্ন নামের একজন লোক যোগাযোগ করেছে। মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলো কয় দিন আগে, জবাবে আমি বললাম কয়েক মিনিট আগে। তারপর মহিলা আমাদের কথাবার্তা জানার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তখনই আমি আমার উদ্বেগের কথাটা তাকে বললাম। ফিশে’তে নির্দিষ্ট ক’রে বলা ছিলো প্যারিসে নয়, নিউইয়র্কে ফোন করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই মহিলা বললো এটাতে আমার উদ্বেগের কিছু নেই। আর পরিবর্তনটা আমার স্বাক্ষরে অথোরাইজ করা হবে। আমি জুরিখকে এটা জানানোর তাগিদ অনুভব করলাম যে, ভালোয়ার একজন অফিসার গেইমেনশেফটের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছে।”

“রাখেন, রাখেন,” জেসন বাঁধা দিয়ে বললো। “মহিলাটি কে?”

“সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।”

“তার মানে আপনি তার সঙ্গে এতো কথা বললেন আর সে আপনাকে তার নামটা পর্যন্ত বলে নি? আপনিও জিজ্ঞেস করেন নি?”

“এটাই তো ফিশের নিয়ম। যদি কোনো নাম বলা হয় তো ভালো। কিন্তু না বলা হলে সেটা জানতে চাওয়া হয় না। কেউ সেটা করবেও না।”

“টেলিফোন নাম্বারটা চাইতে কিন্তু আপনি ইতস্তত করেন নি।”

“আমি তথ্য চেয়েছি। আপনি সাড়ে চার মিলিয়ন ফ্রাঁ ট্রান্সফার করেছেন, বিপুল পরিমাণের টাকা। বিশেষ ক’রে ক্লায়েন্ট যদি উদ্বিগ্নতার সাথে কথা বলে তখন একটু খোঁজ নিতেই হয়। আবার কোনো তথ্য থাকলেও একটু সতর্ক হতে হয়। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, মহিলা ঐ রকমই কিছু বলেছে।”

“কি বলেছে?”

“আপনাকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।”

“কোন দিক থেকে?”

“স্পষ্ট ক’রে কিছু বলে নি। তবে আমি জানতে চেয়েছিলাম এ ব্যাপারে সুরেত কেন জড়িত নয়। মহিলার জবাবটা ছিলো একেবারেই কৌতূহলোদ্দীপক। ‘সুরেত আর ইন্টারপোলের চেয়েও বড় কিছু জড়িত আছে এ ঘটনায়,’ মহিলা বলেছে।

“এতে আপনি কি বুঝলেন?”

“যেকোনো বিচারেই এটি একটি জটিল ব্যাপার। তবে আপনার সাথে কথা বলে আমি অন্য কিছু বুঝতে পারছি।”

“সেটা কি?”

“সেটা হলো, আপনি আমাকে আসলেই বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দেবেন, এজন্যে আমি অসম্ভব সাবধান থাকবো। আপনাকে যারা খুঁজছে তারা সুরেত আর ইন্টারপোলার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।”

“এ বিষয়ে আমরা পরে কথা বলবো। আপনি সেই মহিলাকে বলেছিলেন, আমি আপনার অফিসে আসছি?”

“বলেছি পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনি আসছেন। মহিলা আমাকে বললো টেলিফোনে আরো কিছুক্ষণ আপনার সাথে কথা চালিয়ে যেতে। তারপর মহিলা আরেকটা ফোন ক’রে ফিরে এসে তার চূড়ান্ত নির্দেশগুলো জানালো। আপনাকে যেনো আমার অফিসে আঁটকে রাখা হয়, যতোক্ষণ না আমার সেক্রেটারির কাছে একজন লোক এসে জুরিখের ব্যাপারে তদন্ত করে। আর আপনি যখন চলে যাবেন, তখন আপনাকে ইশারা অথবা ইঙ্গিতের সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়। এতে যেনো কোনো ভুল না হয়। অবশ্যই লোকটা এসেছিলো, তবে আপনি আর এলেন না। তারা অপেক্ষা করলো। কিন্তু আপনি যখন ফোন ক’রে আমাকে জানানলেন আপনি লন্ডনে যাচ্ছেন, আমি আমার অফিস থেকে বের হয়ে লোকটাকে এ কথা বললাম। বাকিটা তো আপনি জানেনই।”

“আপনার মনে কি এ প্রশ্ন জাগে নি যে, তারা আমাকে চেনে না?”

“ব্যাপারটা খুব বেশি অদ্ভুত নয়। ফিশে মানে হলো ফোনকল, মুখ দেখাদেখির ব্যাপার নেই তাতে—কিন্তু সরাসরি জড়িত হলে অবশ্য অন্য কথা। আমিও মহিলাকে তাই বলেছি।”

“মহিলা আপনাকে কি বললো?”

দামাকোর্ট গলাটা পরিষ্কার ক’রে নিলো। “মহিলা এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলো যে, সে যাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করে তারা আমার এই সহযোগীতার কথাটা মনে রাখবে। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, আমি কোনো কিছুই অস্বীকার করছি না...বোঝাই যাচ্ছে, তারা জানে না আপনি দেখতে কি রকম।”

“ব্যাংকের এক লোক আমাকে জুরিখে দেখেছে।”

“তাহলে তার সহযোগীরা তার দৃষ্টিশক্তির উপরে আস্থা রাখে না।”

“আপনি এটা কেন বললেন?”

“একদম নিজস্ব বিবেচনা থেকে বলছি, মঁসিয়ে। মহিলা খুবই দৃঢ় প্রতীজ ছিলো। আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন। আমি তীব্রভাবে যেকোনো ধরণের গোপন কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে আপত্তি জানিয়েছি। এটা তো ফিশের চরিত্র নয়। মহিলা বলেছিলো আপনার কোনো ছবি নেই। অবশ্যই সেটা ডাহা মিথ্যে কথা।”

“তাই কি?”

“স্বাভাবিকভাবেই। সব পাসপোর্টেই তো ছবি থাকে। এমন কোনো ইমিগ্রেশন অফিসার আছে যাকে কেনা যায় না? পাসপোর্ট কন্ট্রোল রুমে দশ সেকেন্ডেই একটা

ছবি থেকে আরেকটা ছবি বানিয়ে নেয়া যায়। না, তারা সেটা করে নি। বিশাল একটা ভুল করেছে তারা।”

“আমারও তাই মনে হয়।”

“আর আপনি,” দামাকোর্ট বলতে লাগলো। “আমাকে অন্য কিছু বলুন। হ্যাঁ, এরজন্যে আপনাকে আসলেই বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হবে।”

“এইমাত্র আপনাকে আমি কি বললাম?”

“বললেন যে, আপনার পাসপোর্ট আপনাকে জেসন বর্ন হিসেবে চিহ্নিত করে না। আপনি কে, মঁসিয়ে?”

জেসন প্রথমে কিছু বললো না। সে তার চশমাটা আবারো ঠিক ক’রে নিলো। “এমন একজন যে আপনাকে প্রচুর টাকা দেবে,” বললো সে।

“এটাই যথেষ্ট। আপনি কেবল বর্ন নামের একজন ক্লায়েন্ট। আর আমি খুব সতর্ক থাকবো।”

“নিউইয়র্কের টেলিফোন নাম্বারটা আমি চাই। সেটা কি আপনি দিতে পারবেন? মোটা অঙ্কের টাকা দেবো।”

“যদি পারতাম তো দিতাম। তবে আমি কোনো উপায়ই দেখছি না।”

“সেটা ফিশে কার্ডটাতে তোলা আছে।”

“যখন বলেছি সেটা মুছে ফেলা হয়েছে, তার মানে এটা বোঝাচ্ছি না যে, ওটা এখনও আছে। ওটা মুছে ফেলা হয়েছে, মঁসিয়ে।”

“তাহলে সেটা জুরিখের কারো কাছে আছে।”

“অথবা সেটা ধ্বংস ক’রে ফেলা হয়েছে।”

“শেষ প্রশ্ন,” জেসন বললো। চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো সে। “এটা আপনাকে নিয়ে। কেবল এভাবেই আপনি টাকাগুলো পাবেন।”

“প্রশ্নটা করুন।”

“আমি যদি আপনাকে কোনো ফোন না ক’রে কোনো কিছু না বলে ভালোয়্যা’তে গিয়ে হাজির হই, তাহলে কি আপনি আরেকটা কল করবেন?”

“হ্যাঁ। ফিশে’কে কেউ অসম্মান করতে পারে না। এটা এসেছে শক্তিশালী বোর্ড রুম থেকে। অন্যথা করলেই চাকরি চলে যাবে।”

“তাহলে আপনি টাকাগুলো পাবেন কি ক’রে?”

দামাকোর্ট ঠোঁট কামড়ালো। “একটা উপায় আছে। এ্যাবসেনসিয়ার সাহায্যে টাকা তোলা। ফরম পূরণ করা হবে, নির্দেশনাগুলো আসবে চিঠিতে, একটা শক্তিশালী অ্যাটর্নি ফার্ম কর্তৃক আইডেন্টিফিকেশন নিশ্চিত করা হবে। তাহলে আমি আর নাক গলাবো না।”

“যদিও আপনি তখনও কল করতে পারবেন।”

“এটা সময়ের ব্যাপার। এমন একজন অ্যাটর্নি যার সাথে ভালোয়্যা অসংখ্য কাজ করেছে সে আমাদের ফোন ক’রে প্রস্তত করতে বললে আমি সেটা করবো। তাকে বলতে হবে সে পূর্ণাঙ্গ ফরম পাঠাবে, চেকটাসহ, তাহলে সেটা হবে ‘বিয়ারার’, বেশি ট্যাক্সের এই যুগে এটা খুব বেশি অপ্রচলিত নয়। খুবই ব্যস্ততম সময়ে একজন মেসেঞ্জার চিঠিটা নিয়ে আসবে আর আমার সেক্রেটারি—খুবই বিশ্বস্ত একজন কর্মচারী—কাউন্টার সিগনেচার আর আমার ইনিশিয়ালের জন্যে চিঠিটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।”

“তাতে কোনো সন্দেহ নেই,” বর্ন বললো, “অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে আপনি সেটা সাইন ক’রে দেবেন।”

“ঠিক। তারপর আমিও একটা কল করবো, হয়তো মেসেঞ্জারকে তার বৃফকেসটাসহ চলে যেতে দেখার পরই।”

“আপনি তা করবেন না, কোনোভাবেই না। প্যারিসের কোনো ল-ফার্মের কথা কি মনে আছে আপনার? অথবা কোনো অ্যাটর্নির?”

“সত্যি বলতে কি, এইমাত্র একজনের নাম আমার মনে পড়েছে।”

“সে কতো টাকা নেবে?”

“দশ হাজার ফ্রাঁ।”

“এটা তো খুবই ব্যয়বহুল।”

“মোটাই না। সে একজন জজ ছিলো, বেঞ্চ বসতো। সম্মানিত মানুষ।”

“আর আপনার ব্যাপারটা কি হবে, আসুন, এটাও ঠিক ক’রে ফেলি।”

“যেমনটি বলেছি, আমি খুব বোধজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। সিদ্ধান্তটা আপনার। যেহেতু আপনি উল্লেখ করেছেন পাঁচ অঙ্কের কথা, তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী আমি পনেরো হাজার ফ্রাঁ চাইবো।”

“এটা তো অনেক বেশি!”

“আপনি যা করেছেন সেটার চেয়ে বেশি নয়, মঁসিয়ে বর্ন।”

“উনে ফিশে কনফিডেনশেইল,” জানালার পাশে ব’সে মেরি বললো। “তাহলে, এভাবেই তারা কাজটা করেছে, এই পদ্ধতিটাই তারা ব্যবহার করেছে।”

“আমি তোমাকে আরেকটু ইম্প্রেস করতে পারি—আমি জানি এটা কোথেকে এসেছে।” ব্যুরো থেকে একটা মদের বোতল নিয়ে এসে জেসন বিছানার পাশে বসে ঢাললো। “তুমি কি শুনতে চাও?”

“আমার শুনতে হবে না,” জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে জবাব দিলো। “আমি জানি ঠিক কোথেকে সেটা এসেছে, আর তার অর্থ কি। এটা খুবই আশংকার কথা।”

“কেন? আমি ভেবেছিলাম তুমি এরকম কিছুই প্রত্যাশা করছো।”

“হ্যা, ফলাফলগুলোর ব্যাপারে, কিন্তু মেকানিজমটা নয়। ফিশে হলো আইন-কানুনের উপর একটি পুরনো ক্ষত। প্রায় সব মহাদেশীয় ব্যাংকেই এটা সীমিত আকারে করা হয়। আমেরিকান, কানাডিয়ান এবং ইউ.কে আইন এটাকে ব্যবহার করতে নিষেধ করে।”

বর্নের মনে পড়ে গেলো দামাকোর্ডের কথাটা। সে কথাটা বললো, “এটার উৎস শক্তিশালী বোর্ডরুম—এটাই সে বলেছিলো।”

“সে ঠিকই বলেছে।” মেরি তার দিকে ফিরলো। “তুমি কি বুঝতে পারছো না? আমি জানতাম তোমার একাউন্টের সাথে ঐ ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দেয়া আছে। আমার ধারণা কাউকে ঘুষ দেয়া হয়েছে তথ্যগুলো দেবার জন্যে। এটা এমন কোনো অভাবনীয় ঘটনা নয়। তবে এটা খুবই ভিন্ন। জুরিখের এই একাউন্টটা প্রতিষ্ঠিত—একেবারে গুরু থেকেই এর কর্মকাণ্ডের সাথে ফিশে একটা অংশ। তোমার নিজের জ্ঞান থেকেই এটা বোঝা যায়।”

“ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান,” জেসন বললো।

“হ্যা। ব্যাংকের মালিকেরা ট্রেডস্টোনের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে। তোমার একসিসের স্বাধীনতা বিবেচনা ক’রে বলা যায় এটা সম্ভব যে তারা যা করেছে সে ব্যাপারে তুমি অবগত।”

“তবে কাউকে ঘুষ দেয়া হয়েছে। কোয়েনিং একটা ফোন নাম্বার থেকে আরেকটা নাম্বার স্থানান্তর করেছে।”

“তাকে বেশ ভালো টাকা দেয়া হয়েছে, এটা আমি তোমাকে বলতে পারি। সে সুইস জেলখানায় দশ বছর জেল খাটতে পারে।”

“দশ? এটা বাড়াবাড়ি রকমের।”

“যেমনটি সুইস আইন কানুন।”

“কলোস,” বর্ন বললো। “কলোস...কেন? আমি তার কি করেছি? আমি এটা নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করছি। নামটা আমি বার বার বলছি। কিছুই পাচ্ছি না...আমি জানি না।”

“কিন্তু কিছু একটা তো আছেই, তাই না?” মেরি সামনে এসে বসলো। “সেটা কি, জেসন? তুমি কি ভাবছো?”

“আমি ভাবছি না...আমি কিছু জানি না।”

“তাহলে তুমি অনুভব করছো। কিছু একটা। সেটা কি?”

“আমি জানি না। হয়তো ভয়...রাগ। আমি জানি না।”

“মনোযোগ দাও!”

“ধ্যাত্তারিকা, তুমি কি মনে করো আমি মনোযোগী নই? মনে করো আমার মনোযোগ নেই? তোমার কি কোনো ধারণা আছে সেটা কি রকম?” বর্ন তার নিজের এই রাগের জন্যে নিজেই বিব্রত বোধ করলো। “দুঃখিত।”

“দুগ্ধখিত হয়ো না। এগুলো হলো ইঙ্গিত, কু, যা তুমি খুঁজছো—আমাদেরকে সেটা খুঁজতে হবে। তোমার পোর্ট নোয়ের ডাক্তার বন্ধুই ঠিক বলেছে, তোমার মনে গুগুলো আসবে। অন্য কিছু দ্বারা উত্তেজিত হবে। যেমনটি তুমি নিজে বলেছো, একটা দেয়াশলাই, একটা মুখ, কোনো রেস্টোরার সামনের অংশ। আমরা এটা ঘটতে দেখেছি। এখন এটা একটা নাম। এমন একটা নাম যা তুমি আমার কাছে এক সপ্তাহের মতো গোপন রেখেছিলে। তোমার বলা উচিত ছিলো তবে তুমি তা করো নি। এটা কি তোমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে? এটা তোমার ভেতরে কোনো কিছু উস্কে দেয়, তারা বের হয়ে আসতে চায়।”

“আমি জানি।” জেসন মদ পান করলো।

“ডার্লিং, সেন-জার্মেইন বলেভার্চে একটা বিখ্যাত বইয়ের দোকান আছে, তারা একটা ম্যাগাজিন বের করে। পুরো একটা ফ্লোর হাজার হাজার পুরনো পত্রিকায় ঠাসা। তারা এমনকি বিষয় অনুযায়ী ক্যাটাগরিও ক’রে থাকে, লাইব্রেরিয়ানের মতো ইনডেক্স তৈরি ক’রে রাখে। কার্লোস সেই ইনডেক্সে আছে কিনা সেটা আমি খুঁজে দেখতে চাই। তুমি কি সেটা করবে?”

বর্ন তার বৃকে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করলো, এই ব্যথাটার সাথে ক্ষতস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ভয় থেকে উৎসারিত। মেরি সেটা দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলো। কিন্তু সে নিজে অনুভব করছে অথচ বুঝতে পারছে না। “সরবোনে পুরনো পত্রিকার সংগ্রহ আছে।” সে বললো তার দিকে চেয়ে। “তাদের একটা আমাকে যারপরনাই খুশিতে ফেলে দিয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্যে। যতক্ষণ না আমি এটা নিয়ে ভেবেছি।”

“একটা মিথ্যে উন্মোচিত হয়েছিলো। সেটাই আসল কথা।”

“কিন্তু আমরা এখন কোনো মিথ্যে খুঁজছি না। তাই না?”

“এবার আমরা সত্য খুঁজছি। ভয় পেয়ো না, ডার্লিং। আমি তো পাচ্ছি না।”

জেসন উঠে দাঁড়ালো। “ঠিক আছে। সেন জার্মেইনে যাচ্ছি। এই ফাঁকে অ্যাডমিসির লোকটাকে ফোন করো।” বর্ন পকেট থেকে পেপার ন্যাপকিনটা বের করলো যাতে ফোন নাম্বার লেখা আছে। রুই মেদেলিনের ব্যাংকের সামনে থেকে যে গাড়িটার নাম্বার টুকে নিয়েছিলো সেটাও লেখা আছে এখানে। “এই যে দামাকোর্ট আমাকে নাম্বারটা দিয়েছে। গাড়ির প্লেট নাম্বারটাও আছে। দ্যাখো, সে কি করতে পারে।”

“ঠিক আছে।” মেরি ন্যাপকিনটা নিয়ে ফোনের কাছে চলে গেলো। ফোনের পাশেই ছোট্ট একটা নোটবুক রাখা আছে। সে পাতা ওল্টালো, “এই যে। তার নাম ডেনিশ করবেলিয়া। পিটার বলেছে সে তাকে দুপুরের মধ্যে ফোন করবে।”

“পিটার তাকে চেনে, তাই না?”

“তারা টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে এক সঙ্গে পড়েছে। আমি তাকে এখন থেকে ফোন করতে পারি, পারি না?”

“অবশ্যই। তবে তাকে বোলো না তুমি কোথায় আছো!”

“পিটারকে যা বলেছি ঠিক তাই বলবো তাকে। আমি এক হোটেল থেকে আরেক হোটলে যাচ্ছি। আমার নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নেই।” সে মতে এভেনুতে অবস্থিত কানাডিয় অ্যাম্বাসিতে ফোন করলে পনেরো সেকেন্ড পরে অ্যাটাশি ডেনিশ করবেলিয়া ফোনটা ধরলো।

“পিটার তোমাকে বলেছিলো আমার কিছু সাহায্যের দরকার,” প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেরি প্রসঙ্গে চলে এলো।

“তারচেয়েও বেশি,” করবেলিয়া জবাব দিলো। “সে বলেছে তুমি জুরিখে আছো। আমি বলছি না সে যা বলেছে তার সবটাই আমি বুঝেছি, তবে একটা ধারণা পেয়েছি। মনে হচ্ছে আজকাল অর্থনৈতিক দুনিয়ায় অনেক চালাকি চলছে।”

“তারচেয়েও বেশি। সমস্যাটা হলো কেউ বলতে চাচ্ছে না কে কার সাথে চালাকিটা করছে। এটাই হলো আমার সমস্যা।”

“আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?”

“আমার কাছে একটা লাইসেন্স আর টেলিফোন নাম্বার আছে। দুটোই প্যারিসের। ফোন নাম্বারটা তালিকাভুক্ত। আমি যদি ফোন করি তবে সেটা খুব অস্বস্তিকর হতে পারে।”

“সেগুলো আমাকে দাও।” মেরি তাই করলো। “আ মারি আসকুয়ে আদ মারি,” করবেলিয়া বললো। তাদের দেশে জাতীয় মোটোটা আওড়ালো সে। “দেখি কি করতে পারি। আগামীকালকে আমার সাথে লাঞ্চ করো তাহলে? খবরগুলো তখনই জানাবো।”

“আমিও সেটা চেয়েছিলাম, কিন্তু আগামীকালকে না। আমি আমার এক পুরনো বন্ধুর সাথে সময় কাটাচ্ছি। অন্য একদিন হবে।”

“পিটার বলেছে আমি যদি চাপাচাপি না করি তবে আমি একটা গর্দভ। সে বলেছে তুমি একজন অসাধারণ মহিলা।”

“সে খুব ভালো, তোমার মতোই। আমি তোমাকে আগামীকাল বিকেলে ফোন করবো।”

“চমৎকার। আমি খোঁজ করতে শুরু ক’রে দেই তাহলে।”

“আগামীকাল কথা হবে, আবোরো ধন্যবাদ।” মেরি ফোনটা রেখে ঘড়ি দেখলো। “তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি পিটারকে ফোন করবো। আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।”

“তুমি কি আসলেই মনে করছো সে খুব জলদি আমাকে খবরটা দেবে?”

“দেবে। সে পতরাত থেকেই ওয়াশিংটনে ফোন করা শুরু করেছে। করবেলিয়াও তাই বললো। আমরা সবাই বিনিময় করছি। এখানকার একটা তথ্যের বিনিময়ে ওখানকার একটা পাবো।”

“কথাটা অস্পষ্টভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ব’লে মনে হচ্ছে।”

“বিপরীত। আমরা টাকা নিয়ে কাজ করছি, কোনো মিসাইল নিয়ে নয়। চারপাশে এসব টাকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশী আইন আমাদের স্বার্থের পক্ষে। যদি না তুমি চাও আরবি শেখেরা গ্রহমান এয়ারক্রাফটের মালিক হবে। তারপর আমরা মিসাইল নিয়ে কথা বলবো...সেগুলো লাঞ্চিং প্যাড থেকে ছেড়ে দেবার পর।”

“আচ্ছা।”

“সকালে প্রথম দিকেই আমরা দামাকোর্ভের লোকটাকে দেখবো। ভেবে রাখো তুমি কি পরিমাণ টাকা ওঠাতে চাও।”

“পুরোটা।”

“সবটাই?”

“ঠিক। তুমি যদি ট্রেডস্টোনের ডিরেক্টর হতে তবে কর্পোরেট একাউন্ট থেকে ছয় মিলিয়ন ফ্রাঁ উধাও হয়ে গেলে কি করতে?”

“বুঝেছি।”

“দামাকোর্ভ বলেছে বিয়ারার চেকগুলো তৈরি করা হবে।”

“সে এটা বলেছে? চেকগুলো?”

“হ্যাঁ, কোনো সমস্যা?”

“অবশ্যই। সেইসব চেকগুলোর নাম্বার জাল টেপের সাহায্যে পাঞ্চ করা হতে পারে, সব ব্যাংকেও পাঠাতে পারে। সেগুলোকে ক্যাশ করার জন্যে তোমাকে একটা ব্যাংকে যেতে হবে। পেমেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।”

“সে খুবই সেয়ানা, তাই না? দু’দিক থেকেই ফায়দা লুটবে সে। আমরা কি করবো?”

“সে তোমাকে যে অর্ধেকটা বলেছে সেটা বাদে—বিয়ারারের অংশটা। তবে চেকগুলো নয়। বন্ড। বিভিন্ন মূল্যের বিয়ারার বন্ডগুলো, সেগুলো খুব সহজেই ভাঙা যায়।”

“তুমি এইমাত্র একটা ডিনার জিতে নিলে,” জেসন তার কাছে গিয়ে মুখটা ধরে বললো।

“আমি আমার জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছি, স্যার,” তার হাতটা ধরে বললো সে। “প্রথমে ডিনার, তারপর পিটার...সেখান থেকে সেন-জার্মেইনের বইয়ের দোকানে।”

“সেন-জার্মেইনের একটি বইয়ের দোকান,” বর্ন প্রতিধ্বনি করলো। বুকের গ্যাপটা আবার শুরু হয়েছে। সেটা কি? সে কেন এতো ভয় পাচ্ছে?

গালা বুলেভার্ড রাসপেইল রেষ্টোরাঁ থেকে বের হয়ে রুই ভগিরার্ডের টেলিফোন ক্যাম্পেক্সের দিকে গেলো। অসংখ্য টেলিফোন বুথ আছে সেখানে।

“ভীড় খুব একটা বেশি না, মাদাম,” ক্লার্ক মেরিকে বললো। “আপনার ফোন কলটা কয়েক মিনিটেই পৌছে যাবে। বারো নাম্বারে যান, প্লিজ।”

“ধন্যবাদ। বারো নাম্বার বুথে?”

“হ্যাঁ, মাদাম। ঐতো, ওখানে।”

তারা বুথের কাছে যেতে থাকলে জেসন তার হাতটা ধরলো। “আমি জানি লোকে কেন এসব জায়গা ব্যবহার করে,” সে বললো। “এগুলো হোটেলের ফোনের চেয়ে একশ’ গুন বেশি দ্রুত।”

“এটাই একমাত্র কারণ।”

মেরি বুথে ঢুকলো। তার হাতে নোটবুক আর পেন্সিল। ফোনটা তুলে নিলো সে।

ষাট সেকেন্ড পরে বর্ন মেরির দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো ফ্যাকাশে মুখে সে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। চোঁচামেচি গুরু ক’রে দিয়েছে, পার্সটা হাত থেকে পড়ে গেলে মেঝেতে সব জিনিস ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লো জেসন। মেরি একেবারে জ্ঞান হারাবার পথে।

“আমি মেরি সেন জ্যাক, প্যারিস থেকে বলছি, লিসা। পিটার আমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছে।”

“মেরি? হায় ঈশ্বর...” সেক্রেটারির কণ্ঠটা মিলিয়ে গেলো, আশেপাশে অন্যান্য কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কণ্ঠগুলো উত্তেজিত। তারপর হৈচৈ আর দৌড়াদৌড়ির শব্দ। ফোনটা অন্য কাউকে দেয়া হলো অথবা কেউ সেটা কেড়ে নিলো।

“মেরি, আমি এ্যালান বলছি,” সেকশনের প্রথম অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর বললো। “আমরা সবাই পিটারের অফিসেই আছি।”

“কি হয়েছে, এ্যালান? আমার হাতে সময় নেই। আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?”

নিরবতা নেমে এলো। “কি ক’রে যে বলি, আমি বুঝতে পারছি না। পিটার মারা গেছে, মেরি।”

“সে...কি?”

“কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে। তারা আসছে।”

“পুলিশ? কি হয়েছে? হায় ঈশ্বর, সে মরে গেছে? কি হয়েছিলো?”

“আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা তার ফোন লগটা পরীক্ষা ক’রে দেখছি। তবে আমরা তার ডেস্কের কিছু স্পর্শ করছি না।”

“তার ডেস্ক...?”

“নোট আর মেমোগুলো।”

“এ্যালান! আমাকে বলো কি হয়েছে?”

“আমরা কিছু জানি না। সে তো আমাদের কিছু বলে নি। কেবল এটুকুই জানি, সে আমেরিকা থেকে দুটো ফোন পেয়েছিলো। ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্ক থেকে। দুপুরের দিকে লিসাকে বলেছিলো সে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে কারো সাথে দেখা করতে। সে বলে নি কার সাথে। পুলিশ তাকে এক ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টের গুদামঘরের টানেল থেকে পেয়েছে। ভয়ংকর ব্যাপার, মেরি। গলায়...গুলি করা হয়েছে। মেরি...? মেরি?”

হলুদ চোখ আর সাদা দাড়ির বৃদ্ধ লোকটি অন্ধকার কনফেশন-রুমে চোখ পিটপিট করছে, ওপাশের স্বচ্ছ পর্দার আড়ালে মাথায় হুড দেয়া লোকটার দিকে ভালো ক’রে তাকানোর চেষ্টা করছে সে। আশি বছরের বৃদ্ধের জন্যে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকার কথাও নয়। তবে তার মাথাটা এখনও বেশ পরিষ্কার আছে।

“অ্যাস্লোস দোমিনি,” সে বললো।

“অ্যাস্লোস দোমিনি, ঈশ্বরের পুত্র,” বললো হুড দেয়া লোকটা। “আপনার দিনকাল কি ভালো যাচ্ছে?”

“দিনগুলো সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে। তবে ভালোই কাটছে।”

“বেশ...জুরিখের কথা বলুন।”

“তারা গুইসান কুয়ের লোকটাকে খুঁজে পেয়েছে। সে আহত হয়েছে। তারা ভারব্রেক্সারওয়েন্ট নামের একজন ডাক্তারের সাহায্যে খুঁজে পেয়েছে তাকে। কড়া জেরার মুখে সে মেয়েটাকে লাঞ্চিত করার কথা স্বীকার করেছে। কেইন মেয়েটার জন্যে ফিরে এসেছে। কেইনই তাকে গুলি করেছে।”

“তাহলে মেয়েটা আর কেইনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।”

“গুইসান কুয়ের লোকটা তা মনে করে না। সে ঐ দু’জনের একজন, যে মেয়েটাকে লাওয়েনস্ট্রাসে থেকে তুলে এনেছিলো।”

“সেও একটা গর্দভ। সে ওয়াচম্যানকে খুন করেছে?”

“সে এটা স্বীকার ক’রে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে। পালানোর জন্যে এছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিলো না।”

“তাহলে তাকে আত্মপক্ষসমর্থন করার দরকার নেই। সে যা করেছে সেটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। তার কাছে কি ওর অস্ত্রটা আছে?”

“আপনার লোকজনের কাছে আছে।”

“ভালো। জুরিখ পুলিশে একজন দক্ষ লোক আছে। সেই অস্ত্রটা তাকে যেনো দেয়া হয়। কেইন খুবই রহস্যময়, মহিলাটি তার চেয়ে অনেক কম রহস্যময়। তার অটোয়াতে লোকজন আছে। তারা লেগে থাকবে। আমরা মেয়েটাকে ফাঁদে ফেলে তাকে ধরবো। আপনার পেন্সিল কি প্রস্তুত আছে?”

“হ্যা, কার্লোস।”

অধ্যায় ১৩

ফোনবুথের ভেতর বর্ন তাকে জড়িয়ে ধ'রে রাখলো। আশ্তে ক'রে বুথের ছোট সিটটাতে বসিয়ে দিলো তাকে। মেয়েটা কাঁপছে, তার নিঃশ্বাস খুব দ্রুত, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। অনেকটা উদাসভাবেই জেসনের দিকে তাকালো সে।

“তারা তাকে খুন ক'রে ফেলেছে। তাকে খুন করেছে! হায় ঈশ্বর, আমি কি করেছি? পিটার!”

“তুমি এটা করো নি! কেউ যদি ক'রে থাকে তো আমি করেছি। এটা নিজের মাথায় ঢোকাও।”

“জেসন, আমি ভয়ে আছি। সে হাজার হাজার মাইল দূরে ছিলো...তারপরও তারা তাকে খুন ক'রে ফেলেছে!”

“ট্রেডস্টোন?”

“আর কে? দুটো ফোন কল করা হয়েছিলো, ওয়াশিংটন...নিউইয়র্কে। সে এয়ারপোর্টে কারো সাথে দেখা করতে গিয়ে খুন হয়েছে।”

“কিভাবে?”

“গুলি করা হয়েছে। গলায়।” ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো সে।

আচমকা বর্নের মাথাব্যাখা শুরু হয়ে গেলো। “কার্লোস?” সে বললো, কেন বললো সেটা সে নিজেও জানে না।

“কি?” মেরি তার দিকে তাকিয়ে রইলো। “তুমি কি বললে?”

“কার্লোস,” আশ্তে ক'রে আবারো বললো। “গলায় একটা বুলেট। এটা কার্লোসের কাজ।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে?”

“আমি জানি না।” সে মেরিকে জড়িয়ে ধরলো। “চলো, এখান থেকে চলে যাই। তুমি কি ঠিক আছো? তুমি হাটতে পারবে?”

সে মাথা নাড়লো। “হ্যাঁ।”

“আমরা মদ খেয়ে নেবো। আমাদের দু'জনেরই সেটার দরকার আছে। তারপর আমরা খুঁজে বের করবো এটা।”

“কি খুঁজে বের করবো?”

“সেন-জার্মেইনের একটা বুক স্টোর।”

‘কার্লোস’ ইনডেক্সে তিনটি পুরনো সংখ্যা আছে। পোটোম্যাক ত্রৈমাসিকের তিন বছরের পুরনো একটি এবং লো গ্লোব-এর প্যারিস সংখ্যায়। তারা ওখানে ব’সে লেখাগুলো পড়লো না। তার বদলে তিনটি সংখ্যা নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলো। ফিরে এলো হোটেল মঁতোপারোয়াতে। ওখানেই তারা পত্রিকাগুলো পড়লো। মেরি বিছানার উপর আর জেসন জানালার পাশে একটা চেয়ারে। কয়েক মিনিট পরে মেরিই প্রথম মুখ খুললো।

“এখানে আছে,” তার কণ্ঠে আর চোখেমুখে ভয়।

“পড়ো।”

“এক পৈশাচিক আর বীভৎস শাস্তি প্রয়োগ ক’রে থাকে কার্লোস অথবা তার ছোট্ট সৈনিকের দলটি। গলায় গুলি ক’রে মারা হয়, প্রায়শই গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ ক’রে মৃত্যুবরণ করে। এটা তাদের জন্যে বরাদ্দ থাকে যারা গুণ্ডাতকের সঙ্গে অনুগত্য অথবা নিরব থাকার প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে। কিংবা যারা কোনো তথ্য দিতে অস্বীকার করে...” মেরি থেমে গেলো, আর পড়তে পারলো না। সে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করলো। “সে তাদেরকে কিছু বলে নি তাই তারা তাকে মেরে ফেলেছে। হায় ঈশ্বর...”

“সে যা জানে না তা তো বলতে পারে না,” বর্ন বললো।

“কিন্তু তুমি জানতে!” মেরি উঠে বসলো। “তুমি গলায় গুলি করার কথাটা জানতে। তুমি এটা বলেছিলে!”

“আমি জানতাম। কেবল এটাই আমি বলতে পারি।”

“কিভাবে?”

“হায়, এ প্রশ্নের উত্তরটা যদি আমি জানতাম! আমি জানি না।”

“আমি কি একটু মদ খেতে পারি?”

“নিশ্চয়।” জেসন মদ নিয়ে ফিরে এলো। “বরফ এনে দেবো? তাতে খুব জলদি কাজ করবে।”

“না,” ম্যাগাজিনটা ছুড়ে ফেলে তার দিকে তাকালো সে। “আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।”

“তুমি আরেক পাগলের সাথে যোগ দিচ্ছে।”

“আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই। বিশ্বাস করিও। কিন্তু আমি...আমি...”

“তুমি নিশ্চিত হতে পারছো না,” বর্ন বললো। “আমি নিজেও না।” সে তার হাতে গ্লাসটা দিলো। “তুমি কি আমার কাছে থেকে গুনতে চাও? আমি কীইবা বলতে পারি? আমি কার্লোসের একজন যোদ্ধা? আমি কি নিরবতার শপথ ভঙ্গ করেছি? এজন্যেই কি আমি খুন করার ধরণটা জানি?”

“থামো।”

“আমি নিজেকে অনেকবার বলেছি ‘থামো, বন্ধ করো। ভেবো না। স্মরণ করার চেষ্টা করো। বেশিদূর যেয়ো না।’ এটা অনেকটা মাতাল হয়ে ঘুম থেকে

ওঠার পরের মতো অবস্থা, কার সাথে মারামারি করেছে, ঘুমিয়েছে, অথবা খুন করেছে নিশ্চিত হতে পারছো না। ধ্যাভারিকা...”

“না...” মেরি বললো। “তুমি আমার কাছে তুমিই। এটা নিয়ে কিছু বোলো না।”

“আমিও সেটা করতে চাই না,” জেসন চেয়ারে গিয়ে আবার বসলো। তার মুখ জানালার দিকে। “তুমি হত্যা করার একটা পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছো। আমি খুঁজে পেয়েছি অন্য কিছু। আমি সেটা জানতাম। যেমনটি জানতাম হাওয়ার্ড লিল্যান্ডের ব্যাপারে। আমাকে এমনকি সেটা পড়তেও হয় নি।”

“কিসের কথা বলছো?”

বর্ন তিন বছরের পুরনো দ্রৈমাসিক পোটোম্যাক-এর একটি সংখ্যা থেকে একটা খবর বের ক’রে মেরির দিকে বাড়িয়ে দিলো সেটা।

“পড়ো,” বললো সে। “‘রূপকথা অথবা দানব,’ নামের খবরটা। তারপর আমি একটা খেলা খেলতে চাইবো।”

“খেলা?”

“হ্যা। আমি কেবল প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফ পড়েছি।”

“ঠিক আছে,” মেরি পড়তে শুরু করলো।

দানব নয়তো মিথ

প্রায় একযুগেরও বেশি সময় ধরে প্যারিস, তেহরান, বৈরুত, লন্ডন, কায়রো এবং আমস্টারডামের অলিগলিতে ‘কার্লোস’ নামটি উচ্চারিত হয়ে আসছে। তাকে গণ্য করা হয় একজন প্রধান এবং শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে। এই খুনির কোনো রাজনৈতিক পরিচয় সেভাবে জানা না গেলেও এটা জানা গেছে, সে পিএলও এবং বাডের মেইনহফ নামক সংগঠনের সাথে জড়িত।

কার্লোসের প্রিয় শখ দ্রুতগতির গাড়ি আর সুন্দরী রমণী। অনেকটা এডাম স্মিথ আর ইয়ান ফ্রেমিংয়ের মিশ্রণ সে।

তার আসল নাম ইলিচ রামিরেজ সানচেজ। ভেনিজুয়েলার নাগরিক। একজন কটর মার্কসবাদী ডাক্তারের ছেলে। ইলিচ নামটা তার বাবা নিজের প্রিয় নেতা লেলিনের নাম থেকে ব্যবহার করেছে। তার বাবাই তাকে রাশিয়াতে পাঠায় লেখাপড়া জন্যে। যার মধ্যে নভগোরোদে গুপ্তচরের প্রশিক্ষণটাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। রাশিয়া বর্তমানে তার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক স্বীকার করে না। লোকটা প্যারানয়েড, সব ধরনের সমস্যার সমাধান বুলেট আর বোমার সাহায্যে করতে আগ্রহী সে। কার্লোস তার নিজের তৈরি দলের

নেতা । রাজনৈতিক এবং আদর্শগত কোনো ক্রায়েন্টের পক্ষে সে গুপ্ত হত্যা ক'রে থাকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ।

সে অনেক ভাষায় কথা বলতে পারে । নিজের মাতৃভাষা স্পেনিশের সাথে রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি । কার্লোস তার সোভিয়েত প্রশিক্ষণটাকে আরো উন্নত করেছে । দীর্ঘদিন খোঁজখবর নিয়ে সে মস্কোতে বোমা ফাটিয়েছে । অনেকেই মনে করে সেটা কিউবানদের সাহায্যেই করেছে সে । বিজ্ঞানের উপর মাস্টার্স । সব ধরনের বোমা আর অস্ত্রের চালনা সে জানে । চোখ বুজে যেকোনো অস্ত্র মুহূর্তেই খুলে ফেলতে পারে । স্পর্শ আর স্নান শুকেই বোমার ব্যাপারে জেনে যায় । আর অসংখ্য উপায়ে সেগুলো ডেটোনেটও করতে জানে ।

সে প্রস্তুত । প্যারিসকে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ঘাঁটি হিসেবে বেছে নিয়েছে, কিন্তু কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে একজন লোককে ভাড়া করা হয়েছে তাকে হত্যা করার জন্যে, বাকিরা সে সাহস দেখায় নি । তার ছবিটা অনেক পুরনো, আর কোনো জন্ম রেকর্ড না থাকার কারণে তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । কালোসের বয়স কতো? কতোজনকে সে মেরেছে, এর কতোটুকু গল্পগুজব—আত্মবীকৃত অথবা অন্যকিছু? কারাকাসের সংবাদ প্রতিনিধি ইলিচ রামিরেজ সানচেজ নামে কোনো বার্থ সার্টিফিকেট খুঁজে পায় নি । তার উপর ভেনেজুয়েলাতে হাজার হাজার সানচেজ আর শত শত রামিরেজ রয়েছে । তবে কারোর নামের আগে ইলিচ নামটি নেই । সেটা কি পরে সংযুক্ত করা হয়েছে? তবে এটা সবাই মানে যে, গুপ্তঘাতকের বয়স পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হবে । তবে নিশ্চিত ক'রে কেউ সেটা জানে না ।

ডালাসে একটা ঘাসের টিলা?

একটা বিষয় নিয়ে কারো মধ্যে মতভেদ নেই যে, প্রথম কয়েকটি খুন গুপ্তঘাতককে এমন একটি সংগঠন গড়তে সাহায্য করেছে যে, সেটা জেনারেল মটরসের একজন অপারেশন অ্যানালিস্টকে ঈর্ষাকাতর ক'রে তুলতে পারে ।

তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে খুব দ্রুতই মৃত্যু নেমে আসে কিন্তু তার সঙ্গে কাজ করলে প্রচুর টাকা আর বোনাস পাওয়া যায় । মনে হচ্ছে এই সংগঠনটির সর্বত্রই সদস্য রয়েছে । আর এটা যে প্রশ্নের জন্ম দেয় সেটা হলো, কোথেকে সে এতো টাকা পায়? সত্যিকারের

খুনি কারা? তেরো বছর আগে ডালাসে এরকম একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছিলো। জন.এফ কেনেডির হত্যা নিয়ে কতো তর্ক বিতর্কই না হয়েছে, কিন্তু সন্তোষজনক কোনো জবাব পাওয়া যায় নি। কেউ বলতে পারে নি, কি ক’রে ‘তিনশ’ গজ দূরে একটা সবুজ টিলার উপর থেকে ধোঁয়া বের হলো। ধোঁয়াটা ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। মোটরসাইকেলে পুলিশের দুটো রেডিওতে শব্দটা রেকর্ড করা হয়েছিলো। তারপরও গুলির কোনো খোসা অথবা আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। সত্যি বলতে কি, তথাকথিত সবুজ টিলার খবরটি সে মুহূর্তে এতোটাই অপ্রাসঙ্গিক ছিলো যে, এফবিআই সেটা ধামাচাপা দিয়ে দেয় আর ওয়ারেন কমিশনের কাছে সেটা কখনই তোলা হয় নি। উত্তর ডালাসের কে এম রাইট এই বক্তব্যটি দিয়েছিলো :

“ওখানে একমাত্র যে বানাচোতটা সবচাইতে কাছাকাছি ছিলো সে হলো বৃদ্ধ বারলাপ বিলি, সে সময় কয়েকশ’ গজ দূরে ছিলো সে।” ‘বিলি’ নামে যাকে উল্লেখ করা হয়েছিলো সে ছিলো ডালাসের একজন ভবঘুরে। তাকে টুরিস্ট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেতো। ‘বারলাপ’ বলতে মোটা কাপড় দিয়ে তার জুতা পেচিয়ে রাখার বাতিকটাকেই নির্দেশ করছে। আমাদের প্রতিনিধির মতে রাইটের জবানবন্দীটি কখনও প্রকাশ করা হয় নি। ছয় সপ্তাহ আগে এক লেবানিজ সন্ত্রাসী ধরা পড়লে তেলআভিভের জেরার মুখে সে স্বীকার করে, তার মৃত্যুদণ্ড রদ করা হলে সে গুণঘাতক ‘কার্লোস’ সম্পর্কে অসাধারণ এক তথ্য দেবে। ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টটা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের ক্যাপিটল প্রতিনিধি জবানবন্দীটির কিছু অংশ পাঠিয়েছে।

জবানবন্দী : কার্লোস ১৯৬৩ সালের নাভেম্বরে ডালাসে ছিলো। সে একজন কিউবান হিসেবে পরিচয় দিয়ে অসওয়াল্ডের ব্রেনওয়াশ করে। সে ছিলো ব্যাক-আপে। এটা ছিলো তারই অপারেশন।”

প্রশ্ন : “তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে?”

জবানবন্দী : “আমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছি। সে একটা ছোট্ট ঘাসের টিলার উপর ছিলো। তার রাইফেলটা ছিলো ওয়্যার শেল-ট্র্যাপ সংযুক্ত।”

প্রশ্ন : “এটা কখনও রিপোর্ট করা হয় নি, তাকে কেন দেখা যায় নি?”

জবানবন্দী : “হয়তো তাকে কেউ দেখেছে, তবে কেউ সেটা জানতো না। সে এক বৃদ্ধলোকের পোশাকে ছিলো। ছেঁড়াফাড়া ওভারকোট আর জুতাটা মোটা ক্যানভাস কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিলো যাতে কোনো ছাপ পাওয়া না যায়।”

একজন সস্ত্রাসীর তথ্য নিশ্চিতভাবেই কোনো অকাটা প্রমাণ নয়, তবে সেটাকে সব সময় অগ্রাহ্য করাও ঠিক না। বিশেষ ক’রে একজন মাস্টার গুণ্ডাঘাতকের বিষয়ে, যে কিনা ছদ্মবেশ নিতে পারঙ্গম। এই জবাবন্দীটি গুরুত্বসহকারে নিতে হবে। আরো অসংখ্য ঘটনা আছে—ডালাসের হৃদয়বিদারক ঘটনাটি, ‘বারলাপ বিলি’কে কয়েকদিন পরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, ড্রাগ ওভারডোজের কারণে সে মৃত্যুবরণ করেছে। একজন সস্ত্রা মদপানকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলো সে, কখনও নারকোটিকস ব্যবহার করে নি। সে ওগুলো কেনার ক্ষমতাও রাখতো না।

তাহলে কি ঘাসের টিলার উপরের লোকটা কার্লোসই ছিলো? একটা অসাধারণ ক্যারিয়ার গুরুর জন্যে কতো অসাধারণ গুরুই না ছিলো সেটা! যদি ডালাস আসলেই তার ‘অপারেশন’ হয়ে থাকে তবে কতো মিলিয়ন ডলার তাকে দেয়া হয়েছিলো? নিশ্চয় সারা পৃথিবীব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার চেয়ে সেটা বেশি ছিলো।

মিথটার অনেক সারবর্তা রয়েছে। কার্লোস হয়তো একজন রক্তমাংসের দানব, যার প্রচুর রক্ত দরকার।

মেরি ম্যাগাজিনটা নামিয়ে রাখলো। “খেলাটা কি?”

“পড়া শেষ?” জেসন জানালা থেকে ফিরে তাকালো।

“হ্যাঁ।”

“আমি অনেকগুলো বক্তব্য জড়ো করেছি। তত্ত্ব, ধারণা, সমীকরণ।”

“সমীকরণ?”

“এখানে একটা কিছু ঘটছে, প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ওখানে, একটা সম্পর্ক তো আছেই।”

“মানে সংযোগ,” মেরি বললো।

“ঠিক আছে, সংযোগ। সবই আছে, আছে না?”

“একদিক থেকে তুমি এটা বলতে পারো। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে অনেক ‘ম্যুয়ান, গুজব আর পরোক্ষ তথ্য আছে।”

“যাইহোক, সত্যতা রয়েছে।”

“বলা ভালো তথ্য রয়েছে।”

“বেশ । তথ্য । ঠিক আছে?”

“খেলাটা কি?” মেরি আবারো জানতে চাইলো ।

“এটার সহজ একটি শিরোনাম আছে । এটাকে বলে ‘ফাঁদ ।’

“কার ফাঁদ?”

“আমার ।” বর্ন মুখোমুখি বসলো । “আমি চাই তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে । ওখানে আছে এরকম যেকোনো কিছু নিয়ে । কোনো ব্যাকাংশ, শহরের নাম, গুজব, কোনো টুকরো তথ্য । যেকোনো কিছু । তারপর শোনো আমার জবাবটা কি হয় । আমার অঙ্ক জবাব ।”

“ডার্লিং, এটা কোনো প্রমাণ—”

“প্রশ্ন করো!” জেসন আদেশ করলো ।

“ঠিক আছে ।” পত্রিকাটা তুলে নিলো মেরি । “বৈরুত,” সে বললো ।

“অ্যামাসি,” জেসন জবাব দিলো । “সিআইএ’র স্টেশন হেড একজন অ্যাটাশি হিসেবে দায়িত্বে আছে । পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে সে । তিন লক্ষ ডলার ।”

মেরি তার দিকে তাকালো । “আমার মনে পড়ছে—” বলতে শুরু করলো সে ।

“আমার না!” জেসন বাঁধা দিয়ে বললো । “বলে যাও ।”

মেরি আবারো ম্যাগাজিনে চোখ রাখলো । “*বাডের মেইনহফ* ।”

“স্টুটগার্ড । রোজেনবুর্গ । মিউনিখ । দু’জন খুন আর একটা কিডন্যাপিং, *বাডের* সংগঠনটি স্বীকার করেছে । টাকা পেয়েছে—” বর্ন থেমে গেলো । তারপর বিস্ময়ে নিচু কণ্ঠে বললো, “ইউএসএ’র সোর্স থেকে । ডেট্রয়েট...উইলমিংটন, ডেলাওয়ার ।”

“জেসন, এগুলো কি—”

“বলে যাও, প্লিজ ।”

“সানচেজ ।”

“ইলিচ রামিরেজ সানচেজ,” সে জবাব দিলো । “সে হলো...কার্লোস?”

“ইলিচ কেন?”

বর্ন থামলো, তার চোখ ঘুরছে । “আমি জানি না ।”

“এটা রাশিয়ান, স্পেনিশ নয় । তার মা কি রাশিয়ান?”

“না...হ্যা । তার মা । এটা তার মা-ই হবে ।...আমার মনে হচ্ছে, তবে নিশ্চিত নই ।”

“নভগোরোদ ।”

“গুগল চর কম্পাউন্ড । কমিউনিকেশন, সংকেত উদ্ধার, ফ্রিকোয়েন্সি ট্রাফিক । সানচেজ ওখানকার একজন গ্র্যাজুয়েট ছিলো ।”

“জেসন, তুমি এটা পড়েছো!”

“আমি এটা পড়ি নি । প্লিজ, বলে যাও!”

মেরি হাবারো পত্রিকার দিকে তাকালো। “তেহরান।”

“আট জন খুন। একাধিক গোষ্ঠীর দায় স্বীকার—খোমেনি এবং পিএলও। দুই মিলিয়ন ডলার পারিশ্রমিক। সোর্স দক্ষিণ-পশ্চিম সোভিয়েত সেক্টর।”

“প্যারিস,” মেরি দ্রুত বললো।

“সব কিছু প্যারিসের মাধ্যমে হবে।”

“কোন চুক্তি?”

“চুক্তি...হত্যা।”

“কার হত্যা? কার চুক্তি?”

“সানচেজ...কার্লোস।”

“কার্লোস? তাহলে সেগুলো কার্লোসের চুক্তি, তার খুন। তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।”

“কার্লোসের চুক্তি,” বর্ন মস্তমূণ্ডের মতো বললো। “তাদের সাথে আমার...কোনো লেনদেন নেই,” ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো সে।

“তুমি বলছো, এসবের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই!”

“না, সেটা ঠিক না!” বর্ন চিৎকার করে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেরির দিকে চেয়ে রইলো। “আমাদের চুক্তি,” সে শান্ত কণ্ঠে বললো।

“তুমি জানো না তুমি কি বলছো!”

“আমি সাড়া দিচ্ছি! অন্ধভাবেই! এজন্যেই আমি প্যারিসে এসেছিলাম!” সে ঘুরে জানালার কাছে গিয়ে ফ্রেমটা ধরলো। “এটাই হলো খেলাটার আসল কারণ,” সে বলতে লাগলো। “আমরা কোনো মিথ্যে খুঁজছি না। সত্য খুঁজছি। মনে আছে? হয়তো আমরা সেটা খুঁজে পেয়েছি, হয়তো খেলাটা এই সত্য উন্মোচিত করেছে।”

“এটা কোনো গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা নয়! এটা ঘটনাচক্রে স্মরণ করা, যন্ত্রণাদায়ক একটি কাজ। পোটোম্যাক-পত্রিকার মতো কাগজে যদি এটা ছাপা হয়ে থাকে, তবে দুনিয়ার অর্ধেক কাগজে কাহিনীটা ছাপা হয়েছে। তুমি সেইসব পত্রিকা থেকে পড়ে থাকতে পারো।”

“সত্য হলো আমি সেটা জানি।”

“পুরোপুরি নয়। তুমি জানো না ইলিচ কোথেকে এসেছে। কার্লোসের বাবা ভেনেজুয়েলার একজন কমিউনিস্ট অ্যাটর্নি ছিলো। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আমার মনে হয়, তুমি কিউবানদের সম্পর্কে কিছুই বলো নি। যদি বলতে তবে সেটা এখানকার লেখা সবচাইতে আতংকজনক অনুমানটির দিকে ধাবিত হতো। তুমি কিছুই বলো নি সে সম্পর্কে।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে?”

“ডালাস,” সে বললো। “নভেম্বর ১৯৬৩।”

“কেনেডি,” বর্ন জবাব দিলো।

“এটাই? কেনেডি?”

“সেটাই তো হয়েছে।” জেসন ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

“হয়েছে। তবে আমি সেটা খুঁজছি না।”

“আমি জানি,” বর্ন বললো। তার কণ্ঠটা কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছে। “একটা সবুজ টিলা...বারলাপ বিলি।”

“তুমি এটা পড়েছো!”

“না।”

“তাহলে এ সম্পর্কে শুনেছো, এর আগে পড়েছো হয়তো।”

“সেটা সম্ভব। কিন্তু সেটা তো প্রাসঙ্গিক নয়, তাই না?”

“বন্ধ করো, জেসন!”

“আবারো সেই কথা। হায়, আমি যদি সেটা করতে পারতাম।”

“তুমি আমাকে কি বলতে চাচ্ছে? তুমিই কার্লোস?”

“হায় ঈশ্বর, না। কার্লোস আমাকে খুন করতে চায়, আর আমি রুশ ভাষায় কথা বলতে পারি না। আমি সেটা জানি।”

“তাহলে কি?”

“শুরুতে যা বলেছি! খেলাটা। খেলাটাকে বলে যোদ্ধাকে ফাঁদে ফেলো।”

“যোদ্ধা?”

“হ্যা। আমি কার্লোসের কাছ থেকে সরে এসেছি। এটাই আমার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ব’লে মনে হচ্ছে।”

“তুমি কেন বললে সরে এসেছো?”

“কারণ সে আমাকে খুন করতে চায়। তাকে সেটাই করতে হবে। সে মনে করে আমি তার সম্পর্কে এ দুনিয়ায় সবচাইতে বেশি জানি।”

মেরি বিছানা থেকে একটা পা বের ক’রে দোলাতে লাগলো। “এটা হলো সরে আসার পরিণাম। তাহলে কারণটা কি? যদি এটা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এটা করেছো...” সে থেমে গেলো।

“সবদিক বিবেচনা ক’রে, নৈতিক অবস্থান খোঁজার জন্যে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে বলেই মনে হয়,” বর্ন বললো, যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে তার মুখে যন্ত্রণার ছাপটি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো সে। “আমি কয়েকটি কারণ সম্পর্কে ভাবতে পারি, একেবারে গৎবাধা কিছু কারণ। যেমন, চোরবাটপার কিংবা খুনিদের খপ্পর থেকে বেড়িয়ে আসা।”

“সব অর্থহীন!” মেরি চিৎকার ক’রে বললো। “এক বিন্দু প্রমাণও নেই।”

“একগাঁদা প্রমাণ আছে, তুমিও সেটা জানো। আমি হয়তো চড়া মূল্যে বিক্রি হয়ে গেছি অথবা ফি’র টাকা থেকে বড় একটা অংক চুরি ক’রে সটকে পড়েছি। এ দুটোই জুরিখের একাউন্টটাকে ব্যাখ্যা করে।” একটু থেমে সে বললো, “এতে

ক'রে হাওয়ার্ড লিল্যান্ড, মার্সেই, বৈরুত, স্টুটগার্ড...মিউনিখ, সবই ব্যাখ্যা করা যায়। আরেকটা ব্যাপার আছে। আমি কেন তার নাম উল্লেখ করতে এড়িয়ে যেতাম। কেন আমি তার কথা বলি নি। আমি ভয়ে ছিলাম। আমি তাকে ভয় পাই।”

কিছু মুহূর্ত নিরবে চলে গেলো।

মেরি মাথা নেড়ে সায় দিলো। “আমি নিশ্চিত, তুমি সেটা বিশ্বাস করো,” বললো সে। “একদিক থেকে আমিও চাই সেটা যেনো সত্যি হয়। তবে আমি সেটা মনে করি না। তুমি এটা বিশ্বাস করো কারণ এটা তোমার এইমাত্র বলা কথার পক্ষে যায়। এটা তোমাকে একটা জবাব দেয়...একটা পরিচয় দেয়। এটা হয়তো এমন একটা আইডেন্টিটি যা তুমি চাও না। তবে, ঈশ্বর জানে, প্রতিদিন গোলক-ধাঁধায় ঘোরার চেয়ে বিস্মৃতির কানাগলিতে ছোট্টার চেয়ে এটা অনেক ভালো।” সে আবারো থামলো। “আমিও চাই এটা যেনো সত্য হয়। এটা সত্যি হলে আমরা এখানে থাকতাম না।”

“কি?”

“এটাই হলো বেখাপ্পা, ডার্লিং। সংখ্যা আর প্রতীকগুলো তোমার সমীকরণের সাথে খাপ খায় না। তুমি যা বলছো, তুমি যদি তাই হও, কার্লোসকে ভয় পাও— তাহলে প্যারিসে তুমি যাওয়ার কথা কোনোমতেই ভাবতে না। আমরা অন্য কোথাও থাকতাম। তুমি এটা নিজেই বলেছো। তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছো। তুমি জুরিখ থেকে টাকাগুলো নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারতে, কিন্তু তুমি সেটা করছো না। তার বদলে তুমি কার্লোসের গুহায় এসে হাজির হয়েছো। এটা তো ভয় পাওয়া অথবা অপরাধ বোধে ভোগা কোনো লোকের কাজ নয়।”

“আমি প্যারিসে এসেছি খুঁজতে। এটাই তো সহজ সরল ব্যাখ্যা।”

“তাহলে পালাও। সকালেই আমরা টাকাগুলো পেয়ে যাবো। এটাও তো খুব সহজ সরল।” তাকে খুব কাছ থেকে দেখতে লাগলো মেরি।

তার দিকে তাকালো জেসন, তারপর ঘুরে ব্যারোর কাছে গিয়ে এক ঢোক মদ পাললো। “এখনও ট্রেডস্টোনকে বিবেচনায় নিতে হবে,” সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো।

“কার্লোসের চেয়ে বেশি কেন? এখানেই তোমার আসল হিসেব। কার্লোস আর ট্রেডস্টোন। একসময় আমি যাকে খুব ভালোবাসতাম তাকে ট্রেডস্টোন খুন করেছে। আমাদের কাছে এখন সবচাইতে বড় কাজ হলো পালানো, জীবন বাঁচানো।”

“আমার মনে হয় তুমি চাইবে, যে লোক তাকে খুন করেছে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে,” বর্ন বললো।

“চাই। খুব চাই। তবে অন্যেরা তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে। আমরা অন্য অনেক জরুরি কাজ আছে। আর প্রতিশোধ নামক জিনিসটা সেই তালিকায়

উপরে দিকে নেই। আমরা, মানে তুমি এবং আমি। নাকি এটা কেবলই আমার ব্যাপার? আমার অনুভূতি?”

“তুমিই ভালো জানো।” মেরির দিকে সরাসরি তাকালো সে। “আমি তোমাকে ভালোবাসি,” ফিস্‌ফিস্‌ করে কথাটা বললো।

“তাহলে চলো পালাই!” তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে যন্ত্রের মতো বললো সে। “চলো, এসব ভুলে যাই। সব ভুলে যতো দ্রুত পারি পালাই। অনেক দূরে কোথাও চলে যাই! চলো।”

“আমি...আমি,” তোতলাতে লাগলো সে। একটা কুয়াশা তাকে জড়িয়ে ধরলো আবার। “কিছু ব্যাপার...আছে।”

“কি ব্যাপার? আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। আমরা একে অন্যকে পেয়েছি। আমরা যেকোনো জায়গায় যেতে পারি। কেউ আমাদেরকে থামাতে পারে না। পারবে কি?”

“কেবল তুমি আর আমি,” সে আবারো নরম কণ্ঠে বললো।

কুয়াশাটা এখন এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো যে, দম বন্ধ হয়ে এলো তার। “আমি জানি। জানি। তবে আমাকে ভাবতে হবে। অনেক কিছু জানার আছে। অনেক কিছু।”

“তোমর কাছে এটা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ?”

“এটা...”

“তুমি কি জানো না?”

“হ্যা...না, মানে, আমি নিশ্চিত নই। এখন আমাকে জিজ্ঞেস করো না।”

“এখন নয়তো কখন? কখন জিজ্ঞেস করতে পারবো? কখন সময় হবে? নাকি কখনও হবে না!”

“চুপ করো!” আচম্কা সে গর্জে উঠলো। নিচের কাঠের ট্রে’র কাঁচের উপর জোরে আঘাত করলো সে। “আমি পালাতে পারি না। পারবো না! আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমাকে জানতে হবে!”

মেরি তার কাছে ছুটে এলো। প্রথমে তার কাঁধে তারপর মুখে হাত রাখলো। কপালের ঘাম মুখে দিলো সে। “এখন তুমি এটা বলেছো। তুমি কি শুনেছো, ডার্লিং? তুমি পালাতে পারছো না কারণ যতো কাছে যাচ্ছে ততোই বেশি তোমাকে উন্মাদ করে তুলছে। আর তুমি যদি পালাতেও, এটা আরো বেশি খারাপ হতো। তোমার কোনো জীবন থাকতো না। তুমি একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে থাকতে। আমি সেটা জানি।”

“জানো?”

“অবশ্যই। আমি না। তুমিই এটা বলেছো।” মেরি তার বুকে মাথা গুঁজে দিলো। “তোমাকে আমার জোর করতে হয়েছে। হাস্যকর ব্যাপার হলো আমি

পালাতে পারি। আমি একটা পেনে ক'রে তোমাকে নিয়ে যেকোনো জায়গায় উধাও হয়ে যেতে পারি। তারপর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। তবে তুমি সেটা করতে পারছো না। এখানে, প্যারিসে তুমি তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবে যদি তুমি এটা সহ্য করতে না পারো। এটা হলো পরিহাসের বিষয়, ডার্লিং। আমি এর সাথে বসাস করতে পারবো, তবে তুমি পারবে না।”

“তুমি উধাও হয়ে যেতে পারো?” জেসন জানতে চাইলো। “তোমার পরিবারের কি হবে, তোমার কাজ—যেসব লোককে তুমি চেনো?”

“আমি না কোনো অবোধ শিশু, না কোনো বোকা,” সে খুব দ্রুত জবাব দিলো। “আমি আমারটা দেখবো। আমি মেডিকেল এবং ব্যক্তিগত কারণে ছুটি বাড়িয়ে নেবার জন্যে অফিসে অনুরোধ করবো। আমি যেকোনো সময় ফিরে যেতে পারবো সেখানে। ডিপার্টমেন্ট সেটা বুঝবে।”

“আর পিটার?”

“হ্যাঁ।” সে একটু চুপ ক'রে গেলো। “আমরা এক সম্পর্ক থেকে আরেক সম্পর্কের দিকে চলে গেছিলাম। আমার মনে হয় পরেরটাই আমাদের দু'জনের জন্যেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে একজন দোষত্রুটিযুক্ত ভায়ের মতো, তুমি তার খুঁতগুলো থাকা সত্ত্বেও তার সফলতা চাও। কারণ তার মধ্যে একধরনের সততা আর ভদ্রতাও রয়েছে।”

“আমি দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত।”

সে তার দিকে মুখ তুলে তাকালো। “তোমারও একই রকম সততা আর ভদ্রতা আছে। অমায়িক আর ভদ্রলোকেরা পৃথিবীটাকে দখল করে নি, করেছে দুর্নীতিবাজরা। আমার কাছে দুর্নীতিবাজ আর খুনির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।”

“ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান?”

“হ্যাঁ। আমরা দু'জনেই ঠিক। আমি চাই তাদের মুখোশটা খুলে যাক। আমি চাই, তারা যা করেছে তার প্রাপ্য শাস্তি তারা পাক। আর এও চাই, তুমি কোনো মতেই যেনো না পালাতে পারো।”

মেরির ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো সে। তার চুলগুলো মুঠোতে ধরলো। “আমি তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেবো,” বললো জেসন। “আমি তোমাকে বলবো, আমার জীবন থেকে বের হয়ে যাও। কিন্তু আমি পারছি না, তবে এটাই আমার করা উচিত।”

“তুমি যদি সেটা করো তবে তাতে কিছুই বদলাবে না। আমি যাবো না, প্রিয়।”

অ্যাটর্নির অফিসটা বুলেভার্ড দ্য লা শাপেলে অবস্থিত। অনেকগুলো ঘর আছে সেখানে। এইসব ঘরে চুক্তি নয়, ডিল করা হয়। ধবধবে সাদা উকিলের ছাগলা দাড়ি। তার নাকটা খাড়া। ভুল ইংরেজিতে কথা বলতে চাইলো সে। যাতে ক'রে পরে দাবি করতে পারে সে ভুল বুঝেছিলো।

মেরিই বেশিরভাগ কথা বললো। বিষয়টা পরিস্কার ক'রে বোঝালো তাকে। ক্যাশিয়ারের চেকটা বিয়ারার বন্ডে বদলে নেবার কথা বললো সে।

যখন ছাগলা-দাড়ির উকিল তার ফোন সংলাপটি বিবৃতকর আতোয়া দামাকোর্তের সাথে শেষ করতে যাচ্ছে, মেরি তার হাত তুলে ধরলো।

“ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে বর্ন চাচ্ছেন মঁসিয়ে দামাকোর্ত আরো দু'লক্ষ ফ্রাঁ নগদে অন্তর্ভুক্ত করবে, একলক্ষ ফ্রাঁ বন্ডের সাথে আর একলক্ষ মঁসিয়ে দামাকোর্তের কাছে। সে বলছে এক লক্ষ ফ্রাঁ এভাবে ভাগ হবে, পচাত্তর হাজার মঁসিয়ে দামাকোর্তের জন্যে আর পচিশ হাজার আপনার জন্যে। সে বুঝতে পেরেছে আপনাদের দু'জনের কাছেই সে ঋণী।”

মেরির কথাবার্তা বেশ দৃঢ় আর স্পষ্ট শোনালো। কি কি করতে হবে সবই বিস্তারিত বলে দিলো সে। বন্ড আর টাকাগুলোর জন্যে মঁসিয়ে বর্ন একটা চামড়ার অ্যাটাশি কেস দেবে। এটা বহন করবে একজন সশস্ত্র কুরিয়ার, সে ব্যাংক থেকে বের হবে ২টা ৩০ মিনিটে, আর পণ্ড নোয়েফে মঁসিয়ে বর্নের সাথে দেখা করবে ঠিক ৩টা বাজে। ক্লায়েন্ট নিজেকে পরিচয় দেবে চামড়ার ব্যাগটার একটা ছোট্ট কাটা অংশের সাথে মিলে যায় এমন একটা চামড়ার টুকরো দিয়ে। তাতে একটা কথার বাকি অংশ পূর্ণ হবে : ‘হের কোয়েনিগ জুরিখ থেকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে।’

কেবল একটা বাদে সবই বিস্তারিত বলা হলো। সেটা মঁসিয়ে বর্নের উপদেশটা বুঝিয়ে দিলো পরিস্কার ক'রে।

“আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিশের ডিমান্ডটা চিঠির মাধ্যমে মেটানো যাবে। মঁসিয়ে দামাকোর্তও এরকমটি করার প্রত্যাশাই করছেন,” মেরি সেন জ্যাক বললো। “আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি, সময়টা মঁসিয়ে বর্নের জন্যে সুবিধাজনক হতে পারে। সেটা যদি তিনি না পান, তবে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং কমিশনের একজন সার্টিফাইড সদস্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হবে। আমি নিশ্চিত সেটার কোনো দরকার হবে না। আমাদের সবাইকে বেশ ভালো টাকা দেয়া হচ্ছে, নেস্ত-সে পাস মঁসিয়ে?”

“সেসে ভেই, মাদাম! ব্যাংকিং আর আইনে...জীবনের মতোই...সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ভয়ের কিছু নেই।”

“আমি জানি,” মেরি বললো।

বর্ন সাইলেন্সারের চ্যানেলটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। ওখান থেকে ধূলা আর গুঁড়োগুলো সরিয়ে ফেলে সজ্জা হলো সে। শেষ মোচড়টা দিয়ে ম্যাগাজিনটা বের ক'রে ক্লিপটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। ছয়টা গুলি আছে। প্রস্তুত সে। অস্ত্রটা বেলেট ঢুকিয়ে লাগিয়ে নিলো জ্যাকেটের বোতাম।

মেরি এর আগে অস্ত্রসহ তাকে দেখে নি। সে পেছন ফিরে বিছানায় ব'সে আছে। কথা বলছে কানাডিয়ান অ্যাম্বাসির অ্যাটাশি ডেনিস করবেলিয়ার সাথে। তার নোট বইয়ের পাশে সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে। করবেলিয়ার তথ্যগুলো টুকে রাখছে সে। তথ্য দেয়া শেষ হলে মেরি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিয়ে দুই তিন সেকেন্ডের জন্যে স্থির হয়ে ব'সে রইলো। পেন্সিলটা এখনও তার হাতে।

“সে পিটারের খবরটা জানে না,” জেসনের দিকে ফিরে বললো সে।

“এটা তো অদ্ভুত।”

“খুবই অদ্ভুত,” বর্ন বললো। “আমার মনে হয় সবার আগে তারই খবরটা পাওয়ার কথা। তুমি বলেছিলে তারা পিটারের ফোন-লগটা দেখেছে। সে তো প্যারিসে করবেলিয়াকে ফোন করেছিলো। তুমি মনে করছো কেউ এটা অনুসরণ করবে।”

“আমি এটা এমনকি বিবেচনাও করি নি। আমি সংবাদপত্র আর ওয়্যার সার্ভিসগুলো নিয়ে ভাবছি। পিটারকে আঠারো ঘণ্টা আগে পাওয়া গেছে, আর সে কানাডিয়ান সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার মৃত্যুর খবরটা গুরুত্ব পাবে, হত্যার খবর তো বিরাট শিরোনাম হবে। কিন্তু তা হয় নি।”

“আজ রাতে অটোয়াতে ফোন করো। খুঁজে বের করো কেন।”

“ঠিক আছে।”

“করবেলিয়া তোমাকে কি বললো?”

“ওহ্, হ্যাঁ,” মেরি নোটবুকটা দেখে বললো, “ক্লই মেদেলিনের লাইসেন্সটা একেবারেই অর্থহীন, দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিলো জঁ পিয়েরে লারুজে যাবার জন্যে।”

“যদু মধু রাম শ্যাম,” জেসন কথার মাঝখানে বললো।

“ঠিক। তোমাকে দেয়া দামাকোর্তের টেলিফোন নাম্বারটার ব্যাপারে তার ভাগ্য ভালো ছিলো। তবে এটা দিয়ে সম্ভাব্য কি হতে পারে সেটা সে বুঝতে পারে নি। সত্যি বলতে কি, আমিও বুঝতে পারি নি।”

“এটা কি খুব অদ্ভুত?”

“তাই তো মনে হয়। এটা সেন অনরের একটা প্রাইভেট ফ্যাশন হাউজ। লো ক্লাসিক।”

“ফ্যাশন হাউজ? মানে, একটা স্টুডিও?”

“আমি নিশ্চিত ওখানে ওরকম একটা স্টুডিও আছে। তবে বড় বড় হাউজগুলোতে ওরকম স্টুডিও থাকেই। করবেলিয়া বলেছে, এটা রেনের হাউজ নামে পরিচিত।”

“কে?”

“রেনে বারপোয়া, একজন ডিজাইনার। তাকে আমি চিনি, তার একটা ডিজাইন করা জামা আমার আছে। খুবই বিখ্যাত লোক।”

“তুমি কি ঠিকানাটা পেয়েছো?”

মেরি মাথা নেড়ে সাই দিলো। “করবেলিয়া কেন পিটারের খবরটা জানে না? কেন সবাই জানে না?”

“হয়তো ফোন করলে জানতে পারবে। প্যারিসের সকালের সংস্করণটির জন্যে খবরটা খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমি সাক্ষ্যকালীন পত্রিকা যোগাড় করবো।” বর্ন তার উপকোটটা নেবার জন্যে ক্রোসেটের দিকে গেলো। “আমি ব্যাংকে ফিরে যাচ্ছি। পণ্ড নোয়েফ পর্যন্ত কুরিয়ারকে অনুসরণ করবো আমি।” কোটটা পরে নিলো সে। মেরি যে তার কথা শুনেছে না সে ব্যাপারে সে সচেতন আছে। “আচ্ছা, ঐসব লোকেরা কি ইউনিফর্ম পরে?”

“কারা?”

“ব্যাংক কুরিয়াররা।”

“এটা সংবাদপত্র জানবে না, তবে ওয়্যার সার্ভিসগুলো জানবে।”

“বুঝলাম না, কি বললে?”

“সময়ের পার্থক্য। পত্রিকাগুলো হয়তো খবরটা পায় নি। তবে ওয়্যার সার্ভিস সেটা জানবে। অ্যাধেসিগুলোতে টেলিটাইপ রয়েছে। তারাও এটা জানবে। এটা রিপোর্ট করা হয় নি, জেসন।”

“তুমি আজ রাতে ফোন করো,” সে বললো। “আমি যাচ্ছি।”

“তুমি কুরিয়ারের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলে। তারা কি ইউনিফর্ম পরে, তাই না?”

“হ্যাঁ।”

“বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরে। তারা আরমোর্ড ভ্যানও ব্যবহার করে। তবে সেটা চাইতে হয়। ভ্যান ব্যবহার করা হলে এক ব্লক দূরে সেটা পার্ক করা হবে, বাকি পথটুকু কুরিয়ার পায়ে হেটেই যাবে।”

“তোমরা কথা শুনে কিছু বুঝতে পারলাম না। কেন?”

“একজন বন্ডেড কুরিয়ার খুব খারাপ হয়, তবে সে খুব প্রয়োজনীয়। তার ব্যাংক ইস্যুরেসের প্রয়োজন পড়ে। একটা ভ্যানকে খুব সহজেই অনুসরণ করা যায়, চিহ্নিত করা যায়। আমি জানি তুমি তোমার মত বদলাবে না, তারপরও বলছি, আমাকে তোমার সাথে যেতে দেবে?”

“না।”

“বিশ্বাস করো, উল্টাপাল্টা কিছু হবে না।”

“তাহলে তোমার যাওয়ারও কোনো কারণ নেই।”

“তুমি পেরেশান হয়ে যাচ্ছে।”

“আমি খুবই তাড়ার মধ্যে আছি।”

“আমি জানি। তুমি আমাকে ছাড়া খুব দ্রুত চলাফেরা করতে পারবে।” মেরি তার কাছে চলে এলো। “আমি বুঝেছি।” তাকে চুমু খেলো সে। আচম্কা বুঝতে

পারলো তার বেল্টে পিস্তলটা আছে। সে তার চোখে চোখ রাখলো। “তুমি উদ্ভিন্ন, তাই না?”

“একটু সাবধান থাকছি,” সে হেসে তার গাল স্পর্শ করলো। “অনেক টাকা তো। এটা আমাদেরকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখবে।”

“আমি কথাটা পছন্দ করেছি।”

“টাকা?”

“না, আমাদের বলাতে,” মেরি বললো। “একটা সেফটি ডিপোজিট বক্সের দরকার।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে?”

“মিলিয়ন ডলারের সার্টিফিকেট তুমি প্যারিসের কোনো হোটেলে রাখতে পারো না। তোমাকে একটা ডিপোজিট বক্সের ব্যবস্থা করতে হবে।”

“সেটা আমরা আগামীকালকে করতে পারবো।” তাকে ছেড়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। “আমি বাইরে গেলে ফোনবুথ থেকে লো ক্লাসিকের নাম্বারটা টুকে একটা রেগুলার নাম্বারে ফোন করো। জেনে নিও তারা কখন খোলা রাখে।” কথাটা বলেই সে দ্রুত চলে গেলো।

একটা থেমে থাকা ট্যাক্সির পেছনের সিটে ব’সে বর্ন ব্যাংকটার প্রবেশদ্বার দেখছে। ড্রাইভার গুনগুন ক’রে অপরিচিত কোনো সুর ভাজছে আর একটা পত্রিকা পড়ছে। তাকে একটা পঞ্চাশ ফ্রাঁ’র নোট অগ্রীম দেয়া হয়েছে। প্যাসেঞ্জারের অনুরোধে ট্যাক্সিটার ইঞ্জিন অবশ্য বন্ধ করা হয় নি।

পেছনের ডান দিকের জানালা দিয়ে দেখা গেলো আরমোরড ভ্যানটা আসছে। জেসনের ট্যাক্সির সামনে এসে গাড়িটা পার্ক করলো। পেছনের দরজার বুলেটপ্রুফ কাঁচের উপরে দুটো ছোটো লাল বাতি জ্বলছে। তার মানে অ্যালার্ম সিস্টেমটা সচল করা হয়েছে।

বর্ন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ইউনিফর্ম পরা লোকটাকে দেখলো। সে গাড়ি থেকে নেমে ব্যাংকের দিকে পা বাড়চ্ছে। তার মধ্যে স্বস্তি ফিরে এলো। এই লোকটা গতকাল ভালোয়্যাতে তিনজন ফিটফাট পোশাক পরা লোকদের একজন নয়।

পনেরো মিনিট পরে কুরিয়ার ব্যাংক থেকে বের হয়ে এলো। তার বাম হাতে চামড়ার অ্যাটাশি কেস। ডান হাতে একটা হোলস্টারকে আড়াল ক’রে রেখেছে সে। কেসটার পাশে এক টুকরো কাটা অংশ দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জেসন তার শার্টের পকেটে চামড়ার টুকরোটা অনুভব করলো। কোনো অঘটন না ঘটলে এটা তাকে প্যারিস আর কার্লোসের কাছ থেকে বহু দূরে নিয়ে যাবে।

এরকম কোনো জীবন যদি থেকে থাকে তবে সে কোনো রকম গোলক-বাঁধা ছাড়াই সেটা গ্রহণ করতে পারবে। যে গোলকবাঁধা থেকে সে পালাতে পারছে না।

কিন্তু এটা তার চেয়েও বেশি। মানুষের তৈরি গোলকবাঁধায় নড়াচড়া করা যায়, কিন্তু তার নিজের গোলকবাঁধাটা একেবারেই অন্যরকম। কোনো গলি বা দেয়াল নেই। আছে কেবল শূন্যতা। রাতের বেলায় সে যখন দুঃশ্বপ্ন দেখে, কেবল অন্ধকার, টের পায় প্রবল বাতাস আর পানিতে তলিয়ে যাওয়া। কেন এরকমটি হয়? প্যারাসুট? তারপর কিছু শব্দ আসে। কোথেকে আসে তার কোনো ধারণাই নেই। তবে কথাগুলো শোনা যায়।

তোমার স্মৃতি চলে গেলে আর থাকে কি? আর তোমার পরিচয়? মি: স্মিথ?

বন্ধ করো!

ভ্যানটা রুই মেদেলিন দিয়ে চলতে শুরু করলো। বর্ন পেছন থেকে ড্রাইভারের কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বললো, “ঐ ভ্যানটা অনুসরণ করো, তবে মাঝখানে কমপক্ষে দুটো গাড়ি রেখে,” ফরাসিতে বললো সে।

ড্রাইভার ঘুরে বললো, “মনে হয় আপনি ভুল ট্যাক্সি বেছে নিয়েছেন, মঁসিয়ে। আপনার টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন।”

“আরে বোকা, আমি ঐ ভ্যানটার কোম্পানিতেই কাজ করি। এটা স্পেশাল একটা কাজ।”

“মাফ করবেন, মঁসিয়ে। তাহলে ঐ ভ্যানটাকে কোনো ভাবেই ছাড়ছি না।”

ট্যাক্সিটা ভ্যানের পেছন পেছন নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করলো। পশ্চিম নোয়েফ থেকে দুই-তিন ব্লক দূরে একটা বৃজের কাছে আসতেই ভ্যানটা ধীরগতির হয়ে গেলো। এখন তিনটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। এক ব্লক দূরে ভ্যানটা থামার কথা থাকলেও থামছে কেন? থেমে গেলো। কেন? ট্রাফিক সিগনাল?...হায় ঈশ্বর, অবশ্যই ট্রাফিক সিগনাল!

“এখানেই রাখো,” ড্রাইভারকে বর্ন বললো। “ঐ মোড়টা দ্রুত পার হও!”

“কি হয়েছে, মঁসিয়ে?”

“তুমি খুব ভাগ্যবান,” জেসন বললো। “আমার কোম্পানি তোমাকে আরো বাড়তি একশ’ ফ্রাঁ দেবে যদি তুমি ঐ ভ্যানটার সামনে গিয়ে ড্রাইভারের সাথে কিছু কথা বলো।”

“কি?”

“সত্যি বলতে কি, আমরা তার পরীক্ষা নিচ্ছি। সে একেবারে নতুন। তুমি কি একশ’ ফ্রাঁ চাও?”

“আমি খালি সামনে গিয়ে কিছু কথা কথা বলবো?”

“হ্যাঁ। বড়জোড় পাঁচ সেকেন্ড, তারপর তুমি তোমার ট্যাক্সিতে ফিরে আসবে।”

“কোনো সমস্যা হবে না তো? আমি আসলে কোনো ঝামেলা চাই না।”

“আমার ফার্মটা ফ্রান্সে খুবই নামী প্রতিষ্ঠান। তুমি আমাদের ট্রাক-ভ্যান সব জায়গায় দেখতে পাবে।”

“বুঝতে পারছি না...”

“তাহলে বাদ দাও!” বর্ন দরজা খুলতে উদ্যত হলো।

“কি কথা বলতে হবে?”

জেসন একশ’ ফ্রাঁ’র নোটটা বের ক’রে হাতে নিলো। “কেবল এটা বলবে : ‘হের কোয়েনিগ। জুরিখ থেকে আপনার জন্যে শুভেচ্ছা।’ মনে থাকবে তো?”

“‘কোয়েনিগ। জুরিখ থেকে আপনার জন্যে শুভেচ্ছা।’ কি আর এমন কঠিন কাজ?”

“তুমি? আমার পেছনে?”

“ঠিক আছে।”

একসাথে ভ্যানটার দিকে পা বাড়ালো তারা। ভ্যানটা কার্লোসের একটা ফাঁদ, ভাবলো বর্ন। শুণ্ডযাতক একটা আরমোর্ড ভ্যান নিয়ে এসেছে। একজন কুরিয়ার সেজে। ভ্যানটার কাছে আসতেই জেসন ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতটা ধরে তাকে থামালো। তার হাতে আরো দুশ’ ফ্রাঁ নোট ধরিয়ে দিলে লোকটা নোটগুলোর দিকে হা ক’রে চেয়ে রইলো।

“মঁসিয়ে?”

“আমার কোম্পানি খুবই উদার। এই লোকটাকে আরো কিছু শিক্ষা দিতে হবে, নতুন তো, তাই তাকে একটু বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে।”

“কি করতে হবে, মঁসিয়ে?”

“‘হের কোয়েনিগ। জুরিখ থেকে আপনার জন্যে শুভেচ্ছা,’ বলার পর খালি বলবে, ‘শিভিউলটা একটু বদলে ফেলা হয়েছে। আমার ট্যাক্সিতে একজন আছেন, যিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন,’ বুঝলে?”

ড্রাইভার নোটগুলোর দিকে তাকালো। “এটা এমন কি কঠিন কাজ?” টাকাটা নিতে নিতে বললো সে।

জেসন ভ্যানটার স্টিলের দেয়ালের পাশে সঁটে রইলো। তার ডান হাত কোমরে গাঁজা পিস্তলটার উপর। সামনের জানালার দিকে গিয়ে কাঁচে টোকা মারলো ড্রাইভার।

“এই যে, তোমাকে বলছি! হের কোয়েনিগ! জুরিখ থেকে তোমার জন্যে শুভেচ্ছা!” সে জোরে জোরে বললো কথাটা।

কাঁচটা দুই ইঞ্চির মতো নেমে গেলো। “কি হয়েছে?” বেশ জোরে একটা কণ্ঠ পাল্টা বললো। “আপনার তো পণ্ড নোয়েফে থাকার কথা, মঁসিয়ে!”

ড্রাইভার কোনো গর্দভ নয় । সেও চাচ্ছে যতো দ্রুত সম্ভব চলে যেতে । “আমি না, গর্দভ!” সে পেছনের দিকে ইঙ্গিত করলো । “আমি তোমাকে সেটাই বলছি যা আমাকে বলা হয়েছে! শিডিউলটা বদলে ফেলা হয়েছে । পেছনে একজন আছে, সে তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে!”

“তাকে বলো তাড়াতাড়ি আসতে,” জেসন পাশ থেকে আরেকটা পঞ্চগশ ফ্রাঁর নোট হাতে তুলে ধরে নিচু স্বরে বললো ।

ড্রাইভার টাকাটার দিকে তাকিয়ে আবার কুরিয়ারের কাছে ফিরে গেলো । “তাড়াতাড়ি করো! যদি নিজের চাকরিটা বাঁচাতে চাও এন্স্ফুণি তার সাথে দেখা করো!”

“এবার এখান থেকে চলে যাও!” বললো বর্ন । ড্রাইভারও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো । বর্ন নিজের জায়গায়ই রইলো । ভ্যানটার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ শুনে আচম্কা সে সতর্ক হয়ে উঠলো । একজন লোক ওয়্যারলেসে কিছু বলছে না, বরং দু’জন লোক একে অন্যের সাথে কথা বলছে ।

“এইসব কথাবার্তা তো তুমি শুনেছো ।”

“সে তোমার কাছে আসবে । সে নিজেই আসবে ।”

“সে তাই করবে । চামড়ার টুকরোটা দেখাবে । যা একেবারে খাপে খাপে মিলতে হবে! তুমি কি আশা করো এই কাজটা আমি এরকম জনাকীর্ণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবো?”

“আমার এটা পছন্দ হচ্ছে না!”

“তুমি আমাকে টাকা দিয়েছো তোমাকে সাহায্য করার জন্যে, তোমার লোকজন অন্য কাউকে খুঁজে নিয়েছে । চাকরি হারাবো না আমি । আমি যাচ্ছি!”

“এটা অবশ্যই পণ্ড নোয়েফে হবে!”

“আমার পাছায় চুমু খাও!”

ধাতব মেঝেতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেলো । “আমি তোমার সাথে আসছি!” প্যান দরজাটা খুলে গেলে জেসন দ্রুত সেটার পেছনে চলে গেলো । তার পেছনে একটা গাড়িতে এক বাচ্চা ছেলে নিজের মুখ কাঁচে লাগিয়ে তাকে দেখছে । তার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটছে সে । গাড়ির হর্নের শব্দ হচ্ছে আশেপাশে । গাড়িগুলো সব থেমে আছে ।

ডান হাতে একটা লোহার শিক নিয়ে গাড়ি থেকে নামলো কুরিয়ার । বর্ন প্রস্তুত । কুরিয়ার রাস্তায় নামতেই সে দরজার ডালাটা দিয়ে দ্বিতীয় লোকটাকে সজোরে আঘাত করলে লোকটা চিৎকার দিলো । ধাক্কা ধেয়ে ভ্যানের ভেতর পড়ে গেলো সে । জেসন কুরিয়ারের দিকে চিৎকার ক’রে বললো, তার হাতে চামড়ার টুকরোটা ধরা ।

“আমি বর্ন! এই যে তোমার চামড়ার অংশটা! তুমি তোমার পিস্তল হোলস্টারেই রাখো, নইলে কেবল চাকরিই খোয়াবে না, প্রাণটাও হারাবে । বানচোত!”

“আমি কোনো ক্ষতি করবো না, মঁসিয়ে। তারা আপনাকে খুঁজে বের করতে চায়! আপনার ডেলিভারি নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমার কথা একদম সত্যি!”

দরজাটা ধপাস ক’রে খুলে গেলে জেসন তার কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে আবারো সেটা বন্ধ ক’রে দিলো। তারপর আবারো সেটা খুলে কার্লোসের সৈনিকের চেহারাটা দেখতে চাইলো সে। তার হাত বেলেটে গোজা অস্ত্রটার উপর।

সে যা দেখতে পেলো, তা হলো একটা অস্ত্রের নল। তার দিকে তাক করা। সে ঘুরে সরে গেলো। জানে এক মূহূর্ত দেরি হলেই গুলিটা তাকে ঘায়েল করবে। অ্যালামটা চালু ক’রে দিলে তার তীব্র শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড় হলো। বিশৃঙ্খলা দেখা গেলো রাস্তায়। কালো পিচের রাস্তায় একটা গুলিবিদ্ধ হলেও তার শব্দ পাওয়া গেলো না।

আরেকবার জেসন দরজার ডালায় আঘাত করলে মেটালের সাথে মেটালের আঘাত লাগার শব্দ শুনতে পেলো সে। কার্লোসের সৈনিকের অস্ত্রটাতে সে আঘাত করতে পেরেছে। নিজের অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নিলো। রাস্তায় হাটু মুড়ে ব’সে পড়ে দরজাটা টেনে খুলতেই জুরিখের লোকটাকে দেখতে পেলো সে। এই খুনিটাকে তারা জোহান নামে ডাকে। একে প্যারিসে নিয়ে এসেছে তাকে চিনিয়ে দেয়ার জন্যে। বর্ন পরপর দুটো গুলি করলে লোকটা পেছন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। তার কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে।

কুরিয়ার লোকটা। অ্যাটাশি কেসটা!

জেসন তাকে দেখতে পেলো। সে গাড়ির নিচে হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার হাতে অস্ত্র। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে সে। বর্ন ঝট ক’রে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্রটার নল ধরে ফেললো। সেটা মুচড়িয়ে কেড়ে নিলো কুরিয়ারে হাত থেকে। অ্যাটাশি কেসটা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করতে শুরু করলো লোকটা।

“কোনো ক্ষতি করবো না, ঠিক আছে? এটা আমাকে দে, বানচোত!” অ্যাটাশি কেসটা ছিনিয়ে নিয়ে লোকটার অস্ত্র ভ্যানের নিচে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পথের উন্মাদগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে হারিয়ে গেলো সে।

রুদ্ধস্থানে দৌড়াচ্ছে জেসন। তার সামনের ছুটে চলা লোকগুলো গোলকধাঁধার এক দেয়াল। তবে যে গোলকধাঁধার মধ্যে তার বসবাস, সেটার সাথে এর পার্থক্য আছে। এখানে কোনো অন্ধকার নেই। বিকেলের সূর্যটা খুবই উজ্জ্বল। গোলকধাঁধা দিয়ে তার ছুটে চলার মতোই তীব্র।

অধ্যায় ১৪

“সবকিছুই আছে এখানে,” মেরি ব্যাংক সার্টিফিকেট আর ফ্রাঁ নোটগুলো টেবিলে রেখে বললো। “আমি বলেছিলাম না এটাই হবে।”

“একটুর জন্যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যেতো।”

“কি?”

“তারা জুরিখের যে লোকটাকে জোহান নামে ডাকতো সে মরে গেছে। আমি তাকে খুন করেছি।”

“জেসন, কি হয়েছে?”

তাকে সব খুলে বললো। “তারা পস্ত নোয়েফে গিয়েছিলো,” বললো সে। “আমার অনুমান ছিলো ব্যাকআপ গাড়িটা ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে যাবে, তারা কুরিয়ারের ওয়্যারলেসে বলবে একটু দেরি করতে। আমি একেবারে নিশ্চিত।”

“ওহ্ ইশ্বর, তারা দেখি সব জায়গায় আছে!”

“কিন্তু তারা জানে না আমি কোথায় আছি,” বর্ন বললো। আয়নায় নিজের সোনালী চুল আর চশমাটা দেখে নিলো সে। “এই মুহূর্তে তারা আমাকে যে জায়গায় খুঁজতে চাইবে না সেটা হলো সেন অনরের ফ্যাশন হাউজে।”

“লো ক্লাসিক?” মেরি জানতে চাইলো।

“ঠিক। তুমি কি ফোন করেছিলে?”

“হ্যাঁ। কিন্তু ওখানে যাওয়াটা তো এখন একেবারে পাগলের কাজ হবে!”

“কেন?” আয়নার দিকে থেকে ঘুরে বললো জেসন। “এটা একটু ভাবো। বিশ মিনিট আগে তাদের ফাঁদটা ভেঙে পড়েছে। তারা এখন অন্ধকারে আছে। নিজেদেরকে দোষারোপ করছে। অথবা তার চেয়েও খারাপ কিছু। এখন তারা আমাকে নয়, নিজেদেরকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত আছে। কেউ নিজের গলায় বুলেট বিদ্ধ করতে চায় না। তবে তারা খুব জলদিই আবার এক হয়ে পুণরায় কাজে নেমে পড়বে। কার্লোস সেটাই করাবে। কিন্তু এখন, কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, সেটা নিয়েই ভাবছে তারা। এ মুহূর্তে তারা এই একটা জায়গাতেই আমাকে খুঁজতে যাবে না।”

“কেউ তোমাকে চিনে ফেলবে।”

“কে? এটা করতে তারা জুরিখ থেকে এক লোককে এখানে নিয়ে এসেছিলো। সে মারা গেছে। আমি দেখতে কী রকম সেটা তারা জানে না।”

“কুরিয়ার। তারা তাকে সঙ্গে নিয়ে নেবে। সে তো তোমাকে দেখেছে।”

“এখন থেকে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা সে পুলিশ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।”

“দামাকোর্ভ কিংবা উকিল লোকটি?”

“আমার ধারণা তারা নরম্যান্ডি কিংবা মার্সেই’র পথে আছে, অথবা তাদের ভাগ্য যদি ভালো হয়, তারা দেশের বাইরে চলে গেছে।”

“ধরো তাদেরকে তারা ধরে ফেলেছে?”

“ধরো তারা করেছে? তোমার ধারণা কার্লোস কোথেকে মেসেজ পায় সেটা সে জানিয়ে দেবে? না।”

“জেসন, আমি খুব ভয় পাচ্ছি।”

“আমিও। তবে সেটা আমাকে চিনে ফেলবে সেজন্যে নয়।” বর্ন আয়নার সামনে ফিরে গেলো। “আমি চেহারাটা বদলে ফেলতে পারি, তবে সেটা আমি করবো না।”

“তুমি আমাকে বলেছিলে, পোর্ট নোয়ে’র ডাক্তারও এ কথা বলেছে।”

“আমার চোখের রঙ কি?” আয়নার আরো কাছে গিয়ে জানতে চাইলো সে।

“কি?”

“আমার দিকে না তাকিয়ে বলো। আমার চোখের রঙ কি? তোমারটা বাদামী, তাতে সবুজ রঙের ফুটকি আছে। আমারটা কি?”

“নিল...নিলচে। অথবা এক রকম ধূসর, আসলে...” মেরি থেমে গেলো। “আসলে আমি ঠিক বলতে পারছি না।”

“এটা একেবারে প্রাকৃতিক। আসলে এগুলো পিস্তল বর্ণের, তবে সব সময় নয়। আমি যখন নিল রঙের শার্ট পড়ি লক্ষ্য করেছি আমার চোখগুলো নিলচে হয়ে যায়। বাদামী জ্যাকেট পড়লে হয় ধূসর। আর আমি যখন নগ্ন থাকি সেগুলো অদ্ভুতভাবেই বর্ণহীন হয়ে পড়ে।”

“এটা কোনো অদ্ভুত কিছু না। আমি নিশ্চিত, লক্ষ লক্ষ লোকের এমনটি হয়।”

“আমিও নিশ্চিত। কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের চোখের শক্তি স্বাভাবিক আছে, তারা কতোজন কনট্যাক্ট লেন্স পরে?”

“কনট্যাক্ট—”

“সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি,” জেসন কথার মাঝে বললো। “কিছু কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা হয় চোখের রঙ বদলে ফেলার জন্যে। চোখ যদি পিস্তল বর্ণের হয়ে থাকে তবে সেটা খুবই কার্যকরী হয়। ওয়াশবার্ন যখন আমাকে প্রথম পরীক্ষা করে দেখেছিলো তখন দীর্ঘদিন কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করার চিহ্ন ছিলো আমার চোখে। এটাও একটা কু, তাই না?”

“তুমি যেমনটি চাও তেমনটিই ভাবো,” মেরি বললো। “যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে তো।”

“কেন হবে না?”

“কারণ ঐ ডাক্তার তোমার মতোই সারাক্ষণ মাতাল থাকে। আর মাতালেরা এরকম নিশ্চিত ক’রে কিছু বলতে পারে না।”

“সে কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত। আমি একজন বহুরূপী। স্থিতিস্থাপক আকার দেয়ার উপযোগী ক’রে ডিজাইন করা হয়েছে আমাকে। আমি খুঁজে বের করতে চাই কার জন্যে সেটা করা হয়েছে। হয়তো আমি জানতে পারবো। তোমাকে ধন্যবাদ, আমার কাছে একটা ঠিকানা আছে। ওখানের কেউ হয়তো সত্যটা জানে। কেবল একজন লোক। কেবল তাকেই দরকার আমার। একজনের সাথে আমার মুখোমুখি হতেই হবে, প্রয়োজনে তাকে...”

“আমি তোমাকে থামাতে পারবো না, তবে ঈশ্বরের দোহাই লাগে, সাবধানে থেকো। তারা যদি তোমাকে চিনতে পারে তবে তোমাকে খুন ক’রে ফেলবে।”

“ওখানে তারা সেটা করবে না; এটা তাদের ব্যবসাকে নষ্ট ক’রে দেবে। এটা প্যারিস।”

“আমার মনে হয় না এটা খুব মজার কোনো বিষয়, জেসন।”

“আমারও তাই মনে হয়। আমি এটা খুব গুরুতরভাবেই হিসেব করছি।”

“তুমি করবেটা কি? মানে কিভাবে করবে?”

“ওখানে গেলে আমি সেটা ভালো করেই জানবো। আমি দামাকোর্তের সাথে যা করেছি ঠিক তাই করবো। বাইরে অপেক্ষা করবো, যেই হোক না কেন অনুসরণ করবো। আমি কাছেই থাকবো। কিছু বাদ দেবো না। সতর্ক থাকবো।”

“তুমি কি আমাকে ফোন করবে?”

“চেষ্টা করবো।”

“আমি অপেক্ষায় থেকে থেকে হয়তো পাগল হয়ে যাবো।”

“অপেক্ষা কোরো না। তুমি কি বন্ডগুলো অন্য কোথাও ডিপোজিট করতে পারবে?”

“ব্যাংকগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে।”

“একটা বড় হোটেল ব্যবহার করো যাদের ভন্ট আছে।”

“তাহলে তো একটা ঘর ভাড়া নিতে হবে।”

“নিয়ে নাও। মরিসে অথবা জর্জ শিল্ক-এ। ডেস্কে অ্যাটাশি কেস্টা রেখে এখানে ফিরে এসো।”

মেরি মাথা নেড়ে সাই দিলো।

“তারপর অটোয়াতে ফোন করবে। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো ওখানে কি হয়েছে।”

“ঠিক আছে।”

টেবিল থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ নিয়ে নিলো বর্ন। “একটা ঘুম খুব সহজেই কাজ আদায় ক’রে দেবে,” বললো সে। “মনে করছি না সেরকম কিছু করতে হবে। তবে হতেও তো পারে।”

“তা পারে,” মেরি বললো। “তুমি কি তোমার নিজের বলা কথাগুলো শুনেছো? তুমি এইমাত্র সাবলীলভাবে দুটো হোটেলের নাম বললে।”

“শুনেছি,” সে তার দিকে সরাসরি তাকালো। “আমি এখানে এর আগেও ছিলাম। অনেকবার। আমি ওখানেও ছিলাম। সেইসব হোটеле নয় অবশ্য। কাছাকাছি কোথাও। যাতে খুব সহজে আমাকে খুঁজে না পাওয়া যায়।” কয়েক মুহূর্তের নিরবতা নেমে এলো।

“আমি তোমাকে ভালোবাসি, জেসন।”

“আমিও,” বললো বর্ন।

“আমার কাছে আবার ফিরে এসো। যাই ঘটুক না কেন, আমার কাছে ফিরে আসবে।”

বাতিগুলো মৃদু আর অতিনাটকীয়। গাড় বাদামী রঙের সিলিং থেকে স্পটলাইটগুলো ঝুলছে। মহামূল্যবান সব পোশাক পরা ম্যানেকিনগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে ক্রেতাদের সুবিধার্থে। পাশেই হাউজের অফিস আর অন্য সব ঘরগুলো। জায়গাটা প্যারিসের সবচাইতে দামি এলাকায় অবস্থিত। একটা সুইচবোর্ডের সামনে মধ্য বয়সী এক লোক ব’সে আছে। সে কন্সোলটা অপারেটিং করছে। হেডফোনের মাউথপিস দিয়ে কথা বলছে লোকটা।

ক্লার্কদের বেশির ভাগই মহিলা। দীর্ঘাঙ্গী আর ছিমছাম গড়নের। সাবেক ফ্যাশন মডেলদেরই কেউ হবে হয়তো। যে কয়জন পুরুষকে দেখা গেলো তারাও ছিমছাম গড়নের। হালকা রোমান্টিক গান ভেসে আসছে। জেসন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। ম্যানেকিনগুলো ভালো ক’রে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো যেনো তাকে একজন ক্রেতা ব’লে মনে করে সবাই। সে কি এখানে কার্লোসের মেসেঞ্জারকে খুঁজে পাবে? অফিসে ঢোকান খোলা দরজাটার দিকে তাকালো সে। নারী-পুরুষ আসছে যাচ্ছে। একে অন্যের সাথে আড্ডা মারছে। তাদের মধ্যে কোনো তাড়া নেই। তাদের চোখেমুখে ফাঁদ কিংবা খুনির কোনো লেশমাত্রও নেই। মনে হচ্ছে না তারা কার্লোসের হয়ে প্যারিসে কাজ করে।

সে যা ভেবেছিলো জায়গাটা একেবারেই তার বিপরীত। তারপরও সে কিছু একটা প্রত্যাশা করছে। তাকে কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্যও করছে না। চারপাশে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

তারপরও, এই এখানেই, কোনো এক জায়গায় একটা প্রাইভেট ফোন রয়েছে, কেউ একজন সেটা দিয়ে কেবল কার্লোসের পক্ষ হয়ে কথাই বলে না, বরং তিনজন খুনিকে শিকার করার ব্যবস্থা করার মতো ক্ষমতাও রাখে। একজন মহিলা...

সে মহিলাকে দেখতে পেলো। এটাই সেই মহিলা হবে। কার্পেট মোড়ানো একটা সিঁড়ি দিয়ে লম্বা আর বয়স্ক এক মহিলা নেমে আসছে। তার মুখে কড়া মেকআপ। একেবারে মুখোশ পরে আছে যেনো। সে থেমে এক চিকনা লোককে কিছু একটা করার নির্দেশ দিলো।

মহিলার চোখে একটু প্রশান্তির ছায়াও রয়েছে। বর্নের দেখা এই চোখ জোড়া সবচাইতে সতর্ক। না, সবচাইতে নয়, কেবল জুরিখের গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটাকে বাদ দিলে।

তার মন বলছে মহিলাই তার টার্গেট। কেবল তার কাছে পৌছানোটাই বাকি। প্রথম চালটা খুব অল্প, আবার খুব বেশি প্রকটও হবে না। মহিলাকে তার কাছে আসতেই হবে, এরকম কিছু একটা করতে হবে তাকে।

একটা পোশাক হাতে নিয়ে সেটার সেলাইগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সে, তারপর বোতামঘর, কলার সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। এক পর্যায়ে কাপড়টা ফেলে দিলেও মহিলার কোনো দৃষ্টি কাড়তে পারলো না। মহিলা তার পাশে থাকা এক সেলস্ ক্লার্কের দিকে আসতেই জেসন সৌজন্যবশত তার দিকে চেয়ে হাসলো। ত্রিশ সেকেন্ড পরে তিনটা ম্যানিকেনের পেছনে দাঁড়িয়ে পোশাকগুলো দেখতে লাগলো সে। এগুলো এখনকার সবচাইতে দামি ডিজাইনের পোশাক।

কাপড়গুলো দেখে ভুরু তুলে মাথা নেড়ে সম্মতিসূচক একটা ভঙ্গী করলো সে। দু'হাত বৃকের কাছে ভাঁজ ক'রে আরেকটা ম্যানিকের দিকে বর্ন। সম্ভাব্য বড় একজন ক্রেতা কিন্তু মনস্থির করতে পারছে না। আর এরকম একজন ক্রেতা যে মূল্যের দিকে খুব একটা তাকাচ্ছে না তার দরকার একটু সাহায্যের। সেই সাহায্যটা আসতে হবে এ বিষয়ে সবচাইতে ভালো জানা লোকের কাছ থেকে। অভিজাত মহিলাটি তাকে দেখতে পেয়ে নিজের চুলটা হাত দিয়ে একটু সরিয়ে আঙুলে আঙুলে তার কাছে এগিয়ে এলো।

“দেখতে পাচ্ছি আপনি ভালো আইটেমগুলোর দিকেই নজর দিচ্ছেন, মিসিয়ে,” ইংরেজিতে বললো মহিলা। তার অভিজ্ঞ চোখ বলছে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে।

“আমারও বিশ্বাস, তাই,” জেসন বললো। “আপনাদের কালেকশানগুলো খুব ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে একটু খোঁজ করার দরকার রয়েছে। তাই না?”

“আমাদের সব ডিজাইনই এক্সক্লুসিভ।”

“সেলা ভা সাঁ দায়ার, মাদাম।”

“আহ, ভু পারলেজ ফ্রাসোয়া?”

“উন পু। পাসাবলি।”

“আপনি একজন আমেরিকান?”

“আমি অবশ্য ওখানে খুব একটা থাকি না,” বললো বর্ন। “আপনি বললেন এইসব শুধু আপনাদের জন্যেই বানানো হয়?”

“হ্যা। আমাদের সাথে ডিজাইনারের চুক্তি আছে। আমি নিশ্চিত আপনি তার নাম শুনেছেন। রেনে বারগোয়া।”

জেসন ভুরু তুললো। “হ্যা। খুবই পরিচিত। তবে সে এখনও কোনো অসাধারণ কিছু করে নি, করেছে কি?”

“করবে, মঁসিয়ে। এটা অবধারিত। প্রতি সিজনেই তার সুনাম বাড়ছে। কয়েক বছর আগে সেন লরেনের পক্ষে কাজ করতো, তারপর গিভেনচি’তে। লোকে বলে ওখানে সে কেবল প্যাটার্নই কাঁটতো। বুঝেছেন তো, আমি কি বললাম।”

“না বোঝার তো কিছু নেই।”

“ঐসব বেড়ালগুলো তাকে কিভাবে দমিয়ে রাখতো, ভাবতে পারেন? কি অসম্মানজনক ব্যাপার! সে মেয়েদেরকে খুব পছন্দ করে, সম্মান করে; তাদের সাথে রসতামাশা করে। ভু কম্প্রেস?”

“জো ভু কম্প্রেস পারফেইমেন্ট।”

“সে খুব শীঘ্রই বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠবে, আর তারা তার জামার কোণগুলোও ছুঁতে পারবে না। এইসব জিনিসকে একজন উদীয়মান মাস্টারের কাজ হিসেবে বিবেচনা করুন, মঁসিয়ে।”

“আপনি দেখছি মানুষ পটাতে খুব দক্ষ। আমি এই তিনটি পোশাক নিচ্ছি। আমার ধারণা এগুলো বারো সাইজের হবে।”

“চৌদ্দ, মঁসিয়ে। তবে ফিট হবে।”

“আমি নিশ্চিত, আপনাদের এখানে ভালো দর্জি আছে।”

“অবশ্যই আছে।”

“আমার সময় বাঁচাচ্ছে, আমার জন্যে আরো কিছু আইটেম বেছে রাখবেন, এরকম লাইনের কিছু পোশাক। একটু আলাদা ছাপা, আলাদা কাট, বুঝেছেন কি?”

“খুব ভালো জ্ঞান আছে দেখছি, মঁসিয়ে।”

“ধন্যবাদ। বাহামা থেকে আমি দীর্ঘ ফ্লাইটে এসেছি, খুবই ক্লান্ত।”

“তাহলে কি একটু বসবেন?”

“সত্যি বলতে কি, আমি একটু ড্রিংক করতে চাচ্ছিলাম।”

“সে ব্যবস্থা করা যাবে। পেমেন্টটা কিভাবে হবে...মঁসিয়ে?”

“নগদে,” জেসন বললো। “চেক আর একাউন্ট হলো জঙ্গলের প্রাণী, তাই না?”

“আপনি খুবই বুদ্ধিমান,” একটু হেসে বললো মহিলা। “ড্রিংকটা আমার অফিসে করছেন না কেন? জায়গাটা খুবই প্রাইভেট আর নিরিবি। আপনি সেখানে আরাম করতে পারেন, সেই ফাঁকে আমি আপনার পছন্দের আইটেমগুলো নিয়ে আসবো।”

“দারুণ।”

“মূল্যের রেঞ্জটা কেমন হবে, মঁসিয়ে?”

“লে মেইলিয়ে, মাদাম।”

“অবশ্যই,” শুকনো সাদা হাতটা বাড়িয়ে বললো। “আমি জ্যাকুলিন লাভিয়া।
লো ক্লাসিকের ম্যানেজিং পার্টনার।”

“আপনাকে ধন্যবাদ,” বর্ন নিজের নাম না বলেই হাতটা মেলানো। এখন
টাকাই হলো তার আসল পরিচয়। “আপনার অফিসটা কোথায়? আমারটা তো
হাজার মাইল দূরে।”

“আসুন, মঁসিয়ে।” সিঁড়ি দিয়ে তারা দু’জন উঠে গেলো।

তার পাশের মহিলাটি যে মারাত্মক কোনো মেসেঞ্জার সে ব্যাপারে জেসন
অনেকটা নিশ্চিত। কয়েক ঘণ্টা আগে একটা বন্দুক-যুদ্ধ হয়ে গেছে, সেটা হয়েছে
অদৃশ্য এক লোকের আদেশে। আর এই মহিলার মতো কেউই সেইসব অর্ডার বহন
ক’রে থাকে। তবে মহিলাকে দেখে এরকম কিছু মনে করার কোনো কারণই নেই।
এখন পর্যন্ত সে লো ক্লাসিকে কোনো প্রাইভেট নাম্বার খুঁজে পায় নি। হিসাবের
একটি অংশ পাওয়া যাচ্ছে না...তবে আরেকটা জিনিস বিব্রতকরভাবেই নিশ্চিত।

সেটা তার নিজের ব্যাপারে। সে একজন বহুরূপী। চালাকিটাতে কাজ হয়েছে।
সে এখন শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে। কোনো সন্দেহ নেই যে, তাকে কেউ চিনতে পারে
নি। পুরো ব্যাপারটিই দেজার্ড টাইপের। এরকম কাজ সে এর আগেও করেছে। সে
এমন একজন লোক যে অচেনা এক জঙ্গলে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তারপরও, কোনো
না কোনোভাবে সে জানে তার পথটা কোথায়, আর কোথায় ফাঁদ পাতা আছে,
অথবা কিভাবে এড়ানো যায় সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। বহুরূপী খুবই অভিজ্ঞ
একজন। বর্ন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো। নিচের ডান দিকে মধ্যবয়সী
অপারেটর মাউথ পিসে নিচু কণ্ঠে কথা বলছে। মাথা দোলাচ্ছে সে যেনো ওপাশে
যে আছে তাকে সব ঠিক আছে বলে আশ্বস্ত করছে,।

সিঁড়ির সপ্তম ধাপে এসে বর্ন থেমে গেলো। এটা অনৈচ্ছিকভাবেই হলো।
লোকটার মাথার পেছন দিক, গালের হাড়ের গঠন, মাথার পাতলা ধূসর চুল—
যেভাবে সেগুলো কানের দু’পাশে আলতোভাবে পড়ে আছে। সে এই লোকটাকে
আগে কোথাও দেখেছে! কোথাও। অতীতে। বিস্মৃত এক অতীতে। তবে এখন
অন্ধকারের মধ্যে...আলোর ঝলকানির সাথে স্মরণ করছে। বিস্ফোরণ, কুয়াশা,
ঝড়ো বাতাস। সেটা কি? কোথায় সেটা? তার চোখে কেন যন্ত্রণাটা আবার ফিরে
এলো? ধূসর চুলের লোকটা চেয়ার ঘোরাতে শুরু করছে। তাদের মধ্যে চোখাচোখি
হবার আগেই জেসন তার মুখটা সরিয়ে ফেললো।

“মঁসিয়ে দেখছি আমাদের অনন্য সাধারণ সুইচ-বোর্ডের দিকে চেয়ে আছেন,”
মাদাম লাভিয়া বললো। “এটা আমরা আমাদের সেন অনরের অন্য দোকানগুলো
থেকে লো ক্লাসিকে আলাদা করার তাগিদেই বসিয়েছি।”

“কিভাবে?”

“যখন কোনো ক্লায়েন্ট লো ক্লাসিকে ফোন করে তখন কোনো মাথা মোটা মহিলা সেটার জবাব দেয় না, তার বদলে একজন সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক, যার নখদর্পনে আমাদের সব তথ্য রয়েছে, সে জবাব দেয়।”

“চমৎকার ব্যবস্থা।”

“অন্যেরাও তাই বলে।”

তারা জ্যাকুলিন লাভিয়ার সুবিশাল অফিসে ঢুকলো। একগাঁদা এক্সিকিউটিভ এখানে কাজ করে। দেয়ালে জলরঙের ছবি টাঙানো। কিছু কিছু খুবই সাহসী, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। দেয়ালে মডেলদের অসংখ্য ছবিও আছে, সুন্দর আর যৌন আবেদনময়। বাতাসে একটা বন্য সুগন্ধী টের পেলো বর্ন। এই জায়গাটা এক বয়স্ক আর ক্ষিপ্ত বাঘিনীর অভয়ারণ্য। যারা তার জায়গাটা, অবস্থানটার জন্যে হুমকী হিসেবে আবির্ভূত হয় সে তাদেরকে নিমেষে পরাভূত করে। তারপরেও মহিলা বেশ নিয়মনিষ্ঠ। সবকিছু বিবেচনা করে এটা বোঝা যায়, সে হলো কার্লোসের একজন লিয়াজো।

সুইচবোর্ডের লোকটা কে? তাকে সে কোথায় দেখেছে?

তাকে এক সারি মদের বোতল থেকে বেছে নিতে বলা হলে সে ব্য্রাভি বেছে নিলো।

“বসুন মঁসিয়ে। আমি রেনেকে আপনার সাহায্যে নিয়োজিত করবো, যদি তাকে খুঁজে পাই।”

“আপনার মহানুভবতা, তবে আমি নিশ্চিত আপনি যা পছন্দ করবেন সেটা খুবই ভালো হবে। এটা আপনার অফিস। সব জায়গায় রুচির ছাপ দেখতে পাচ্ছি। আমি বেশ আরাম বোধ করছি এখানে।”

“আপনিও খুব মহানুভব।”

“কেবল যখন এটার দরকার পড়ে,” বললো জেসন। এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে। “আসলে আমি ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই। এসব ছবি আমি দেখেছি। বাহামাতে এসব ছবি যায়।”

“হ্যা, তা যায়,” লাভিয়া একমত পোষণ করলো। “খুব বেশি দেরি হবে না আমার মঁসিয়ে।”

আপনি সেটা করবেনও না, ভাবলো জেসন। লো ক্লাসিকের পার্টনার ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। মাদাম লাভিয়া একজন ক্লাস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ভালোমতো চিন্তা করার জন্যে খুব বেশি সময় দেবে না। সে খুব জলদি একগাঁদা পোশাক নিয়ে ফিরে আসবে। সেজন্যে এই ঘরে যদি কার্লোস সংক্রান্ত কোনো কিছু থেকে থাকে তবে সেটা খুব দ্রুত খুঁজতে হবে। আর সেটা ডেস্কের আশেপাশে অথবা ডেস্কেই থাকার কথা।

জেসন ছবি দেখা বাদ দিয়ে ডেস্কটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। রিসিপ্ট, বিল আর চিঠিপত্রের সাথে একটা এ্যাড্রেস বুক আছে। চারটা নাম আছে প্রথম পৃষ্ঠায়। নামগুলো, কোম্পানিগুলোর ঠিকানা আর ফোন নাম্বার মুখস্ত করতে পারলে ভালোই হতো, সে আপন মনে বললো। তাই যখন করতে যাবে ঠিক এমন সময় তার চোখ গেলো টেলিফোনটার নিচে একটা ইনডেক্সের দিকে। ফোনের নিচে থাকার কারণে অল্প একটু অংশই দেখা যাচ্ছে। আর সেখানে আরো একটা জিনিসও আছে—শুকনো, সহজে চোখে পড়ে না। ট্রান্সপারেন্ট টেপের একটা টুকরো। ইনডেক্সে কার্ডটার প্রান্ত ছুঁয়ে সেটাকে আঁটকে রেখেছে। টেপটা অপেক্ষাকৃত নতুন, সাম্প্রতিক সময়ে লাগানো হয়েছে।

বর্ন টেলিফোনটা সরাতে সেটা বেজে উঠলে আবারো ওটা ডেস্কে রেখে দিলো। এরপরই এক লোক ঘর ঢুকলে একটু সরে গেলো সে। লোকটা আচমকা থেমে বর্নের দিকে চেয়ে রইলো। তার চোখেমুখে সতর্কতা থাকলেও কিছুই বললো না। দ্বিতীয়বার ফোনটা বেজে উঠলে লোকটা এগিয়ে এসে ফোনটা তুলে নিলো।

“আলো?” লোকটা মাথা নিচু করে চুপচাপ শুনে গেলো। মধ্যবয়সী, পেশীবহুল একজন। সূর্যের আলোয় তামাটে চামড়া বয়সটাকে বিভ্রান্ত করছে। লোকটা অন্য হাতে ফোনটা নিয়ে রুক্ষভাবে বললো, “পাস ইসি। সে পাস। তেলিফোনজে প্লাস তর্দ...” ফোনটা রেখে সে জেসনের দিকে চেয়ে রইলো। “অউ এশ জ্যাকুলিন?”

“আন্তে বলুন, প্রিজ,” বর্ন ইংরেজিতে মিথ্যেটা বললো। “আমার ফ্রেঞ্চ খুব একটা ভালো না।”

“দুঃখিত,” তামাটে বর্ণের লোকটা জবাব দিলো। “আমি মাদাম লাভিয়াকে খুঁজছি।”

“মালিক?”

“হ্যা। সে কোথায়?”

“আমার টাকার শ্রাঙ্ক করছে,” জেসন হেসে গ্রাসটা ঠোঁটের কাছে ধরলো।

“ওহ? আপনি কে, মঁসিয়ে?”

“আপনি কে?”

লোকটা বর্নকে খুঁটিয়ে দেখলো।

“রেনে বারগোয়া।”

“ওহ, ঈশ্বর!” জেসন উচ্ছ্বাসে বললো। “সে তো আপনাকেই খুঁজছে। আপনি তো অসাধারণ, মি: বারগোয়া। সে বলেছে আপনার কাজগুলোকে আমি যেনো উদীয়মান একজন মাস্টারের কাজ হিসেবে দেখি।” বর্ন আবারো হাসলো। “আপনার জন্যেই তো আমি বাহ্যমাতে ফোন করে প্রচুর টাকা চেয়ে পাঠিয়েছি।”

“আপনার দয়া, মঁসিয়ে। আমার ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি আবারো।”

“আপনি বরং ফোনের জবাব দিন। আমাকে নিয়ে ভাববেন না।”

“ক্রেতা, সরবরাহকারী, সব হাউকাউ মার্কা গর্দভ। আমি কার সাথে কথা বলছি, মঁসিয়ে?”

“বৃগ্‌স্‌,” কোথেকে এ নামটি সে পেলো সে সম্পর্কে জেসনের কোনো ধারণাই নেই। বেশ অবাকই হলো সে। “চার্লস্‌ বৃগ্‌স্‌।”

“আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আনন্দিত হলাম,” বারগোয়া তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। “আপনি বলছেন জ্যাকুলিন আমাকে খুঁজছে?”

“মনে হচ্ছে আমার প্রয়োজনেই।”

“তাকে খুঁজে বের করি তাহলে।” ডিজাইনার খুব দ্রুত চলে গেলো।

জেসন ডেস্কের কাছে গিয়ে দরজার দিকে চোখ রাখলো। তার হাত টেলিফোনটার উপর। ফোনটা সরিয়ে ইনডেক্সটা দেখলো সে। দুটো ফোন নাম্বার আছে সেখানে। প্রথমটি দেখেই চেনা যাচ্ছে, জুরিখের এক্সচেঞ্জ নাম্বার, দ্বিতীয়টি অবধারিতভাবেই প্যারিসের।

তার ধারণাই ঠিক। নাম্বার দুটোর দিকে তাকালো সে। ওগুলো মুখস্ত ক’রে ফোনটা আবার আগের জায়গায় রেখে ডেস্ক থেকে সরে দাঁড়ালো।

ডেস্ক থেকে সরতেই মাদাম লাভিয়া ঘরে ঢুকলো হুড়মুড় ক’রে। তার হাতে আধডজন পোশাক। “সিঁড়িতে রেনের সাথে দেখা হয়েছে। সেও আমার পছন্দগুলো বেশ পছন্দ করেছে। সে আরো জানালো, আপনার নাম বৃগ্‌স্‌, মঁসিয়ে।”

“আমি সেটা নিজেই আপনাকে বলতাম,” বর্ন বললো একটু হেসে। “তবে আমার মনে হয় না আপনি আমার নামটা জানতে চেয়েছিলেন।”

“ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে। এখানে আমি আপনার জন্যে খাদ্য নিয়ে এসেছি!” সে পোশাকগুলো আলাদা আলাদা ক’রে কয়েকটা চেয়ারের উপর রাখলো। “আমি সত্যি বিশ্বাস করি এগুলো আমাদের দেয়া রেনের সবচাইতে সেরা কাজ।”

“তার দেয়া? তাহলে সে এখানে কাজ করে না?”

“কথার কথা আর কি। তার স্টুডিওটা করিডোরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। তবে সেটা একটা পবিত্র জায়গা। আমি নিজেও ওখানে ঢুকলে কাঁপতে শুরু করি।”

“এগুলো অসম্ভব সুন্দর,” একটার পর একটা কাপড় দেখতে দেখতে বর্ন বললো। “তবে আমি আমার ডার্লিংকে ঘাবড়ে দিতে চাই না।” তিনটি পোশাক দেখিয়ে সে বললো। “আমি এগুলো নিচ্ছি।”

“চমৎকার পছন্দ, মঁসিয়ে বৃগ্‌স্‌!”

“বাক্সে ক’রে দেবেন কি।”

“অবশ্যই। সে নির্ধারিত ভাগ্যবতী এক মেয়ে।”

“বলতে পারেন একজন ভালো সঙ্গী, তবে বাচ্চা মানুষ। বঞ্চে যাওয়া এক বাচ্চা। আমি খুব বেশি বিদেশে থাকি, তাকে খুব একটা সময় দিতে পারি না। তাই আমার মনে হয় আমার উচিত হবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই একটা কারণে আমি

তাকে কেইপ ফেরেতে পাঠিয়েছি।” সে হেসে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করলো। “লা ফ্যাকচার, সিল ভু পুইত?”

“আমি একটা মেয়েকে এসব দিয়ে দিচ্ছি,” মাদাম লাভিয়া টেলিফোনের পাশে ইন্টারকমটার বোতাম চাপলো। “আরেকটু ব্র্যান্ডি নেবেন, মঁসিয়ে?” বললো সে।

“মাখসি বুঁয়ো,” বর্ন তার গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলে গ্লাসটা নিয়ে বারের দিকে গেলো। জেসন জানে তার যে পরিকল্পনা সেটার সময় এখনও হয় নি। তবে খুব জলদিই আসবে—এখন নয়। এবার ম্যানেজিং পার্টনারের সাথে ভাব জমালো সে। “বারগোঁয়া,” সে বললো। “আপনি বলছেন তার সাথে আপনাদের চুক্তি আছে?”

মাদাম লাভিয়া ঘুরে তাকালো। “ওহ্ হ্যা। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ, একটা পরিবারের মতো আর কি।”

বর্ন তার ব্র্যান্ডিটা নিয়ে মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে ব’সে পড়লো। “এটা খুবই ভালো একটি ব্যবস্থা,” সে উদ্দেশ্যহীনভাবেই বললো।

লম্বা, ছিপছিপে যে মেয়েটির সাথে সে অফিসে ঢোকার সময় প্রথম কথা বলেছিলো, সেই ক্লার্ক মেয়েটি হাতে একটি সেলস্ বুক নিয়ে ঢুকলে লাভিয়া মেয়েটিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলো। তারপর সেলস্ বুকটা হাতে নিয়ে জেসনের দিকে বাড়িয়ে বললো, “ভইসি লা ফ্যাকচার, মঁসিয়ে।”

বর্ন মাথা ঝাঁকালো, জানালো খাতিয়ে দেখার দরকার নেই। “কমবুঁয়ো?” জিজ্ঞেস করলো সে।

“ভিস্ত-মিলে, সোঁয়াতে ফ্রাঁ, মঁসিয়ে,” লাভিয়া জানালো। জেসনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো সে।

কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। জেসন পাঁচ হাজার ফ্রাঁ’র নোটগুলো বের ক’রে তাকে দিলে টাকা আর পোশাক নিয়ে উত্তেজক ভঙ্গীতে হেটে ঘর থেকে চলে গেলো মেয়েটা।

“আপনার ভাংতি টাকাগুলো নিয়ে আসার সময় সবগুলো পোশাক প্যাকেজ ক’রে নিয়ে আসবে।” লাভিয়া তার নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলো। “এখান থেকে আপনি ফেরেতে যাচ্ছেন। খুবই চমৎকার জায়গা।”

টাকা পরিশোধ করা হয়ে গেছে। সময় এসে গেছে এখন। “ঐ কিভার গার্টেনে ফিরে যাবার আগে প্যারিসে শেষ রাতটা কাটাবো,” জেসন বললো, গ্লাসটা তুলে টোস্ট করলো ঠাট্টাচ্ছিলো।

“হ্যা। আপনি বলেছেন আপনার বান্ধবীর বয়স খুবই কম।”

“বলতে গেলে একেবারে বাচ্চা, তবে মেয়েটা সঙ্গী হিসেবে ভালো। কিন্তু আমি একটু পরিণত বয়সের মেয়েই বেশি পছন্দ করি।”

“আপনি অবশ্যই তাকে খুব পছন্দ করেন,” লাভিয়া পাল্টা বললো নিজের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে। “আপনি তার জন্যে দারুণ সুন্দর আর দামি জিনিস কিনে দিচ্ছেন।”

“সে যা করেছে সে তুলনায় এটা একেবারেই নগন্য।”

“সত্যি!”

“সে আমার স্ত্রী, সত্যি বলতে কি তৃতীয় স্ত্রী। তবে বাহামাতে আমি এটা গোপন রেখেছি। এখানে হোক আর ওখানে হোক, আমার জীবনটা একেবারেই নিয়মের মধ্যে চলে।”

“আমিও তাই মনে করি।”

“কয়েক মিনিট আগে বাহামা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার একটা চিন্তা মাথায় এসেছে। এজন্যেই আমি বারগোয়ার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম।”

“সেটা কি?”

“আপনি হয়তো ভাববেন আমি খুব তাড়াহুড়া করছি। তবে আপনাকে আশ্বস্ত করছি, আমি তা করছি না। আসলে আমার যখন কোনো কিছু মনে আসে আমি সেটা প্রকাশ করি। যেহেতু বারগোয়া আপনার খুব দামি একটি রত্ন, তাই আপনি কি বাহামাতে কোনো শাখা খোলার কথা ভেবেছেন?”

“বাহামায়?”

“এবং দক্ষিণ দিকে। মানে ক্যারিবিয়ানে।”

“মঁসিয়ে, এটাই আমরা চালাতে হিমশিম খাই। বাইরে কোনো কিছু পরিচালনা করাটা অনেক ঝামেলার হবে।”

“আপনি যেমনটি ভাবছেন তেমনটি হবে না। স্থানীয় লোকেরাই সব করবে, আপনারা কেবল তদারকি করবেন আর পার্সেন্টিজ পাবেন।”

“তাতেও তো বেশ টাকা লাগবে, মঁসিয়ে বৃগস্।”

“শুরুতে কিছু টাকা লাগবে। সেটাকে আপনি প্রবেশ ফি বলতে পারেন। টাকাটা বেশি হলেও অসম্ভব কিছু না। তাছাড়া ওখানে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে। ভালো ব্যবস্থাপনা করে তারা।”

“আপনি তাদের চেনেন?”

“খুব চিনি। আমার মনে হয় আইডিয়াটার মূল্য আছে। আপনার লেবেলটারও মূল্য আছে—লো ক্লাসিক, প্যারিস, গ্র্যান্ড বাহামা...কানিল বে, এরকম আর কি।” বর্ন বাকি ব্র্যান্ডটুকু পান ক’রে ফেললো। “হয়তো আপনি ভাবছেন আমি পাগল। মাঝে মাঝে আমি আমার পছন্দের জিনিসের জন্যে ডলার বিনিয়োগ করি। ঝুঁকি নেই।”

“ঝুঁকি?” জ্যাকুলিন লাভিয়া আলতো ক’রে চুলে হাত দিয়ে বললো।

“আমি কেবল আইডিয়া দেই না, সেগুলো বাস্তবায়ন করতেও সাহায্য করি।”

“কে বলেছে?”

“তুমি সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো না।”

“আমি জিজ্ঞেস করছি!”

“আমার কথা শোনো। গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমি বাড়িতে নেই। বারো ঘণ্টা ধরে আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করো—আমি তোমাকে ফিরে আসার কথা বলছি না। এটা তোমার গভর্নমেন্টের আদেশ।”

“আদেশ? কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই?”

“তাই। তারা চায় তুমি এসব থেকে দূরে থাকো। তারা তাকে সম্পূর্ণ একা ক’রে ফেলতে চায়।”

“দুঃখিত, এ্যালান—এটা হবে না। গুডবাই,” সে ফোনটা রেখে দিয়ে নিজের হাতটার কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করলো। ওহ, ঈশ্বর, সে তাকে খুবই ভালোবাসে... আর তারা তাকে খুন করার চেষ্টা করছে। জেসন, আমার জেসন। তারা সবাই তোমাকে খুন করতে চায়। কিন্তু কেন?”

সুইচবোর্ডের মধ্যবয়সী লোকটি লাল ক্রিপটাতে আঘাত করলে লাইনগুলো আর ব্লক হয়ে থাকলো না। সব ইনকামিং কলকে বিজি সিগনাল দিচ্ছিলো সেটা।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। খুব বেশি আগে নয়, যখন অন্যেরা তার জন্যে সুইচবোর্ডের সামনে ব’সে থাকতো তার সায়গনের কোম্পানি আর মেকং অফিসের কমিউনিকেশন রুমে। আর এখন, এখানে সে ব’সে আছে অন্য একজনের জন্যে।

সিঁড়িতে হাসাহাসির শব্দ শুনে সেদিকে তাকালো সে। জ্যাকুলিন বেশ তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই বেশ ধনী একজনের সাথে। জ্যাকুলিন সুরক্ষিত স্বর্ণখনি থেকেও সোনা তুলে নিয়ে আসতে পারে—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে লোকটাকে সে দেখতে পায় নি। সে জ্যাকুলিনের অন্য পাশে আছে, তার মুখটা অদ্ভুতভাবেই অন্য দিকে ঘোরানো।

তারপর এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলো সেই মুখটা। তাদের চোখাচোখি হলো। খুবই সর্গক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট। ধূসর চুলের সুইচবোর্ড অপারেটরের নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বাস আর বিশ্বাসের দোলাচালে দুলতে লাগলো সে। যে মুখটা দেখলো সেটা অনেক বছর ধরেই দেখে নি।

হায় ঈশ্বর—সে এখানে!

সুইচবোর্ড থেকে লোকটা অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়ালে মাউথপিসটা কান থেকে খুলে ফেলতেই সেটা মাটিতে পড়ে গেলো। প্রাটফর্ম থেকে বের হয়ে এসে জ্যাকুলিন লাভিয়ার সাথে ভূতটাকে ভালো ক’রে দেখার জন্যে তাকালো সে। এই ভূতটা

একজন খুনি—পাক্কা খুনি। তারা তাকে বলেছিলো এটা ঘটবে, তবে সে একটুও বিশ্বাস করে নি। এখন করছে। সে-ই তো!

তাদের দু'জনকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে থামাতে হবে। মহিলাকে থামাতে হবে! কিন্তু দৌড়ে চিৎকার ক'রে এটা করতে গেলে মহিলা মারা যাবে। মাথায় একটা বুলেট বিদ্ধ হবে সে।

দরজার কাছে পৌঁছাতেই জেসন দরজা খুলে লাভিয়াকে বের হতে দিলো। তারা এখন রাস্তায়। ধূসর চুলের লোকটা সামনের একটা জানালার কাছে দৌড়ে চলে এলো। বাইরের রাস্তায় একটা ট্যাক্সি থামালো জেসন। দরজাটা খুলে দিচ্ছে সে। জ্যাকুলিনকে দূরত্রে ইশারা করছে। হায় ঈশ্বর। জ্যাকুলিন চলে যাচ্ছে!

মধ্যবয়সী ধূসর চুলের লোকটা দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো। তার গন্তব্য এখন স্টুডিও।

“রেনে! রেনে!” ভেতরে ঢুকেই চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো সে।

বারগোয়া স্কেচ করছেলো। মুখ তুলে তাকাতেই খুব অবাক হলো সে। “কি হয়েছে?”

“জ্যাকুলিনের সাথে ঐ লোকটা কে? সে এখানে কতোক্ষণ ধ'রে আছে?”

“ওহ্, সম্ভবত আমেরিকান,” ডিজাইনার বললো। “তার নাম বৃগস্। খুবই ধনী লোক। আজকে আমাদের বিক্রির অবস্থাটা বেশ ভালো ক'রে দিয়ে গেছে সে।”

“তারা কোথায় গেলো?”

“আমি জানি না, তারা যেকোনো জায়গায় যেতে পারে।”

“সে ঐ লোকটার সাথে গেছে।”

“আমাদের জ্যাকুলিন, তার রুচি আছে বলতে হবে।”

“তাদেরকে খুঁজে বের করো। জ্যাকুলিনকে ধরতে হবে!”

“কেন?”

“সে জেনে গেছে। সে জ্যাকুলিনকে খুন করবে!”

“কি?”

“আরে ঐ লোকটাই সেই লোকটা! কসম খেয়ে বলছি! ঐ লোকটাই কেইন!”

অধ্যায় ১৫

“সেই লোকটা হলো কেইন,” কর্নেল জ্যাক ম্যানিং সরাসরি বললো কথাটা। যেনো পেট্যাগনের কনফারেন্স টেবিলে তিনজন সিভিলিয়ান সদস্যের কেউ তার সাথে দ্বিমত পোষণ করছে। তারা প্রত্যেকেই তার চেয়ে বয়সে বড়। আর তারা নিজেদেরকে তার তুলনায় অনেকে বেশি অভিজ্ঞও মনে করে। তাদের কেউই এটা মানতে প্রস্তুত নয় যে, তাদের নিজেদের সংগঠন যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনী খবরটা যোগাড় ক’রে ফেলেছে। চতুর্থ সিভিলিয়ান ব্যক্তিটি এখানে থাকলেও তার মতামত গণ্য করা হবে না। সে কংগ্রেসনাল ওভারসাইট কমিটির সদস্য। “আমরা যদি এখনই কিছু না করি,” ম্যানিং আবারো বলতে লাগলো, “তাহলে আমরা যা জেনেছি তা জানাজানি হবার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সে আবারো জাল ফস্কে বেরিয়ে যাবে। ঠিক যেমনটি হয়েছিলো এগারো দিন আগে। সে ছিলো জুরিখে। আমরা নিশ্চিত সে এখনও ওখানেই আছে। আর ভদ্র মহোদয়গণ, সে-ই কেইন।”

“এটা একটা বক্তব্য বটে,” ন্যাশনাল সিকিউরিটির টেকো মাথার অধ্যাপক আলফ্রেড জিলেট বললো। তাদের প্রত্যেকের হাতে জুরিখের ঘটনার উপর রিপোর্টের কপি দেয়া আছে। সে ওটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কথাটা বললো। ব্যক্তিগত স্ক্রিনিং এবং মূল্যায়নে একজন অভিজ্ঞ লোক সে। পেট্যাগন তাকে বেশ প্রতিভাবান মনে করে। তার রয়েছে উঁচু তলার অনেক বন্ধুবান্ধব।

“আমি এটাকে খুব অভূতপূর্ব হিসেবেই দেখছি,” সিআইএ’র অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর পিটার নোলটন বললো। পঞ্চাশের ঘরে বয়স হলেও এই লোকটা ত্রিশ বছর আগের একজন আই.ভি.লিগারের মতো পোশাক-আশাক পরে থাকে। “আমাদের সোর্স এগারো দিন আগে কেইনকে ব্রাসেল্‌সে দেখেছিলো, জুরিখের নয়। আমাদের সোর্সদের খুব কমই ভুল হয়।”

“এটাও একটা বক্তব্য বটে,” তৃতীয় সিভিলিয়ান ব্যক্তিটি বললো, এই ঘরের একমাত্র ব্যক্তি যাকে ম্যানিং শ্রদ্ধা করে। সে এখানে সবচাইতে বয়স্ক, তার নাম ডেভিড অ্যাবোট। একজন সাবেক অলিম্পিক সাঁতারু, শারিরীক সক্ষমতার মতোই তার রয়েছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তার বয়স এখন ষাটেরও বেশি। তবে তার শরীর আর মন এখনও সতেজ রয়েছে। ভেতরে যা-ই হোক না তার মুখে সেটা কখনও প্রকাশ হয় না। গোপন অপারেশনের বোবা সন্ধ্যাসী নামে পরিচিত ছিলো এক সময়, সেই থেকে সংক্ষিপ্ত হয়ে কেবল সন্ধ্যাসী নামেই এখন সে সমধিক পরিচিত। সে জানে

সে কি বলছে, কর্নেল ভাবলো। যদিও সে বর্তমানে শক্তিশালী ফর্টি কমিটিতে আছে, তবে এর আগে সে দীর্ঘদিন সিআইএ'তে ছিলো, অবশ্য সিআইএ'র তখন নাম ছিলো ওএসএস। “আমার সময়কালে এজেন্সিতে,” চিবিয়ে চিবিয়ে অ্যাবোট বললো, “সোর্সেরা প্রায়শই চুক্তিবদ্ধ থাকতো।”

“তথ্য খতিয়ে দেখার জন্যে আমাদের কাছে অনেক পদ্ধতি রয়েছে,” অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টর বললো। “কোনো অশ্রদ্ধা না করেই মি: অ্যাবোটকে আমি বলছি, আমাদের ট্রান্সমিশন যন্ত্র আমাদেরকে সরাসরি আর দ্রুত খবর দিয়ে থাকে।”

“ঐ যন্ত্রটা ভেরিফিকেশন করা হয় নি। তবে আমি তর্ক করবো না। মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে ব্রাসেল্‌স অথবা জুরিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।”

“ব্রাসেল্‌সের তথ্যটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য,” নোলটন দৃঢ়ভাবে বললো।

“তাহলে সেটাই আগে শোনা যাক,” বললো টেকো মাথার জিলেট। “আমরা জুরিখের রিপোর্টটাতে ফিরে যাই, এটা সবার সামনেই আছে। আমাদের সোর্স আরো কিছু জানিয়েছে যা জুরিখ এবং ব্রাসেল্‌সের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে না। এটা ঘটেছিলো প্রায় ছয় মাস আগে।”

সাদা চুলের অ্যাবোট জিলেটের দিকে তাকালো। “ছয় মাস আগে? আমার তো মনে পড়ছে এন.এস.সি কেইনের ব্যাপারে ছয় মাস আগে কিছু ডেলিভারি দিয়েছিলো।”

“এটা পুরোপুরি কনফার্ম করা ছিলো না,” জবাবে বললো জিলেট। “আমরা কমিটিকে অসমর্থিত কোনো তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না।”

“এটাও তো একটা বক্তব্য হয়ে গেলো,” বললো অ্যাবোট।

“কংগ্রেসম্যান ওয়াল্টারস,” কর্নেল বোধ দিয়ে বললো। “আমরা শুরু করার আগে কি আপনার কোনো প্রশ্ন রয়েছে?”

“অবশ্যই রয়েছে,” টেনিসির কংগ্রেসম্যান ছোটো একটা হুকারই দিলো যেনো। তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো চারদিকে ঘুরছে। “তবে যেহেতু আমি এখানে নতুন। আপনারাই আগে শুরু করুন, পরে আমি আমার কথা বলবো।”

“খুব ভালো, স্যার,” কথাটা বলে ম্যানিং মাথা নাড়লো সিআইএ'র নোলটনের দিকে। “এগারো দিন আগে ব্রাসেল্‌সে কি হয়েছিলো?”

“প্রেস্ ফঁতোয়্য একজন খুন হয়েছিলো—মস্কো এবং পশ্চিমের সাথে ব্যবসা করে এরকম একজন ছদ্মবেশী ডিলার ছিলো সে। জেনেভায় অবস্থিত সোভিয়েত ফার্ম রুশোলমাজের একটি শাখা চালাতো। আমরা জানি যাত্রাপথে কেইন তার তহবিলটা অন্য মুদ্রায় বদলে নিয়েছিলো।”

“কেইনের সাথে এই খুনটার সম্পর্ক কি?” সন্দেহগ্রস্ত জিলেট জানতে চাইলো।

“প্রথমে বলতে গেলে বলতে হয়, পদ্ধতিটা। অস্ত্রটা ছিলো লম্বা সূঁচের। দিনের বেলায় জনাকীর্ণ স্কয়ারে বিদ্ধ করা হয়েছিলো সেটা। একেবারে নিখুঁতভাবে। কেইন এর আগেও এটা ব্যবহার করেছে।”

“এটা একদম সত্যি কথা,” অ্যাবোট একমত হলো। কয়েক বছর আগে একজন রুম্যানিয়ান ছিলো লন্ডনে। তার এক সপ্তাহ আগে সে মরেছে। মনে হচ্ছে দু’জনেই কেইনের হাতে খুন হয়েছে।”

“মনে হচ্ছে, কিন্তু নিশ্চিত নয়,” কর্নেল ম্যানিং বাঁধা দিয়ে বললো। “তারা উঁচু স্তরের রাজনৈতিক বেস্‌ম্যান। তাদেরকে কেজিবিও ঘায়েল ক’রে থাকতে পারে।”

“অথবা কেইন, সোভিয়েতদের চেয়ে খুব কম ঝুঁকির সাহায্যে,” সিআইএ’র লোকটা বললো।

“কিংবা কার্লোস,” জিলেট যোগ করলো। তার কণ্ঠটা চড়া। “কার্লোস আর কেইন, কেউই আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা দু’জনেই ভাড়া খাটে। সব ধরনের খুনের ব্যাপারে আমরা কেইনকে কেন দোষারোপ করি?”

“এটা আমরা করি তার কারণ, সোর্সগুলো একে অন্যের ব্যাপারে জানে না, অথচ তাদের তথ্য একরকম হয়,” নোলটন জবাব দিলো।

“এটা খুব বেশি নিখুঁত,” জিলেট ভিন্মত পোষণ ক’রে বললো।

“ব্রাসেলসে ফিরে যাই,” বললো কর্নেল। “যদি এটা কেইন হয়ে থাকে তবে সে কেন রুশোলমাজের একজন ব্রোকারকে খুন করবে? সে তো তাকে ব্যবহার করতো।”

“একজন ছদ্মবেশী ব্রোকার,” শুধরিয়ে দিলো সিআইএ’র ডিরেক্টর। “আমাদের ইনফর্মারদের ভাষ্য অনুযায়ী যেকোনো কারণেই সেটা সে করতে পারে। লোকটা একজন চোর। আর কেন হবে না? তার বেশির ভাগ ফ্রেতাই তো তাই। সে হয়তো কেইনকে ঠকিয়েছিলো, যদি সেরকম কিছু ক’রে থাকে তাহলে সেটা হবে তার শেষ ট্রানজাকশান। অথবা সে এতোটাই বোকা ছিলো যে, কেইনের পরিচয়টা খোঁজ ক’রে ছিলো। এটার সামান্যতম ইঙ্গিত পেলেও কেইন তাকে হত্যা করবে। কিংবা কেইন হয়তো তার সাম্প্রতিক সাক্ষীসাবুদগুলো মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। যাইহোক না কেন, কেইন-ই কাজটা করেছে।”

“আমি জুরিখের ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে পারলে অনেক কিছুই জানা যাবে,” ম্যানিং বললো। “আমি কি সামারিটা উত্থাপন করবো?”

“একটু দাঁড়ান, প্রিজ,” সল্ল্যাসী ডেভিড অ্যাবোট তার পাইপ জ্বালাতে জ্বালাতে বললো। “আমার বিশ্বাস আমাদের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য ছয় মাস আগের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন যার সাথে কেইনের ঘটনাটার সম্পর্ক রয়েছে। হয়তো আমাদের সেটাই আগে শোনা উচিত।”

“কেন?” জানতে চাইলো জিলেট। “এটা অনেক আগের ঘটনা, এর সাথে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই।”

“আমার ধারণা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড জানাটা আমাদেরকে সাহায্যই করবে। তারপর আমরা সামারিতে ফিরে যাবো,” সিআইএ’র সাবেক পাণ্ডা বললো।

“ধন্যবাদ আপনাকে, মি: অ্যাবোট,” কর্নেল বললো। “লক্ষ্য করবেন, এগারো দিন আগে জুরিখে চারজন খুন হয়েছে। তাদের মধ্যে লিমাট নদীর পার্কিং এলাকার একজন ওয়াচম্যানও আছে। ধরে নেয়া যায় সে কেইনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলো না। তবে মাঝখানে প’ড়ে প্রাণ হারিয়েছে। বাকি দু’জনকে একটা গলিতে পাওয়া গেছে শহরের পশ্চিম উপকূলে। তাদেরকে দেখে হত্যাকাণ্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ব’লে মনে হয়। হয়তো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা। খালি চতুর্থ ব্যক্তিটি বাদে। সে গলিতে খুন হওয়া লোকগুলোর সাথে সম্পর্কিত—তারা তিন জনই মিউনিখ আভারওয়াল্ডের লোক—আর সেও কেইনের সাথে জড়িত।”

“এটা চারনাক,” জিলেট সামারিটা দেখে বললো। “আমার ধারণা এটা চারনাক। আমি এই লোকটাকে কেইনের ফাইলে কোথাও পেয়েছিলাম।”

“হ্যা, তাই,” জবাব দিলো ম্যানিং। “এটা প্রথমে জি-টু রিপোর্টে এসেছিলো। আঠারো মাস আগে। তারপর আবার একবছর আগে তার সম্পর্কে জানা যায়।”

“তার মানে ছয় মাস আগে,” সন্ধ্যাসী আশ্তে ক’রে কথার মাঝখানে বলে জিলেটের দিকে তাকালো।

“হ্যা, স্যার,” কর্নেল আবারো বলতে শুরু করলো। “নরকের কীটের একটি যোগ্য উদাহরণ হলো এই চারনাক। যুদ্ধের সময় সে দাচাউ’তে অবস্থিত চেকোশ্লোভাকিয়ান আর্মিতে ছিলো। বীভৎসভাবে জেরা আর হত্যা করার এক ক্যাম্প হিসেবে যা পরিচিত। সে পোলিশ, স্লোভাক, আর ইহুদিদেরকে টর্চার করার পর শাওয়ারে পাঠাতো—সেখানে তথ্য আদায় ক’রে আশুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতো। যুদ্ধের পর সে পালিয়ে যায়, কিন্তু পালানোর সময় এক ল্যান্ড-মাইনে নিজের একটা পা হারায়। কেইন তাকে খুঁজে পেয়ে তাকে তার খুনখারাবির কাজে ব্যবহার করতো। টাকা দিয়ে পালতো তাকে।”

“একটু দাঁড়ান!” নোলটন বাঁধা দিয়ে বললো। “আমরা এই চারনাকের কাজকর্ম সম্পর্কে আগেও আলোচনা করেছি। আমাদের এজেন্সিই তাকে প্রথম উন্মোচিত করেছিলো, মনে পড়ে কি। আমরা তাকে বহু আগেই ফাঁস ক’রে দিতাম যদি আমাদের দেশ বন সরকারের কয়েকজন সোভিয়েত বিরোধী অফিশিয়ালের ব্যাপারে নাক না গলাতো। আপনি ধরে নিয়েছেন কেইন চারনাককে ব্যবহার করেছে। আপনি এটা আমাদের চেয়ে বেশি নিশ্চিত ক’রে জানেন না।”

“কিন্তু এখন তো জানি,” ম্যানিং বললো। “সাড়ে সাত মাস আগে আমরা এক লোকের ব্যাপারে জানতে পেরেছিলাম, যে ড্রেই এলপেনহসার নামে একটা রেস্টোরাঁ চালায়। আমরা জানতে পেরেছিলাম সে কেইন আর চারনাকের মাঝে একজন সংযোগস্থাপনকারী। আমরা তাকে এক সপ্তাহ নজরদারী করেছি কিন্তু কিছুই পাই

নি। সে জুরিখ আন্ডারওয়ার্ডের ছোটোখাটো একজন সদস্য। এই যা। তাকে নিয়ে আমাদের বেশি সময় ব্যয় করা ঠিক না।” কর্নেল থামলো। সবার চোখ তার উপরে দেখে খুশি হলো সে।

“আমরা যখন চারনাকের হত্যার খবরটা পেলাম তখন একটা জুয়া খেললাম। পাঁচ রাত আগে আমাদের দু’জন লোক ড্রেই এলপেনহসার রেস্টোরাঁটা বন্ধ হবার পর সেখানে লুকিয়ে ছিলো। তারা রেস্টোরাঁর মালিককে চেপে ধরে তাকে কেইনের হয়ে চারনাকের সাথে কাজ করার জন্যে অভিযুক্ত করে। লোকটা একেবারে হাউমাউ ক’রে কেঁদে তাদের পায়ে পড়লে তারা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো। সে নিজের সুরক্ষার জন্যে ভিক্ষা চায়। সে স্বীকার করেছে যে রাতে চারনাক খুন হয় সে রাতে কেইন জুরিখেই ছিলো। সে কেইনকে দেখেছে। চারনাকের সাথে তার কথাও হয়েছে।”

মিলিটারির লোকটা একটু থামলে ডেভিড অ্যাবোট আস্তে ক’রে শিষ বাজালো। “এটাও তো একটা বক্তব্য হয়ে গেলো,” শান্ত কণ্ঠে বললো সে।

“আপনার কাছে আসা সাত মাস আগে এই খবরটা কেন এজেন্সিকে জানানো হয় নি?” নোলটন জানতে চাইলো।

“ওটার সত্যতা জানা যায় নি।”

“আপনারা জানতে পেরেন নি, কিন্তু আমাদের কাছে এলে সেটা হয়তো অন্যরকম কিছু হতো।”

“সেটা সম্ভব। আমি মানছি তার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুব বেশি সময় ব্যয় করি নি। জনশক্তি ছিলো সীমিত। এজন্যে সব বিষয় নিয়ে সার্ভিলেন্স করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।”

“আমরা জানতে পারলে সেটা নিয়ে আলাপ করতে পারতাম।”

“আমরা আপনার সময় বাঁচিয়ে দিয়েছি।”

“ইঙ্গিতটা কোথেকে পেয়েছিলেন?” জিলেট জানতে চাইলো।

“গোপন একটা সোর্স থেকে।”

“আপনি সেটা মেনে নিয়ে ছিলেন?” বিস্মিত হয়ে বললো জিলেট।

“এই একটা কারণে আমাদের গুরুত্ব দিকে সার্ভিলেন্সটা সীমিত আকারে ছিলো।”

“হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি কখনও খতিয়ে দেখেন নি?”

“অবশ্যই দেখেছি। সেটাই তো স্বাভাবিক,” কর্নেল আয়েশ ক’রে জবাব দিলো।

“বোঝাই যাচ্ছে খুব কম উৎসাহের সাথে,” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ম্যানিং। তার চারপাশে কমসংখ্যক মিলিটারি ব্যক্তি থাকাটাই এই দীর্ঘশ্বাসের কারণ।

“ইনফর্মার এটা বেশ স্পষ্ট ক’রে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা যদি আরো অন্য কোনো শাখাকে জড়িত করি সে আর আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে না। আমাদের মনে হয়েছে সেটা মানা উচিত। এরকমটি আমরা আগেও করেছি।”

“আপনি কি বললেন?” পেন্টাগনের অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললো নোলটন।

“নতুন কিছু নয়, পিটার। আমরা সবাই আমাদের সোর্স নিয়োগ করি, রক্ষা করি তাদেরকে।”

“এ ব্যাপারে আমরা সচেতন আছি। এজন্যে আপনি ব্রাসেল্‌সের ব্যাপারে বলেন নি।”

নিরবতা। আলফ্রেড জিলেট প্রথম মুখ খুললো। “প্রায়শই বলে থাকেন ‘আমরা এটা আগেও করেছি,’ তাই না, কর্নেল?”

“কি?” ম্যানিং জিলেটের দিকে তাকালো। তবে সে সচেতন আছে ডেভিড অ্যাবোটের চোখ তাদের দু’জনের উপর। “আমি জানতে চাই আপনাকে কতোবার বলা হয়েছে যে, আপনার সোর্সকে নিজের কাছে রাখবেন।”

“আমার মনে হয় অনেকবার।”

“আপনার মনে হয়?”

“বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর কি।”

“আর আপনি, পিটার? এজেন্সির ব্যাপারটা কি?”

“পুরোপুরি বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।”

“হায় ঈশ্বর, এর মানে কি?” এতোক্ষণ চুপ ক’রে থাকা কংগ্রেসম্যান কথার মাঝখানে বললো। “আমাকে ভুল বুঝবে না, আমি এখনও শুরু করি নি। আমি কেবল ভাষাটা ধরতে চাচ্ছি।” সিআইএ’র লোকটার দিকে তাকালো সে। “আপনি এইমাত্র কি বললেন? কিসের বিস্তার?”

“বিস্তার, কংগ্রেসম্যান ওয়াল্টারস্। এটা কেইনের ফাইলে বিস্তারিতভাবে আছে। অন্য ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নজরে ইনফর্মারদের আনলে তাদেরকে হারানোর ঝুঁকি থাকে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি এটাই প্রচলিত আছে।”

“আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একটা বাছুরের টেস্টিউব করছেন।”

“যা ভুল তা বার বার ক্রশ চেক করা হয় না,” জিলেট বললো।

“শব্দের নতুন ব্যাখ্যা,” বললো সল্ল্যাসী। “তবে আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারলাম ব’লে মনে হচ্ছে না।”

“আমি বলবো এটা বেশ পরিষ্কার,” এনএসসি’র লোকটা কর্নেল ম্যানিং এবং পিটার নোলটনের দিকে তাকিয়ে বললো। “দেশের সবচাইতে কার্যক্ষম গোয়েন্দা সংস্থা কেইনের ব্যাপারে তথ্য পেয়েছে—বিগত তিন বছর ধরে—আর তাতে কোনো ক্রশ চেক করা হয় নি। আমরা সব ধরনের তথ্যই নির্ভরযোগ্য ডাটা হিসেবে গ্রহণ ক’রে থাকি। সেগুলো জমিয়ে রাখি।”

“আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ ক’রে আসছি—হয়তো অনেক দিন ধরেই। আমি মানছি—তবে এখানে এমন কিছু নেই যা আমি এর আগে শুনি নি,” অ্যাভোট বললো। “সোর্সগুলো খুবই ধূর্ত আর আত্মরক্ষাকারী হয়ে থাকে। তারা কেউই চ্যারিটি করতে আসে না। কেবল লাভ আর টিকে থাকার জন্যে কাজ করে তারা।”

“আমার আশংকা হচ্ছে আপনি আমার পয়েন্টটা এড়িয়ে যাচ্ছেন,” চশমাটা খুলে বললো জিলেট। “আমি আগেও বলেছি কেইনের সাম্প্রতিক অনেকগুলো গুণ্ডহত্যার ব্যাপারে সতর্ক ক’রে দিয়েছিলাম। তাকে আমার আমাদের কালে সবচাইতে সফল গুণ্ডঘাতক ব’লে মনে হয়—সম্ভবত ইতিহাসে। এখন তাকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এটা ভুল। আসলে কার্লোসের ব্যাপারেই আমাদের বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। কার্লোসের খবর কি?”

“আমি আপনার বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছি, আলফ্রেড,” সন্ধ্যাসী বললো। “কার্লোসের সময় ফুরিয়ে গেছে, এখন কেইনের সময়। পুরনোর বদলে নতুনের আগমন হয়েছে। আমার সন্দেহ, পানিতে আরো বেশি হিংস্র হাঙরের আবির্ভাব ঘটেছে।”

“আমি এর সাথে একমত নই,” ন্যাশনাল সিকিউরিটির লোকটা বললো। “আমাকে ক্ষমা করবেন, ডেভিড, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কার্লোস এই কমিটিটাকে কুক্ষিগত ক’রে ফেলেছে। তার দিক থেকে মনোযোগ সরানোর অর্থ হলো আমরা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি একটা দাঁতহীন হাঙরের পেছনে ব্যয় করছি, যেখানে হিংস্র হাঙরটা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

“কার্লোসকে কেউ ভুলে যাচ্ছে না,” ম্যানিং বাঁধা দিয়ে বললো। “সে এখন কেইনের মতো কার্যক্ষম নয়, কেবল এটাই বলতে চাচ্ছি।”

“হয়তো,” শীতল কণ্ঠে বললো জিলেট। “কার্লোস চায় আমরা ঠিক এটাই বিশ্বাস করি। আর ঈশ্বর জানে, আমরা সেটা বিশ্বাসও করি।”

“আপনি কি এতে সন্দেহ করেন?” জানতে চাইলো সন্ধ্যাসী। “কেইনের সফলতার রেকর্ড খুবই অসাধারণ।”

“আমি কি সন্দেহ করতে পারি?” প্রতিধ্বনি করলো জিলেট। “এটাই হলো প্রশ্ন, তাই না? কিন্তু আমাদের কেউ কি নিশ্চিত হতে পারবে? এটাও একটা দামি প্রশ্ন। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পেন্টাগন আর সিআইএ আক্ষরিক অর্থেই স্বনির্ভরভাবে কাজ ক’রে যাচ্ছে। এমন কি নিজেদের সোর্সের যথার্থতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই।”

“এই শহরের কোনো নিয়ম খুব সহজেই প্রবর্তিত হয় না,” সন্ধ্যাসী বললো। তাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে এখন।

আবারো কথার মাঝখানে কথা বললো কংগ্রেসম্যান। “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, মি: জিলেট?”

“আমি ঐ ইলিচ রামিরেজ সানচেজের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আরো তথ্য জানতে চাই। সেই—”

“কার্লোস,” কংগ্রেসম্যান বললো। “তার উপরে আমি কিছু লেখা পড়েছি ব’লে মনে হচ্ছে। ধন্যবাদ আপনাকে। বলে যান।”

ম্যানিং দ্রুত বললো। “আমরা কি আবার জুরিখে ফিরে যেতে পারি, প্রিজ। আমাদের রিকমেন্ডেশন হলো, কেইনের পিছু নিতে হবে আর সেটা এখনই। আমরা ভারত্বের ওয়েন্টে-এ কথাটা ছড়িয়ে দিতে পারি। আমাদের সব ইনফর্মারদেরকে জড়ো করতে পারি, জুরিখ পুলিশকে সহযোগীতা করার জন্যে অনুরোধ করতে পারি। আমরা আর একটা দিনও নষ্ট করতে পারি না। জুরিখের লোকটাই কেইন।”

“তাহলে ব্রাসেল্‌সেরটা কে?” জানতে চাইলো সিআইএ’র নোলটন। সে সবচাইতে বেশি প্রশ্ন করছে। “খুন করার পদ্ধতিটা কেইনের মতোই। ইনফর্মারদের কথাও তো মিলে যায়। তাহলে সেটার উদ্দেশ্য কি?”

“অবশ্যই আপনাকে ভুয়া তথ্য দেয়া,” জিলেট বললো। “আর জুরিখে কোনো কিছু করার আগে আমি বলবো আপনি কেইনের সবগুলো ফাইল ঘেটে রি-চেক করুন। আপনার ইউরোপিয়ান স্টেশনের সব ইনফর্মাররা, যারা অযৌক্তিকভাবে আবির্ভূত হয় তথ্য দেবার জন্যে, তাদেরকে গুটিয়ে আনুন। আমার একটা আইডিয়া আছে, আপনি এমন কিছু খুঁজে বের করুন যা আপনি প্রত্যাশা করেন না : রামিরেজ সানচেজের চমৎকার লাতিন হাতটা।”

“যেহেতু আপনি বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে জন্যে চাপাচাপি করছেন, আলফ্রেড,” বললো অ্যাবোট। “তাহলে ছয় মাস আগে সংঘটিত অসমর্থিত ঘটনাটা আমাদেরকে বলছেন না কেন। এটা হয়তো অনেক সাহায্যে আসবে।”

এই প্রথম ন্যাশনাল সিকিউরিটির সদস্যকে দ্বিধাগ্রস্ত ব’লে মনে হচ্ছে। “কেইন মার্সেইর পথে রওনা দিয়েছে ব’লে অঁয়ে প্রভিন্সের এক নির্ভরযোগ্য সোর্সের কাছ থেকে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে খবরটা পাই।”

“আগস্ট?” কর্নেল বিস্মিত হলো। “মার্সেই? এটা তো লিল্যান্ড! অ্যাথাসেডর লিল্যান্ড গুলিবিদ্ধ হন মার্সেই’তে। আগস্টে!”

“কিন্তু কেইন রাইফেল থেকে গুলিটা ছোড়ে নি। ওটা কার্লোসের কাজ ছিলো। এই খবরটা একদম নিশ্চিত। ব্যালিস্টিক মার্কিংগুলো আগের গুলুহত্যার সাথে মিলে যায়। তিন তিন জনের কাছ থেকে এক অজ্ঞাত কালো চুলের ভাড়াটে লোকের বর্ণনা পাওয়া গেছে, তারা তাকে ওয়াটারফ্রন্ট হাউজের চতুর্থ এবং পঞ্চম তলায় দেখেছে। একটা ব্যাগ ছিলো তার সাথে। লিল্যান্ডকে যে কার্লোস খুন করেছে সে ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই।”

“ঈশ্বরের দোহাই,” গর্জে উঠলো অফিসার। “এটা তো ঘটনার আগে, খুনের আগে। কে করেছে সেটা জানি না, তবে লিল্যান্ডের ব্যাপারে একটা কনট্রাস্ট ছিলো—এটা কি আপনার মনে উদয় হয় নি? আমরা যদি কেইনের ব্যাপারটা জানতাম তাহলে আমরা লিল্যান্ডকে রক্ষা করতে পারতাম। তিনি আমাদের মিলিটারির সম্পদ ছিলেন। ধাত্তারিকা, তাহলে আজ বেঁচে থাকতেন তিনি!”

“আমার তা মনে হয় না,” জিলেট শান্ত কণ্ঠে বললো। “লিল্যান্ড এমন লোক ছিলেন না যে, বাঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন। অস্পষ্ট কোনো সতর্কতায় কোনো কাজই হতো না। তাছাড়া আমাদের কৌশলটা যদি একসঙ্গে ধরে রাখা যেতো, তাহলে লিল্যান্ডকে সতর্ক করে দিলে হিতে বিপরীত হতো।”

“কিভাবে?” রুক্ষভাবে জানতে চাইলো সল্ল্যাসী।

“আমাদের সোর্স সেই সময় মধ্যরাতে কেইনের সাথে যোগাযোগ করে, আগস্টের ২৩ তারিখ ভোর তিনটায় আবার তার সঙ্গে দেখা করে রুই সারাসিনে। লিল্যান্ডকে পঁচিশ তারিখের আগপর্যন্ত দেখা যায় নি। যেমনটি বলেছি, সেটা যদি জানতাম তবে কেইনকে বিরত করা যেতো। তা হয় নি, কেইনকেও আর দেখা যায় নি।”

“আর আপনার সোর্স একমাত্র আপনার সাথেই যোগাযোগ রাখার জন্যে চাপাচাপি করেছে,” সল্ল্যাসী বললো। “বাকি সবাইকে বাদ দিয়ে।”

“হ্যাঁ,” জিলেট মাথা নেড়ে বললো। নিজের বিবৃত হওয়াটা লুকাতে পারলো না। “আমাদের মনে হয়েছিলো লিল্যান্ডের ঝুঁকিটা অপসারিত হয়েছে—যার ফলে কেইন এসে হাজির হয় দৃশ্যপটে—আর তাকে ধরার মতো সুযোগটিও এসে গিয়েছিলো। অবশেষে আমরা একজনকে পেয়েছি, যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে কেইনকে চিহ্নিত করেছে। আপনাদের কেউ কি এটা অন্য কোনোভাবে সামলাতে পারতেন?”

নিরব। এবার নিরবতা ভাঙলো টেনিসির কংগ্রেসম্যান। “জিশুস্ট, সর্বশক্তিমান....কি সব যাচ্ছেতাই ব্যাপার।”

নিরবতা। সল্ল্যাসী ডেভিড অ্যাবোটের বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠটা সেই নিরবতা ভাঙলো। “পাহাড় থেকে নেমে আসা মুসা নবীর মতো একজন সং ব্যক্তি হিসেবে আমি কি আপনার প্রশংসা করবো, স্যার? সত্য হলো, আপনি এইসব অতি গোপন তথ্যে উত্তেজিত নন, এটা আপনার কাছে বরং স্বস্তির ব্যাপার।”

“আমার মনে হয় না কংগ্রেসম্যান পুরোপুরি—”

“ওহ্, চুপ করুন, পিটার,” বললো সল্ল্যাসী। “আমার মনে হয় কংগ্রেসম্যান কিছু বলতে চান।”

“একটু বলছি,” ওয়াল্টার্স বললো।

“আমি ভেবেছিলাম আপনারা সব মিলিয়ে একুশজন। মানে, আপনারা একুশজন এটা তদন্ত করছেন। এরই মধ্যে আপনারা আরো ভালো কিছু জেনে

যাবেন। আপনাদের তো বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা বলার কথা, একে অন্যের সাথে তথ্য বিনিময় ক'রে প্রত্যেকের গোপনীয়তাকে সম্মান দিয়ে সমাধানে পৌঁছানোর কথা। তার বদলে আপনারা একদল বাচ্চা ছেলের মতো এমনভাবে কথাবার্তা বলছেন, লাফাচ্ছেন যেনো কে কার আগে সস্তা চকোলেট পেতে পারেন। এটা ট্যাক্সদাতাদের মূল্যবান অর্থের অপচয়।”

“আপনি খুব বেশি সরলীকরণ ক'রে ফেলছেন, কংগ্রেসম্যান,” বললো জিলেট। “আপনি একটা কাল্পনিক ফ্যাক্ট-ফাইন্ডার মেকানিজমের কথা বলছেন। এরকম কোনো জিনিস আসলে নেই।”

“আমি যুক্তিবাদী মানুষের কথা বলছি। আমি একজন আইনজীবী। আর এই অভিশপ্ত সার্কাসে ঢোকার আগে আমি প্রতিদিন অনেক গোপন আর স্পর্শকাতর তথ্য নিয়ে কাজ কারবার করেছি। এসব আমার কাছে কি আর এমন নতুন?”

“আপনার বক্তব্যটা কি?” জ্ঞানতে চাইলো সল্ল্যাসী।

“আমি একটা ব্যাখ্যা চাইছি। আঠারো মাসেরও বেশি সময় ধরে আমি ব'সে আছি ‘গুপ্তহত্যা সাব কমিটি’র হাউজে। আমি হাজার হাজার পৃষ্ঠা ঘেটে দেখেছি শত শত নাম আছে তাতে, আর তার চেয়েও বেশি আছে তত্ত্ব। আমার মনে হয় না, এখানে কোনো ষড়যন্ত্র বা সন্দেহভাজন গুপ্তঘাতক আছে যার ব্যাপারে আমি অবগত নই। আমি ঐসব খিওরি আর নামগুলোর সাথে দুই বছর ধরে পরিচিত।”

“আমি বরং বলবো আপনার উপরে আমারদের অনেক আস্থা,” সল্ল্যাসী কথার মাঝখানে বললো।

“এজন্যেই তো আমি গুভার-সাইট চেয়ারে বসেছি। আমি ভেবেছিলাম আমি বাস্তবিকই কিছু অবদান রাখতে পারবো। তবে এখন আমি অতোটা নিশ্চিত নই। আমি আচম্কা এটা ভাবতে শুরু করেছি যে, আমি আসলে কি জানি।”

“কেন?” ম্যানিং বেশ রেগেই বললো।

“কারণ আমি এখানে বসে বসে তিন বছর ধরে আপনাদের চার জনের কাছ থেকে একটা অপারেশনের কিসসা শুনে যাচ্ছি। যাতে ইনফর্মার অফিসার, আর ইউরোপের প্রধান প্রধান সব পোস্টই জড়িত—সবই একজন গুপ্তঘাতককে নিয়ে, যার ‘কর্ম সফলতার’ তালিকা খুবই অসাধারণ। আমি কি ঠিক বলেছি?”

“বলে যান,” শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো সল্ল্যাসী। চোঁটে তার পাইপ ধরা। “আপনার প্রশ্নটা কি?”

“সে কে? মানে, কেইন লোকটা আসলে কে?”

অধ্যায় ১৬

নিরবতাটি ঠিক পাঁচ সেকেন্ড ক্ষণস্থায়ী হলো, সেই সময়ে চোখগুলো ঘুরে বেড়ালো একে অন্যের উপর। কয়েকজন গলা খাকারি দিলো, কিন্তু কেউ চেয়ার থেকে নড়লো না। এটা এমন, যেনো কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। টেনিসির পাহাড় থেকে নেমে আসা কংগ্রেসম্যান এফরেম ওয়াল্টার্সকে খুব সহজে এড়িয়ে যাওয়া গেলো না। আজ্ঞেবাজে জিনিসগুলো বেরিয়ে পড়লো ঠিকই।

তার পাইপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো ডেভিড অ্যাবোট। “কেইনের মতো লোক সম্পর্কে জনগণ যতো কম জানবে আমাদের ততোই মঙ্গল।”

“এটা তো আমার প্রশ্নের জবাব হলো না,” ওয়াল্টার্স বললো। “তবে আমি ধারণা করছি এটা কেবল প্রশ্নের উত্তরটার শুরু।”

“সেটাই। সে একজন পেশাদার গুপ্তঘাতক—খুবই প্রশিক্ষিত—জীবনসংহার করার পদ্ধতি জানা একজন বিশেষজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা আর বিশেষ জ্ঞানটি বিক্রির জন্যে; কোনো রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত অনুরক্ত নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। তার একমাত্র কাজ হলো মুনাফা করা—আর তার মুনাফা সরাসরি তার সুনামের সাথে আনুপাতিক হারে বাড়ে।”

কংগ্রেসম্যান মাথা নেড়ে সায় দিলো। “তাহলে এই সুনামটি চেপে রেখে আপনারা মুক্ত প্রচার আর বিজ্ঞাপনকে রোধ করে রেখেছেন।”

“ঠিক। পৃথিবীতে অনেক ম্যানিয়াক আছে যাদের সত্যিকার অথবা কল্পিত শত্রু রয়েছে, তারা যদি তার সম্পর্কে জানতে পারে তবে খুব সহজেই কেইনের দ্বারস্থ হবে। দুর্ভাগ্যবশত, সেটা হয়েও গেছে। আজ পর্যন্ত সরাসরি আটত্রিশটি খুন করেছে কেইন, আর বারো থেকে পনেরোটির ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করা হয়।”

“এটা হলো তার ‘কর্ম সম্পাদনের’ তালিকা?”

“হ্যাঁ। আর আমরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। প্রত্যেকটি নতুন খুন তার সুনামকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।”

“কিছুদিনের জন্যে লুকিয়ে ছিলো সে। একেবারে নিশ্চল ছিলো,” সিআইএ’র নোলটন বললো। “তখন আমরা ভেবেছি সে বুঝি মারাই গেছে। খুনিরা অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যাও করে থাকে। ভেবেছিলাম সে হয়তো তাই করেছে।”

“যেমন?” ওয়াল্টার্স জানতে চাইলো।

“মাদ্রিদের একজন ব্যাংকার যে আফ্রিকায় সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ইউরোপোলিটান কর্পোরেশনের পক্ষে ঘুষের টাকা দিতো, তাকে পসিয়ো দ্য লা

কাস্তেলানা'য় এক চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি করা হয়। এক ড্রাইভার কাম দেহরক্ষী তাকে এবং খুনি, উভয়কেই গুলি ক'রে হত্যা করে। কিছুদিন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম খুনটা কেইন করেছে।”

“ঘটনাটা আমার মনে আছে। এর জন্যে কে টাকা দিয়েছিলো?”

“যেকোনো কোম্পানি হতে পারে,” জিলেট জবাব দিলো। “যারা গোল্ডপ্লেটেড গাড়ি আর ইনডোর সরঞ্জাম স্বেচ্ছাচারদের কাছে বিক্রি করতে চায়।”

“আর কি? আর কারা?”

“ওমানের শেখ মুস্তাফা কালিগ,” কর্নেল ম্যানিং বললো। “সে একটা ব্যর্থ ক্যু'য়ে নিহত হয়।”

“তা নয়,” অফিসার বললো। “কোনো ক্যু প্রচেষ্টা ছিলো না, জি-টু ইনফর্মাররা সেটা নিশ্চিত করেছে। কালিগ মোটেও জনপ্রিয় ছিলো না, তবে অন্য শেখেরা বোকা নয়। ক্যু'য়ের গল্পটা আসলে গুপ্তহত্যাকে আড়াল করার জন্যে বলা হয়েছে, যা অন্য পেশাদার খুনিদেরকে প্রলুব্ধ করেছে। এজন্যে তিনজন ছোটোখাটো অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। কিছুদিন আমরা ভেবেছি তাদের একজন ছিলো কেইন। এসময়ে কেইনের সাথে সব রকম যোগাযোগ বন্ধ ছিলো।”

“কালিগকে খুন করার জন্যে কে টাকা দিয়েছিলো?”

“এটা আমরা নিজেদেরকে অসংখ্যবার জিজ্ঞেস করেছি,” বললো ম্যানিং। “একমাত্র যে সম্ভাব্য জবাবটা এসেছে সেটা অবশ্য এক সোর্সের দাবি, তবে সেটা খতিয়ে দেখার কোনো উপায় ছিলো না। সে বলেছে কেইন এটা করেছে, এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, এরকম একটা কাজ সে করতে পারে। মনে রাখবেন, তেল ব্যবসায়ী শেখেরা খুব কড়া নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।”

“আরো কয়েক ডজন ঘটনা আছে,” নোলটন জানালো। “সেগুলোও ঐ একই রকম, খুবই সুরক্ষিত ব্যক্তিবর্গ খুন হয় আর সোর্স আগ বাড়িয়ে জানায় যে, কাজটা কেইন করেছে।”

“আচ্ছা,” কংগ্রেসম্যান জুরিখের রিপোর্টটা হাতে ভুলে নিলো। “তবে আমার কাছে যা আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে আপনারা জানেন না সে কে?”

“না, দুটো বর্ণনা একই রকম,” বাঁধা দিয়ে বললো সন্ধ্যাসী। “বোঝা যাচ্ছে কেইন ছদ্মবেশ নিতে খুব দক্ষ। এ বিষয়ে তার প্রতিভা রয়েছে।”

“তারপরও লোকে তাকে দেখেছে, কথটা বলেছে। আপনার জুরিখের সোস, সে তো তার ব্যাপারে কিছু বলছে না। তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। কিছু একটা তো নিশ্চিত ক'রে জানতেই হবে।”

“আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য রয়েছে,” সন্ধ্যাসী জবাব দিলো। “তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতা তাতে নেই। কেইন কখনও নিজেকে দিনের আলোয় প্রদর্শন করে না। সে রাতের বেলায় মিটিং করে। অন্ধকার ঘরে অথবা সংকীর্ণ কোনো গলিতে।

সে কখনও একের অধিক ব্যক্তির সাথে একই সময়ে দেখা করেছে ব'লে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। আমাদেরকে বলা হয়েছে সে কখনও দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে না, সব সময়ই ব'সে থাকে—কোনো স্বল্প আলোর রেস্তোরাঁয়, অথবা পার্ক করা গাড়িতে। কখনও সে কালো সানগ্লাস ব্যবহার করে। কখনও কোনো কিছুই না। একবার তাকে দেখা গেছে কালো চুলে। আরেকবার সাদা, লাল অথবা মাথায় টুপি পরা অবস্থায়।”

“ভাষা?”

“এখানে আমরা একটু বেশি নিশ্চিত,” সিআইএ'র ডিরেক্টর বললো। “ইংরেজি এবং ফরাসিতে অনর্গল বলতে পারে, এছাড়াও কয়েকটি প্রাচ্যদেশীয় ভাষা সে জানে।”

“কোন কোন ভাষা?”

“যেমন ভিয়েতনামী?”

“ভিয়েত—” ওয়াল্টার একটু সামনে ঝুঁকে এসে বললো। “আমার কেন মনে হচ্ছে আমি এমন কিছু জানতে চাই যা আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না?”

“এর কারণ, আপনি হয়তো ক্রশ এক্সামিনের ব্যাপারে খুব বেশি স্মার্ট, কাউসেলার।” অ্যাবোট নিজের পাইপটা দেয়াশলাই দিয়ে ধরিয়ে বললো।

“সম্ভবত বেশি সতর্ক,” কংগ্রেসম্যান একমত হয়ে বললো। “এবার বলুন সেটা কি?”

“কেইন,” বললো জিলেট। তার চোখ অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ডেভিড অ্যাবোটের দিকে ঘুরলো। “সে কোথেকে এসেছে তা আমরা জানি।”

“কোথেকে?”

“দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে,” ম্যানিং জবাব দিলো। যেনো ধারালো কোনো ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে এমন ভঙ্গী করলো সে। “আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, তাতে মনে হচ্ছে সে কম্বোডিয়া আর লাওসের সীমান্ত এলাকার কোনো পার্বত্য অঞ্চলের লোক। সেটা ভিয়েতনামের গ্রামীণ এলাকাও বটে। আমরা এই তথ্যটা মেনে নিয়েছি। এটা খাপ খেয়ে যায়।”

“কোন্টার সাথে?”

“অপারেশন মেডুসার সাথে,” কর্নেল তার পাশ থেকে একটা ম্যানিলা এনভেলপ হাতে তুলে নিয়ে সামনে রাখলো। “এটা হলো কেইনের ফাইল,” মাথা নেড়ে ইনভেলপটার দিকে চেয়ে বললো সে। “এটা মেডুসা সংক্রান্ত কাগজপত্র। এটার সাথে কেইনের সম্পর্ক আছে।”

টেনিসির লোকটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বাঁকা হাসি হাসলো। “আপনারা জানান, আপনারা আপনাদের বড় বড় টাইটেল দিয়ে আমাকে জবাই করছেন। ঘটনাচক্রে এটা খুবই দারুণ; এটা খুবই জঘন্য, খুবই অশুভ। আমার মনে হয়,

আপনারা এরকম কোনো কোর্সে ভীতি হলেই ভালো হয়। বলে যান কর্নেল। মেডুসা জিনিসটা কি?”

ম্যানিং ডেভিডন অ্যাবোটের দিকে চেয়ে বললো, “এটা সার্চ এ্যান্ড ডেস্ট্রয় মতবাদের একটি গোপন বিষয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ভেতরে ঢুকে কাজ করার উদ্দেশ্যে এটা ডিজাইন করা হয়েছিলো। ষাটের শেষ আর সত্তর দশকের শুরুতে আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান এবং স্থানীয় স্বৈচ্ছাসেবীদেরকে নিয়ে এ দলটি গঠন করা হয় উত্তর ভিয়েতনামের দখলকৃত এলাকায় অপারেশন চালানোর জন্যে। তাদের প্রধান কাজ ছিলো শত্রুপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আর সরবরাহ লাইন ধ্বংস করা, বন্দীশিবিরগুলো চিহ্নিত করা এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগীতা করছে এরকম গ্রামীণ নেতাদেরকে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে শেষ ক’রে ফেলা। সম্ভব হলে শত্রুপক্ষের কমান্ডারদেরকেও।”

“এটা হলো যুদ্ধের ভেতর যুদ্ধ,” নোলটন বললো। “দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো জাতিগত, বাহ্যিক বেশভূষা আর ভাষার বিভিন্নতার ফলে তাদের সমন্বয় করাটা দুরূহ হয়ে ওঠে। সেখানে ছিলো জার্মান, ডাচ আন্ডারগ্রাউন্ড, কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সেজন্যে পশ্চিম ইউরোপের নিয়োগগুলোর বেলায় সবসময় যেরকমটি বাছবিচার করার কথা ছিলো তেমনটি হয় নি।”

“সেখানে এরকম কয়েক ডজন টিম ছিলো,” কর্নেল আবার বলতে শুরু করলো। “তবে একমাত্র আশা ছিলো আমেরিকার জয়লাভ। ওখানে অস্ট্রেলিয়ান এবং ব্রিটিশ ভবঘুরে ছিলো যারা অনেক বছর ধরে বসবাস ক’রে আসছিলো, আরো ছিলো খুবই মটিভেটেড আমেরিকান সৈনিক আর সিভিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স ক্যারিয়ার অফিসার। এবং অবধারিতভাবেই বড়সড় অপরাধীদের একটি চক্র। নেতৃত্বে ছিলো চোরাকারবারিরা— সমগ্র দক্ষিণ চায়না সাগর এলাকা জুড়ে তারা অস্ত্র, মাদক, স্বর্ণ আর হীরা-পাচার করতো। তারা রাতের বেলায় আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতো। আমাদের অনেক রিক্রুট করা কর্মী ছিলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে আসা দাগী আসামী। তাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিতও ছিলো। এ সবই বেশ কার্যকরী ছিলো। তাদের অভিজ্ঞতার দরকার ছিলো আমাদের।”

“এটা ছিলো স্বৈচ্ছাসেবীদের একটা অংশ,” কংগ্রেসম্যান বললো। “পুরনো লাইনের নেভি আর আর্মি; ব্রিটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান ভবঘুরের দল, ফরাসি ঔপনিবেশিক এবং চোর বাটপারের দল। আপনারা তাদেরকে এক সঙ্গে কাজ করাতে পারলেন কিভাবে?”

“প্রত্যেককে লোভ দেখিয়ে,” জিলেট বললো।

“প্রতিশ্রুতি,” কর্নেল বেশ জোরে বললো কথাটা। “র্যাংকের নিশ্চয়তা, পদোন্নতি, ক্ষমতা। একেবারে নগদ বোনাস, আর কয়েকটি ক্ষেত্রে বিরোধীদের

কাছ থেকে চুরি করা তহবিল হাতিয়ে নেবার সুযোগ। বুঝলেন, তারা সবাই একেবারে পাগল হয়ে গেলো। আমরাও সেটা বুঝি। তাদেরকে গোপনে প্রশিক্ষণ দিলাম, কোড ব্যবহার করা, বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবহার করতে শেখা, ফাঁদ পাতা আর খুনের পদ্ধতিগুলোও শেখানো হলে—এমনকি সায়গনের উইপেন কমান্ড এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পিটার যেমনটি বলেছেন, ঝুঁকিটা ছিলো অবিশ্বাস্য—ধরা পড়লে অত্যাচার, নির্যাতন আর হত্যা। মূল্যটা ছিলো খুব চড়া আর তারা সেটা চুকিয়েছেও। বেশিরভাগ লোক তাদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ হিসেবেই ভাবতো। তবে তারা খুবই প্রতিভাবান ছিলো। অস্থিরতা তৈরি করা আর খুন-ঝারাবি ছিলো তাদের প্রধান দায়িত্ব। বিশেষ ক’রে গুপ্তহত্যা।”

“মূল্যটা কি ছিলো?”

“অপারেশন মেডুসা নব্বই পার্সেন্ট হতাহতের করুণ পরিণতি বরণ করে। তবে যারা আর কখনও ফিরে আসে নি তাদেরকেও ধরা হয়েছিলো এর মধ্যে।”

“এঁসব চোরবাটপার আর ফেরারীদের অংশটা?”

“হ্যাঁ। মেডুসা থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা চুরি করে কেউ কেউ। আমরা মনে করি কেইন ছিলো তাদের মধ্যে একজন।”

“কেন?”

“তার মোদাস ওপারেন্দি, মানে পদ্ধতিটা। সে খুনের কাজে যেরকম কোড, ফাঁদ, পদ্ধতি ব্যবহার করেছে সেগুলো আমরা মেডুসায় তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলাম।”

“হায় ঈশ্বর! তাহলে তো আপনরা তার পরিচয়টা জানেন,” ওয়াল্টার্স বললো। “সেগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেটা আমি পরোয়া করি না—আর আমি এও নিশ্চিত আপনারা চান না তাদের ব্যাপারটা জনসম্মুখে জানানাজানি হোক, তবে আমার ধারণা তাদের সম্পর্কে সব কিছুই রেকর্ড করা আছে।”

“তা আছে, তবে আমরা সেগুলো গোপন অর্কাইভ থেকে সরিয়ে ফেলেছি। তার মধ্যে এটাও আছে।” অফিসার তার সামনের ফাইলটার টোকা মারলো। “আমরা তথ্যগুলো কম্পিউটারে ঢুকিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখেছি, একেবারে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে—যতোটুকু সম্ভব দেখেছি। তবে শুরুতে যা বলেছি তার চেয়ে বেশি আমরা কিছু পাই নি।”

“এটা তো অবিশ্বাস্য,” কংগ্রেসম্যান বললো। “অথবা বলা যায় অবিশ্বাস্যরকমের অযোগ্যতা।”

“ঠিক তা নয়,” দ্বিমত পোষণ ক’রে বললো ম্যানিং। “লোকটার দিকে তাকান। আমরা তার সাথে কি কাজ করেছি ভাবুন। যুদ্ধের পর পূর্ব-এশিয়া জুড়ে কেইনের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে; টোকিও থেকে ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং কম্বোডিয়া, লাওস এবং কলকাতা। আমাদের এশিয়ান স্টেশন আর

অ্যাঘাসিতে আড়াই বছর আগে থেকে খবর আসতে শুরু করে একজন মারাত্মক-নির্মম গুপ্তঘাতক আছে। ভাড়ায় খুন করে সে। যতো বড়সড় খুন হয় তাতে কেইনের নাম জড়িয়ে পড়ে। সোর্সরা সব সময় খবর দিতো কেইনের ব্যাপারে। কেইন। কেইন আর কেইন। টোকিতে একটা হত্যা, হংকংয়ে গাড়িবোমা; মাদকদ্রব্য বোঝাই কারাভান গোল্ডেন ট্রায়ান্গলে অ্যাঘাসের শিকার হয় তো কলকাতায় এক ব্যাংকার গুলিবিদ্ধ হয়। মউলমেইনে একজন অ্যাঘাসেডরের খুন, সাংহাইর পথে রাশিয়ান টেকনিশিয়ান অথবা আমেরিকান ব্যবসায়ীর খুন। সর্বত্রই কেইন। সব গোয়েন্দা সংস্থায় তার নাম উচ্চারিত হতে লাগলো। তারপরেও সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একজন লোকও তাকে চেনে বা তার পরিচয় জানে বলে দাবি করতে এগিয়ে এলো না। আমরা কোথেকে শুরু করবো?”

“কিন্তু আপনিই না বললেন, সে মেডুসার সাথে ছিলো?” টেনেসির লোকটা বললো।

“হ্যা, অবশ্যই।”

“তাহলে মেডুসার ডেসিয়ারেই তো তার সম্পর্কে তথ্য রয়েছে!”

কেইনের ফাইলটা ফোল্ডার থেকে বের করলো কর্নেল। “এ হলো হতাহতের তালিকা। শ্বেতাঙ্গ পশ্চিম ইউরোপিয়ানদের তালিকা, যারা অপারেশন মেডুসায় উধাও হয়ে গিয়েছিলো—আর আমি যখন বলবো উধাও হয়ে গেছে, বুঝতে হবে তারা কোনোরকম চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেছে—এই নিন। তিয়াস্তর জন আমেরিকান, ছেচনিশজন ফরাসি, চক্শিজন অস্ট্রেলিয়ান আর বৃটিশ, এবং আরো পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ, যাদেরকে হানয় থেকে রিড্রুট ক’রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো—তাদের বেশির ভাগকেই আমরা চিনি না। দুশ’ ত্রিশ জনের মতো লোক। কতোগুলো অন্ধ গলি? কে বেঁচে আছে? কে মরেছে? এমনকি বেঁচে যাওয়া প্রত্যেকের ব্যাপারে যদি আমরা জানতামও তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, সে এখন কোথায় আছে? সে কে? আমরা এমনকি কেইনের জাতীয়তার ব্যাপারেও নিশ্চিত নই। আমরা মনে করি সে আমেরিকান। তবে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।”

“এমআইএ-দের খুঁজে বের করার ব্যাপারে হানয়কে আমরা যে তাড়া দিয়েছিলাম তাতে কেইনের ব্যাপারটা একটা সাইড ইস্যু ছিলো,” নোলটন জানালো। “আমরা এইসব নাম ডিভিশনের তালিকায় রেখেছি।”

“এখানেও একটা ঘটনা আছে,” আর্মি অফিসার যোগ করলো। “হানয়ের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বাহিনী অনেক মেডুসা সদস্যকে হত্যা করেছিলো। তারা এই অপারেশনের ব্যাপারটা জানতো। আর আমাদের মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাটা একদম বাতিল ক’রে দিতে পারি না। হানয় জানতো মেডুসার সদস্যরা কোনো কমবাট বাহিনী নয়। তারা কোনো ইউনিফর্ম পরে না। তাই তাদেরকে হত্যা করলে জবাবদিহিতাও করতে হবে না।”

ওয়াল্টার্স হাত বাড়িয়ে বললো, “আমি কি দেখতে পারি?” ফাইলটার দিকে ইশারা করলো সে।

“নিশ্চয়!” অফিসার কংগ্রেসম্যানকে সেটা দিয়ে দিলো। “আপনি অবশ্যই বোঝেন, এই নামগুলো খুবই গোপনীয়, ঠিক মেডুসা অপারেশনটার মতোই।”

“এই সিদ্ধান্তটি কে নিয়েছিলো?”

“জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের রেকমেডশনের উপর ভিত্তি করে পরপর কয়েকজন প্রেসিডেন্ট এই নির্বাহী আদেশটি বহাল রেখেছিলেন। এটা সিনেটের আর্মি সার্ভিস কমিটি কর্তৃকও সমর্থিত হয়েছিলো।”

“তাহলে তো এটাকে ফায়ার পাওয়ার বলা যেতে পারে, পারে না?”

“এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যাবে বলে মনে করা হয়েছিলো,” সিআইএ’র লোকটা বললো।

“এক্ষেত্রে আর্মি কোনো প্রশ্ন তুলবো না,” ওয়াল্টার্স একমত পোষণ করলো। “তবে আমরা তো কোনো গুণঘাতককে প্রশিক্ষণ দেই না। অথচ এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন খুনিকে প্রশিক্ষিত করে মাঠে ছেড়ে দিয়ে আমরা আর তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।”

“আমরা সেটা বিশ্বাস করি,” বললো কর্নেল।

“আপনি বলেছেন সে এশিয়াতে তার সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছে, তবে পরে ইউরোপে চলে এসেছে। কখন?”

“প্রায় একবছর আগে।”

“কেন? কোনো ধারণা আছে?”

“অবশ্যই,” পিটার-নোলটন বললো। “অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে আর সে খুব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। হুমকী বোধ করেছে। প্রাচ্যদেশীয় লোকদের মাঝে একজন শ্বেতাঙ্গ খুনি, খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। সেজন্যে সে ইউরোপে চলে এসেছে। ঈশ্বর জানে, তার সুনাম বেশ ছড়িয়েছে। ইউরোপে তার কাজের কোনো অভাব হবে না।”

ডেভিড অ্যাবোট গলাটা খাকারি দিয়ে পরিস্কার করে নিলো। “কিছুক্ষণ আগে বলা আলফ্রেডের কথার সূত্র ধরে আমি আরেকটা সম্ভাবনার কথা বলতে পারি।” অ্যাবোট একটু থেমে জিলেটের দিকে তাকালো। “তিনি বলেছিলেন আমরা দস্তবিহীন হাঙরের পিছু নিতে বাধ্য হয়েছি, যেখানে কিনা ‘হিংস্র হাঙরটা মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে,’ আমি বিশ্বাস করি এটাই হলো আসল কথা, যদিও আমার ধারণাটা ভুলও হতে পারে।”

“হ্যাঁ,” এনএসসি’র লোকটা বললো। “আমি কার্লোসের কথাই বুঝিয়েছিলাম। কেইনের পেছনে ছোট্ট আমাদের উচিত হবে না। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে কার্লোসকে নিয়ে।”

“অবশ্যই। কার্লোস। আধুনিক ইতিহাসে সবচাইতে পরাক্রমশালী খুনি। সে আমাদের সময়কালে অসংখ্য এবং বড় বড় ট্রাজিক হত্যার নায়ক। আপনি ঠিকই বলেছেন, আলফ্রেড। কার্লোসকে আমরা ভুলে যেতে পারি না।”

“ধন্যবাদ,” বললো জিলেট। “বক্তব্যটা বোঝাতে পেরেছি বলে আমি খুশি।”

“তা পেরেছেন। তবে আপনি আমাকে ভাবিয়েছেনও। আপনার কথা শুনে আমার একটা কথা মনে হলো। কেইনের মতো মানুষের জন্যে প্রলুব্ধের ব্যাপারটা কি কল্পনা করতে পারেন, যে কিনা একটা ভয়ংকর জায়গাতে, আবদ্ধ পরিবেশে ভবঘুরে আর ফেরারীদের সাথে দুর্নীতিবাজ সরকারের হয়ে কাজ করেছে? সে কার্লোসকে অবশ্যই দর্শ্য করবে। সে দ্রুতগতির, উজ্জ্বল আর লাক্সারি ইউরোপকেও হিংসা করবে। সে নিজেকে না জানি কতবার বলেছে ‘আমি কার্লোসের চেয়ে সেরা।’ এইসব লোকের খুব অহংবোধ থাকে। আমার ধারণা সে ইউরোপে গেছে ভালো আর আরামদায়ক এক দুনিয়ার খোঁজে...এবং অবশ্যই কার্লোসকে উৎখাত করতে। যাদের টাইটেল নেই তারা টাইটেলটা পেতে চায়, স্যার। সে চ্যাম্পিয়ন হতে চায়।”

জিলেট অ্যাবোটের দিকে চেয়ে রইলো। “তবুটা কৌতুহলোদ্দীপক।”

“তাহলে আপনার কথার সূত্র ধরেই বলছি,” কংগ্রেসম্যান বললো। “কেইনকে অনুসরণ করে আমরা কার্লোস পর্যন্ত পৌছাতে পারবো।”

“ঠিক।”

“ব্যাপারটা বুঝেছি কিনা সেব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই,” একটু উদ্ভিগ্ন আর বিরক্ত হয়ে বললো সিআইএ’র ডিরেক্টর। “কেন?”

“এক ঢিলে দুটো পাখি মারা,” ওয়াল্টার্স জবাব দিলো। “তারা একে অন্যের সাথে জড়িয়ে আছে।”

“একজন চ্যাম্পিয়ন স্বেচ্ছায় তার শিরোপা ছেড়ে দেবে না,” অ্যাবোট পাইপটা তুলে নিয়ে বললো। “সে নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্যে প্রাণপণে লড়বে। কংগ্রেসম্যান যেমনটি বলেছেন, আমরা কেইনকে খোঁজা অব্যাহত রাখবো। তবে আমাদেরকে বনের অন্য প্রাণীদের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। আর আমরা যদি কেইনকে খুঁজে পাই, তখন হয়তো আমরা লাগাম টেনে ধরবো। অপেক্ষা করবো তার পিছু পিছু কার্লোসের আসার জন্যে।”

“তখন দু’জনকেই কজায় নেয়া যাবে,” মিলিটারি অফিসার বললো।

“খুবই বুদ্ধিদীপ্ত,” বললো জিলেট।

মিটিংটা শেষ হয়ে গেলে সবাই চলে গেলো। কিন্তু সন্ধ্যাসী হিসেবে পরিচিত ডেভিড অ্যাবোট দাঁড়িয়ে থাকলো পেন্টাগনের কর্নেলের পাশে, যে কিনা মেডুসার কাগজপত্রগুলো ফোন্ডারে ভরে নিচ্ছে। হতাহতের তালিকাটা যখন ঢোকাতে যাবে সে অ্যাবোট তখন তাকে বললো।

“আমি কি একটু দেখতে পারি? আমাদের কাছে কোনো কপি নেই।”

“এগুলো আমাদের ইন্ট্রাকশন,” কাগজটা বৃদ্ধের হাত দিয়ে অফিসার জবাব দিলো। “আমি ভেবেছিলাম এগুলো আপনাদের কাছ থেকেই এসেছে। মাত্র তিনটি কপি আছে। এখানে, এজেন্সিতে এবং কাউন্সিলে।”

“এগুলো আমার কাছ থেকেই এসেছে,” অ্যাবোট নিরবে হাসলো। “শহরের যে অংশে আমি থাকি সেখানে অনেক বেশি সিভিলিয়ান থাকে।”

টেনিসির কংগ্রেসম্যানের প্রশ্নের জবাবটা না শুনেই কর্নেল ঘুরে তালিকার নামগুলোর দিকে নজর বোলাতে বোলাতে চলে গেলো। একটা নাম বাদ দেয়া হয়েছে দেখে সে চমকে উঠলো। একটা নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। জবাবদিহিতা হলো এমন একটা জিনিস যা তারা করে না। কখন। কোথায় সেটা? এই ঘরে সেই হলো একমাত্র লোক যে নামটা জানে। শেষ পৃষ্ঠায় যেতেই সে নিজের হৃদস্পন্দনটার শব্দ শুনতে পেলো। নামটা আছে এখানে।

বর্ন, জেসন সি—শেষ স্টেশন : তাম কুয়ান। আরে, এসব কি?

রেনে বারগোয়া তার ডেস্কের ফোনটা আছাড় দিয়ে রেখে দিলো। “সবগুলো ক্যাফেতেই আমরা চেষ্টা করেছি, সে যেসব রেস্টোরাঁয় যায় সেখানেও!”

“প্যারিসে এমন কোনো হোটেল নেই যেখানে সে রেজিস্টার করেছে,” সুইচবোর্ডের ধূসর চুলের লোকটা বললো। পাশেই আরেকটা ফোন নিয়ে ব’সে আছে সে। “দুই ঘণ্টা হয়ে-গেছে, এরমধ্যে হয়তো সে মরেই গেছে। যদি সে মরে গিয়ে না থাকে তো তার এখন ইচ্ছে করছে সে যেনো মরে যায়।”

“সে তাকে খুব বেশি কিছু বলতে পারবে না,” বারগোয়া বললো। “আমাদের চেয়েও কম বলতে পারবে। বুড়ো লোকটার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।”

“সে যথেষ্ট জানে। পার্ক মঁশিউতে ফোন করেছিলো।”

“সে কেবল মেসেজটা রিলে করেছে। নিশ্চিত ক’রে জানতো না কার কাছে সেটা দিচ্ছে।”

“কিন্তু সে জানে কেন দিচ্ছে।”

“কেইনও তা জানে। আমি তোমাকে আশ্বস্ত করতে পারি। সে পার্ক মঁশিউতে বিরাট একটা ভুল ক’রে ফেলেছে,” ডিজাইনার সামনে ঝুঁকে বললো। “আমাকে আবার বলো, যতোটুকু তোমার মনে পড়ে, সবটুকু। তুমি কেন এতোটা নিশ্চিত হলে যে, সে-ই বর্ন?”

“আমি সেটা জানি না। আমি বলেছি সে হচ্ছে কেইন। আমি যদি তার মেথডগুলো নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে পারতাম, তাহলে বুঝতেন সে-ই কেইন।”

“বর্ন হলো কেইন। আমরা তাকে মেডুসা রেকর্ডে আগাগোড়াই পেয়েছি। এজন্যেই তোমাকে ভাড়া করা হয়েছে।”

“তাহলে সে-ই বর্ন, তবে এই নামটা সে ব্যবহার করে না। অবশ্য মেডুসা-তে অনেক লোক আছে যারা নিজেদের সত্যিকারের নাম ব্যবহার করতো না। তাদের জন্যে ভুয়া পরিচয়টাই বেশি নিরাপদ ছিলো। তাদের অপরাধের রেকর্ড আছে। সে ঐইসব লোকেদেরই একজন হবে।”

“কেন সে? অন্যেরাও তো উধাও হয়েছে। তুমি হয়েছেো।”

“কারণ সে এখানে এসেছে, আর এটাই যথেষ্ট। তবে আরো আছে। আমি তাকে কাজ করতে দেখেছি। তার কমান্ডে এক মিশনে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। এই অভিজ্ঞতাটা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। সে তা ভুলে যায় নি। সে-ই কেইন হতে পারে—আপনার কেইন।”

“আমাকে বলো।”

“আমরা তাম কুয়ান’র একটা সেক্টরে এক রাতে প্যারাসুট দিয়ে নামলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো ওয়েব নামের এক আমেরিকানকে উদ্ধার করা। সে ভিয়েত কংদের হাতে বন্দী ছিলো। আমরা সেটা জানতাম না। তবে আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিলো খুব ক্ষীণ। এমনকি সায়গন থেকে আমাদের ফ্লাইটটাও ছিলো খুবই বিপজ্জনক। বিমানটা বাতাসের ঝাপটায় এমনভাবে কাঁপছিলো যেনো সেটা ভেঙে পড়বে। তারপরও সে আমাদেরকে জাম্প করার আদেশ করলো।”

“আর তোমরা তাই করলে?”

“তার অস্ত্রটা আমাদের মাথার দিকে তাক্ করা ছিলো। আমরা হয়তো নিচে বাঁচতে পারবো, কিন্তু সামনের বুলেটের হাত থেকে একদমই পারবো না।”

“তোমরা সেখানে কয়জন ছিলে?”

“দশজন।”

“তাহলে তোমরা তো তাকে ঘায়েল করতে পারতে।”

“আপনি তাকে চেনেন না।”

“বলে যাও,” বারগোয়া বললো।

“আমাদের মধ্যে আটজন মাটিতে নেমে পুণরায় যোগ দিতে পেরেছিলো। বাকি দু’জন বোধহয় জাম্প করে নিচে ঠিকমতো নামতে পারে নি। মরে গিয়েছিলো। আমি ছিলাম সবচাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ, তবে আমি সেই এলাকাটা চিনতাম, সেজন্যে তারা আমাকে পাঠিয়েছিলো।” ধূসর চুলের লোকটা একটু থামলো। “এক ঘন্টা পরেই আমরা বুঝতে পারলাম এটা একটা ফাঁদ। আমরা জঙ্গল দিয়ে প্রাণপণে দৌড়লাম। আর রাতের বেলায় সে একাই মর্টার এবং গ্রেনেড নিয়ে নেমে পড়লো হত্যা করতে। ভোরের আগে ফিরে এসে আমাদেরকে বেইজ-ক্যাম্পের কাছাকাছি যাবার জন্যে বাধ্য করলো। এক সময় আমি আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলাম।”

“তুমি কেন এটা করলে? সে হয়তো তোমাদেরকে একটা কারণ বলেছিলো, তোমরা মেডুসার সদস্য ছিলে, কোনো সৈনিক তো ছিলে না।”

“সে বলেছিলো এটাই জীবিত হয়ে বের হয়ে আসার একমাত্র পথ। আর তাতে যুক্তিও ছিলো। আমরা শত্রুপক্ষের একেবারে ভেতরে ছিলাম। সরবরাহ পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে বেইজ ক্যাম্পটা খুঁজে বের করার দরকার ছিলো—যদি আমরা সেটা নিতে পারি তো। সে বলেছিলো আমাদেরকে নিতেই হবে। আমাদের এছাড়া আর কোনো পথ নেই। কেউ এ নিয়ে তর্ক করলে সে একটা বুলেট খরচ করতে দ্বিধা করতো না—এটা আমরা জানতাম। তৃতীয় রাতে আমরা ক্যাম্পটা খুঁজে পেলে সেটা দখলে নিয়ে নিতে সক্ষম হই। আর সেখান থেকে ওয়েব নামের লোকটাকেও খুঁজে পাই, তবে একেবারে মৃতপ্রায়। ওখান থেকে আমরা আমাদের দলের আরো দু’জন সদস্যকেও জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করি, কিন্তু যা দেখতে পেয়েছিলাম তাতে খুবই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। এক শ্বেতাঙ্গ আর এক ভিয়েতনামী। আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে ভিয়েতকংরা তাদেরকে টাকা দিয়ে ছিলো—আমার ধারণা মূলত তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই।”

“কেইনকে?”

“হ্যাঁ।”

“ভিয়েতনামিটা আমাদেরকে প্রথমে দেখে ফেলে পালিয়ে যায়। কেইন নির্বিকারভাবে শ্বেতাঙ্গ লোকটার মাথা গুলি ক’রে মাথাটা গুঁড়িয়ে দেয়।”

“সে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছিলো?”

“আমাদের চারজন এবং ওয়েব নামের লোকটাকে। পাঁচজন খুন হয়েছিলো। সেই ভয়ংকর ভ্রমণ থেকে ফিরে আমি বুঝতে পারলাম কেন মেডুসার সবচাইতে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ব্যক্তি।”

“কোন দিক থেকে?”

“আমার দেখা সবচাইতে ঠাণ্ডা মাথার লোক সে, খুবই বিপজ্জনক, একেবারেই অনুনমেয়। একসময় আমি ভেবেছিলাম তার জন্যে যুদ্ধটা খুবই অদ্ভুত একটি ব্যাপার। তার কোনো ধর্মীয় নীতি ছিলো না, কেবল নিজের অদ্ভুত নৈতিকতা ছাড়া। সব মানুষই তার শত্রু—বিশেষ ক’রে নেতারা, সে দু’পক্ষের কাউকেই পরোয়া করতো না।” লোকটা আবারো থামলো। “মনে রাখবেন, মেডুসা’তে বিপথগামী আর বেপরোয়া লোকজনে ছিলো প্রচুর। অনেকেই ছিলো যারা কমিউনিস্টদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতো। একেবারে বাতিকগ্রস্ত ছিলো তারা। একজন কমিউনিস্টকে খুন করলে জিও খুশি হবে—খ্রিস্টীয় শিক্ষার অদ্ভুত এক উদাহরণ। অন্যেরা—যেমন আমার—ভাগ্য খুব ভালো ছিলো যে ভিয়েতমিনরা আমাদেরকে চুরি করেছিলো। একমাত্র সাপ্তানা হোতো যদি আমেরিকানরা যুদ্ধে জিততো। ফ্রান্স আমাদের দিয়েবুঁফু’তে পরিত্যাগ করেছিলো। তবে কয়েক ডজন লোক তখনও মেডুসাতে

ভাগ্য গড়ে নেবার সুযোগ দেখতে পাচ্ছিলো। পকেটে প্রায়শই থাকতো পঞ্চাশ থেকে সত্তর হাজার ডলার। এক কুরিয়ার অবসরে গিয়ে সিঙ্গাপুর অথবা কুয়ালামপুরে নিজের মাদক ব্যবসা খুলে বসতে পারলো। ট্রায়ালে। সেই গ্রুপেই আমি ঐ অদ্ভুত লোকটাকে স্থান ক'রে দিলাম। বলতে পারেন, সে আধুনিক যুগের একজন পাইরেট।”

বারগোয়া এবার মুখ খুললো। “দাঁড়াও, তুমি একটু আগে বললে একটা মিশনের কমান্ড ছিলো। মেডুসাতে সেনাবাহিনীর লোক ছিলো, তুমি কি নিশ্চিত সে আমেরিকান সেনাবাহিনীর কোনো অফিসার নয়?”

“আমেরিকান, এটা নিশ্চিত, তবে আর্মির নয়।”

“কেন?”

“সে মিলিটারির সব কিছুই ঘৃণা করতো। সে মনে করতো আর্মির লোকেরা বোকা আর অযোগ্য। তাই সে নিজেই নিজের মতো চলাতো। এক সময় তাম কুয়ানে আমাদের কাছে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে অর্ডারগুলো আসতো। সে ট্রান্সমিশন ভেদ ক'রে একজন রেজিমেন্টাল জেনারেলকে বলেছিলো তার পোঙ মারবে সে—মানে, তার কথা মানবে না। কোনো আর্মি অফিসার এ কাজ করবে না।”

“যদি না সে তার নিজের পেশাটা ছেড়ে দেয়,” ডিজাইনার বললো। “প্যারিস তোমাদের ছেড়ে গেলে তোমরা নিজেরা যতোটুকু করার করেছো, মেডুসা থেকে চুরি করেছো, নিজেদের তথাকথিত দেশপ্রেমিক কর্মকাণ্ড নিজেরাই ঠিক ক'রে নিয়েছো।”

“রেনে, আমার দেশ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করারও আগে।”

“কেইনে ফিরে আসি আবার। তুমি বলেছো বর্ন নামটা সে ব্যবহার করতো না। সেটা কি?”

“আমি মনে করতে পারছি না। যেমনটি আমি বলেছি, অনেকের জন্যে পদবীটা প্রাসঙ্গিক নয়। সে আমার কাছে কেবল ‘ডেল্টা’ হিসেবেই ছিলো।”

“মেকং ব-দ্বীপ?”

“না, গৃক বর্ণমালাটার কথা বলছি।”

“আলফা, ব্রাভো, চার্লি...ডেল্টা,” বারগোয়া ইংরেজিতে বললো নির্বিকারভাবে। “কিন্তু অনেক অপারেশনে কোড ‘চার্লি’র বদলে ‘কেইন’ ব্যবহার করা হতো, কারণ, ‘চার্লি’র সাথে কং-এর সাদৃশ্য আছে যা ভিয়েত কংদের সংক্ষিপ্ত রূপ। তাই ‘চার্লি’ হয়ে গেলো ‘কেইন’।”

“একদম সত্য। তাই বর্ন হয়ে গেলো ‘কেইন’। সে ‘ইকো’ অথবা ‘ফক্সট্রট’ কিংবা ‘জুলু’ ব্যবহার করতে পারতো। কোনো পার্থক্য নেই। তোমার বক্তব্যটা কি, বলো?”

“সে কেইন নামটা ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নিয়েছে। এটা প্রতীকি। সে শুরু থেকেই এটা পরিস্কার ক’রে নিতে চেয়েছিলো।”

“কি চেয়েছিলো?”

“কেইন নামটা কার্লোসকে প্রতিস্থাপিত করবে। ভাবুন। চার্লসের স্পেনিশ হলো কার্লোস—চার্লি। ‘কেইন’ ছদ্মনামটা ‘চার্লি’র বিকল্প—মানে কার্লোসের। শুরু থেকেই তার এই উদ্দেশ্য ছিলো। কেইন কার্লোসকে প্রতিস্থাপিত করবে। আর সে চেয়েছিলো এটা কার্লোস জানুক।”

“কার্লোস কি জেনেছিলো?”

“অবশ্যই। খবরটা আমস্টারডাম, বার্লিন, জেনেভা, লিবসন, আর এই প্যারিসে ছড়িয়ে পড়েছিলো। কেইনকে খুব সহজেই পাওয়া যায়। যোগাযোগ করা যায়। তার পারিশ্রমিকও কার্লোসের চেয়ে কম। একেবারে জেঁকে বসলো সে! ক্রমাগতভাবেই কার্লোসের অবস্থানকে গ্রাস করতে শুরু করলো।”

“দু’জন ম্যাটাডোর একই মাঠে। কেবল একজনই থাকতে পারবে সেখানে।”

“সেটা হবে কার্লোস। আমরা বড়সড় চডুইটাকে ফাঁদে ফেললাম। সে সেন অনরে থেকে দু’ঘণ্টার দূরত্বে কোথাও থাকে।”

“কিস্তি কোথায়?”

“কোনো ব্যাপার না। আমরা তাকে খুঁজে বের করবোই। হাজার হোক সে আমাদের খুঁজে বের করেছে। সে ফিরে আসবে। তার অহং এটা করবে। তখনই ঈগলটা উড়ে এসে চডুইটাকে ধরে ফেলবে। কার্লোস তাকে খুন করবে।”

বৃদ্ধলোকটা তার বাম হাতের নিচে থাকা সিঙ্গেল ক্রাচটা পাশে রেখে কালো পর্দাটা ফাঁক ক’রে কনফেশনাল বুথে প্রবেশ করলো। খুব একটা ভালো নেই সে। তার চোখেমুখ ফ্যাকাশে। মৃত্যু ভয় জেঁকে বসেছে। পর্দার ওপর পাশের অবয়বটা তার এই অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছে না বলে সে খুশি হলো। তাকে যদি খুব বিধ্বস্ত দেখায় তবে গুণ্ডামতক আর তাকে হয়তো কোনো কাজ দেবে না। তার দরকার এখন কাজ। কেবল একটা সপ্তাহ বাকি আছে, আর তার দায়দায়িত্বও রয়েছে। সে কথা বললো।

“অ্যাস্লোস দোমিনি।”

“অ্যাস্লোস দোমিনি, ঈশ্বরের পুত্র,” পর্দার ওপাশ থেকে নিচু কণ্ঠস্বরটা বললো। “আপনার দিনকাল কি ভালো যাচ্ছে?”

“দিন ফুরিয়ে আসছে আমার, তবে ভালোই যাচ্ছে।”

“হ্যা। আমার মনে হয় আমার জন্যে এটা আপনার শেষ কাজ। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার পারিশ্রমিকও পাঁচগুন বেড়ে যাবে। আমি আশা করি এটা আপনাকে খুব সাহায্য করবে।”

“ধন্যবাদ কার্লোস, তুমি তাহলে জানো।”

“জানি। এটা এমন কিছু যা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। আর খবরটা আমৃত্যু গোপন রাখবেন। ভুল করার কোনো সুযোগ নেই।”

“আমি সব সময়ই সঠিক আর নিখুঁত ছিলাম। আমি আমৃত্যু তাই করবো।”

“শান্তিতে করুন, পুরনো বন্ধু। এটা খুবই সহজ...আপনি ভিয়েতনামি অ্যাড্বাসিতে যাবেন, ফান লক্ নামের একজন অ্যাটাশিকে চাইবেন। যখন আপনি একা থাকবেন তখন এই কথাগুলো বলবেন : ‘১৯৬৮’র মার্চে মেডুসায়, তাম কুয়ান সেস্টর। কেইন ছিলো। আরেকজনও ছিলো।’ বুঝেছেন?”

“১৯৬৮’র মার্চে মেডুসায়। তাম কুয়ান সেস্টর। কেইন ছিলো। আরেকজনও ছিলো?”

“হ্যা। সে আপনাকে বলবে কখন ফিরে আসতে হবে। সেটা এক ঘণ্টার মধ্যেই হবে।”

অধ্যায় ১৭

“আমার মনে হয় জুরিখের ফিশে কনফিডেনশিয়াল’র ব্যাপারে কথা বলার সময় হয়েছে।

“হায় ঈশ্বর!”

“আপনি যাকে খুঁজছেন সে আমি নই।”

বর্ন মহিলার হাতটা শক্ত করে ধরলো যাতে সে আরজেনতুইলের জনাকীর্ণ রেস্টোরাঁর প্যাসেজ দিয়ে দৌড়ে পালাতে না পারে। জায়গাটা প্যারিস থেকে কয়েক মাইল দূরে। তারা এখন একা। ভেলভেটের বুথটা একটা খাঁচার মতো।

“তুমি কে?” লাভিয়া ভুরু কুঁচকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

“একজন ধনী লোক যে বাহামা’তে থাকে। তুমি কি বিশ্বাস করছো না?”

“আমার বোঝা উচিত ছিলো,” বললো মহিলা, “কোনো চেক না—কেবল নগদ। তুমি এমনকি বিলের দিকে তাকিয়েও দেখো নি।”

“অথবা দামগুলোর দিকে। এজন্যেই তো তুমি আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছো।”

“আমি একটা বোকা। ধনীরা সব সময় মূল্যের দিকে আগে তাকায়।” লাভিয়া চারপাশে তাকালো। দেখলো পালানোর পথ আছে কিনা। পালানোর জন্যে একজন ওয়েটারকে হয়তো সে ডাকতে পারে।

“ভুলেও এরকমটি ভেবো না,” মহিলার চোখ দেখে জেসন বললো। “সেটা হবে একদম বোকামির মতো কাজ। কথা বললে আমাদের দু’জনেরই মঙ্গল।”

তার দিকে তাকালো মহিলা। “আমি আবারো জিজ্ঞেস করছি, তুমি কে?”

“আমার নামটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেটা বলেছি সেটাই ধরে নাও।”

“বৃগস্? এটা তো ভূয়া।”

“ঠিক ঐ লারুজের মতো, আর সেটা একটা ভাড়া গাড়ি নিয়ে ভালোয়্যা ব্যাংকে তিনজন খুনিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। ওখানে তারা হারিয়ে ফেলেছিলো। তারা আজ দুপুরে পশু নোয়েফেও ধরতে পায় নি। সে পালিয়ে গেছে।”

“ওহ ঈশ্বর!” মহিলা চিৎকার করে ভেঙে পড়লো।

“আমি বলেছি এরকম করবে না!” বর্ন তার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে টান দিলো। “আমি যদি চিৎকার দেই, মঁসিয়ে?”

“তাহলে আমি আরো জোরে চিৎকার দেবো,” জবাব দিলো জেসন। “আমাদের দু’জনকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের ক’রে দেবে তারা। আর বাইরে গেলে আমার মনে হয় না তোমাকে সামলানো অসম্ভব হবে। কথা বলছো না কেন? আমরা একে অন্যের কাছ থেকে হয়তো কিছু জানতে পারবো। হাজার হোক আমরা চাকরিজীবী, চাকরিদাতা নই।”

“তোমাকে আমার বলার কিছু নেই।”

“তাহলে আমিই শুরু করি। হয়তো তুমি তোমার মত বদলাবে।” সে আশ্তে ক’রে তার হাতটা আলগা করলে মহিলা ধীরস্থির হয়ে গেলো। শোনার জন্যে প্রস্তুত সে। “তুমি জুরিখে মূল্য চুকিয়েছো। আমরাও মূল্য চুকিয়েছি। অবশ্যই তোমার চেয়ে বেশি। আমরা একই লোকের পিছু নিয়েছি। আমরা জানি কেন আমরা তাকে চাচ্ছি।” সে তার হাতটা ছেড়ে দিলো। “কেন তুমি করলে?”

মহিলা প্রায় আধ মিনিট কোনো কথা বললো না। তার বদলে নিরবে জেসনকে দেখে গেলো। তার চোখেমুখে ক্রোধ থাকলেও তাতে ভয় রয়েছে। বর্ন জানতো সে সঠিকভাবে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছে। জ্যাকুলিন লাভিয়ার জন্যে কথা বলাটা হবে বিপজ্জনক। এটা তার জীবনকে হুমকীর মুখে ফেলে দিতে পারে।

“আমরাটা কে?” সে জানতে চাইলো।

“যে কোম্পানিটা নিজেদের টাকাগুলো চাচ্ছে। প্রচুর টাকা। তার কাছে সেটা আছে।”

“তাহলে সে ওগুলো আয় করে নি?”

জেসন জানতো তাকে খুব সতর্ক হতে হবে। সে যতোটুকু জানে তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে জানতে হবে। “ঠিক আছে, এ নিয়ে বিতর্ক আছে।”

“কি ক’রে তা হতে পারে? হয় সে করেছে নয়তো করে নি। এরমধ্যে মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই।”

“এবার আমার পালা,” বর্ন বললো। “তুমি একটা প্রশ্নের সাথে আরেকটা প্রশ্ন করছো, আমি তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাই নি। এবার চলো ফিরে যাই সেই কথায়। তুমি কেন তাকে চাচ্ছো? কেন সেন অনরের একটা অভিজাত দোকানের একটি প্রাইভেট ফোন জুরিখের ফিশের সাথে সংযোগ দেয়া আছে?”

“সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মঁসিয়ে।

“কার জন্যে?”

“তুমি কি পাগল?”

“ঠিক আছে। এই প্রশ্নটা এখনকার মতো বাদ দিচ্ছি। মনে হচ্ছে এটা আমরা জানি।”

“অসম্ভব!”

“হয়তো, হয়তো না। তাহলে এটার ব্যবস্থা করা হয়েছে...একজন লোককে হত্যা করতে?”

“আমার বলার কিছু নেই।”

“তারপরও কিছুক্ষণ আগে আমি একটা গাড়ির কথা বললে তুমি পালানোর চেষ্টা করেছিলে। এটা তো কিছু বলছে বলেই মনে হচ্ছে!”

“একেবারেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।” জ্যাকুলিন লাভিয়া তার মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললো। “ভাড়ার ব্যবস্থাটা আমিই ক’রে দিয়েছি। এটা বলতে কোনো সমস্যা দেখেছি না, কারণ কোনো প্রমাণ নেই যে, আমি সেটা করেছি। এর বাইরে আমি কিছুই জানি না।” আচম্কা তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেলো। “তোমরা কারা?”

“আমি তোমাকে বলেছি। একটা কোম্পানি, যারা নিজেদের টাকাগুলো ফেরত চাচ্ছে।”

“তুমি খামোখাই নাক গলাচ্ছে! প্যারিস ছাড়ো! এসব বাদ দাও!”

“কেন আমরা সেটা করবো? আমরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, আমরা আমাদের ব্যালাপশিটটা সংশোধন করতে চাই। সেটা করার ক্ষমতা আর অধিকার আমাদের আছে।”

“তোমাদের কিছুই করার নেই!” মাদাম লাভিয়া রেগেমেগে বললো। “ভুলটা তোমাদের, তোমরাই সেটার মূল্য চুকাবে!”

“ভুল?” তাকে খুব সতর্ক হতে হবে। “আমাদের কাছ থেকে চুরি করলে আমরা তো আর দোষী হতে পারি না!”

“তোমাদের পছন্দটা ভুল ছিলো, মঁসিয়ে। তোমরা ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলে।”

“সে জুরিখ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে,” জেসন বললো। “তুমি সেটা জানো। আর তোমরা যদি সেটা তার কাছ থেকে নিতে যাও তাহলে অনেক বড় ভুল ক’রে ফেলবে।”

“আমরা কোনো টাকা চাই না!”

“জেনে খুশি হলাম। ‘আমরা’-টা কারা?”

“আমার মনে হয় তুমি বলেছিলে সেটা তুমি জানো।”

“আমি বলেছিলাম আমাদের একটা ধারণা আছে। জুরিখের কোয়েনিগ নামের লোকটার পরিচয় ফাঁস করাটাই যথেষ্ট। প্যারিসের দামাকোর্ত। আমরা যদি সেটা করি তো খুব বড়সড় বিব্রতকর একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই না?”

“টাকা? বিব্রত? এগুলো তো কোনো ইস্যু নয়। তোমরা সবাই বোকার মতো কাজ করছো! আবারো বলছি, প্যারিস ছাড়ো। এসব বাদ দাও। এটা আর তোমার বিষয় নয়।”

“আমরা মনে করি না সেটা তোমাদেরও বিষয়। সত্যি বলতে কি, আমরা মনে করি তোমরা অযোগ্য।”

“অযোগ্য!” অবিশ্বাস ফুটে উঠলো লাভিয়ার চোখেমুখে ।

“ঠিক ।”

“তোমার কি কোনো ধারণা আছে, কি বলছো? কার সম্পর্কে বলছো?”

“তাতে কিছুই যায় আসে না । তোমরা এসব থেকে বিরত না থাকলে সব ফাঁস ক’রে দেবো । জুরিখ, ভালোয়া, সব । সুরেত, ইন্টারপোলকে ডাকবো...গুরু হবে পাকড়াও অভিযান ।”

“তুমি একটা পাগল । বোকাও বটে ।”

“মোটাই না । সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের বন্ধু রয়েছে । আমাদেরকে আগে তথ্য যোগাড় করতে হবে, তারপর সঠিক সময় আর স্থানের জন্যে অপেক্ষা করবো । আমরা তাকে পাকড়াও করবোই ।”

“তাকে তোমরা কিছুই করতে পারবে না । সে আবারো উধাও হয়ে যাবে! সেটা কি বুঝতে পারছো না? সে প্যারিসে আছে । একদল লোক তাকে খুঁজছে, সেটা সে জানে না । সে হয়তো একবার দু’বার পালাতে পারবে । কিন্তু তৃতীয়বার পারবে না! আমরা তাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছি!”

“আমরা চাই না তোমরা তাকে ফাঁদে ফেলো । এটা আমাদের কাম্য নয় ।” প্রায় সময় হয়ে গেছে, ভাবলো বর্ন । তবে সত্যটা বের করার জন্যে মহিলাকে বিস্ফোরিত করতে হবে । আরেকটু সময় লাগবে । “আমাদের আলটিমেটামটা শোনো, আর এটা তুমিই জায়গা মতো পৌছে দেবে—তা না হলে তোমার অবস্থা হবে কোয়েনিগ আর দামাকোর্তের মতো । তোমাদের শিকার অভিযান বন্ধ করো, তা যদি না করো আগামীকাল সকাল থেকে আমরা খুব দ্রুত আমাদের কাজ শুরু ক’রে দেবো । আমরা এমন শোরগোল করবো যে, সেনা অনরের লো ক্লাসিক খুবই বিখ্যাত আর জনপ্রিয় জায়গা হয়ে উঠবে । অনেকে ওখানে যাবে, তবে কোনো ক্রেতা নয়, বুঝলে?”

চড়া মেকআপের মুখোশটাতে ফাঁটল ধরলো, “তুমি এটা করবে না! কতো বড় আত্মপরাধ তোমার? এসব বলার তুমি কে!”

একটু চুপ থাকলো সে তারপর আঘাত হানলো । “এমন একদল লোক যারা তোমাদের কার্লোসকে তেমন একটা পরোয়া করে না ।”

লাভিয়া জমে গেলো একেবারে । তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে চোখেমুখে একটা বিস্ময় ফুঁটে উঠলো । “তুমি জানো,” নিচু কণ্ঠে বললো সে । “তারপরও তোমরা ভাবছো তার বিরুদ্ধে তোমরা যেতে পারবে? তোমরা মনে করো তোমরা কার্লোসের সমকক্ষ?”

“বলতে গেলে সেরকমই ।”

“তুমি একটা উন্মাদ । কার্লোসকে তোমরা আলটিমেটাম দিতে পারো না ।”

“দিলাম তো ।”

“তাহলে তুমি মরে গেছো। তুমি এ নিয়ে কারো সাথে কথা বলেছো তো ঐদিনই শেষ হয়ে যাবে। সব জায়গায় তার লোক রয়েছে। তারা তোমাকে রাস্তায় ফেলে জবাই করবে।”

“তারা তা করতে পারে যদি তারা জানে কাকে জবাই করতে হবে,” জেসন বললো। “তুমি ভুলে গেছো। তারা জানে তুমি কে। কোয়েনিগ আর দামাকোর্ট। যখনই তোমাকে ফাঁস করবো, তারা তোমাকে শেষ ক’রে দেবে। কার্লোস আর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে না। কিন্তু আমাকে কেউ চেনে না।”

“তুমি ভুলে গেছো, মঁসিয়ে; আমি তোমাকে চিনি।”

“এ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার খোঁজ কোরো...এসব ক্ষতি হবার পর আর তোমার নিজের ভাগ্য নির্ধারণের পর। খুব বেশি সময় লাগবে না।”

“এটা একেবারেই পাগলামী। কোথেকে যে এসেছো তুমি; উড়ে এসে জুড়ে ব’সে এরকম পাগলের মতো কথা বলছো। তুমি এটা করতে পারবে না!”

“তুমি কি আপোষ করার কথা বলছো?”

“এটা করা যেতে পারে,” জ্যাকুলিন লাভিয়া বললো। “যেকোনো কিছু সম্ভব।”

“এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার মতো অবস্থান কি তোমার আছে?”

“আমি এটা পৌছে দেয়ার মতো অবস্থানে আছি...অন্যেরা এটা পৌছে দেবে তার কাছে।”

“তাহলে আমরা কথা বলতে পারি।”

“তা পারি, মঁসিয়ে,” মাদাম লাভিয়া বললো।

“তাহলে যেটা নিশ্চিত সেটা নিয়েই শুরু করা যাক।”

“কোনটা?”

এখনই সত্যটা বলতে হবে।

“কার্লোসের সাথে বর্নের কি হয়েছে? সে কেন তাকে চাচ্ছে?”

“বর্নটা আবার কে—” মহিলা চুপ মেরে গেলো, তিজতা আর ভয় তিরোহিত হলো বিস্ময়ে।

“আমি আবারো সেটা বলছি,” নিজের হৃদস্পন্দনটা তার কানে এলো। “কার্লোসের সাথে বর্ন কি করেছে?”

“সে তো কেইন! আমাদের মতো তুমিও সেটা জানো। সে তোমার ভুল পছন্দ! তুমি এক ভুল লোককে বেছে নিয়েছো!”

কেইন। সে নামটা শুনেছে, একটা প্রতিধ্বনি বজ্রপাতের মতো তার কানে তাল লাগিয়ে দিলে তার মাথার তীব্র যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এলো। বার বার তার মাথায় শব্দটা উচ্চারিত হতে লাগলো। কেইন। কেইন। আবারো চারপাশে কুয়াশা। অন্ধকার, ঝড়ো বাতাস। বিস্ফোরণ।

আলফা, ব্রাভো, কেইন, ডেল্টা, ইকো, ফক্সট্রট...কেইন, ডেল্টা। ডেল্টা, কেইন, ডেল্টা... কেইন।

কেইন-এ চার্লি।

ডেল্টা-তে কেইন!

“কি হয়েছে তোমার?”

“কিছু না,” বর্ন তার ডান হাতটা দিয়ে বাম হাতের কজি ধরে রেখেছে। তার আঙুলগুলো এতো জোরে খামছে ধরেছে যে, মাংস কেটে ভেদ করছে যেনো। তাকে কিছু একটা করতে হবে। তার এই কাঁপুনিটা বন্ধ করতে হবে। যন্ত্রণাটা উপেক্ষা করতে হবে। তার মাথাটাও পরিষ্কার ক’রে নিতে হবে। সত্যের চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে মুখ ঘুরিয়ে রাখতে পারে না। “বলে যাও,” নিজের কণ্ঠটা নিয়ন্ত্রণে এনে বললো সে।

“তুমি কি অসুস্থ? তোমাকে খুব ফ্যাকাশে আর—”

“আমি ঠিক আছি,” সে কর্কশভাবে বললো। “বললাম তো, বলে যাও।”

“তোমাকে বলার আর কি আছে?”

“পুরোটা বলো। আমি এটা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।”

“কেন? এমন কিছু নেই যা তুমি জানো না। তুমি কেইনকে বেছে নিয়েছো। কার্লোসকে বাতিল করেছো। ভাবছো এখন আবার তাকে বাতিল করতে পারবে। তুমি তখনও ভুল করেছো, এখনও করছো।”

আমি তোকে খুন করবো। তোর গলা টিপে দম বের ক’রে ফেলবো। বল আমাকে। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বল। শেষ প্রাণেই আমার গুরু নিহিত আছে। আমাকে সেটা জানতে হবে।

“তাতে কিছু যায় আসে না,” সে বললো। “তুমি যদি আপোষ করতে চাও—যদি তোমার নিজের জীবনটা কেবল বাঁচাতে চাও—আমাকে বলো কেন আমরা শুনবো। কার্লোস কেন এতোটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ...এতোটা প্যারানয়েড...বর্নের ব্যাপারে? এটা আমাকে বুঝিয়ে বলো, মনে করো আমি এ সম্পর্কে কিছুই শুনি নি। তা যদি না করো, তাহলে যে নামগুলো বলেছি, তা প্যারিসে ফাঁস ক’রে দেবো। আর বিকেলের মধ্যেই তুমি খুন হয়ে যাবে।”

লাভিয়া আড়ষ্ট হয়ে গেলো। “কার্লোস কেইনকে পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত খুঁজে বেড়াবে। তাকে খুন করবে।”

“আমরা সেটা জানি। আমরা জানতে চাই, কেন?”

“তাকে সেটা করতে হবে। নিজেকে দ্যাখো। তোমার মতো লোকজনকে দ্যাখো।”

“এটা তো অর্থহীন। তুমি জানো না আমরা কারা?”

“আমার জানার দরকারও নেই। আমি জানি তোমরা কি করেছো।”

“খুলে বলো!”

“বলেছি। তুমি কার্লোসকে কোণঠাসা করার জন্যে কেইনকে বেছে নিয়েছিলে—সেটা তোমার ভুল ছিলো। ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছো তুমি। ভুল গুণঘাতককে তুমি টাকা দিয়েছো।”

“ভুল গুণ্ঘাতক...”

“তুমিই প্রথম নও, তবে তুমি হবে শেষ। সেই ভণ্ড উল্লাসিকটা এই প্যারিসে খুন হবে, কোনো আপোষ করা হোক আর না হোক।”

“আমরা ভুল গুণ্ঘাতককে বেছে নিয়েছিলাম...” কথাটা অভিজাত, সুগন্ধী ছড়ানো রেস্তোরাঁর ভেতরে ভেসে বেড়ালো। তার চারপাশের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। যন্ত্রণাটাও মিঁয়ে আসছে। সে দেখতে শুরু করলো। আর যা দেখতে পেলো, সেটা একটা দানবের অবয়ব। কোনো মিথ নয়, একটা দানব। আরেকটা দানব। দুটো।

“তুমি কি এ ব্যাপারে সন্দেহ করো?” মহিলা জিজ্ঞেস করলো। “কার্লোসের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। তাকে কেইনের পেছনে লাগতে দাও। তাকে তার প্রতিশোধ নিতে দাও।” একটু থেমে আবারো বললো, “আমি কিছুই প্রতীক্ষা করছি না, তবে আমি তোমার হয়ে কথাটা জানিয়ে দেবো, তোমার লোকজনদের ক্ষতিটা পুষিয়ে দেবার জন্যে। এটা সম্ভব...তুমি সেটা বোঝো...তোমার কন্ট্রাস্টটাকে সম্মান জানানো হবে, আর কাজটা সে-ই করবে যাকে তোমার আগে বেছে নেয়া উচিত ছিলো।”

“আমরা ভুল একজনকে বেছে নিয়েছিলাম।”

“তুমিও সেটা বোঝো, তাই না মঁসিয়ে? তোমাকে সেটা কার্লোসের বলা উচিত ছিলো। হয়তো...তুমি যদি তোমার ভুলটা বুঝতে পারো তবে হয়তো সে তোমার ক্ষতিটাকে পুষিয়ে দেবে।”

“এই হলো তোমার আপোষ?” বর্ন কাঠখোঁট্টাভাবে বললো। নিজের সমস্ত চিন্তা ভাবনাগুলো গোছাতে চাইলো সে।

“যেকোনো কিছুই সম্ভব। হুমকী ধামকি দিয়ে ভালো কোনো ফল পাবে না তুমি, সেটা আমি বলতে পারি। কেবল অর্থহীন খুনাখুনি হবে। আর তাতে ক’রে কেইনেরই লাভ হবে। তুমি খালি একবারই হারবে না, দ্বিতীয়বারও হারবে।”

“সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে...” জেসন তার শুকনো গলায় ঢোক গেলার চেঁটা করলো। “তাহলে আমি আমার লোকজনকে বোঝাবো কেন আমরা...ভুল লোককে...বেছে নিয়েছিলাম।” এটা বন্ধ করো! কথাটা শেষ করো। নিয়ন্ত্রণ করো নিজে। “কেইন সম্পর্কে যা জানো সব আমাকে বলো।”

“এটা জেনে তোমার কি লাভ?”

“আমরা যদি ভুল মানুষকে বেছে নিয়ে থাকি তবে আমাদের কাছে ভুল তথ্যও আছে।”

“তুমি শুনেছো সে কার্লোসের সমকক্ষ, তাই না? তার পারিশ্রমিক একটু কম, আর মাঝখানে যেহেতু ধাপগুলো কম, লোকজনও কম জড়িত, তাই কন্ট্রাস্টটা ট্রেস করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই না?”

“হয়তো।”

“অবশ্যই। এটাই তো সবাই বলাবলি করে, আর এটা একেবারেই মিথ্যে। কার্লোসের আসল শক্তি তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে তথ্যের উৎসগুলো—অকাটা আর নির্ভরযোগ্য সব তথ্য।”

“মনে হচ্ছে তার সাথে অনেক লোক জড়িত। জুরিখেও অনেকে ছিলো। এখানে, এই প্যারিসেও অনেক আছে দেখছি।”

“সবাই অন্ধকারে আছে, মঁসিয়ে। সবাই। কেউ জানে না কি করছে তারা।”

“অন্ধকারে আছে?”

“বলতে গেলে আমি এই অপারেশনে কয়েক বছর ধরেই আছি, আরো কয়েক ডজন আছে যাদের ছোটোখাটো কিছু ভূমিকা রয়েছে—কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আমি এখন পর্যন্ত একজনের সাথেও সাক্ষাত করি নি, যে কখনও কার্লোসের কথা আমাকে বলেছে। সে কে, সে সম্পর্কে খুব কম মানুষেরই ধারণা আছে।”

“এটা তো কার্লোস। আমি কেইনের সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম। কেইনের সম্পর্কে তুমি কি জানো।” নিয়ন্ত্রণ করো নিজেকে। তুমি মুখ সরিয়ে রাখতে পারো না। তার দিকে তাকাও। তাকাও!

“কোথেকে শুরু করবো?”

“তোমার মনে প্রথমে যা আসে সেখান থেকে শুরু করো। সে কোথেকে এসেছে?” চোখ সরিয়ে নিও না!

“দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে।”

“অবশ্যই...” ওহ ঈশ্বর।

“আমেরিকান মেডুসা থেকে। আমরা সেটা জানি...”

মেডুসা! ঝড়ো বাতাস, অন্ধকার, আলোর ঝলকানি, তীব্র যন্ত্রণা... ব্যথাটা এবার তার মাথাটা জেঁকে ধরলো। সে আর তার মাঝে রইলো না। সে এক সময় যেখানে ছিলো সেখানে চলে গেলো। সময় আর দূরত্বের বিচারে বহু দূরের এক পৃথিবীতে। যন্ত্রণাটা। ওহ ঈশ্বর। যন্ত্রণাটা...

ভাও!

সি-সাহ্!

তাম কুয়ান! আলফা, ব্রাভো, কেইন... ডেল্টা।

ডেল্টা...কেইন।

চার্লির জন্যে কেইন।

কেইনের জন্যে ডেল্টা।

“কি হয়েছে?” মহিলা ভয়ানক কণ্ঠে জানতে চাইলো। “তুমি ঘামছো। তোমার হাত কাঁপছে। তোমার কি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে?”

“এটা খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে,” একটা ক্রমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো জেসন।

“খুব প্রেসারের কারণে হয়েছে, না?”

“হ্যা। বলে যাও। সময় বেশি নেই। লোকজন এসে যাবে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। কেইনের কথা বলো। তুমি বললে সে এসেছে আমেরিকান...মেডুসা থেকে।”

“লে মার্সিয়ে দু দায়াবাল,” লাভিয়া বললো। “ইন্দো-চিনা ঔপনিবেশিকরা মেডুসার এই ডাক নাম দিয়েছিলো—খুবই যথার্থ একটি নাম, তুমি কি তাই মনে করো না?”

“আমি কি মনে করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমি শুনতে চাই তুমি কি মনে করো, তুমি কেইনের ব্যাপারে কি জানো।”

“তোমার অ্যাটাকটা তোমাকে আরো বেশি রুশ্ব ক’রে ফেলেছে।”

“আমার অধৈর্য আমাকে আরো বেশি অধৈর্য ক’রে তুলেছে। তুমি বললে আমরা ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছিলাম। যদি তাই ক’রে থাকি তবে আমাদের কাছে ভুল তথ্য ছিলো। লে মার্সিয়ে দু দায়াবাল। তুমি কি বলতে চাচ্ছে, কেইন একজন ফরাসি?”

“মোটাই না, তুমি আমাকে খুব বাজেভাবে পরীক্ষা করছো। আমি এটা উল্লেখ করেছেি কেবল এটা বোঝানোর জন্যে যে, আমরা মেডুসার অভ্যন্তরে কতো গভীরে প্রবেশ করেছিলাম।”

“‘আমরা’ হলো সেইসব লোক যারা কার্লোসের হয়ে কাজ করে।”

“সেটা তুমি বলতে পারো।”

“আমি সেটাই বলবো। কেইন যদি ফরাসি না হয়ে থাকে, তবে সে কি?”

“সন্দেহাতীতভাবেই একজন আমেরিকান।”

ওহ ঈশ্বর! “কেন?”

“তার ধরণ-ধারণ সব আমেরিকান। তার মধ্যে কোনো সূক্ষ্মতা নেই। অন্যের কাজের কৃতিত্ব সে নিজের নামে নিয়ে নেয়। যাদের কিছুই করে নি, তাদের হত্যার দাবি ক’রে বসে সে। কার্লোসের পদ্ধতিগুলো আর কানেকশানগুলো জীবিত অন্য যে কারোর চেয়ে বেশি স্টাডি করেছে সে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, সে নাকি সম্ভাব্য ক্রায়েন্টদের কাছে ওগুলো মুখস্ত বলে যায়। সে কেবল নিজেকে কার্লোসের জায়গায় ভাবে না, মাঝে মাঝে সে দাবি করে সে-ই কার্লোস। খুনের কন্ট্রাষ্ট গ্রহণ ক’রে সেটা খুব সহজেই সে সম্পাদনা করতে পারবে।” লাভিয়া থামলো। “একই কাজ সে তোমার সঙ্গেও করেছে—তোমার লোকজনের সঙ্গে, তাই না?”

“হতে পারে।” জেসন আবারো তার হাতের কজিটা ধরলো, তার কাছে কথাগুলো ফিরে আসছে।

স্টুটগার্ড। রেজেনবার্গ। মিউনিখ। দুটো খুন আর একটা অপহরণ, বাডের-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে টাকাগুলো এসেছিলো...

তেহরান? আটটা খুন। একাধিক দাবি—খোমেনি এবং পিএলও। চুক্তির অঙ্ক দুই মিলিয়ন ডলার। দক্ষিণ-পশ্চিম সোভিয়েত সেক্টর।

প্যারিস...সবগুলো কন্ট্রাক্টই প্যারিসে প্রক্রিয়া হয়েছে।

কার কন্ট্রাক্ট?

সানচেজ...কার্লোস?

“...সব সময় এধরণের চালাকি করে।”

লাভিয়া কথা বললেও সে শুনতে পেলো না। “কি বললে তুমি?”

“তুমি মনে করতে পেরেছো, হ্যা? সে তোমার সাথেও একই চালাকি করেছে—তোমার লোকজনের কথা বলছি আর কি। এভাবেই সে তার অ্যাসাইনমেন্টগুলো পেয়ে থাকে।”

“অ্যাসাইনমেন্ট?” বর্ন আবার ধাতস্থ হয়ে বাস্তবে ফিরে এলো। “সে অ্যাসাইনমেন্টগুলো পেয়ে থাকে, তারপর,” উদাসভাবে বললো সে।

“সেগুলো বিশেষজ্ঞ আর অভিজ্ঞদের সাহায্যে বাস্তবায়ন করে থাকে। তার খুন করার রেকর্ড খুবই অসাধারণ। অনেক দিক থেকে কার্লোসের পরেই তার অবস্থান—তবে তার সমকক্ষ নয়। কিন্তু একজন গেরিলা হিসেবে কার্লোসের চেয়ে অনেক ভালো। তার অসাধারণ এবং বহুমুখী দক্ষতা আছে। খুবই উদ্ভাবনী, মেডুসা থেকে বের হয়ে আসা প্রশিক্ষিত একটি মারণাস্ত্র সে। তবে এটা তার অহংকার আর সেটাই তাকে কার্লোসের কাছে ধরাশায়ী করবে।”

“এজন্যে সে আমেরিকান? নাকি এটা তোমার ধারণা? আমার মনে হয় তুমি আমেরিকান টাকা পছন্দ করো।”

“এটা কোনো পূর্ব-ধারণা বা সংস্কার নয়, মঁসিয়ে। তার পরিচয়টা আমরা জানি।”

“কিভাবে সেটা জানলে?”

“একজন অতৃপ্ত মানুষকে ওয়াশিংটন থেকে আনা হয়েছে।”

“ওয়াশিংটন?”

“সেই আমেরিকানটাও কেইনকে খুঁজছে, আমার ধারণা মেডুসার কথা কখনও প্রকাশ করা হয় নি। কেইন হয়তো খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। এই অতৃপ্ত লোকটা আমাদেরকে প্রচুর তথ্য দিয়েছে, তার মধ্যে মেডুসা রেকর্ডও রয়েছে। জুরিখের লোকগুলোর সাথে এটা ম্যাচ করা খুবই সহজ ব্যাপার। বিশেষ করে কার্লোসের জন্যেও। অন্যকারোর জন্যে নয়।”

খুব বেশি সহজ-সরল, জেসন ভাবলো। কেন এই ভাবনাটা এলো সেটা সে জানে না। “আচ্ছা,” সে বললো।

“আর তুমি? তুমি কিভাবে তাকে খুঁজে বের করবে? কেইন না, বর্নের কথা বলছি।”

উদ্বেগের ঘন কুয়াশার মাঝে জেসন আরেকটা কথা স্মরণ করলো। কথাটা তার নয়, মেরির। “খুবই সহজ,” বললো সে। “একটা অব্যবহৃত ডিপোজিটের মাধ্যমে অন্য একটা একাউন্টে আমরা তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। উদ্বৃত্তটা আরেকটা ব্লাইন্ড একাউন্টে পাঠানো হয়েছিলো। নাম্বারগুলো ট্রেস করা যেতে পারে, এটা একটা ট্যান্ড্র হাতিয়ার।”

“কেইন এটা করতে দিয়েছিলো?”

“সে এটা জানতো না। যে নাম্বারের টাকা দেয়া হয়েছিলো সেটা অন্য একটা নাম্বার—টেলিফোন নাম্বার—ফিশের একটা নাম্বার।”

“আমি তোমার প্রশংসা করছি।”

“এটার কোনো দরকার ছিলো না, কিন্তু তুমি তো কেইনের সম্পর্কে সবই জানো। এ পর্যন্ত তুমি যা করেছো সেটা একটা আইডেন্টিফিকেশনকে ব্যাখ্যা করে। এবার বলে যাও। এই বর্ন নামের লোকটা সম্পর্কে যা জানো, সব। তোমাকে যা বলা হয়েছে, সবটাই বলো।” সতর্ক থেকে। তোমার কণ্ঠ থেকে টেনশনটা ঝেড়ে ফেলো। তুমি এখন ডাটা মূল্যায়ন করছো। মেরি, তুমি এটা বলেছিলে। প্রিয় মেরি। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, তুমি এখানে নেই।

“তার সম্পর্কে যা জানি সেটা পূর্ণাঙ্গ নয়। সে মূল্যবান ডাটাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এই শিক্ষাটা সে সন্দেহাতীতভাবেই কার্লোসের কাছ থেকে শিখেছে। তবে সবটা নয়। আমরা সবগুলো টুকরো জড়ো করে একটা ছবি পেয়েছি। মেডুসাতে নিয়োগ পাবার আগে সে সিঙ্গাপুরের বসবাসরত ফরাসি বলা একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী হিসেবে নিউইয়র্ক-ক্যালিফোর্নিয়ার আমেরিকান আমদানীকারকদের পক্ষ হয়ে কাজ করতো। সত্য হলো, সে এসব আমদানীকারক কর্তৃক্ষ বরখাস্ত হয়েছিলো, তারপরেই তাকে আমেরিকাতে ফিরিয়ে নিয়ে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। সে তাদের কাছ থেকে বেশ মোটা অংকের টাকা চুরি করেছিলো। সিঙ্গাপুরে একজন বিচ্ছিন্ন, একাকী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলো সে। অবৈধ জিনিস আমদানী, অপারেশন চালানো, এবং অসাধারণ পৈশাচিকতার কারণে সে খুব শক্তিশালী ছিলো।”

“তার আগে বলা,” জেসন কথার মাঝখানে বললো। টের পেলো কপালে আবারো ঘাম জমতে শুরু করেছে। “সিঙ্গাপুরের আগে সে কোথায় ছিলো?” সতর্ক থাকো! ছবিগুলো! সে সিঙ্গাপুরের পথঘাটের ছবিগুলো দেখতে পেলো। প্রিন্স এডওয়ার্ড রোড, কিম চুয়ান, বুন ট্রাই স্ট্রট, ম্যাক্সওয়েল, কাসকাডেন।

“এইসব রেকর্ড কেউ খুঁজে পাবেন না। কেবল গুজব আছে আর সেগুলো অর্থহীন। যেমন বলা হয়, সে একজন বহিষ্কৃত যাজক, যে কিনা পাগল হয়ে গেছে। আরেকটা গুজব আছে, সে ছিলো একজন তরুণ আগ্রাসী ব্যাংকার, যে সিঙ্গাপুরের কয়েকটি ব্যাংকের তহবিল তহরুপ করেছে। জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না। কোনো কিছু খতিয়ে দেখারও নেই।”

তুমি ভুল বলছো, প্রচুর আছে। তবে সেটার কোনো কিছুই এটার অংশ নয়... একটা ফাঁক আছে এখানে, আর সেটা পূরণ করতে হবে। তুমি আমাকে সাহায্য রকতে পারবে না। সম্ভবত কেউই পারবে না। কেউ করবেও না।

“এ পর্যন্ত তুমি চমকে দেবার মতো কিছুই বলো নি,” বর্ন বললো। “আমার আগ্রহ আছে তার সাথে সম্পর্কিত কোনো কিছুই না।”

“তাহলে আমি জানি না তুমি কি চাও! তুমি আমাকে প্রশ্ন করছো, বিস্তারিত বলার জন্যে চাপ দিচ্ছে। আর যখনই আমি তোমাকে কোনো কিছু বলছি, তুমি সেটা অপ্রাসঙ্গিক ব’লে বাতিল ক’রে দিচ্ছে। তুমি আসলে কি চাও?”

“তুমি কেইনের ব্যাপারে যা জানো...তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে? যেহেতু তুমি আপোষ করতে চাচ্ছে, তার একটা যুক্তিসংগত কারণ দাও আমাকে। যদি আমাদের তথ্যগুলো আলাদা হয়, তবে সে কি করেছে সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামানো হবে না। কখন সে তোমাদের নজরে প্রথম এলো? কার্লোসের নজরে? দ্রুত বলো!”

“দু’বছর আগে,” বললো মাদাম লাভিয়া। “এশিয়া থেকে একটা খবর পাওয়া গেলো যে, এক শ্বেতাঙ্গ বিস্ময়করভাবে কার্লোসের অনুরূপ সার্ভিস দেবার প্রস্তাব করছে। সে খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলো। মউলমেনে এক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুন হলেন; দু’দিন বাদে টোকিওতে নাম করা এক জাপানি রাজনীতিবিদ খুন হলেন। এক সপ্তাহ পরে, হংকংয়ের এক সংবাদপত্রের সম্পাদক গাড়ি বোমায় নিহত হলেন। আর তারও আটচল্লিশ ঘণ্টা কম সময় পরে—কলকাতার রাস্তায় একজন ব্যাংকার খুন হলো। সবগুলোর পেছনে ছিলো কেইন।” মহিলা থামলো। বর্নের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে, কিন্তু সে কিছুই দেখতে পেলো না। “তুমি কি দেখছো না, সে সবখানেই আছে? সে এক খুন থেকে আরেক খুনের ঘটনা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে। সে খুব দ্রুত নিজের সুনাম তৈরি ক’রে ফেলেছে। কারো সন্দেহ নেই সে একজন পেশাদার। এরপরই নির্দেশ পাঠানো হলো : এই লোকটার সম্পর্কে জানো, যতো পারো জেনে নাও। আমরা যেটা বুঝি নি, কার্লোস সেটা বুঝতে পেরেছে। আর বারো মাস পরে তার ধারণাই সঠিক ব’লে প্রমাণ হচ্ছে। ম্যানিলা, ওসাকা, হংকং এবং টোকিও থেকে খবর আসতে লাগলো। কেইন ইউরোপে চলে গেছে। তারা আরো জানালা সে প্যারিসকে তার অপারেশনের ঘাঁটি বানাবে। চ্যালেঞ্জটা পরিস্কার। দস্তানা ছুড়ে মারা হয়েছে। কেইন কার্লোসকে ধ্বংস করতে মরিয়া। সে হয়ে উঠবে নতুন কার্লোস, যারা তাদেরকে খুঁজছে সে তাদের সার্ভিস দিতে লাগলো। যেমনটি আপনি তাকে খুঁজছেন, মঁসিয়ে।”

“মউলমেন, টোকিও, কলকাতা...” জেসন বিড়বিড় ক’রে বললো। অস্পষ্ট এক অতীতের স্মৃতি ছায়া ভেসে এলো তার চোখের সামনে। “ম্যানিলা, হংকং...” সে থামলো। কুয়াশাটা কাটাতে চাইলো।

“সেইসব জায়গা এবং আরো অসংখ্য জায়গায়,” লাভিয়া বলতে লাগলো। “আর এটাই হলো কেইনের ভুল। অনেকের কাছে কার্লোস হয়তো অনেক কিছু, কিন্তু যেসব লোক তার কাছ থেকে সুবিধা পেয়েছে, লাভবান হয়েছে, তারা তার প্রতি আনুগত্য দেখায়। তার ইনফর্মার আর ভাড়াটেরা খুব সহজে বিক্রি হয় না। যদিও কেইন এটা বার বার চেষ্টা করেছে। কেইন যা বুঝতে পারে নি—এখনও বুঝতে পারছে না—তা হলো কার্লোসের নেটওয়ার্কটা খুবই বিস্তৃত। কেইন যখন ইউরোপে চলে এলো তখন জানতো না তার কর্মকাণ্ডের খবর বার্লিন, লিসবন, আমস্টারডাম...ওমান পর্যন্ত চাউড় হয়ে গেছে।”

“ওমান,” বর্নের মুখ দিয়ে শব্দটা বের হয়ে গেলো। “শেখ মুস্তাফা কালিগ,” ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো সে।

“এটা কখনই প্রমাণিত হয় নি!” দ্বিমত পোষণ করে লাভিয়া বললো। “ইচ্ছাকৃতভাবে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের ধোয়া তোলা হয়েছিলো, আসলে কন্ট্রাস্টটাই কল্লিত। সে একটি অভ্যন্তরীণ হত্যার কৃতিত্ব নিয়েছে। কেউ ঐ নিরাপত্তা ভেদ করতে পারে নি। একটা মিথ্যে!”

“একটা মিথ্যে,” জেসন প্রতিধ্বনি করলো।

“অনেক মিথ্যে আছে। সে বোকা নয়, আশ্চর্য করে একটা গল্প ছেড়ে দেয় সে, জানে এসব গল্প মুখে মুখে ফুলে ফেঁপে উঠবে। সে প্রতিটি চালেই কার্লোসকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। নিজেকে সে কার্লোসের শ্রদ্ধাভিক্ষিত করতে চাইছে। কিন্তু তার সাথে কার্লোসের কোনো তুলনা চলে না। এমন সব কন্ট্রাস্ট নেয় সে যা বাস্তবায়ন করতে পারে না। তুমি হলে তার একমাত্র উদাহরণ। আমরা আরো কয়েক জনের কথা জানি। শুনেছি এজন্যেই নাকি সে কয়েক মাস ধরে গা ঢাকা দিয়েছে, তোমার মতো লোকদেরকে এড়িয়ে চলছে।”

“এড়িয়ে চলছে...” জেসনের হাতটা আবার কাঁপতে শুরু করলো। মাথাটা ধপ্‌ ধপ্‌ করছে এখন। “তুমি...নিশ্চিত?”

“খুবই। সে মারা যায় নি। লুকিয়ে ছিলো। কেইন একটা এনসাইনমেন্টে ব্যর্থ হয়েছে। এটা তো অনস্বীকার্য। সে খুব অল্প সময়ে অনেক বেশি কাজ হাতে নিয়ে নিয়েছে। তারপরও, যখন কাজ করে নিজের সুনাম রক্ষার জন্যে বেছে নেয় একটা ব্যর্থ হত্যাকাণ্ড। এক্ষেত্রে সে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বেছে নেয়। যেমন হত্যাকাণ্ডটি সবাইকে শিহরিত করেছে। অ্যাধাসেডর মউলমেইনে ভ্রমন করছিলেন। তাকে কেউ হত্যার জন্যে বলে নি। ওটা হলো তার কর্মকাণ্ডের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরকম আরো দুটো আছে—সাংহাই’র এক রাশিয়ান কমিসার এবং মাদ্রিদের এক ব্যাংকার...”

এই কথাগুলো জেসন আগেও শুনেছে। এগুলো যেনো তার বিস্তৃত অতীতের স্মরণ।

মেয়েটা কথা বলছে...তার সম্পর্কে!

আলফা, ব্রাভো, কেইন, ডেল্টা...কেইন হলো চার্লি, ডেল্টা হলো কেইন।

জেসন বর্ন এমন একজন গুপ্তঘাতক যার নাম কেইন।

একটা চূড়ান্ত প্রশ্ন, সরবোনে দু'রাত আগে যে জবাবটা পেয়ে অন্ধকার থেকে তার সংক্ষিপ্ত মুক্তি ঘটেছিলো। মার্শেই। আগস্ট ২৩ তারিখের ঘটনাটা।

“মার্শেই’তে কি ঘটেছিলো?” সে জানতে চাইলো।

“মার্শেই?” লাভিয়া স্মরণ করার চেষ্টা করলো। “তুমি কি ক’রে জানতে পারলে? তোমাকে কোন্ মিথ্যেটা বলা হয়েছে, বলো?”

“শুধু বলো কি ঘটেছিলো।”

“লিল্যান্ডের কথা বলছো? ঐ রহস্যময় অ্যাশাসেডর? বলা হচ্ছে কেউ টাকা দিয়ে তাকে খুন করিয়েছে, সেটার কনট্রাক্ট আসলে কার্লোসের ছিলো।”

“আমি যদি বলি অনেকেই আছে যারা মনে করে কাজটা কেইন করেছে, তাহলে কি হবে?”

“সবাই এরকম ভাবুক সেটাই তো সে চায়! এটা তো কার্লোসকে চূড়ান্ত অপমান করেছে—তার খুনের কৃতিত্ব চুরি করা হয়েছে। কেইনের কাছে পেমেন্টটা বড় কথা নয়। সে কেবল পৃথিবীকে দেখতে চায়—আমাদের পৃথিবীকে—যে কাজ কার্লোসকে দেয়া হয়েছে সেটা সে আগেভাগে ক’রে দিতে পারে। তবে সে কাজটা করতে পারে নি, জানোই তো। লিল্যান্ড খুনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।”

“সে ওখানে ছিলো।”

“সে ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলো। তাকে আর দেখা যায় নি। অনেকেই বলে সে খুন হয়েছে, কিন্তু যেহেতু কোনো লাশ পাওয়া যায় নি তাই কার্লোস সেটা বিশ্বাস করে নি।”

“কেইন কিভাবে খুন হতে পারে?”

মাদাম লাভিয়া মাথা ঝাঁকালো। “ওয়াটারফ্রন্টের দু’জন লোক এই কৃতিত্বটা নেবার চেষ্টা করেছিলো। এজন্যে টাকা পাবার চেষ্টাও করেছিলো তারা। একজনকে আর কখনও দেখা যায় নি। ধরে নেয়া হয় কেইন তাকে খুন করেছে। যদি সেটা কেইন হয়ে থাকে তো। তারা ছিলো ডক-ইয়ার্ডের ভবঘুরে।”

“ফাঁদটা কি ছিলো?”

“তথাকথিত ফাঁদ, মঁসিয়ে। তারা খবর পেয়েছিলো হত্যাকাণ্ডের আগের রাতে অথবা ঠিক আগেভাগে কেইন এক লোকের সাথে দেখা করতে আসবে রুই সারাসিনে। তারা বলেছে, কেইন ডকে অপেক্ষা করছে বলে তারা একটা মেসেজ দিয়ে লোকটাকে মাছ ধরার একটা ট্রলারে নিয়ে আসে। ট্রলারটা এবং তার স্কিপারকে আর দেখা যায় নি। সুতরাং তারা হয়তো ঠিকই বলেছে—তবে যেমনটি বলেছি, কোনো প্রমাণ নেই। যে লোকটাকে ওখানে দেখা গেছে তার সাথে কেইনের যথার্থ বর্ননাও পাওয়া যায় নি। ওখানেই ওটা শেষ হয়ে গেছে।”

তুমি ভুল বলছো । ওখান থেকেই এটা আমার জন্যে শুরু হয়েছে ।

“আচ্ছা,” বললো বর্ন । “আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে সেটা অবশ্য অন্যরকম ।”

“ভুল । তোমাদেরটা ভুল, মঁসিয়ে । আমি যা বলেছি সেটাই সত্যি ।”

“হ্যা, আমি জানি ।”

“তাহলে আমরা আমাদের আপোষ রফা ক’রে ফেলি?”

“কেন নয়?”

“বুঁয়ো ।” মহিলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো । “তুমি দেখবে এটা সবার জন্যেই ভালো হবে ।”

“তাতে...এখন আর কিছুই যায় আসে না ।” তার কথাটা একদমই শোনা গেলো না । এটা সে নিজেও জানে । সে কি বলেছে? সে এইমাত্র কি বললো? কেন বললো?...কুয়াশাটা আবারো জেঁকে ধরলো তাকে । বজ্রপাতের শব্দ বাড়তে লাগলো । মাথার যন্ত্রণাটা ফিরে এলো আবার । “মানে...যেমনটি বললে, এটা সবার জন্যেই ভালো হবে ।”

সে দেখতে পেলো—টের পেলো—লাভিয়ার চোখ তার উপর । তাকে পরখ করছে । “এটাই যুক্তিসঙ্গত সমাধান ।”

“অবশ্যই । তুমি মনে হয় ভালো বোধ করছো না?”

“আমি বললামই তো, এটা তেমন কিছু না । এটা কেটে যাবে ।”

“আমি স্বস্তি পেলাম । তুমি কি আমাকে কিছু সময়ের জন্যে টয়লেটে যেতে দেবে?”

“না ।” জেসন তার হাতটা খপ্ ক’রে ধরে ফেললো ।

“জে ভু প্রি, মঁসিয়ে । বাথরুমে যাবো । যদি প্রয়োজন মনে করো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকো ।”

“আমরা চলে যাবো । চলে যাবার সময় সেরে নিও ।” ওয়েটারকে বিল নিয়ে আসার ইশারা করলো বর্ন ।

“তোমার যেমন ইচ্ছে,” মহিলা বললো ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডোরে জেসন দাঁড়িয়ে আছে । করিডোরের শেষ মাথায় লেডিস রুম । দশ মিনিট ধরে লাভিয়া লেডিস-রুমে আছে, এটা জেসনকে খুব বিরত করছে । কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছে না জেসন । তার অবস্থা খুব সঙ্গীন । শব্দ আর যন্ত্রণা তাকে গিলে খাচ্ছে । সামনে তাকিয়ে আছে সে, তার পেছনে এক মৃত লোকের ইতিহাস । অতীতটা সত্যের চোখে ধরা পড়েছে । তারা তাকে খুঁজে পেয়েছে । সেও দেখেছে । কেইন...কেইন...কেইন ।

মাথার উপরে কালো সিলিংয়ের দিকে তাকালো সে। তাকে কাজ করতে হবে। নিজেকে আর কোনো নিকষ কালো গহ্বরে ফেলে দিতে পারবে না। একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে...না, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। এখন কেবল সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে।

মেরি। মেরি? ওহ, ঈশ্বর, আমার ভালোবাসা। আমরা অনেক ভুল করেছি!

সে গভীর একটা দম নিয়ে ঘড়ি দেখে লেডিসরুমের দিকে তাকালো।

জ্যাকুলিন লাভিয়া কোথায়? সে বের হয়ে আসছে না কেন? ভেতরে থেকে সে কি করার আশা করছে? হোটেলের মাইতর দি'কে ডেকে সে জেনে নিয়েছে ভেতরে কোনো ফোন নেই। তখন লাভিয়া তার সঙ্গেই ছিলো। লোকটার জবাব সে শুনেছে। জিজ্ঞেস করার কারণটাও বুঝেছে।

আচম্কা তীব্র আলোর ঝলকানি হলে পিছিয়ে গেলো সে। দেয়াল ঘেষে দু'হাতে চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো। তীব্র যন্ত্রণা। ওহ ঈশ্বর। তার চোখে আগুন!

এরপরই কথাগুলো শুনতে পেলো জেসন। করিডোর দিয়ে যেতে থাকা সুবেশী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা মৃদু স্বরে কথা বলছে।

“রজে’তে আপনার ডিনারের স্মরণে, মঁসিয়ে,” ক্যামেরা হাতে এক প্রাণবন্ত হস্টেস বললো। “ছবিগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। রজে’র সৌজন্যে।”

বর্ন আড়ষ্ট হয়ে রইলো। জানতো ক্যামেরাটা ভাঙতে পারবে না। আরেকটা ভীতি জঁকে ধরলো তাকে। “আমার ছবি তুলছো কেন?” জানতে চাইলো সে।

“আপনার ফিয়াসে অনুরোধ করেছে, মঁসিয়ে,” লেডিস রুমের দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে মেয়েটা জবাব দিলো। “ভেতরে আমাদের কথা হয়েছে। আপনি খুব ভাগ্যবান। চমৎকার এক মেয়ে পেয়েছেন। ও আপনাকে এটা দিতে বলেছে।” মেয়েটি ভাঁজ করা একটা কাগজ দিয়ে রেস্টোরাঁ থেকে বের হয়ে যেতেই জেসন সেটা পড়লো।

তোমার অসুস্থতা আমাকে ভুগিয়েছে, আমি নিশ্চিত তোমাকেও ভোগাচ্ছে সেটা, আমার নতুন বন্ধু। হতে পারে তুমি যা বলেছো, তুমি তাই। আবার এও হতে পারে তুমি তা নও। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই জবাবটা পেয়ে যাবো। ডিনার করতে আসা এক সহমর্মী কাস্টমার একটা টেলিফোন করছে, ছবিটা প্যারিসের পথে আছে এখন। তুমি আর সেটা থামাতে পারবে না। আমাদের আপোষ রফাটা নিয়ে আর মাথা ঘামায়ো না। আমার সহযোগীরা যখন এসে পৌঁছাবে তখন আমরা আবার কথা বলবো।

বলা হয়ে থাকে কেইন একজন বহুরূপী, বিভিন্ন ধরনের বেশভূষা নিয়ে থাকে সে। আরো বলা হয়ে থাকে, সে খুবই হিংস্র। এসবই হলো অসুস্থতা, তাই না?

সে দৌড়ে অন্ধকার রাস্তায় চলে এলো। একটা অপস্রয়মান ট্যাক্সির ছাদের বাতিটা দেখা যাচ্ছে। মোড় নিলে সেটা উধাও হয়ে গেলো। একটু থেমে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো সে। আরেকটা ট্যাক্সির জন্যে চারদিকে তাকালো। একটাও নেই। রজে'র দ্বাররক্ষী তাকে বলেছিলো একটা ক্যাব দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। মঁসিয়ে কেন তাকে আরো আগে বললো না? ফাঁদটা পাতা হয়েছে আর সে নিজে এসে সেটাতে ঢুকে পড়েছে।

সামনে! একটা বাতি। আরেকটা ট্যাক্সি! দৌড়াতে শুরু করলো সে। তাকে সেটা থামাতে হবে; তাকে প্যারিসে ফিরে যেতে হবে। মেরির কাছে।

একটা গোলকধাঁধায় অন্ধের মতো ছুটছে সে। কিন্তু পালানোর কোনো পথ নেই। সে জানে কে সে...কি ছিলো। সে একজন অপরাধী।

সে চলে যাবে। মেরি কখনও জানতে পারবে না, আর সেও তাকে কখনও বলতে পারবে না কেন এভাবে চলে গেলো। মেরির কাছে সে ঋণী। এই যন্ত্রণাটা খুবই গভীর। কিন্তু কেইন হওয়ার যন্ত্রণাটা তার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র।

কেইন!

মেরি। মেরি! আমি একি করেছি?

“ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!”

Scan & Edit by Mahmud Rakib

অধ্যায় ১৮

প্যারিস ছাড়া! এফুণি! তুমি যা করছো তা বন্ধ করো! চলে যাও...এগুলো তোমার গভর্নমেন্টের অর্ডার। তারা চায় তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তারা জেসনকে একাকী ক'রে ফেলতে চায়।

মেরি বিছানার পাশে টেবিলে রাখা অ্যাস্ট্রেতে সিগারেটটা ফেলে দিলো। তার চোখ তিন বছরের পুরনো পোটোম্যাক পত্রিকাটার উপর। জেসন তাকে দিয়ে জোর ক'রে যে খেলাটা খেলিয়েছিলো সেটা নিয়ে একটু ভাবলো সে।

“আমি শুনবো না!” সে আপন মনেই কথাটা বললো। খালি ঘরে কথাটা প্রতিধ্বনি করলো যেনো। জানালার কাছে গেলো সে।

আমাকে কিছু বিষয় জানতে হবে...সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে যথেষ্ট কিছু...তবে হয়তো সব কিছু নয়। আমার একটা অংশ হয়তো পালাতে কিংবা উধাও হয়ে যেতে পারবে। এসবের কোনো স্মৃতি আমার নেই। যার কোনো স্মৃতি নেই তার অস্তিত্বও নেই।

“ডার্লিং, তাদেরকে এটা তোমার সাথে করতে দিও না!” মেরির কথাটা এখন আর চমকে দিচ্ছে না। সে জানে জেসন পালাবে না। অর্ধ সত্য নিয়ে সে সন্তুষ্ট হবে না।

তারা তাকে একাকী ক'রে ফেলতে চায়।

তারা কারা? জবাবটা আছে কানাডায়, কিন্তু কানাডা বহু দূরে। আর সেটাও একটা—ফাঁদ।

জেসন প্যারিসের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলো। মেরিও সেটা টের পাচ্ছে এখন। যাই হোক না কেন, সেটা এখানেই আছে। তারা যদি এমন কাউকে খুঁজে বের করতে পারে, যে চাদরটা সরিয়ে তাকে দেখিয়ে দেবে তাকে ম্যানিপুলেট কার হয়েছে, মানে একরকম কজা করা হয়েছে, তারপর দেখা যাবে আরেকটা প্রশ্ন এসে হাজির হয়েছে, জবাবগুলো আর তাকে আত্মহননের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না। সে যদি তার অতীতের কোনো অপরাধ কাহিনী জানতে পারে, তবে সে আরো বড় অপরাধের ঘুঁটি হিসেবে আবির্ভূত হবে। সে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। তবে সবকিছুই আপেক্ষিক। তার ভালোবাসার মানুষটি যা বলেছে সেই অতীতের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যদি থেকে থাকে তবে সেটা মেনে নিয়েই বেঁচে থাকতে পারবে, সেগুলো ভুলে থাকতে পারবে। এই বোধোদয়টাই তার খুব বেশি দরকার। তাকে বুঝতে হবে, সে বলির পাঠা; তার শত্রুরা যা বোঝাতে চায় সারা দুনিয়াকে

সে আসলে তার চেয়ে অনেক কম অপরাধী। তার মৃত্যু আরেকজনের স্থান নিয়ে নেবে। সেই যদি এটা বুঝতো, মেরি যদি তাকে বোঝাতে পারতো। আর মেরি যদি তা করতে না পারে, নির্ঘাত তাকে হারাবে। তারা তাকে ঘায়েল করবে। খুন করে ফেলবে তাকে।

তারা।

“তুমি কে?” সে জানালার দিকে চিৎকার ক’রে বললো। “তুমি কোথায়?” মেরির দম বন্ধ হয়ে গেলো যেনো। কিছুক্ষণ পরে সে আবার শ্বাস নিতে পারলো। সে একেবারে ভড়কে গেছে। এরকমটি আগেও তার হয়েছে। প্যারিসে তাদের প্রথম রাতে, যখন সে ক্যাফে থেকে বের হয়ে তাকে খুঁজতে গেলো।

“বন্ধ করো!” সে চিৎকার ক’রে বললো। “এটা পাগলামী,” সে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো। জেসন চলে গেছে পাঁচ ঘণ্টা হলো। সে কোথায়? সে এখন কোথায়?

অভিজাত হোটেল মর্তপারোয়ার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলো বর্ন। সামনের কয়কটি ঘণ্টা তার স্মরণযোগ্য সংক্ষিপ্ত জীবনের সবচাইতে কঠিন মুহূর্ত হবে—এমন একটা জীবন যা পোর্ত নোয়ে’র আগে একেবারেই ফাঁকা ছিলো। একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। দুঃস্বপ্নটা চলবে। তবে সে এটা নিয়ে একা একা থাকতে পারবে। সে মেরিকে এতোটাই ভালোবাসে যে, তাকে তার সঙ্গে থাকার কথা বলতে পারে নি। সে উধাও হয়ে যাবার জন্যে একটা পথ খুঁজে বের করবে। কাজটা খুব সহজেই করা যাবে। একটা ভূয়া সাক্ষাতের কথা বলে চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না। তারপর কয়েক ঘণ্টা পরে একটা চিঠি লিখে সব জানাবে :

সব শেষ হয়ে গেছে। আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। কানাডায় ফিরে যাও, কাউকে কিছু বোলো না, আমাদের দু’জনের ভালোর জন্যেই। আমি জানি কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা করা যাবে।

শেষ কথাটা মিথ্যে—সে কখনও তার সঙ্গে দেখা করবে না—তবে ছোট্ট একটা আশা জিঁইয়ে রাখতে হবে। মেয়েটা কোনোভাবে অটোয়ার উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠলেই রক্ষা—আস্তে আস্তে তাদের এক সঙ্গে থাকা এক সপ্তাহের মুহূর্তগুলো গভীর অন্ধকারে, এক গোপন স্মৃতিতে বন্দী হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হয়তো মনে পড়বে, এই যা। একটা সময় সেই স্মৃতিটুকুও থাকবে না। বেঁচে থাকবে তার জীবন্ত স্মৃতিগুলো নিয়ে। চোখের আড়ালে থাকলে মনেরও আড়াল হয়ে যাবে। তার চেয়ে অন্য কেউ এটা ভালো জানে না।

সে লবিটা পেরিয়ে যাবার সময় মার্বেল কাউন্টারের পাশে একটা টুলে বসা দ্বাররক্ষীর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। একটা সংবাদপত্র পড়ছে লোকটা; মুখ তুলে তাকালো না বললেই চলে। কেবল লক্ষ্য করলো কেউ একজন আসছে।

এলিভেটরটা পঞ্চম তলায় গিয়ে থামলে জেসন গভীর দম নিয়ে দরজার কাছে গেলো। সে যেভাবেই হোক নাটকীয়তা এড়াতে চায়—কথায় কিংবা চাহুনিতে কোনো সতর্কতা যেনো না থাকে। সে জানে কি বলতে হবে। এটা খুব সতর্কভাবে ভেবে নিয়েছে সে।

“রাতের বেশির ভাগ সময় হেটে বেড়িয়েছি,” মেরির হাতটা ধরে তার লাল চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললো সে। তার মাথাটা বুকে চেপে ধরলো। “হ্যাংলা পাতলা ক্লার্কদের অনুসরণ করা, অর্থহীন কথাবার্তা শোনা, আর কফি খাওয়া। লো ক্লাসিক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই না। ওটা একটা চিড়িয়াখানা। বানর আর ময়ূরের খেলা চলছে সেখানে। তবে আমার মনে হয় না কেউ কোনো কিছু জানে। একটা সম্ভাবনা রয়েছে, ওখানে একজন আছে, সে এক লোকের খোঁজে ব্যস্ত।”

“সে?” জানতে চাইলো মেরি। তার কাঁপুনিটা কমে আসছে।

“যে লোকটা সুইচবোর্ড চালায়,” বর্ন বললো। “তার সঙ্গে মধ্যরাতে রুই হতেফিউলে’র বাক্সিগুয়ে’তে দেখা করতে রাজি হয়েছে।”

“সে কি বললো?”

“সামান্য, তবে আমাকে আগ্রহী করার জন্যে যথেষ্ট। আমি লক্ষ্য করেছি, আমি যখন প্রশ্ন করছিলাম তখন সে আমাকে দেখছিলো। জায়গাটা খুবই নিরিবিলা, তাই আমি খুব ভালোভাবেই ক্লার্কদের সাথে কথা বলতে পেরেছি।”

“প্রশ্ন? তুমি তাকে কি প্রশ্ন করেছো?”

“অনেক ব্যাপারে। প্রধানত ম্যানেজারের সম্পর্কে। মেয়েটা যদি কার্লোসের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে তাহলে তার অবস্থা হতো হিস্ট্রিরিয়াগ্রস্তের মতো। আমি তাকে দেখেছি। সেরকম কিছু তার হয় নি। তার আচরণ ছিলো একেবারে স্বাভাবিক।”

“কিন্তু মেয়েটা তো খবরাখবর দেয়, তুমিই তো বলেছো। দামাকোর্ত সেটা বুঝিয়ে বলেছে। আর ফিশেটাও সে কথারই প্রমাণ দেয়, দেয় না?”

“সরাসরি দেয় না। সে একটা ফোন কল পায় এবং তাকে আরেকটা কল করার আগে বলা হয় কি বলতে হবে।” আসলে জ্যাকুলিন লাভিয়া বেশ ভালো ভাবেই জড়িত। জেসন এটাই খুঁজে পেয়েছে। তবে সে সরাসরি জড়িত নয়।

“তুমি এভাবে যাকে-তাকে যেখানে সেখানে প্রশ্ন করতে পারো না,” মেরি বললো।

“পারি,” বর্ন বললো, “যদি আমি একজন আমেরিকান লেখক হই, আর সেন অনরের উপর একটা জাতীয় ম্যাগাজিনে লেখার কাজ করি।”

“খুব ভালো, জেসন।”

“এতে কাজ হয়েছে। কেউ এরকম কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায় না।”

“কি জানতে পারলে?”

“এরকম জায়গায় যা হয়, লো ক্লাসিকের নিজস্ব কাস্টমার আছে, সবাই বেশ ধনী। বেশিরভাগ লোকেই একে অন্যকে চেনে, কার্লোস জানে সে কি করছে। ওখানে একটা রেগুলার এনসারিং সার্ভিস আছে। তবে ফোনবুথে তালিকাবদ্ধ থাকে সেরকম কিছু নয়।”

“তারা তোমাকে এটা বলেছে?” মেরি তার চোখে চোখ রেখে হাতটা ধরে জানতে চাইলো।

“খুব বেশি না,” মেরির চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো সে। “বারগোয়ার খুব নামডাক আছে ওখানে। সবাই তার প্রশংসা করে। তবে সবাই সেই ম্যানেজারকে মানে। আমার কাছে মনে হয়েছে মহিলা হলো তথ্যভাণ্ডার। সে আমাকে কিছুই বলে নি। কেউ একজন আরেকজনকে তথ্য দেয়, সে আবার সেটা আরেকজনকে দিয়ে দেয়। সোসটি ট্রেস্ করা যাবে না। এই পেয়েছি আমি।”

“মিটিংটা বাস্তিগুঁয়ে’তে, আজ রাতেই বা কেন?”

“আমি চলে যাবার সময় সে আমার কাছে এসে একটা অদ্ভুত কথা বলেছে,” জেসনকে এই মিথ্যে অংশটা আবিষ্কার করতে হলো না। এটা তাকে এক অভিজাত রেস্টোরাঁয় মাত্র এক ঘণ্টা আগে চিরকুটের মাধ্যমে বলা হয়েছে। “সে বলেছে, ‘তুমি যা বলছো হয়তো তুমি তাই, আবার তুমি তা নাও হতে পারো।’ তখনই সে আমাকে একটু পান করার প্রস্তাব করে। সে বলেছে সেটা যেনো সেন অনরের থেকে একটু দূরে হয়।” বর্ন দেখতে পেলো মেরির অবিশ্বাস ক্রমশ সরে যাচ্ছে। মেয়েটা তার মিথ্যের কারসাজিতে ধরা পড়েছে। কেন পড়বে না? সে হলো অসংখ্য খুনের নায়ক, খুবই উদ্ভাবনী। এই মূল্যায়নটা তার কাছে খুব একটা ঘৃণ্য ব’লে মনে হলো না। সে হলো কেইন।

“সে হয়তো সেই একজন, জেসন। তুমি বলেছিলে তোমার খালি একজনকে দরকার, এটা হতে পারে সেই লোকটাই!”

“আমরা সেটা দেখবো,” বর্ন তার হাত ঘড়িটা দেখলো। তার বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে আসছে। সে আর পেছনে ফিরে তাকাতে পারবে না। “আমাদের হাতে প্রায় দু’ঘণ্টা আছে। তুমি অ্যাটাশি কেস্টা কোথায় রেখে যাবে?”

“মরিসে। আমি সেখানে রেজিস্টার করেছি।”

“চলো সেটা তুলে নিয়ে ডিনার ক’রে আসি। তুমি তো ঝাও নি, খেয়েছো কি?”

“না...” মেরির চোখে মুখে প্রশ্ন। “কেসটা যেখানে আছে সেখানেই রাখছো না কেন? ওখানেই তো বেশি নিরাপদে আছে। সেটা নিয়ে আমাদের উদ্দিগ্ন হবার কোনো দরকার নেই।”

“আমাদেরকে যদি এখান থেকে খুব দ্রুত চলে যেতে হয় তাহলে তো সেটা নিতে সমস্যা হবে,” সে সঙ্গে সঙ্গেই বললো, যেনো কথাটা তার ঠোঁটে লেগে ছিলো। মদ নেবার জন্যে ব্যুরোর দিকে গেলো জেসন। যেকোনো মুহূর্তে মুখ ফস্কে বেফাঁস কিছু বের হয়ে যেতে পারে, তার চোখমুখ দেখে মেরি বুঝে যেতে পারে।

“কি হয়েছে, ডার্লিং?”

“কিছু না,” বহুরূপী হেসে বললো। “আমি খুব ক্লান্ত, সম্ভবত একটু নিরাশও।”

“হায় ঈশ্বর, কেন? এক লোক তোমার সাথে গোপনে মধ্যরাতে দেখা করতে চাচ্ছে, এমন এক লোক যে সুইচবোর্ড অপারেট করে। সে তোমাকে কিছু একটা বলতে পারে। আর তুমি বিশ্বাস করছো ঐ মেয়েটার সাথে কার্লোসের যোগাযোগ আছে। সে তোমাকে কিছু একটা বলতে বাধ্য। আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ছো।”

“তোমাকে এটা বোঝাতে পারবো কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই,” জেসন বললো। এখন সে আয়না দিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। “তোমাকে বুঝতে হবে, সেখানে আমি কি পেয়েছি।”

“কি পেয়েছো?”

“যা আমি পেয়েছি,” জেসন বললো। “এটা একটা আলাদা জগৎ,” বর্ন বলতে লাগলো, বোতল আর গ্লাসের জন্যে ব্যুরো দিকে এগোলো। “অন্যরকম সব লোকজন। কালো ভেলভেটের মধ্যে ছোটো ছোটো স্পটলাইট। গসিপ আর গালগল্প চলে, কোনো কিছুই সিরিয়াসলি নেয়া হয় না। সেই সব লোভী লোকগুলো কিংবা সেই মহিলাটি কার্লোসের তথ্যদাতা হতে পারে, সেটা কেউ জানে না। কেউ কখনও সন্দেহ করে না কার্লোসের মতো এক খুনি এরকম লোকদের ব্যবহার করে। এটাই আমি পেয়েছি। খুবই হতাশাজনক।”

“আর অযৌক্তিকও বটে। তুমি যাই বিশ্বাস করো, ঐসব লোকজন খুবই সজ্ঞানে কাজ করে। তুমি জানো আমি কি ভাবছি? আমার মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত, তোমার দরকার একটু পান করার। তুমি যদি আজ রাতে ওটা বাতিল করতে তাহলে খুব ভালো হতো। একদিনে তুমি অনেক বেশি কাজ ক’রে ফেলেছো।”

“আমি সেটা করতে পারবো না,” বেশ জোর দিয়ে বললো।

“ঠিক আছে, তুমি পারবে না,” অসহায়ের মতো বললো সে।

“দুঃখিত, আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।”

“হ্যা, আমি জানি,” সে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললো। “আমি ফ্রেশ হয়ে নিই, তারপর দু’জনে একসঙ্গে যাবো। তুমি একটু মদ খেয়ে নাও, ডার্লিং। তোমার মুখ তেতো হয়ে গেছে।”

“মেরি?”

“হ্যা?”

“একটু বোঝার চেষ্টা করো। ওখানে গিয়ে আমি যা জানতে পেরেছি সেটা আমাকে খুব হতাশ করেছে। আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম কিছু হবে। সহজ কিছু।”

“তুমি যখন খোঁজাখুঁজি করছিলে আমি তখন অপেক্ষা করছিলাম, জেসন। কিছুই জানতাম না। সেটাও খুব সহজ ছিলো না।”

“আমি ভেবেছি তুমি কানাডায় ফোন করেছো। করো নি?”

মেরি থমকে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলো। “না,” বললো সে। “অনেক দেরি হয়ে গেছে।”

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে বর্ন ডেস্কের কাছে গেলো। ড্রয়ার খুলে স্টেশনারিগুলো বের করলো। একটা বল পয়েন্ট নিয়ে কথাগুলো লিখে ফেললো :

সব শেষ হয়ে গেছে। আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। কানাডায় ফিরে যাও। কাউকে কিছু বোলো না, আমাদের দু’জনের ভালোর জন্যেই। আমি জানি তোমার সাথে কোথায় দেখা করা যাবে।

কাগজটা ভাজ ক’রে সেটা একটা খামে ঢুকিয়ে মানিব্যাগ থেকে ফরাসি আর সুইস ফ্রাঁগুলো বের ক’রে চিঠিটার সাথে ঐ খামে ভরে রাখলো জেসন। খামটা বন্ধ ক’রে তার উপর লিখলো : মেরি।

সে খুবই আকুলভাবে লিখতে চাইলো : আমার ভালোবাসা, আমার প্রিয়তমা। কিন্তু পারলো না।

বাথরুমের দরজা খুলে গেলে খামটা তার জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলো সে। “খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো দেখছি,” সে বললো।

“তাই নাকি? আমার তো তা মনে হচ্ছে না। তুমি কি করছিলে?”

“আমি একটা কলম খুঁজছিলাম,” বল পয়েন্টটা তুলে নিয়ে সে জবাব দিলো।

“ঐ লোকটা যদি আমাকে কিছু বলে আমি সেটা লিখে রাখবো।”

মেরি শুকনো খালি গ্রাসটার দিকে তাকালো। “তুমি মদ খাও নি দেখছো?”

“গ্রাস ব্যবহার করি নি।”

“আচ্ছা। আমরা কি এবার বের হতে পারি?”

লিফটে চড়ার সময় তারা কোনো কথা বললো না। কয়েক মুহূর্ত বাদে জেসন মেরির হাতটা ধরলে সে তার হাতটা শক্ত ক'রে ধরে তার দিকে তাকালো। মেরির এই চাহুনি অপ্রতিরোধ্য।

ওহ ঈশ্বর, আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি মেরি। তুমি আমার পাশে আছো, আমাকে স্পর্শ করছো আর আমি মারা যাচ্ছি। তবে তুমি আমার সাথে মরতে পারো না। আমি হলাম কেইন।

“কোনো কিছু হবে না। সব ঠিক থাকবে,” জেসন বললো। দরজাটা খুলতেই জেসন গভীর করে দম নিয়ে নিলো।

“ওহ, আমি ভুলে গেছি।”

“কি?”

“আমার মানিব্যাগ। আমি সেটা ব্যুরোর ড্রয়ারে রেখে এসেছি। লবিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।” সে বের হয়ে আবার বাটন চেপে দরজাটা বন্ধ ক'রে ঘরের দিকে যেতে লাগলো।

ঘরে ঢুকেই খামটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের ক'রে বিছানার পাশে টেবিলে রেখে দিলো। তীব্র যন্ত্রণার সাথে সে খামটার দিকে ফিরে তাকালো।

“বিদায়, আমার ভালোবাসা,” ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো সে।

রুই দ্য রিভোলির হোটেল মরিসের বাইরে হালকা বৃষ্টির মধ্যে বর্ন অপেক্ষা করছে আর প্রবেশপথের কাঁচের দরজা দিয়ে মেরিকে দেখছে। মেরি ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে আছে। অ্যাটাশি কেসটা নেবার জন্যে স্বাক্ষর করছে সে। স্বাক্ষরের পরেই কেসটা তার হাতে দিয়ে দেয়া হলো। এবার মাত্র ছয় ঘণ্টার জন্যে ভাড়া নেয়া হোটেলের একটা ঘরের বিল মিটিয়ে দেবার জন্যে ক্লার্ককে বললো সে।

বিলটা দেয়ার আগে দু'মিনিট পার হয়ে গেলো। একটু গা ছাড়া ভাব। মরিসের কোনো গেস্টের জন্যে এটা স্বাভাবিক ব্যবহার নয়।

মেরি রাস্তায় চলে এলো, পাশেই একটা দোকানের অঙ্ককারাচ্ছন্ন জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে, মেরি তার কাছে চলে এলো। জেসনকে স্টুকেসটা দিয়ে জোর ক'রে একটু হাসলো। তার ভেতর থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো যেনো।

“ঐ লোকটা আমাকে সন্দেহ করছে। আমি নিশ্চিত সে মনে করছে আমি ঘরটা কোনো দুই নাম্বারি কাজে ব্যবহার করেছে।”

“তুমি তাকে কি বলেছো?” বর্ন জিজ্ঞেস করলো।

“আমার পরিকল্পনা বদলে গেছে, এই।”

“ভালো। যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। তোমার নামটা রেজিস্ট্রেশন কার্ডে আছে। তুমি কেন ওখানে ছিলে তার জন্যে একটা কারণ ভেবে রেখো।”

“ভেবে রাখবো?...আমি একটা কারণ ভেবে রাখবো?” মেরি তার চোখের দিকে তাকালো ।

“মানে, আমরা একটা কারণ ভেবে রাখবো । সঙ্গত কারণেই ।”

“সঙ্গত কারণে ।”

“চলো এবার ।” বৃষ্টির মধ্যে তারা রাস্তাটা দিয়ে হেটে গেলো । খুব জলদি ভারি বৃষ্টি নামবে । সে মেয়ের হাতটা ধরলো—তাকে গাইড করার জন্যে নয়, সৌজন্যতাবশতও নয়—কেবল তাকে স্পর্শ করার জন্যে । সময় খুব কমই আছে ।

আমি কেইন । আমি মৃত্যু ।

“একটু আস্তে হাটতে পারো না?” মেরি বললো ।

“কি?” জেসন বুঝতে পারলো সে আসলে দৌড়াতে শুরু করেছে । “আমি একটা ট্যান্সি ধরতে চাচ্ছি,” হাটার গতি না কমিয়েই সে বললো । সামনেই একটা খালি ক্যাব দাঁড়িয়ে আছে । “খুব জোরে বৃষ্টি নামবে ।”

তারা কাছে পৌঁছাতেই ক্যাবটা চলে গেলে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো । তারা এখন একটি সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়ালো । মেরির দিকে তাকিয়ে জেসন দেখলো সে চোখ দুটো কুচকে রেখেছে । প্রথমে বর্ন ভাবলো বৃষ্টির কারণে সে এরকমটি করছে । কিন্তু আচমকা মেরি ডান হাত দিয়ে নিজেই নিজের মুখ চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠলো । বর্ন তাকে ধরে তার মাথাটা বুকে চেপে রাখলো । সে চিৎকার থামালো না ।

সে তার এই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আচরণের কারণটা খুঁজে বের করার জন্যে চারপাশে তাকালো । এরপরই ওটা দেখতে পেলো সে । আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে সে বুঝে ফেললো চূড়ান্ত একটি অপরাধ ক’রে ফেলেছে সে । তাকে আর ছেড়ে যেতে পারবে না জেসন । এখন আর সেটা সম্ভব নয় ।

সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্রের একটা ট্যাবলয়েড পত্রিকায় বড় বড় কালো অক্ষরে লেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ল্যাম্পপোস্টের আলোতে :

খুনি এখন প্যারিসে

জুরিখ হত্যাকাণ্ডের জন্যে এক মেয়েকে খোঁজা হচ্ছে
সন্দেহভাজন কয়েক মিলিয়ন চুরি করেছে ব’লে গুজব আছে

সেই ভয়ংকর লেখাগুলোর নিচে মেরির একটা ছবি ছাপা হয়েছে ।

“চুপ করো!” জেসন মেরির মুখটা বুকে চেপে ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বললো । পকেট থেকে কয়েন বের ক’রে দুটো পত্রিকা কিনে নিলো সে । সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃষ্টিতে ভেঁজা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়ে ছুটতে লাগলো । এবার তারা দু’জনেই গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে ।

বর্ন দরজাটা খুলে মেরিকে আগে ঘরে ঢুকতে দিলো। ঘরে ঢুকেই নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো সে। তার দৃষ্টি জেসনের উপর। তার নিঃশ্বাসে অস্বাভাবিকতা। ভয় আর রাগের এক মিশ্রণ সেখানে।

“আমি তোমার জন্যে মদ নিয়ে আসছি,” বললো জেসন। গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে সে ভাবতে লাগলো। সে করেছে কি? হায় ঈশ্বর!

আমি কেইন। আমি মৃত্যু।

মেরির আত্ননাদ শুনতে পেয়ে ঘুরে তাকালো, কিন্তু তাকে থামানোর জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। মেরির হাতে খামটা। ইতিমধ্যেই সেটা খুলে চিঠিটা পড়েও ফেলেছে সে। তারপরই তার ভেতর থেকে একটা সুতীব্র আত্ননাদ ঠেলে বের হয়ে এসেছে।

“জেসন!”

“পিজ! না!” সে ছুটে এসে তার হাতটা ধরে ফেললো। “এটা কোনো ব্যাপার না। এতে কিছু যায় আসে না। এটা আর হিসেবের মধ্যে রেখো না!” অসহায়ের মতো বলতে লাগলো সে। মেরির চোখে জল গড়িয়ে পড়তে দেখলো। “আমার কথা শোনো! এটা আমি আগে লিখেছিলাম।”

“তুমি চলে যাচ্ছিলে! হায় ঈশ্বর, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলে!” তার দৃষ্টিতে শূন্যতা আর ভয়। “আমি টের পেয়েছিলাম। আমি জানতাম!”

“আমিই তোমাকে টের পাইয়ে দিয়েছিলাম।” সে তার দু’কাঁধ ধরে তার মুখোমুখি করলো। “তবে এটা এখন শেষ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না। শোনো আমার কথা। আমি যাচ্ছি না!”

মেরি আবারো চিৎকার দিলো। “আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না!”

তাকে জড়িয়ে ধরলো জেসন। “আমাদেরকে আবার শুরু করতে হবে। বোঝার চেষ্টা করো। এখন সব হিসেব বদলে গেছে—আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। এভাবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।”

জেসনের বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলো মেরি। “কেন জেসন? কেন?”

“পরে বলবো। এখন নয়। এখন কিছু বোলো না। আমাকে ধরে রাখো কেবল।”

এভাবে কয়েক মুহূর্ত অতিক্রম হয়ে গেলো। হিস্টিরিয়া শেষ হয়ে এলে চেতনা ফিরতেই একটা চেয়ারে তাকে বসালো বর্ন। এবার দু’জনেই হেসে ফেললো। জেসন তার পাশে হাটু মুড়ে বসে পড়লে কিছুক্ষণ চুপ রইলো তারা।

“মদ খাবে?” অবশেষে সে বললো।

“মনে হয় খাবো,” বললো মেরি। “তুমি কিছুক্ষণ আগেই ঢেলে রেখেছো।”

“সেটা এমনি এমনি পড়ে থাকবে না,” বলেই সে ব্যারোর কাছে গিয়ে দু’গ্লাস হাইস্কি নিয়ে এলো। মেরি গ্লাসটা হাতে নিলে সে বললো, “ভালো লাগছে?”

“একটু। তবে এখনও ভয় আর শংকা কাটছে না...হয়তো রাগও। আমি এতোটা ভীত যে এ নিয়ে ভাবতে পারছি না।” মদে চুমুক দিয়ে সে চোখ দুটো বন্ধ ক’রে ফেললো। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো, “তুমি এটা কেন করলে, জেসন?”

“কারণ আমি ভেবেছিলাম আমাকে এটা করতে হবে। এটাই হলো সহজ জবাব।”

“এটা কোনো জবাবই না। আমি তার চেয়েও বেশি কিছু আশা করছি।”

“হ্যা, তা করতে পারো, আমি সেই জবাব তোমাকে দেবো। তোমাকে সেটা শুনতে হবে। বুঝতে হবে। তোমাকে তোমার নিজেকে রক্ষা করতে হবে।”

“রক্ষা—”

“আমি সে কথায় আসছি। তবে আমাদেরকে আগে জানতে হবে কি হয়েছে— আমার নয়, তোমার ব্যাপারে বলছি। এখন থেকেই আমাদেরকে শুরু করতে হবে। তুমি কি সেটা করতে পারবে?”

“পত্রিকাটা?”

“হ্যা।”

“ঈশ্বর জানে, আমি খুবই আগ্রহী,” দুর্বলভাবে হেসে বললো সে।

“এখানে,” জেসন পত্রিকা দুটো হাতে নিয়ে বললো, “আমরা দু’জনেই এটা পড়বো।”

“কোনো খেলা নয়?”

“কোনো খেলা নয়।”

সুদীর্ঘ আর্টিকেলটা পড়লো সে। পড়ার সময় মেরি বার কয়েক দীর্ঘশ্বাস ফেললো। শেষে অবিশ্বাসে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সে। বর্ন কিছু বললো না। সে ইলিচ রামিরেজ সানচেজের লম্বা হাতটা দেখতে পাচ্ছে। কার্লোস মৃত্যুর আগপর্যন্ত কেইনকে অনুসরণ করবে। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। কার্লোস তাকে খুন করবে। মেরি সেন জ্যাক পরিত্যাগযোগ্য। কেইনকে ধরার জন্যে বলির পাঠা বানানো হবে তাকে।

আমি কেইন। আমি মৃত্যু।

আর্টিকেলটা আসলে দুটো আর্টিকেল—সত্য-মিথ্যা আর কল্পনার সাথে অনুমান মেশানো এক খবর। প্রথম অংশে বলা হচ্ছে, এক কানাডিয় সরকারী কর্মকর্তা, সেন জ্যাক নামের এক মহিলা অর্থনীতিবিদের কথা। তাকে তিন তিনটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে দেখা গেছে। তার আঙুলের ছাপ কানাডা সরকার নিশ্চিত করেছে। ক্যারিলিওন দু’লাক থেকে পুলিশ একটা হোটেলের চাবি পেয়েছে, গুইসানকুয়ে’র মারামারির সময় সেটা খোঁয়া গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এটা মেরি সেন জ্যাকের ঘরের চাবি। যে ক্লার্ক তাকে চাবিটা দিয়েছে সে তাকে বেশ ভালোমতোই মনে

করতে পেরেছে—তাকে খুবই উদ্ভিগ্ন আর বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিলো। শেষ আলামতটা হলো একটা পিস্তল, স্টেপডেকস্ট্রাসের দুটো হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে। ব্যালিস্টিক পরীক্ষায় জানা গেছে অস্ত্রটা হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আবারো কানাডা সরকার নিশ্চিত করেছে সেটা। ছাপটি মহিলার হাতের।

আর্টিকেলের এই জায়গায় সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে। একটা গুজবের কথা বলা হয়েছে, যাতে বলা আছে, ব্যানহফস্ট্রাসের ব্যাংক থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার কম্পিউটার কারসাজি ক’রে চুরি করা হয়েছে। এই একাউন্টটা ছিলো একটি আমেরিকান কর্পোরেশনের, যার নাম ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান। ব্যাংকের নাম গেইমেনশেফট। এছাড়া বাকি সবই অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে। সত্যের চেয়ে অনুমানই বেশি।

অজ্ঞাত এক সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে এক আমেরিকান পুরুষ যথাযথ কোড ব্যবহার ক’রে প্যারিসে নতুন এক একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছে। প্যারিসে সেই একাউন্টের মালিক টাকাগুলো নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। ব্যাংকের একাউন্টের কোড নাম্বারগুলো বের করা রীতিমতো অসম্ভব কাজ হলেও সেটাই করা হয়েছে, খুব সম্ভবত অত্যাধুনিক কম্পিউটার ব্যবহার ক’রে। ব্যাংকের এক কর্মকর্তা হের ওয়ালথার এপফেল বলেছেন, এ বিষয়ে পুরোদমে তদন্ত কাজ চলছে। তবে ব্যাংকের আইন অনুযায়ী এর চেয়ে বেশি কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখানে এসে মেরি সেন জ্যাকের কানেকশনটা স্পষ্ট করা হয়েছে। তাকে একজন সরকারী অর্থনীতিবিদ এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নিয়মকানুনের অভিজ্ঞ লোক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তার রয়েছে কম্পিউটার জ্ঞান। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সহযোগী হিসেবে। এই চুরির কাজে সেও ভূমিকা রেখেছে। একজন পুরুষ সন্দেহভাজন আছে। তাকে ঐ মেয়ের সাথে ক্যারিলিওন দু’লাক-এ একসঙ্গে দেখা গেছে।

মেরি প্রথমে পড়াটা শেষ ক’রে পত্রিকাটা ফেলে দিলো মেঝেতে। শব্দ শুনে বর্ন তার দিকে তাকালো। মেরি দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখেমুখে এক ধরণের অস্বাভাবিক স্থিরতা। বর্ন এটা মোটেও চাচ্ছিলো না। সে দ্রুত পড়া শেষ ক’রে কয়েক মুহূর্ত বাকহীন রইলো। তারপর কথা বললো সে।

“মিথ্যে,” বললো সে, “আর এটা তারা আমার জন্যেই করেছে। আমি কে এবং কি, তার জন্যে করেছে। তোমাকে বলির পাঠা বানিয়ে আমাকে ধরবে। আমি দুঃখিত। বলতে পারছি না কতোটা দুঃখিত।”

মেরি তার দিকে তাকালো এবার। “এটা মিথ্যের চেয়েও বেশি, জেসন।”

“মিথ্যে ছাড়াও অনেক সত্য আছে এখানে।”

“সত্য?” একমাত্র সত্য হলো তুমি জুরিখে ছিলে। তুমি কখনও অস্ত্র ধরো নি। তুমি স্টেপডেকস্ট্রাসের আশেপাশেও ছিলে না। তুমি কোনো হোটেলের চাবি হারাও নি, গেইমেনশেফট ব্যাংকেও যাও নি।”

“একমত, তবে আমি সেই সত্যটা নিয়ে কথা বলছি না।”

“তাহলে?”

“গেইমেনশেফট, স্ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান, এপফেল। এগুলো তো সত্য—বিশেষ ক’রে এপফেলের বক্তব্যটা—অবিশ্বাস্য। সুইস ব্যাংকাররা খুবই সতর্ক। তারা আইনকে হালকা চোখে দেখে না। এসব আইন লঙ্ঘন কররা দণ্ড খুবই মারাত্মক। সুইজারল্যান্ডে ব্যাংক সংক্রান্ত অপরাধ গুরুতর অফরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এপফেল যা বলেছে তার জন্যে সে কয়েক বছরের সাজা ভোগ করতে পারে। সে কেবল একাউন্ট সম্পর্কেই বলে নি, নামটাও উল্লেখ করেছে। যদি না তাকে কোনো শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ এই কথা বলতে আদেশ করে থাকতে পারে, যারা আইনকে উপেক্ষা করতে পারবে।”

“কেন? কেন গেইমেনশেফট অথবা ট্রেডস্টোন, সেভেনটি-ওয়ান কিংবা এপফেল এই গল্পের অংশ হলো?” মেরি বললো।

“আমি তো তোমাকে বলেছিই, তারা আমাকে চায়, তারা জানে আমরা এক সঙ্গে আছি। কার্লোস জানে আমরা এক সঙ্গে আছি। তোমাকে পেলে আমাকেও তারা পাবে।”

“না, জেসন, এটা কার্লোসের চেয়েও বড় কিছু। তুমি আসলে বুঝতে পারছো না, কার্লোসের পক্ষে সুইজারল্যান্ডের আইন এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।” সে তার দিকে তাকালো। “এটা একটা গল্প নয়, দুটো গল্প। দুটোই মিথ্যে। প্রথমটি দ্বিতীয়টির দুর্বল অনুমানের সাথে সম্পর্কিত—লোকজনের অনুমান—একটা ব্যাংকিং সমস্যা কখনও জনগনকে জানানো হবে না। যদি না পুরোপুরি তদন্ত হবার পর সত্য খুঁজে পাওয়া যায়। আর সেই দ্বিতীয় গল্পটা—ইচ্ছাকৃতভাবেই ভূয়া বক্তব্য দেয়া হয়েছে যে, গেইমেনশেফট থেকে মিলিয়ন ডলার চুরি করা হয়েছে—তার সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমি নাকি জুরিখের তিনটি খুনের সাথে জড়িত।”

“বুঝিয়ে বলো, প্লিজ।”

“এখানে, জেসন। আমার কথাটা বিশ্বাস করো। এটা ঠিক আমাদের সামনে আছে।”

“সেটা কি?”

“কেউ আমাদের কাছে একটা মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করছে।”

অধ্যায় ১৯

আর্মির সিডানটা ম্যানহাটনের ইস্ট-রিভার ড্রাইভ ধরে ছুটে চলেছে। বিলম্বিত শীতের তুষারপাতের কারণে স্রিয়মান হয়ে আছে হেডলাইটের আলো। পেছনের এক কোণে গুঁটিসুটি মেরে ব'সে থাকা মেজর সাহেব ঝিমুচ্ছে। তার কোলে একটা বৃফকেস। বৃফকেসটা একটা চেইনের মাধ্যমে তার কোমরের বেল্টের সাথে আঁটকানো। সিকিউরিটি ডিভাইসটি বিগত নয় ঘণ্টায় মাত্র দু'বার সরানো হয়েছিলো। একবার জুরিখ থেকে বিদায় নেবার সময়, আর দ্বিতীয়বার কেনেডি বিমান বন্দরে নামার পর। যদিও সেই দুটো জায়গাতেই আমেরিকান সরকারের লোকজন কাস্টম্‌স ক্লার্ককে নজরদারী করেছে—সত্যি বলতে গেলে আসলে বৃফকেসটা। তাদেরকে বলা হয় নি কেন, তাদেরকে কেবল ইন্সপেকশনটা নজরদারী করার অর্ডার দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিক প্রসিডিউর থেকে একটু এদিক ওদিক হলেই, বৃফকেসটার প্রতি অযাচিত আগ্রহ দেখা গেলেই তারা হস্তক্ষেপ করতো। দরকার পড়লে অস্ত্রের ব্যবহারও করতো।

একটা আচম্কা মৃদু রিং হলে মেজর চোখ খুলে তার বাম হাতটা মুখর সামনে তুলে ধরলো। শব্দটা হাত ঘড়ির এলার্মের। সে তার ডুয়েল-টোনাল ঘড়িটার বোতাম চাপলো। প্রথমটা জুরিখের, দ্বিতীয়টা নিউইয়র্কের। অফিসার যখন চব্বিশ ঘণ্টা আগে তার কেবল অর্ডারটা পেয়েছিলো তখন অ্যালার্মটা সেট করা হয়েছে। ট্রান্সমিশনটা তিন মিনিটের মধ্যে আসবে, মেজর ভাবলো, সে একটু সামনে ঝুঁকে ড্রাইভারকে বললো।

“সার্জেন্ট, তোমার স্ক্রেনলারটা ১৪৩০ মেগাহার্টজে ঘোরাবে কি?”

“জি, স্যার,” সার্জেন্ট রেডিও প্যানেলের দুটো সুইচ টিপে দিলো। “এই যে, স্যার।”

“ধন্যবাদ। মাইক্রোফোনটা কি পেছন পর্যন্ত আসবে?”

“আমি জানি না। কখনও চেষ্টা ক'রে দেখি নি, স্যার।” ড্রাইভার মাইক্রোফোনটা পেছনে দিয়ে দিলো। “মনে হয় যাবে,” বললো সে।

স্পিকারে ঘর্ঘর্ শব্দ হলো। এই ট্রান্সমিটারটি বৈদ্যুতিকভাবেই স্ক্যান করে এবং ফ্রিকোয়েন্সিকে জ্যাম ক'রে দেয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মেসেজটা আসবে। তাই হলো।

“ট্রেডস্টোন? ট্রেডস্টোন, কনফার্ম, প্রিজ।”

“ট্রেডস্টোন, শুনতে পাচ্ছি,” মেজর গর্ডন ওয়েব বললো। “আপনি ক্রিয়ার, এখন বলে যান।”

“আপনার অবস্থান কি?”

“ট্রাইবোরো’র একমাইল দক্ষিণে, ইস্ট-রিভার ড্রাইভ,” মেজর বললো।

“আপনার টাইমিং গ্রহযোগ্য,” বললো কণ্ঠটা।

“শুনে খুশি হলাম। এটা আমাকে আনন্দিত করেছে...স্যার।”

একটা ছোট বিরতি, মেজরের মন্তব্যটাকে সাদরে গ্রহণ করা হলো না। “১৩৯ ইস্ট সেভেনটি ফার্স্ট-এর দিকে যান। আবার বলে নিশ্চিত ক’রে নাও।”

“ওয়ান-থ্রি-নাইন, ইস্ট সেভেনটি-ফার্স্ট।”

“তোমার গাড়িটা এলাকার বাইরে রাখবে। পায়ে হেটে যাবে বাকি পথ।”

“বুঝেছি।”

“আউট।”

“আউট।” ওয়েব বোতাম চেপে মাইক্রোফোনটা বন্ধ ক’রে ড্রাইভারের কাছে দিয়ে দিলো। “সেই জায়গাটার কথা ভুলে যাও, সার্জেন্ট। তোমার নাম এখন খুবই সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছে।”

“ঠিক আছে, মেজর। ঘরঘর শব্দ ছাড়া আমি কিছুই শুনি নি। যেহেতু জায়গাটা আমি চিনি না, বলেন কোথায় নামিয়ে দেবো?”

ওয়েব হাসলো। “দুই ব্লকের বেশি দূরে নয়। তার চেয়ে বেশি হাটলে আমি কোনো নর্দমায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো।”

“লেব্র এ্যান্ড সেভেনটি সেকেন্ডের ব্যাপারটা কি?”

“এটা কি দুই ব্লকের মধ্যে?”

“না তিন ব্লক দূরে।”

“যদি তিন ব্লক হয় তো-তুমি একজন প্রাইভেট।”

“তাহলে আমি আপনাকে পরে এসে তুলতে পারবো না, মেজর। প্রাইভেটরা এরকম কাজের জন্যে অনুমতি পায় না।”

“ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।” ওয়েব চোখ বন্ধ করলো। দু’বছর পরে অবশেষে ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান দেখতে পাবে সে। তার উত্তেজনা বোধ করার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। তার কেবল ক্লান্ত আর অর্থহীন বোধ হচ্ছে। হয়েছে কি?

রাস্তার সাথে টায়ারের ঘর্ষণের শব্দটা তাকে সম্মোহিত ক’রে ফেলছে। এই শব্দটা তার অনেক দিন আগের স্মৃতিটাকে জাগিয়ে দিলো। একটা ঘন অরণ্যের এক রৈখিক শব্দ। তারপর রাত—সেই রাতটা—যখন চোখ ধাঁধানো আলো আর বিস্ফোরণ চারপাশে, তাকে বলা হচ্ছে সে মারা যাচ্ছে। তবে সে মরে নি। একটা অলৌকিকের মতো ঘটনা ঘটিয়ে এক লোক তাকে বাঁচিয়ে ছিলো...তার পর অনেক বছর চলে গেছে, সেই রাতটা, সেইসব দিনগুলো কখনও ভোলার নয়। কি আবার হলো?

“এই যে, এসে গেছি, মেজর।”

ওয়েব চোখ খুলে তাকিয়ে কপালের ঘামগুলো হাত দিয়ে মুছে হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। বৃষ্কেসটা ধরে দরজার হাতলে হাত রাখলো।

“আমি এখানে থাকবো ২৩০০ এবং ২৩৩০ এর মধ্যেই, সার্জেন্ট। যদি তুমি পার্ক করতে না পারো, আশেপাশেই থেকো, আমি খুঁজে নেবো।”

“জি স্যার।” ড্রাইভার বললো। “মেজর কি বলবেন, পরে আমরা কোথায় যাবো?”

“কেন? তোমার কি আরেকটা ভাড়া আছে?”

“কি যে বলেন, স্যার। আমি তো আপনার কাজে নিয়োজিত। আপনিও সেটা জানেন। আমার গাড়িতে তেল খুব বেশি নেই। যদি বেশি দূরে যান তো তেল নিতে হবে।”

“দুর্গুণিত,” মেজর একটু থামলো। “ঠিক আছে। তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে সেটা কোথায়, কারণ আমি জানি না। আমরা নিউজার্সির ম্যাডিসনের একটা প্রাইভেট এয়ার-ফিল্ডে যাবো। আমাকে ওখানে একশো ঘন্টার আগে পৌছাতে হবে।”

“আমার অস্পষ্ট একটা ধারণা আছে,” ড্রাইভার বললো। “২৩৩০-এ আপনি খুব কাছে পৌঁছে যাবেন, স্যার।”

“ঠিক আছে—তাহলে ২৩০০-ই। ধন্যবাদ,” ওয়েব গাড়ি থেকে নেমে গাড়িটা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপর মোড় নিয়ে দক্ষিণের সেভেনটি সেকেন্ড স্ট্রিট-এর দিকে পা বাড়ালো।

চার মিনিট পরে, চমৎকার ব্রাউনস্টোন ভবনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তাটা খুবই শান্ত, ধনীদেবের এলাকা—পুরনো টাকাওয়ালাদের। ম্যানহাটনের এই অংশে সবচাইতে স্পর্শকাতর ইন্টেলিজেন্স অপারেশন হাউজ অবস্থিত সেটা কোনো লোকেই বিশ্বাস করবে না। বিশ মিনিট আগে, মেজর গর্ডন ওয়েব হলো দেশের আট থেকে দশজন লোকের মধ্যে একজন, যে এটার অস্তিত্বের কথাটা জানে।

ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান।

প্রবেশপথের সামনের ছোট সিঁড়িটা দিয়ে উঠে গেলো। সে জানে এই পাথরের ধাপগুলোর নিচে এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস আছে যা ক্যামেরাগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করে দেবে; ভেতরে একটা পর্দায় তার ছবিটা ভেসে উঠবে। এর বাইরে সে কিছুই জানে না। কেবল জানে ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান কখনও বন্ধ হয় না। দিনে চব্বিশ ঘন্টা এটা মনিটর আর অপারেটেড করে থাকে কয়েকজন বাছাই করা লোক। তাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

সে বেলটা বাজালো। বেলটা খুব সাদামাটা হলেও দরজাটা খুব অসাধারণ। ওয়েব জানালার দিকে তাকালো। সবগুলোতে কাঁচ লাগানো আছে। সে জানে প্রতিটি কাঁচই এক ইঞ্জি পুরু। পয়েন্ট ৩০ গুলির আঘাত সহিতে পারার ক্ষমতা আছে কাঁচগুলোর। ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান একটা দুর্গ।

দরজাটা খুলে গেলে মেজর অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসি হাসি মুখ করলো। সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে এ জায়গার ব'লে মনে হয় না। সে ছোটোখাটো গড়নের। অভিজাত দেখতে, ধূসর চুলের এক মহিলা। হালকা পাতলা মুখ।

“আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে, মেজর। জেরেমি লিখে জানিয়েছিলো, আপনি আসবেন। ভেতরে আসুন। আপনাকে আবারো দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।”

“আপনাকে দেখেও খুব ভালো লাগছে,” ওয়েব জবাব দিলো। চমৎকার ফ্যারে টুকে টের পেলো চারদিকে সুগন্ধী। “তবে আমি নিশ্চিত নই আপনার সাথে আগে আমার দেখা হয়েছে কিনা।”

মহিলা হেসে ফেললো, “ওহ, কতোবার আমরা ডিনার করেছি।”

“জেরেমির সাথে?”

“অবশ্যই।”

“কে জেরেমি?”

“এক অনুগত ভাগ্নে, যে আপনার প্রতিও অনুগত এবং বন্ধুভাবাপন্ন। চমৎকার এক তরুণ। সে আর এখন নেই, সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।” মহিলা তার বাহুটা ধরে ভেতরের দিকে পা বাড়ালো। “এটা প্রতিবেশীদের জন্যে সুবিধার হয়েছে। আসুন, তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।” তারা একটা খিলানপথ দিয়ে বিশাল লিভিংরুমে এসে পড়লো। মেজর ভেতরটা তাকিয়ে দেখলো। জানালার পাশে একটা গ্র্যাভ পিয়ানো রাখা। তার পাশেই আছে একটা হার্প। আর সব জায়গায়— পিয়ানো এবং পালিশ করা টেবিলগুলোর উপরে—সিলভার ফ্রেমের ছবি। অতীতের ঐশ্বর্য এবং অভিজাত্য ধরে রাখা হয়েছে। নৌকায় নারী-পুরুষ ব'সে আছে। কয়েকটি মিলিটারি ছবিও আছে। আর অবশ্যই আছে দুটো ছবি, কেউ একজন পোলো ম্যাচের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

তারা হলওয়ার শেখপ্রাস্তে এসে পড়লো। একটা বিশাল মেহগনি দরজা। বাস-রিলিফ আর লোহার অলংকার বসানো, ডিজাইন আর নিরাপত্তার অংশ হিসেবে। এখানে যদি কোনো ইনফারেড ক্যামেরা থাকে তবে ওয়েব সেটার লেন্স কোথায় আছে ধরতে পারবে না। মহিলা একটা অদৃশ্য বেলে চাপ দিলে মেজর মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেলো কেবল।

“তোমাদের বন্ধু এসে গেছে। এবার পোকার খেলা বন্ধ ক'রে কাজে নেমে পড়ো, জেসুইট।”

“জেসুইট?” ওয়েব অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

“একটা পুরনো জোক,” মহিলা জবাবে বললো। “আপনি যখন মার্বেল খেলতেন আর মেয়েদের ভেংচি কাটতেন তখনকার সময়ের জোক এটা।”

দরজাটা খুলে গেলে বয়স্ক কিন্তু এখনও ঋজু শরীরের ডেভিড অ্যাবোটের অবয়বটা দেখা গেলো। “তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, মেজর,” গোপন সার্ভিসের সাবেক চিফ, সল্ল্যাসী নামে পরিচিত লোকটা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো।

“আমারও খুব ভালো লাগছে, স্যার।” ওয়েব হাত মেলালো। অ্যাবোটের পাশে আরেকজন বয়স্ক লোক এসে দাঁড়ালো।

“জেরেমির একজন বন্ধু, কোনো সন্দেহ নেই,” লোকটা বললো। তার গস্তীর কণ্ঠে হাস্যরস আছে। “খুবই দুঃখিত সময়ের অভাবে পুরো পরিচয়টা দিতে পারছি না, তরুণ। আসো। মার্গারেট। উপরে চমৎকার ফায়ারফ্রেস আছে।” সে অ্যাবোটের দিকে তাকালো। “তুমি যখন চলে যাবে আমাকে জানাবে, ডেভিড?”

“অবশ্যই,” জবাব দিলো সন্ন্যাসী। “আমি এই দু’জনকে দেখাবো কিভাবে তোমাকে রিং করতে হয়।”

তখনই ওয়েব বুঝতে পারলো ঘরে তৃতীয় আরেকজন রয়েছে। সে ঘরের শেষ মাথায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মেজর তাকে চিনতে পারলো। এলিয়ট স্টিভেন্স। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র সহকারী—কেউ কেউ বলে প্রেসিডেন্টের জমজ। চল্লিশের মতো বয়স হবে তার। শক্ত শরীর। চশমা পরে, আর ভাবসাবে বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ।

“...সেটা খুবই চমৎকার হবে,” যে বৃদ্ধলোকটি সময়ের অভাবে নিজের পরিচয়টা ঠিক মতো দিতে পারে নি সে বললো। ওয়েব তার কথাটা শুনতে পেলো না। তার চোখ হোয়াইট হাউজের সহকারীটির উপর। “আমি অপেক্ষায় থাকবো।”

“আবারো দেখা হবে,” অ্যাবোট কথাটা বলেই ধূসর চুলের মহিলার দিকে তাকালো। “ধন্যবাদ মিস্টার মেগ। তোমার নীচের দিকের অভ্যাসগুলো বজায় রেখো।”

“তুমি এখনও অভদ্রই আছো, জেসুইট।”

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দম্পতি জোড়া চলে গেলে ওয়েব একটু হাসলো। এই লোক দুটোই এই বাড়ির মালিক। “আপনি তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন, তাই না?”

“বলতে পারো সারা জীবন ধরেই,” অ্যাবোট জবাব দিলো। “যুগোশ্লাভিয়াতে আমরা যখন ডোনোভান অপারেশন চালিয়ে ছিলাম তখন সে আড্রিয়াটিক সাগরে আমাদের ইয়াখটম্যান ছিলো। মিখাইলোভিচ একবার বলেছিলো সে ঝড়ো বাতাস আর বিক্ষুব্ধ সাগরেও খুব ভালো ইয়াখট চালাতে পারে। আর মিসেস মেগের আভিজাত্যে বোকা বনে যেয়ো না। সে হলো সেইসব দুঃসাহসী মেয়েগুলোর একজন, পিরানহা মাছের মতোই যাদের দাঁত ধারালো।”

“কাহিনীগুলো তো দারুণ।”

“এটা কখনও বলা হয় না,” অ্যাবোট কথাটা বলে চোখ বন্ধ করলো। “আমি চাই তুমি এলিয়ট স্টিভেন্সের সাথে পরিচিত হও। আমার মনে হয় না সে কে সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে। ওয়েব, এ হলো স্টিভেন্স, আর স্টিভেন্স, এ হলো ওয়েব।”

“কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে কোনো ল-ফার্মে আছি,” স্টিভেন্স হাত বাড়িয়ে বললো।

“আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগছে, ওয়েব। ভ্রমণ কেমন হলো?”

“আমি আসলে মিলিটারি ট্রান্সপোর্টই বেশি পছন্দ করতাম। এইসব কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্সগুলো আমি ঘৃণা করি। ভেবেছিলাম কেনেডি এয়ারপোর্টে এক কাস্টমসের লোক বুঝি আমার সুটকেসটার চেইন ছিড়েই ফেলবে।”

“তোমাকে এই পোশাকে খুবই সম্মানিত লোকদের মতো লাগছে,” অ্যাবোট হেসে বললো। “তুমি একেবারে একজন চোরাকারবারির মতো।”

“এই পোশাকটা বুঝতে পেরেছি ব’লে এখনও নিশ্চিত নই আমি,” মেজর দেয়ালের সাথে আঁটকে রাখা একটা তাকে বৃক্ষকেসটা রেখে চেইনটা খুলে ফেলে বললো।

“তোমাকে আমার বলা উচিত নয়,” অ্যাবোট বললো, “মাঝে মধ্যে স্থলভাগে বেশ কড়া নিরাপত্তা থাকে। একজন আর্মির ইন্টেলিজেন্স অফিসার বিশেষ ক’রে এরকম সময় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা খুবই আশংকার কথা।”

“তাহলে আমিও বুঝতে পারছি না,” হোয়াইট হাউজের সহকারীটি বললো। সে ওয়েবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

“আমি ভেবেছিলাম ছদ্মবেশটা নিলে সেটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।”

“ওয়েবের জরিখ সফর একটা রুটিন কন্সুলেট চেক। জি-টু শিডিউলে সেটা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। এইসব সফরের ব্যাপারে কেউ কাউকে বোকা বানায় না। তারা যা তারা তাই, আর কিছু না। নতুন সোর্স নিয়োগ দেয়া, ইনফর্মারদের টাকা দেয়া, সোভিয়েতরা এটা সবসময়ই ক’রে থাকে। তারা এটা লুকানোর চেষ্টাও করে না। আমরাও না, সত্যি বলছি।”

“কিন্তু এই সফরের আসল উদ্দেশ্য তো তা নয়,” স্টিভেন্স বললো। “সুতরাং লুকাতে হয়েছে।”

“সেটাই।”

“আমি কি সাহায্য করতে পারি?” প্রেসিডেনশিয়াল সহকারী মনে হলো বৃক্ষকেসটার ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী। সে বৃক্ষকেসটার দিকেই চেয়ে আছে।

“ধন্যবাদ,” ওয়েব বললো। “কর্ডটা কেবল টানুন।”

স্টিভেন্স তাই করলো। “আমি সব সময় ভাবতাম চেইনটা হাতের কজির সাথে লাগানো থাকে,” সে বললো।

“অনেকবার এভাবে হাত কেটে গেছে,” মেজর হেসে হোয়াইট হাউজের লোকটাকে বলেই বৃক্ষকেসটা খুলে টেবিলের উপর রাখলো। “তাহলে এই হলো ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান। জায়গাটা এরকম হবে আমি ভাবি নি।”

“পর্দাগুলো একটু নামিয়ে দেবে কি, এলিয়ট?” অ্যাবোট বললে প্রেসিডেন্টের সহকারী তাই করলো। এরপর একটা বইয়ের শেলফের দিকে গেলো অ্যাবোট,

সেটার নিচে একটা ক্যাবিনেট খুলে ভেতরে হাত রাখতেই একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ হলো। পুরো বইয়ের শেলফটা বাম দিকে সরে গেলো আশ্বে আশ্বে। ওপর প্রান্তে একটি রেডিও কনসোল। গর্ডন ওয়েবের দেখা সবচাইতে অত্যাধুনিক একটি যন্ত্র। “এর চেয়ে বেশি কিছু কি তুমি ভেবে ছিলে?” জানতে চাইলো অ্যাবোট।

“ঈশ্বর...” মেজর কনসোলটা দেখেই শিস্‌ বাজিয়ে বললো।

পেন্টাগনের ওয়ার-রুমে অনেক বেশি যন্ত্রপাতি আছে, তবে এটা সেটারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ ব’লে মনে হচ্ছে। পৃথিবীর চাইতে আধুনিক ইন্টেলিজেন্স স্টেশন।

“আমিও অবাক হয়েছি,” স্টিভেন্স বললো। “তবে মি: অ্যাবোট ইতিমধ্যেই আমাকে এটা দেখিয়ে দিয়েছেন। এটা তো কেবলমাত্র শুরু। আরো কিছু বোতাম-টোতাম থাকলে এই জায়গাটা দেখে মনে হতো ওমাহার এম.এ.সি’র মতো।”

“এসব বোতাম এই ঘরটাকে অভিজাত ইস্ট সাইড লাইব্রেরিতেও রূপান্তরিত করে ফেলেছে।” বুড়ো লোকটা ক্যাবিনেটের ভেতরে হাত রাখলে মুহূর্তে বিশাল কনসোলটা আবার একটা বইয়ের শেল্ফে ঢেকে গেলো। তারপর সে পাশের বইয়ের শেল্ফের কাছে গিয়ে ক্যাবিনেটটা খুলে আবারো কিছু একটা টানলে একই রকম শব্দ হলো। শেল্ফটা সরে গেলে দেখা গেলো পেছনে তিনটি ফাইল ক্যাবিনেট রয়েছে। চাবি দিয়ে অ্যাবোট ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করলো। “আমি তোমাকে খুব বেশি কিছু দেখাচ্ছি না, গর্ডন। আমরা যখন শেষ করবো তখন আমি চাইবো তুমি এসব ভালো করে দেখে নেবে। আমি তোমাকে সেই সুইচটা দেখিয়ে দেবো, যেটা এগুলোকে আবার আগের জায়গায় রেখে দেবে। তোমার যদি কোনো সমস্যা হয়, বাড়ির মালিক সেটা দেখবে।”

“আমি দেখবোটা কি?”

“সেটা আমরা বলবো। এখন আমি চাইবো জুরিখের কথা শুনতে। তুমি কি জানলে, বলো?”

“ক্ষমা করবেন, মি: অ্যাবোট,” স্টিভেন্স বাঁধা দিয়ে বললো। “আমি যদি একটু দেরিতে বুঝে থাকি তো তার কারণ এসবই আমার কাছে একদম নতুন। তবে আমি একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি যেটা আপনি একটু আগে মেজর ওয়েবের সফরের ব্যাপারে বলছিলেন।”

“সেটা কি?”

“আপনি বলেছেন সফরটা জি-টু শিডিউলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো।”

“ঠিক।”

“কেন? মেজরের উপস্থিতি জুরিখে আরো বেশি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, ওয়াশিংটনে নয়। অথবা জানতে চাইবো, করেছে কি?”

সন্ধ্যাসী হাসলো। “আমি বুঝতে পারছি কেন প্রেসিডেন্ট তোমাকে তার সঙ্গে রাখেন। আমরা কখনই সন্দেহ করি নি যে, কার্লোস ওয়াশিংটনে দুই কিংবা তিনটি

সার্কেল নিয়ে এসেছে। সে অসম্ভব ব্যক্তিদেরকে লোভনীয় সব প্রস্তাব দিয়েছে। এরকম লোকজন ছাড়া একজন কার্লোস টিকে থাকতে পারে না। তোমার অবশ্যই স্মরণে আছে, সে আসলে মৃত্যু বিক্রি করে না, সে বিক্রি ক'রে কোনো দেশের সরকারের গোপনীয়তা, সবই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে, কেবল এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, তাকে তারা বহিষ্কার ক'রে কতোটা ভুল করেছে।”

“প্রেসিডেন্ট এটা জানতে চাইবেন,” সহকারী বললো। “এটা কয়েকটা ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করবে।”

“এজন্যেই তো তুমি এখানে এসেছো, তাই না?” অ্যাবোট বললো।

“আমারও তাই মনে হয়।”

“জুরিখ থেকে শুরু করলেই ভালো হয়,” ওয়েব বৃফকেসটা ফাইল ক্যাবিনেটের সামনে নিয়ে এসে বললো। বৃফকেসটা খুলে সেটা থেকে কয়েকটা কাগজ বের করলো সে। “আপনি হয়তো সন্দেহ করবেন না যে, কার্লোস ওয়াশিংটনে আছে, তবে আমি সেটা নিশ্চিত করতে পারি।”

“কোথায়? ট্রেডস্টোনে?”

“কোনো শক্ত প্রমাণ নেই, তবে এটাকে বাতিল ক'রে দিতে পারবেন না। সে ফিশেটা খুঁজে পেয়েছে। এটাকে সে বদলে নিতে পেরেছে।”

“হায় ঈশ্বর, কিভাবে?”

“ঠিক যেভাবে আমি অনুমান করতে পারি; যাকে আমি চিনি।”

“কে?”

“কোয়েনিগ নামের এক লোক। সে তিন দিন আগেও গেইমেনশেফট ব্যাংকের প্রাইমারি ভেরিফিকেশন সেকশনের দায়িত্বে ছিলো।”

“তিন দিন আগে? এখন সে কোথায়?”

“মরে গেছে। প্রতিদিন যে রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করতো সেখানে একটা দুর্ঘটনায় সে মরে গেছে। এখানে পুলিশের রিপোর্টটা আছে। আমি সেটা অনুবাদও করেছি।”

অ্যাবোট কাগজটা হাতে নিয়ে পাশেই একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেও এলিয়ট দাঁড়িয়ে রইলো। আবাবো বলতে লাগলো ওয়েব। “খুবই কৌতূহলোদ্দীপক কিছু আছে এখানে। এটা এমন কিছু বলে নি যা আমরা জানি না, তবে একটা কু আছে, যা আমরা ফলো-আপ করবো।”

“সেটা কি?” পড়তে পড়তে বললো অ্যাবোট। “এটা দুর্ঘটনাটার বর্ণনা দিয়েছে। আরেকটা গাড়ির সাথে রাস্তার মোড়ে সংঘর্ষ হয়েছে।”

“এটা শেষের কথা। এটাতে গেইমেনশেফট ব্যাংকের হত্যার খবর উল্লেখ করা আছে, মানে, আমাদের পাছায় যে পেরেকটা ঢুকেছিলো তার খবর।

“তাই নাকি?” অ্যাবোট পাতা ওলটালো।

“এটাতে দেখুন। শেষ কয়েকটা বাক্য। দেখুন, আমি কি বলতে চাচ্ছি?”

“ঠিক তা নয়,” অ্যাবোট ভুরু কুচকে জবাব দিলো।

“এটাতে বলা আছে কোয়েনিগ গেইমেনশেফটের একজন অফিসার ছিলো যেখানে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডলো ঘটেছে...আর সে প্রথম দিকের গোলাগুলির একজন চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলো। এই তো।”

“আমি মনে করি না এটাই সব,” ওয়েব বললো। “আমার মনে হয় আরো আছে। কেউ একটা প্রশ্ন তুলেছিলো, তবে সেটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি খুঁজে বের করতে চাই জুরিখ পুলিশ রিপোর্টে কার লাল পেন্সিলের আঁচড় পড়েছে। সে কার্লোসের লোক হতে পারে; আমরা জানি তার ওখানে একজন লোক রয়েছে।”

অ্যাবোট চেয়ারে হেলান দিয়ে ভুরু তুললো। “ধরে নিচ্ছি তোমার কথাই ঠিক। তাহলে পুরো রেফারেন্সটা কেন মুছে ফেলা হলো না।”

“একদম সোজা। খুনটা হয়ে গেছে। কোয়েনিগ একজন চাক্ষুষ সাক্ষী, যে তদন্তকারী অফিসার রিপোর্টটা লিখেছে সে আইনগতভাবেই জানতে চাইবে কেন।”

“কিন্তু সে যদি কানেকশানের ব্যাপারে কোনো ধারণা ক’রেই থাকে, তাহলে সে কি সেটা মুছে ফেলার জন্যে বিব্রত হবে না?”

“তার দরকার নেই। আমরা সুইজারল্যান্ডের একটি ব্যাংক নিয়ে কথা বলছি। ওখানকার কিছু এরিয়া অফিশিয়ালি অলজ্ঞানীয়, যদি না কোনো প্রুফ থেকে থাকে।”

“সবসময় নয়। আমি বুঝতে পারছি তুমি সংবাদপত্রের ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ।”

“আন অফিশিয়ালি। আমি যৌনতাবিষয়ক সাংবাদিকতা ব্যবহার করেছিলাম—যদিও এটা তাকে প্রায় খুন ক’রে ফেলেছিলো—মারপথে ওয়ালথার এপফেলের সমর্থন পই।”

“একটু থামাচ্ছি,” এলিয়ট বললো। “আমার মনে হয় ঠিক এখানেই ওভাল অফিস এসে গেছে। আমি সেই সংবাদপত্রটি পড়ে ধারণা করেছি, যাতে আপনি কানাডিয়ান মেয়েটার কথা উল্লেখ করেছেন।”

“ঠিক তা নয়। সেই গল্পটা ইতিমধ্যেই চাউড় হয়ে গেছে। আমরা সেটা থামাতে পারতাম না। কার্লোস জুরিখ পুলিশকে সেটা ফোনে জানিয়ে দেয়। তারা সেই রিপোর্টটা ইস্যু করেছে। আমরা কেবল সেটার সাথে ভূয়া একটা গল্প জুড়ে দিয়েছে যে, গেইমেনশেফট ব্যাংক থেকে কয়েক মিলিয়ন চুরি আর হত্যাকাণ্ডের সাথে মেয়েটি জড়িত।” ওয়েব একটু থেমে অ্যাবোটের দিকে তাকালো। “এটা নিয়েই আমাদেরকে কথা বলতে হবে। এটা পুরোপুরি ভূয়া নাও হতে পারে।”

“আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না,” সল্ল্যাসী অ্যাবোট বললো।

“আমিও এটা বিশ্বাস করতে চাই না,” জবাব দিলো মেজর। “কখনও চাই না।” হোয়াইট হাউজের সহকারীটি আর্মি অফিসারের মুখোমুখি বসলো। “আমাকে এটা পরিস্কার জানতে হবে।”

“আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন,” অ্যাবোট মুখ খুললো। ওয়েবের চোখেমুখে বিষয়টা দেখলো। “এলিয়ট এখানে এসেছে প্রেসিডেন্টের আদেশে। অটোয়া এয়ারপোর্টের খুনটার ব্যাপারে।”

“সেটা একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে গেছে,” স্টিভেন্স সরাসরি বললো। “কানাডার প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্টকে প্রায় বলেই ফেলেছিলেন যে, আমাদের নোভা স্কটিয়া স্টেশনটা সরিয়ে নিতে। তিনি খুব ক্ষেপে আছেন।”

“এতোটা বাজে ঘটনা কিভাবে হলো?” ওয়েব জানতে চাইলো।

“খুবই খারাপভাবে। তারা কেবল জানে কানাডার ন্যাশনাল রেভেনুর একজন র‍্যাংকিং অফিসার একটি আনলিস্টেড আমেরিকান কর্পোরেশনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে খুনের শিকার হয়েছে। ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে গেছে, কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সকে এ ব্যাপারে নাক না গলানোর কথা ব’লে। এটা খুবই স্পর্শকাতর ইউএস অপারেশন।”

“কাজটা করলো কে?”

“আমার বিশ্বাস আমি এখানে সেখানে আইরন এ্যাজ্ নামটা শুনেছি,” অ্যাবোট বললো।

“জেনারেল ক্রুফোর্ড? শালার বানচোত—বানচোত আয়রন এ্যাজ্!”

“আপনি কি কল্পনা করতে পারেন?” কথার মাঝখানে স্টিভেন্স বললো। “তাদের লোক খুন হবে আর আমরা তাদেরকে বলবো এ ব্যাপারে নাক না গলাতে।”

“তার কথা ঠিক,” অ্যাবোট বললো। “এটা খুব দ্রুত করতে হয়েছে, ভুলবোঝাবুঝির কোনো অবকাশ ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিন পদক্ষেপ নিতে হয়েছিলো। সব কিছু থামানোর জন্যে খুবই ঝুঁকি নিতে হয়েছিলো। এর ফলে আমাকে ম্যাকেঞ্জি হকিন্সের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে—ম্যাক এবং আমি বার্মাতে একসঙ্গে কাজ করেছি। সে অবসরে গেলেও তারা তার কথা শোনে। তারা এখন সহযোগীতা করছে, সেটাই হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই না?”

“আরো কিছু বিষয়ও তো আছে, মি: অ্যাবোট,” স্টিভেন্স প্রতিবাদ ক’রে বললো।

“সেগুলো অন্য লেভেলের, এলিয়ট। কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নেই। সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।”

“প্রেসিডেন্ট এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, স্যার। এজন্যেই আমি এ বিষয়ে পরিষ্কার একটা ছবি পেতে চাচ্ছি।” স্টিভেন্স থেমে ওয়েবের দিকে তাকালো। “না, প্রিজ, আমাকে এটা জানতে দিন। আপনি আসলে কী করছেন, কেন করছেন? এই কানাডিয়ান মেয়েটাকে নিয়েই বা আমরা সবাই কি খেলা খেলছি, বলুন?”

“শুরুতে আমরা কিছুই করি নি। সেটা ছিলো কার্লোসের কাজ। জুরিখ পুলিশের খুব উঁচু পদে কার্লোসের একজন বেতনভূক্ত লোক আছে। ঐ পুলিশই মেয়েটার সাথে তথাকথিত তিনটি হত্যার অভিযোগ এনেছে। আর এ ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর। মেয়েটা কোনো খুনি নয়।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে,” সহকারিটি বললো। “এটা কার্লোসের কাজ। সে কেন এটা করলো?”

“বর্নকে শেষ ক’রে দেয়ার জন্যে। সেন জ্যাক মেরি আর বর্ন একসঙ্গে আছে।”

“বর্ন হলো সেই গুপ্তহত্যাকারী যে নিজেকে কেইন ব’লে পরিচয় দেয়, ঠিক?”

“হ্যাঁ,” ওয়েব বললো। “কার্লোস তাকে খুন করার জন্যে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ। কেইন কার্লোসের ঘাটি ইউরোপে ঢুকে পড়েছে। তবে তার কোনো ছবি নেই। কেউ আসলে জানে না সে দেখতে কি রকম। তাই মেয়েটার ছবি ছাপানো হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করা হয়েছে সেটা—আর সেটা ওখানকার প্রায় সব পত্রিকাতেই উঠেছে—কেউ না কেউ তাকে ঠিকই দেখতে পাবে। তাকে যদি পাওয়া যায়, তবে কেইনকে—বর্নকে—খুঁজে পাওয়া যাবে। কার্লোস তাদের দু’জনকেই খুন করবে।”

“ঠিক আছে। আবারো বলছি, এটা কার্লোস। এখন তুমি কি করবে?”

“যা আমি বলেছি। গেইমেনশেফটে গিয়ে তাদেরকে বোঝাও যে, মেয়েটা হয়তো বড়সড় চুরির সঙ্গে জড়িত। এটা খুব সহজ কাজ হবে না। তবে তাদের লোক কোয়েনিগ ঘুষ খেয়ে কাজটা করতে সাহায্য করেছে, আমাদের কোনো লোক সেটা করে নি। এটা একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তারা এটা ঢেকে রাখতে চাইবে। তারপর আমি পত্রিকাগুলোকে ডেকে ওয়ালথার এপফেলের কথাটা জানানো। রহস্যময় নারী, খুনি, মিলিয়ন ডলারের চুরি; সম্পাদকেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে সেটার উপরে।”

“ঈশ্বরের দোহাই, কেন?” স্টিভেন্স চিৎকার ক’রে বললো। “আপনি ইউএস ইন্টেলিজেন্স স্ট্র্যাটেজির জন্যে অন্য দেশের নাগরিককে ব্যবহার করবেন! আমাদের বন্ধুপ্রতিম সরকারের খুবই উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তাকে ব্যবহার করবেন! আপনারা কি পাগল হয়ে গেলেন? আপনারা কেবল পরিস্থিতিটাকে আরো খারাপ ক’রে ফেলবেন, আপনারা মেয়েটাকে বলির পাঠা বানাবেন!”

“আপনি ভুল করছেন,” ওয়েব বললো। “আমরা মেয়েটার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি। আমরা কার্লোসের অস্ত্রটাকে ঘুরিয়ে তার বিরুদ্ধেই তাক করছি।”

“কিভাবে?”

সন্ধ্যাসী হাত তুলে বাঁধা দিলো। “এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমাদেরকে আরেকটা প্রশ্নে ফিরে যেতে হবে,” সে বললো। “কারণ এটার জবাব হয়তো আপনাকে এই ধারণাই দেবে যে, তথ্যটা কতোটা গোপন রাখা উচিত। কিছুক্ষণ আগে আমি মেজরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কার্লোসের লোকেরা কিভাবে বর্নকে খুঁজে

পেলো—ফিশেটা খুঁজে পেলো, যা বর্নকে কেইন হিসেবে চিহ্নিত করে। আমার মনে হয়, আমি সেটা জানি। তবে আমি চাই সে তোমাকে বলুক।”

ওয়েব সামনের িকে ঝুকে এলো। “মেডুসা রেকর্ড,” সে শান্ত কণ্ঠে বললো।

“মেডুসা...?” স্টিভেন্সের চোখমুখের ভাষা বলে দিচ্ছে মেডুসা হোয়াইট হাউজের গোপন বৃক্ষিংয়ে আলোচিত হয়েছে। “ওগুলো তো মাটি চাপা দিয়ে দেয়া হয়েছে,” সে বললো।

“একটু সংশোধন ক’রে দিচ্ছি,” অ্যাবোট অনেকটা প্রতিবাদ ক’রে বললো। “একটা অরিজিনাল আর দুটো মাত্র কপি আছে, কিন্তু সেগুলো আছে পেন্টাগনের ভল্টে, সিআইএ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে। ওগুলো দেখা সম্ভব কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লোকের পক্ষে। আর সেটা একেবারে শীর্ষ কর্ম-কর্তারাই পারে। বর্ন মেডুসা থেকেই এসেছে। ব্যাংক রেকর্ড ক্রশ-চেক করলে সেইসব নাম বের হয়ে আসবে। কেউ সেগুলো কার্লোসকে দিয়ে দিয়েছে।”

স্টিভেন্স অ্যাবোটের দিকে তাকালো। “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কার্লোস...আমাদের উচ্চপদস্থ লোকজনের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে? এটা তো সাংঘাতিক একটা অভিযোগ।”

“এটাই হলো একমাত্র ব্যাখ্যা,” ওয়েব বললো।

“বর্ন কেন তার নিজের নামটা ব্যবহার করবে?”

“এটার দরকার ছিলো,” অ্যাবোট জবাব ছিলো। “এটাই হলো পুরো দৃশ্যটা আসল অংশ। খুবই নির্ভরযোগ্য হতে হয়। সবই নির্ভরযোগ্য হতে হয়। সব।”

“নির্ভরযোগ্য?”

“হয়তো আপনি এখন বুঝবেন,” মেজর বলতে লাগলো। “সেন জ্যাক মেরিকে মিলিয়ন ডলার চুরির সাথে জড়িয়ে আমরা আসলে বর্নকে বেরিয়ে আসার কথা বলছি। সে জানে এটা ভুয়া।”

“বর্ন বেরিয়ে আসবে?”

“লোকটার নাম জেসন বর্ন,” অ্যাবোট এবার উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করলো। “একজন আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসার। কেইন ব’লে কেউ নেই। কার্লোস যেরকম একজনের কথা বিশ্বাস করে, সেরকম কিছু নেই। সে একটা টোপ, কার্লোসের জন্যে একটা ফাঁদ; এই হলো বর্ন।”

নিরবতাটি সংক্ষিপ্ত হলো হোয়াইট হাউজের লোকটার কারণে। “আমার মনে হয় আপনি আরো বিস্তারিত বললে ভালো হয়। প্রেসিডেন্টকে তো সব জানতে হবে।”

“আমিও তাই মনে করি,” অ্যাবোট বিড়বিড় ক’রে বললো। “জানালায় পর্দাটা সরিয়ে উদাসভাবে বাইরে তাকালো। “এটা আসলে সমাধানের অযোগ্য একটি সমস্যা। প্রেসিডেন্ট বদলায়, ভিন্ন লোক, ভিন্ন মেজাজ, ভিন্ন চিন্তা নিয়ে ওভাল অফিসে বসে একেকজন। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী ইন্টেলিজেন্স কৌশল-পরিকল্পনা

বদলায় না। এই পরিকল্পনাটিও সেই রকম। তারপরও, বেফাঁস কোনো মন্তব্য, প্রেসিডেন্ট পরবর্তী জীবনে হইস্কি খেয়ে কিছু বলে ফেলা, অথবা সেরকম কিছু সমস্ত পরিকল্পনাটাকে ভেঙে দিতে পারে। এমন কোনো দিন নেই যে, আমরা এ নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত থাকি না।”

“প্রিজ,” স্টিভেন্স বাঁধা দিয়ে বললো। “আমি আপনাকে মনে রাখতে বলবো, আমি এখানে এসেছি প্রেসিডেন্টের আদেশে। আপনি সেটা মানেন কিংবা না মানেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আইনগতভাবেই তিনি এটা জানার অধিকার রাখেন। আর তার নামেই বলছি, আমি তার এই অধিকারটা সম্মুখ রাখবো।”

“বেশ ভালো,” অ্যাবোট বললো। এখনও বাইরে তাকিয়ে আছে সে। “তিন বছর আগে আমরা বৃটিশদের কাছ থেকে একটা পৃষ্ঠা ধার করেছিলাম। আমরা এমন এক লোককে সৃষ্টি করেছি যে কখনও ছিলো না। আপনার যদি স্মরণে থাকে তো একটা গল্প জানেন। নরম্যান্ডির অভিযানের আগে বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স পর্তুগালের উপকূলে একটা লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিলো, তারা জানতো এটার ব্যাপারে যে ডকুমেন্টই লুকানো হোক না কেন খবরটা লিসবনের জার্মান এম্বাসিতে ঠিকই গিয়ে পৌছাবে। সেই লাশের জন্যে একটি জীবন, একটা নাম সৃষ্টি করা হলো। একজন নাভাল অফিসার, স্কুল, প্রশিক্ষণ, ভ্রমণের আদেশ, ড্রাইভার লাইসেন্স, লন্ডনের অভিজাত ক্লাবের সদস্যপদ এবং আধ ডজন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। সবই অস্পষ্ট, কোনো নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই। তবে এসবই একটা জিনিসকে ইঙ্গিত করেছিলো যে, নরম্যান্ডি থেকে একশো মাইল দূরের অভিযানটা এগিয়ে আসছে। আর ছয় সপ্তাহ পরে জুন মাসেই টার্গেট করা হবে। সারা ইংল্যান্ড জুড়ে থাকা জার্মান এজেন্টদের খবরে ভীতি তৈরি হবার পর—সেটা আসলে এমআই ফাইভ-এর নিয়ন্ত্রণে করা হয়েছিলো—বার্লিনের হইকমান্ড খবরটাতে বিশ্বাসী হয়ে বিপুল পরিমানের সৈন্যের সমাবেশ ঘটায় সেখানে। যতো প্রাণহানিই ঘটে থাকুক, হাজার হাজার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিলো ঐ লোকটা, যার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।” অ্যাবোট পর্দাটা সরিয়ে চেয়ারে ফিরে এলো।

“কাহিনীটা আমি শুনেছি,” হোয়াইট হাউজের সহকারী বললো। “আর?”

“আমাদেরটাতে অবশ্য বৈচিত্র্য আছে,” অ্যাবোট বললো। “একটা জীবন্ত মানুষ তৈরি করা, দ্রুত একটা রূপকথা প্রতিষ্ঠিত করা, সর্বত্র একই সময়ে, পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে, কার্লোসকে প্রতিটি পদক্ষেপে নাকানি চুবানি খাওয়ানো। যখনই কোনো খুন, হত্যাকাণ্ড, হোমড়া-চোমড়াদের অপমৃত্যু, অব্যাখ্যাত মৃত্যু হতো কেইনের নামটা উঠে আসতো। নির্ভরযোগ্য সোস—টাকা দিয়ে তথ্যগুলো যথার্থভাবে ছড়ানো হতো—তার নামটাই গেলানো হতো সবখানে। এম্বাসিগুলো, আঁড়িপাতার পোস্টগুলো, পুরো ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক ক্রমাগতভাবেই কেইনের নাম ছড়াতে লাগলো। তার কর্মকাণ্ডকে প্রচার করতে

লাগলো। তার 'খুন'গুলো প্রতি মাসে বাড়তে লাগলো। কখনও কখনও মনে হতো প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে। সবজায়গাতেই সে ছিলো...সব ক্ষেত্রেই।”

“মানে, এই বর্নের কথা বলছেন?”

“হ্যাঁ। সে কয়েক মাসেই কাছে থাকা প্রতিটি ফাইলে কার্লোসের ব্যাপারে যা কিছু আছে সব কিছু শিখে ফেলে, কার্লোসের নাম জড়ানো প্রতিটি খুনের ব্যাপারে তথ্য নিয়েছে। সে কার্লোর কৌশল আর পদ্ধতিগুলো গোথ্রাসে গিলেছে। এমন সব তথ্য জেনেছে যা কোনোদিন দিনের আলো দেখে নি, দেখবেও না হয়তো। এটা বিস্ফোরণমূলক—সরকার এবং আন্তর্জাতিক কিছু বিষয় একে অন্যের গলা জড়িয়ে আছে। এমন কিছু নেই যা বর্ন জানে না। তারপর সে নিজেকে প্রদর্শন করলো, সবসময় ভিন্ন রূপে, কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পারে সে, পেশাদার খুনিদের মতো কথা বলা শুরু করলো। তারপর একদিন উধাও হয়ে গেলো, পেছনে রেখে গেলো একদল বিস্মিত আর ভয়ান্ত নারী-পুরুষ। তারা কেইনকে দেখেছে। তার অস্তিত্ব ছিলো। আর সে ছিলো নির্মম। এই ইমেজটাই বর্ন ধারণ করলো।”

“সে এভাবে তিন বছর আভারগ্রাউন্ডে রইলো?” স্টিভেন্স জানতে চাইলো।

“হ্যাঁ। সে ইউরোপে চলে যায়, এশিয়ার সবচাইতে সফল শ্বেতাঙ্গ গুপ্তঘাতক, মেডুসা থেকে গ্র্যাজুয়েট, কার্লোসের আঙিনায় এসে কার্লোসকেই চ্যালেঞ্জ ক'রে বসলো। এই প্রক্রিয়ায় সে কার্লোসের টার্গেট করা চারজন লোককে রক্ষা করলো। কার্লোসের হত্যার কৃতিত্ব নিতে শুরু করলো। তার সঙ্গে মশ্করা করতে শুরু করলো। সে সবচাইতে বিপজ্জনক মিথ্যের মধ্যে বসবাস ক'রে তিন তিনটি বছর পার করলো। এরকম কিছুর অস্তিত্ব খুব কম লোকেই জানতো।”

“সে কি ধরণের লোক?”

“একজন পেশাদার,” গর্ডন ওয়েব জবাব দিলো। “যার ট্রেনিং আছে, সক্ষমতা আছে, যে মনে করতো কার্লোসকে খুঁজে পাওয়া যাবে, থামানো যাবে।”

“কিন্তু তিন বছর?”

“এটা যদি খুব অবিশ্বাস্য মনে হয়,” অ্যাবোট বললো, “তাহলে আপনি জানবেন যে, সে সার্জারি ক'রে নিয়েছিলো। এটা যেনো তার অতীতের সাথে চূড়ান্ত একটি বিচ্ছেদ। সে যা ছিলো তা আর রইলো না। আমার মনে হয় না কোনো দেশ বর্নের মতো মানুষকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে। সম্ভবত একমাত্র পথ হলো তাকে সফল হবার সুযোগ ক'রে দেয়া—ঈশ্বরের সহায়তায় আমি সেটা করতে চাই।” অ্যাবোট একটু থেমেত বললো, “অবশ্য যদি এটা বর্ন হয়ে থাকে তো।”

যেনো এলিয়টকে কোনো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হলো। “আপনি কি বললেন?” সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

“আমার আশংকা আমি হয়তো এটা শেষ পর্যন্ত বলেউ যাবো। আমি চাইবো আমি এই ফাঁকটা বর্ননা করার আগে ভূমি পুরো চিত্রটা বুঝে নেবে। এটা হয়তো

ফাঁকও নয়—আমরা কেবল জানি না। অনেক কিছুই ঘটেছে যা আমাদের মাথায় ঢুকছে না। তবে সেটাও আমরা নিশ্চিত ক’রে জানি না। এই কারণেই অন্য লেভেল থেকে কোনো রকম নাক গলানো হয় নি। আমরা মানুষ হত্যার নিন্দা করি। বিশেষ ক’রে এমন একজন মানুষ, যে আমাদের যে কারোর চেয়েও বেশি দিয়েছে। সফল হলে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে, তবে অজ্ঞাত কোনো নামে। কেবলমাত্র নিজের পরিচয়টা প্রকাশ না ক’রে।”

“আমার মনে হচ্ছে আপনাকে সেটা আরেকটু পরিষ্কার ক’রে বুঝিয়ে বলতে হবে,” প্রেসিডেন্টের সহকারী বললো।

“আনুগত্য, এলিয়ট। এটার সাথে সাধারণ ভালো ‘লোক’-এর কোনো সম্পর্ক নেই। কার্লোস এমন একটা বাহিনী গঠন করেছে যারা তার প্রতি অনুগত। তারা হয়তো তাকে চেনে না তবে তাকে শ্রদ্ধা করে। কোনোভাবে যদি সে কার্লোসকে ঘায়েল করতে পারে—অথবা কার্লোসকে ফাঁদে ফেলতে পারে, যাতে ক’রে আমরা তাকে পাকড়াও করতে পারি—তখন সে মুক্ত হতে পারবে।”

“কিন্তু আপনি তো বললেন সে জেসন বর্ন নাও হতে পারে।”

“আমি বলেছি আমরা জানি না। ব্যাংকে যে গেছে সে বর্নই ছিলো। স্বাক্ষরটা বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এখনকারটা কি বর্ন? পরবর্তী কয়েকটা দিনে সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।”

“যদি সে প্রকাশ্য হয়,” ওয়েব যোগ করলো।

“এটা খুবই নাজুক ব্যাপার,” বৃদ্ধলোক বলতে লাগলো। “অনেক অনুঘটক রয়েছে। এটা যদি বর্ন না হয়—অথবা সে যদি বেঈমানী ক’রে থাকে—তাহলে এটা অটোয়ার খুনটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে, এয়ারপোর্টের খুনটার কথা বলছি। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে মনে হয় মেয়েটাকে সে প্যারিস থেকে টাকা তোলার কাজে ব্যবহার করেছে। কার্লোসকে কেবল কানাডিয়ান ট্রেজারি বোর্ডে কয়েকটা ইনকোয়ারি করতে হবে। বাকিটা তার জন্যে ছেলে-খেলা হয়ে যাবে। মেয়েটার সাথে যোগাযোগকারীকে খুন করবে, তাকে ভয় পাইয়ে দেবে। তাকে বিচ্ছিন্ন ক’রে বর্নকে ফাঁদে ফেলার কাজে ব্যবহার করবে।”

“আপনারা কি মেয়েটার বাতর্জিটা পৌছাতে পেরেছেন?” মেজর জানতে চাইলো।

“আমি চেষ্টা করেছিলাম, ব্যর্থ হয়েছি। আমি ম্যাক হকিন্সকে দিয়ে সেন জ্যাকের সাথে কাজ করে এ্যালান নামের এক লোককে ফোন করিয়েছিলাম। সে মেয়েটাকে দ্রুত কানাডায় ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিলো। কিন্তু মেয়েটা এখনও বর্নের সঙ্গেই রয়ে গেছে।”

“ধ্যাত্তারিকা!” ওয়েব ক্ষিপ্ত হয়ে বললো।

“একদম ঠিক। মেয়েটাকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারতাম তবে হয়তো অনেক কিছু জানতে পারতাম। মেয়েটাই হলো মূল চাবিকাঠি। সে কেন বর্নের সাথে আছে? বর্নই বা কেন তার সাথে আছে? কিছুই মাথায় ঢুকছে না।”

“আমি তো আরো বুঝতে পারছি না,” প্রেসিডেন্টের লোকটা রেগেমেগে বললো। “আপনারা যদি প্রেসিডেন্টের সহযোগীতা চান—আমি অবশ্য কোনো কথা দিচ্ছি না—আপনাদেরকে পুরো বিষয়টা আরো পরিষ্কার করতে হবে।”

অ্যাবোট তার দিকে ফিরলো। “ছয় মাস আগে বর্ন উধাও হয়ে যায়,” সে বললো। “কিছু একটা ঘটেছিলো। আমরা নিশ্চিত নই ঘটনাটা কি। তবে সব টুকরো জোড়া লাগিয়ে সম্ভাব্য একটা ছবি তৈরি করতে পারি। সে জুরিখে যাবার পথে খবর পায় কার্লোস মার্সেই’র পথে আছে। পরে, খুব দেরিতে আমরা বুঝেছিলাম সেটা। সে জানতে পেরেছিলো কার্লোস হাওয়ার্ড লিল্যান্ডকে খুন করার জন্যে কনট্রাক্ট নিয়েছে, আর বর্ন সেটা থামাবার চেষ্টা করেছিলো। তারপর আর কিছুই জানা যায় নি। সে উধাও হয়ে গেলো। সে কি মরে গেছে? সে কি তীব্র চাপে ভেঙে পড়েছে? সে কি... হাল ছেড়ে দিয়েছে?”

“আমি এটা মেনে নিতে পারছি না,” ওয়েব রেগেমেগে বললো। “আমি এটা মেনে নেবো না!”

“আমি জানি তুমি তা করবে না,” বললো অ্যাবোট। “এজন্যই আমি চাই তুমি সেই ফাইলটা প’ড়ে দেখো। তুমি তার সমস্ত কোডগুলো জানো। দ্যাখো, জুরিখের কোনো ফাঁক ধরতে পারো কিনা।”

“প্রিজ!” স্টিভেন্স বললো। “আপনারা কি মনে করেন? আপনাকে অবশ্যই শক্ত কিছু খুঁজে পেতে হবে। যাতে তার উপর ভিত্তি ক’রে পুরো ব্যাপারটা বিচার করা যায়। আমার সেটা দরকার, মি: অ্যাবোট। প্রেসিডেন্টের সেটা দরকার।”

“আমার কাছে যদি শক্ত কিছু থাকতো তাহলে আমি সেটা আপনাকে বলতাম,” অ্যাবোট জবাব দিলো। “আমরা কি পেয়েছি? সবকিছু, আবার কিছুই না। প্রায় তিন বছর ধরে আমরা আমাদের রেকর্ডগুলো সযত্নে আড়াল ক’রে রেখেছি। প্রতিটি ভূয়া কর্মকাণ্ড ডকুমেন্ট ক’রে রাখা হয়েছে। প্রতিটি চালই সংজ্ঞায়িত এবং জাস্টিফাই করা হয়েছে। প্রত্যেক নারী এবং পুরুষ—ইনফর্মার, কনট্রাক্ট, সোর্স—মুখ, কণ্ঠ আর বলার জন্যে গল্প দেয়া হয়েছে। আর প্রত্যেক সপ্তাহে, প্রত্যেক মাসেই আমরা কার্লোসের আরো কাছে চলে আসছিলাম। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেলো। ছয় মাসের দীর্ঘ শূন্যতা।”

“এখন তো আর সেই অবস্থা নেই,” প্রেসিডেন্টের চ্যালাটা পাল্টা বললো। “সেই নিরবতা ভেঙেছে। কে ভেঙেছে?”

“এটাই তো আসল প্রশ্ন, তাই নয় কি?” ক্রান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ বললো। “কয়েক মাসের নিরবতা, তারপর আচম্কা তার কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেলো। একাউন্টটাতে অনুপ্রবেশ হলো। ফিশেটা বদলে ফেলা হলো, মিলিয়ন ডলার করা হলো ট্রান্সফার—বলতে গেলে চুরি করা হলো। লোকজন খুন হতে লাগলো, ফাঁদে পড়তে লাগলো অন্য মানুষদেরকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে, কিন্তু কার জন্যে? কার দ্বারা?” অ্যাবোট ক্রান্ত ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকালো। “ঐ লোকটা আসলে কে?”

অধ্যায় ২০

লিমোজিনটা নক্সা করা ব্রাউনস্টোন ভবনের বাইরে দুটো ল্যাম্পপোস্টের মাঝখানে পার্ক ক'রে রাখা আছে। সামনের আসনে ইউনিফর্ম পরা ব'সে আছে শফার, এ ধরনের পথঘাটে এরকম গাড়ি আর এরকম ড্রাইভার অহরহই দেখা যায়। ব্যতিক্রম হলো দু'জন লোক পেছনের অঙ্ককার আসনে ব'সে আছে। বের হওয়ার কোনো লক্ষণ তাদের মধ্যে নেই। তার বদলে তারা ব্রাউনস্টোন ভবনটার প্রবেশদ্বারের দিকে লক্ষ্য রাখছে। তারা নিশ্চিত ইনফ্রারেড ক্যামেরায় তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না।

এক লোক তার চশমাটা ঠিক ক'রে নিলো। মোটা কাঁচের পেছনে চোখ দুটো পেচার মতো। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের পারসোনেল স্ক্রিনিং অ্যান্ড ইন্ভালুয়েশন ডিরেক্টর আলফ্রেড জিলেট কথা বললো। “যখন কোনো উঁচু নাক ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তখন সেটা দেখতে কতোটাই না আনন্দের লাগে।”

“আপনি আসলেই তাকে অপছন্দ করেন, তাই না?” জিলেটের সঙ্গী, কালো রেইন কোট পরা ভারি কাঁধের এক লোক, ইউরোপের কোনো শ্লাভিচ ভাষার টান আছে যার কথায়, সে বললো।

“আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি ওয়াশিংটনের যেসব জিনিস ঘৃণা করি সে ঐসব জিনিসের পক্ষে দাঁড়ায়। রাইট স্কুল, জর্জ-টাউনের বাড়ি, ভার্জিনিয়ার খামার, তাদের ক্লাবের গোপন মিটিংগুলো। তাদের আছে শক্তপোক্ত ছোট্ট এক দুনিয়া যেখানে তুমি ঢুকতে পারবে না—তারাই সব কিছু চালায়। বানচোতের দল। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ওয়াশিংটনের আত্মস্মরি ভদ্রলোকেরা। তারা অন্য লোকের বুদ্ধি মত্তা ব্যবহার ক'রে নিজেদের সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। আর তুমি যদি বহিরাগত হও তাহলে তুমি হয়ে যাবে মদন। ‘চমৎকার একজন কর্মচারী!’”

“আপনি বাড়িয়ে বলছেন,” ইউরোপিয়ানটি বললো। তার চোখ ভবনটার দিকে। “আপনি ওখানে খুব খারাপ কিছু করেন নি। যদি করতেন তো আপনার সাথে আমরা কখনও যোগাযোগ করতে পারতাম না।”

জিলেট ভুরু কুচকালো। “আমি যদি বাজে কিছু ক'রে না থাকি তাহলে তার কারণ আমি ডেভিড অ্যাবোটের মতো অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলাম। আমার মাথায় এমন হাজার হাজার তথ্য আছে যা তারা এমনকি স্মরণও করতে পারবে না। তাদের জন্যে খুব সহজ ছিলো, যখনই কোনো প্রশ্ন করা হতো, সমস্যা দেখা দিতো তখনই আমাকে সেটা সামলাতে বলতো, সমাধান করতে বলতো। পারসোনেল স্ক্রিনিং অ্যান্ড ইন্ভালুয়েশনের পরিচালক! তারা এই পদটি সৃষ্টি করেছে আমার জন্যে। জানো কেন?”

“না, আলফ্রেড,” ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকটি হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বললো। “আমি জানি না, কেন?”

“কারণ তারা হাজার হাজার রিজিউম আর ডেসিয়ার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোর ধৈর্য রাখে না। তারা বরং সান সূচি’তে ডিনার করতেই বেশি পছন্দ করে। অথবা সিনেট কমিটির সামনে ব’সে স্মার্টনেস দেখাতে পারে। অন্যের তৈরি করা কাগজ থেকে পড়তে পারে—যে কাজগুলো ভালো স্টাফরা তৈরি ক’রে দেয়।”

“আপনি খুবই তিক্ত একজন মানুষ,” ইউরোপিয়ানটি বললো।

“তুমি যতোটুকু জানো তারচেয়েও বেশি। এসব বানচোতের কাজ করতে করতে জীবন পার ক’রে দিয়েছি। কিসের জন্যে? একটা পদ আর মাঝে মধ্যে ডেভিড অ্যাবোটের মতো কর্তাদের সঙ্গে লাক্ষ্য করার জন্যে! আমার মতো লোকজন ছাড়া তারা কিছুই না।”

“লোকটাকে খাটো ক’রে দেখবেন না। কার্লোস কিন্তু তা করে না।”

“কিভাবে সে করবে? সে তো জানে না কিভাবে মূল্যায়ণ করা হয়। অ্যাবোট যা করে তা গোপনীয়তার চাদরে ঢেকেই করে। কেউ জানে না সে কতো ভুল করেছে। আর কখনও যদি কোনো ভুল প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে তার জন্যে আমাদের মতো লোকদেরকে দোষ দেয়া হয়।”

ইউরোপিয়ান লোকটি জিলেটের দিক থেকে মুখ সরিয়ে জানালার দিকে তাকালো। “আপনি খুবই আবেগপ্রবণ, আলফ্রেড,” সে শান্ত কণ্ঠে বললো। “আপনি এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।”

আমলা লোকটি হাসলো। “সেরকম কিছু কখনও হবে না : আমি বিশ্বাস করি কার্লোসের প্রতি আমার অবদান সেটা নিশ্চিত করবে। বলতে পারো আমি এমন একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি যা আমি এড়িয়ে যেতে পারি না।”

“সং বক্তব্য,” ভারি কাঁধের লোকটি বললো।

“তোমার ব্যাপারটা কি? তুমি আমাকে খুঁজে পেয়েছো?”

“আমি জানি কি খুঁজতে হয়,” জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে ইউরোপিয়ানটি বললো।

“মানে, বলতে চাচ্ছি, কার্লোসের জন্যে তুমি যে কাজ করো।”

“আমার কাছে কোনো জটিল কারণ নেই। আমি এমন এক দেশ থেকে এসেছি যেখানে শিক্ষিত লোকেরা মার্ক্সিস্ট বয়ান আওড়ায় মুখের মতো। কার্লোসও জানে কি খুঁজতে হয়।”

জিলেট হেসে ফেললো। “আমরা তাহলে খুব বেশি ভিন্ন নই।”

“হয়তো,” ইউরোপিয়ানটি বললো। আবারো ঘড়ির দিকে তাকালো। “খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। অ্যাবোট সবসময়ই মধ্য রাতের শাটল ধরে, তার প্রতিটি ঘণ্টা ওয়াশিংটনে জবাবদিহি করতে হয়।”

“তুমি নিশ্চিত সে একা বের হয়ে আসবে?”

“সে সবসময়ই তা করে, এটা নিশ্চিত তাকে এলিয়ট স্টিভেন্সের সাথে দেখা যাবে না। ওয়েব এবং স্টিভেন্স সবসময়ই আলাদা আলাদাভাবে যাতায়াত করে। বিশ মিনিটের মতো ব্যবধান থাকে।”

“তুমি ট্রেডস্টোনটা কিভাবে খুঁজে পেলে?”

“সেটা খুব কঠিন ছিলো না। আপনার অবদান আছে, আলফ্রেড। আপনি ভালো স্টাফদেরই একজন।” লোকটা হেসে ফেললো, তার চোখ ব্রাউস্টোন ভবনটার দিকে। “কেইন মেডুসা থেকেই এসেছে। আপনি সেটা আমাদেরকে বলেছেন, আর কার্লোসের সন্দেহটা যদি যথার্থ হয়, তাহলে সেটা সন্ধ্যাসীই। আমরা সেটা জানি। এটা তাকে বর্নের সাথে জুড়ে রেখেছে। অ্যাবোটকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারী করার জন্যে কার্লোস আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। কিছু একটা হচ্ছে। যখন জুরিখের গুলির শব্দ ওয়াশিংটনে শোনা গেলো তখন অ্যাবোট সন্ধ্যাসীটা একেবারে উতলা হয়ে উঠলো। তাকে আমরা এখানে অনুসরণ করলাম। এটা খুবই জরুরি ব্যাপার।”

“এটাই তোমাকে কানাডায় নিয়ে গেছে? অটোয়ার সেই লোকটার কাছে?”

“অটোয়ার লোকটা ট্রেডস্টোনের খোঁজ করতে গিয়ে নিজেকে উন্মোচিত ক’রে ফেলেছিলো। আমরা যখন জানতে পারলাম মেয়েটা কে, তখনই ট্রেজারি বোর্ডকে নজরদারীতে রাখতে শুরু করলাম। প্যারিস থেকে একটা ফোন এলো। মেয়েটা করেছিলো সে ফোন। তাকে একটা জিনিস খোঁজার কথা বললো। আমরা জানতাম না কেন। তবে আমরা সন্দেহ করলাম বর্ন হয়তো ট্রেডস্টোন চাউড় ক’রে দেবার চেষ্টা করছে। বর্ন যদি বেঈমানী করে থাকে, তবে টাকাগুলো নিয়ে বের হওয়ার একটামাত্র পথই আছে। তাতে কিছু যায় আসে না। আচম্কা, এই সেকশনের প্রধান এমন একটা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যেটা কানাডার সরকারের বাইরে কেউ কখনও শোনে নি। ইন্টেলিজেন্স যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের তারগুলো পুড়িয়ে ফেললো। তার মানে কার্লোস ঠিকই ধারণা করেছে। আপনিও সঠিক, আলফ্রেড। কেইন ব’লে কিছু নেই। সে একটা উদ্ভাবন, একটা ফাঁদ।”

“শুরু থেকেই,” জিলেট বললো। “আমি তোমাকে সেটা বলেছি। তিন বছর ধ’রে ভুয়া রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। সোর্সগুলো খতিয়ে দেখা হয় নি। সবই ওখানে আছে।

“শুরু থেকেই,” ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক বললো। “সন্দেহাতীতভাবেই এটা অ্যাবোটের সেরা সৃষ্টি...যতোক্ষণ না কিছু একটা ঘটলো, আর তার সৃষ্টিটা তার সঙ্গেই বেঈমানী করলো।”

“স্টিভেন্স এখানে এসেছে সেটা কনফার্ম করতে। প্রেসিডেন্ট সব কিছু জানতে চান।”

“তাকে তা জানতেই হবে। অটোয়াতে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ট্রেজারি বোর্ডের সেকশন হেড আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের হাতে খুন হয়েছে।” ইউরোপিয়ানটি এবার আমলার দিকে তাকালো। “মনে রাখবেন আলফ্রেড, আমরা খালি জানতে চাই কি হয়েছে। আমরা সেগুলো জানার জন্যেই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। এগুলো একেবারেই তর্কাতীত। অ্যাবোট সেগুলো অস্বীকার করতে পারবে না। তবে সেগুলো অবশ্যই এমনভাবে উপস্থিত করতে হবে যেনো সেগুলো আপনার নিজের সোর্সরা নিজস্ব কায়দায় সংগ্রহ করেছে। আপনি খুবই ভড়কে যাবেন। আপনি একটা জবাবদিহিতা দাবি করবেন। পুরো ইন্টেলিজেন্স সম্প্রদায়কে বোকা বানানো হয়েছে।”

“তাই তো হয়েছে!” জিলেট আতিশয্যে বললো। “বোকা বানিয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াশিংটনের কেউ জানে না বর্ন কে, ট্রেডস্টোন কি। তারা সবাইকে অন্ধকারে রেখেছে। এটা তো ভয়ংকর কথা। আমাকে ভান করার কোনো দরকারই হবে না। শালারা সব উল্লাসিক বানচোতের দল।”

“আলফ্রেড,” অন্ধকারে হাত তুলে সতর্ক ক’রে দিয়ে ইউরোপীয়ানটি বললো। “মনে রাখবেন, কার হয়ে আপনি কাজ করছেন। হুমকীটা আবেগের উপর ভিত্তি ক’রে হতে পারে না। বরং ঠাণ্ডা মাথায় পেশাদারিত্বের সাথে হতে হবে। সে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ ক’রে ফেলবে। আপনাকে খুব দ্রুত এইসব সন্দেহ দূর করতে হবে। আপনি অভিযোগকারী, সে নয়।”

“মনে থাকবে।”

“বেশ।” হেডলাইটের আলো কাঁচের উপর আছড়ে পড়লো। “অ্যাবোটের ট্যাক্সিটা এখানে। আমি ড্রাইভারকে সামলাবো,” ইউরোপিয়ান তার ডান দিকের একটা সুইচে হাত রাখলো। “পথের পাশে আমি আমার গাড়িতে থাকবো, শুনতে থাকবো।” সে তার ড্রাইভারকে বললো। “যেকোনো মুহূর্তে অ্যাবোট বের হয়ে আসবে। তুমি জানো তোমাকে কি করতে হবে।”

ড্রাইভার মাথা নেড়ে সায় দিলে দু’জন লোকই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। ড্রাইভার বেরিয়ে এসে এমনভাবে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো যেনো এই শহরের কোনো ধনী লোক সে। পেছনের জানালা দিয়ে জিলেট দেখতে পেলো দু’জন লোক কিছু দূর গিয়ে আলাদা হয়ে গেলো। তারপর ইউরোপিয়ানটি ক্যাবের দিকে এগিয়ে এলো, তার হাতে একটা বিল, সে হাতটা তুলে রাখলো। ট্যাক্সিটাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। পলিকল্লনাটা বদলে গেছে।

ড্রাইভার রাস্তার উত্তর দিকের ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান’র প্রবেশদ্বারের সিঁড়ি থেকে দুটো বাড়ির আগে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় লুকিয়ে রইলো।

ত্রিশ সেকেন্ড পরে জিলেট ব্রাউনস্টোন ভবনটার দিকে তাকালো। অঐর্ধ্য ডেভিড অ্যাবোট বেরিয়ে আসছে। রাস্তার এপাশ-ওপাশ দেখে নিলো সে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুবই বিরক্ত হলো। ট্যাক্সিটা আসতে দেরি করছে অথচ তাকে একটা প্লেন ধরতে হবে। শিডিউলটা খুবই নিখুঁতভাবে অনুসরণ করার কথা। অ্যাবোট রাস্তায় নেমে বাম দিকে পা বাড়ালো, সে ট্যাক্সিটা খুঁজছে। সেটার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ড্রাইভারকে অতিক্রম করবে। তাই করলো। দু'জন লোকই এখন ক্যামেরার আওতার বাইরে।

পথ রোধটা খুব দ্রুত হলো, আলাচনাও চললো সমান তালে। কয়েক মুহূর্ত বাদে বিস্মিত ডেভিড অ্যাবোট লিমোজিনে ঢুকে পড়লে ড্রাইভার অস্বাভাবিক থেকে বেরিয়ে এলো।

“তুমি!” অ্যাবোটের কণ্ঠে তিক্ততা আর ক্রোধ। “তোমরাই তাহলে।”

“আমার মনে হয় না আপনি এখন এমন অবস্থায় আছেন যে, ঘৃণা করতে পারেন....উল্লেখ্য হতে পারেন।”

“তোমরা করেছে কি! কতো বড় আত্মপরিচয় তোমাদের? জুরিখ। মেডুসা রেকর্ড। তুমিই তাহলে সেটা করেছে!”

“মেডুসা রেকর্ড, জুরিখ? হ্যাঁ, আমিই করেছি। তবে আমি কি করেছি সেটা কোনো প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো আপনি কি করেছেন। আমরা আমাদের লোকগুলোকে জুরিখে পাঠিয়েছি, বলে দিয়েছি কি খুঁজতে হবে। আমরা এটা খুঁজে পেয়েছি। তার নাম বর্ন, তাই না? তাকেই আপনারা কেইন বলে ডাকেন। যে লোকটাকে আপনারা আবিষ্কার করেছেন।”

অ্যাবোট নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলো। “এই বাড়িটা কিভাবে খুঁজে পেলেন?”

“লেগে থাকলে সবই সম্ভব। আমি আপনাকে অনুসরণ করেছি।”

“তুমি আমাকে অনুসরণ করেছে? তোমরা এসব কি করছো?”

“একটা রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করছি। আপনার মিথ্যে আর বিকৃত করার রেকর্ড। আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রাখার রেকর্ড। আপনি কি করছেন?”

“ওহ, ঈশ্বর, তুমি আস্ত একটা বোকা!” অ্যাবোট গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো। “তুমি এটা কেন করলে? তুমি নিজে কেন আমার কাছে এলে না?”

“কারণ আপনি কিছুই করেন নি। আপনি পুরো ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিকে কুক্ষিগত করেছেন। লক্ষ-লক্ষ ডলার, অকথিত হাজার মানুষের হাজার লক্ষ ঘণ্টা শ্রম। এ্যামেসিস আর স্টেশনগুলোকে মিথ্যে তথ্য গিলিয়েছেন, এমন একজন খুনির ব্যাপারে যার কোনো অস্তিত্বই নেই। ওহ, আপনার কথাগুলো আমার মনে পড়েছে—কার্লোসের জন্যে কি দারুণ চ্যালেঞ্জ! কতো অপ্রতিরোধ্য একটা ফাঁদই না পেতেছিলেন! আর আমরা হলাম আপনার ঘুঁটি। সিকিউরিটি কাউন্সিলের একজন দায়িত্ববান সদস্য হিসেবে আমি তীব্রভাবেই সেটা ঘৃণা করি। আপনারা সবাই একরকম। কারা আপনাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে নির্বাচন করেছে যে যখন খুশি আইন ভাঙতে পারেন—না, কেবল আইন নয়, নিয়মনীতি সব? আমাদেরকে বোকা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন আপনি।”

“আর কোনো উপায় নেই,” বৃদ্ধলোকটি ক্লান্তভাবে বললো। “কতোজন জানে? আমাকে সত্যি কথা বলো।”

“আমি সেটা নিজের কাছেই রেখেছি। আমি সেটা আপনাকে দেবো।”

“সেটা হয়তো যথেষ্ট হবে না। হায় ইশ্বর!”

“সেটা হয়তো শেষও নয়,” আমলা লোকটা সহমর্মিতার সাথে বললো। “আমি জানতে চাই কি ঘটেছে।”

“কি ঘটেছে?”

“আপনার এই বিখ্যাত কৌশলটার। মনে হচ্ছে সেটা...ভেঙে পড়ছে।”

“তুমি এটা কেন বললে?”

“এটা তো খুবই পরিস্কার। আপনি বর্নকে হারিয়েছেন, আপননি তাকে খুঁজে পাবেন না। আপনার কেইন জুরিখের ব্যাংক থেকে সৌভাগ্যের মিলিয়ন ডলার নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।”

অ্যাবোট কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকলো। “দাঁড়াও। এতে তোমার ক্ষিপ্ত হবার কি আছে?”

“আপনি,” জিলেট খুব দ্রুত বললো। সতর্ক লোকটা তার আসল প্রশ্নটা উত্থাপন করলো। “আমি বলবো, যে মানুষটি সেটা সৃষ্টি করেছে তার মুখোমুখি ব’সে যখন পেন্টাগনের ঐ গাধাটা অপারেশন মেডুসা নিয়ে কথা বলছিলো...আপনি তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন, এটা আমি খুব প্রশংসা করি।”

“ইতিহাস,” বৃদ্ধলোকটির কণ্ঠ এখন খুব শক্তিশালী শোনাচ্ছে। “সেটা অবশ্য তোমাকে কিছু বলে নি।”

“বলা যায়, আপনার কিছু না বলাটাই বরং অস্বাভাবিক। মানে, টেবিলে আপনি ছাড়া আর কে ছিলো যে মেডুসার ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি জানে? কিন্তু আপনি একটা কথাও বলেন নি। আর সেটাই আমাকে ভাবতে শুরু করেছে। তাই আমি চরমভাবে এই কেইন খুনিকে টাকা দেয়ার ব্যাপারে বিরোধীতা করেছি। আপনি বাঁধা দিতে পারতেন, ডেভিড। আপনি কেইনকে খোঁজার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে গ্রহণযোগ্য কারণ বলতে পারতেন। আপনি কার্লোসকে শিকারের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।”

“এটাই সত্য,” অ্যাবোট বাঁধা দিয়ে বললো।

“অবশ্যই এটা সত্য। আপনি জানেন কখন এটা ব্যবহার করতে হয় আর আমি জানি কখন এটাকে থামাতে হয়। ধূর্ত। মেডুসার মাথা থেকে একটা সাপ টেনে বের করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তাকে একটা মিথ তৈরির জন্যে। প্রতিযোগী চ্যাম্পিয়নের রিংয়ে কাঁপ দিয়ে ঢুকে পড়েছে তার সাথে লড়াই করার জন্যে।”

“এটা গুরুত্বপূর্ণ দিককার কথা।”

“কেন নয়? যেমনটি আমি বলেছি। খুবই ধূর্ত একটি কৌশল ছিলো সেটা। এমনকি কেইনের নিজের লোকেরা তার বিরুদ্ধে কাজ করলেও সে টিকে গিয়েছে।

সমস্ত পদক্ষেপ আর গোপন তথ্য চল্লিশজনের জনের কমটিতে যে লোক প্রত্যেকের কাছে গোপন অপারেশনের রিপোর্ট পেশ করতো সে ছাড়া আর কে কেইনের কাছে কে জানিয়ে দিতো? আপনি আমাদের সবাইকে ব্যবহার করেছেন!”

অ্যাবোট মাথা নাড়লো। “বেশ। একদিক থেকে তোমার কথা ঠিক। আমিও মনে করি অনেক অপব্যবহার হয়েছে, সবই জাস্টিফাই করা হয়েছে—তবে তুমি সেরকমটি ভাবছো না। চেক এ্যান্ড ব্যালান্স সব সময় করতে পারতাম না। ট্রেডস্টোনে সরকারের সবচাইতে আস্থাভাজন কতিপয় লোকের একটি দল অন্তর্ভুক্ত আছে। তাদের মধ্যে আর্মির জি-টু থেকে সিনেট, সিআইএ, নেভাল ইন্টেলিজেন্স এবং এখন, সত্যি বলতে কি, হোয়াইট হাউজের লোকও ঢুকে পড়েছে। সত্যিকার অর্থে কোনো অন্যায় বা অপব্যবহার হলে এইসব লোকের যে কোনো একজন অপারেশনটা থামিয়ে দিতে ইতস্তত করবে না। কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত তা করে নি। আমি তোমার কাছে আবেদন করবো, তুমিও তা করো না।”

“আমি কি ট্রেডস্টোনের অংশ?”

“তুমি এখন সেটার অংশ হয়ে গেছো।”

“আচ্ছা। এখন বলুন, কি হয়েছে? বর্ন কোথায়?”

“হায় ঈশ্বর, আমি যদি সেটা জানতাম! আমরা এমনকি নিশ্চিত নই যে, সে-ই বর্ন।”

“আপনারা নিশ্চিত নন কিসের ব্যাপারে?”

“আচ্ছা। এখন বলুন, কি হয়েছে? বর্ন কোথায়?”

“হায় ঈশ্বর, আমি যদি সেটা জানতাম! আমরা এমনকি নিশ্চিত নই যে, সে-ই বর্ন।”

“আপনারা নিশ্চিত নন কিসের ব্যাপারে?”

ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকটি ড্যাশবোর্ডের সুইচে হাত রাখলো। সেটা অফ ক’রে দিলো সে। “এই তো,” সে বললো। “এটাই শুধু আমাদের জানার দরকার ছিলো,” সে তার পাশে ড্রাইভারের দিকে ফিরলো। “এক্ষুণি সিঁড়ির পাশে চলে যাও। মনে রাখবে, তাদের কেউ যদি বের হয়ে আসে, দরজা বন্ধ হবার আগে তোমার হাতে সময় থাকবে ঠিক তিন সেকেন্ড। দ্রুত কাজ করবে।”

প্রথমে ড্রাইভার বের হয়ে সে ট্রেডস্টোন সেভেনটি ওয়ান-এর দিকে পা বাড়ালো। পাশের একটা ব্রাউনস্টোন ভবন থেকে মধ্যবয়সী এক দম্পতি তাদের নিমন্ত্রণদাতাকে উচ্চস্বরে গুডবাই জানাচ্ছে। ড্রাইভার হাটা ধীরগতির ক’রে ফেললো। দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিগারেট বের ক’রে জ্বালালো। ইউরোপিয়ানটি সব দেখছে। তারপর তার কালো রেইন কোর্টের বোতাম খুলে ভেতর থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার বের করলো। সেফটি লকটা বন্ধ ক’রে অস্ত্রটা

আবারো হোলস্টারে রেখে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার অপর পাশের লিমোজিনটার দিকে পা বাড়ালো। আয়নাগুলো এমন এ্যাসপেলে রাখা আছে যে, ভেতরে থাকা কোনো মানুষ সেটা দিয়ে তাকে আসতে দেখবে না। গাড়ির পেছনের ট্রাংকটার সামনে এসে ইউরোপিয়ান লোকটা একটু থেমে গেলো। তারপর বিদ্যুৎবেগে সামনের ডান দিকের দরজাটা এক ঝটকায় খুলে ভেতরে ঢুকেই অস্ত্রটা সিটের উপর তাক করলো।

আলফ্রেড জিলেট আংকে উঠে বাম দিকের দরজাটার হাতলের দিকে হাত বাড়ালো। ইউরোপিয়ান লোকটি চারটা দরজার লক সুইচে চাপড় করলো। ডেভিড অ্যাবোট একটুও নড়লো না, অনুপ্রবেশকারীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে।

“শুভ রাত্রি, অ্যাবোট,” ইউরোপিয়ান বললো। “আরেকজন, যে আমাকে প্রায়ই বলতো ধর্মীয় স্বভাবে বিশ্বাস রাখতে। সে আপনাকে তার কংগ্রাচুলেশাস পাঠিয়েছে। কেবল কেইনের জন্যে নয়, বরং আপনার ট্রেডস্টোনের নিজস্ব লোকদের জন্যেও। যেমন ধরেন, ইয়াখট-এর ড্রাইভার। একসময় খুবই উঁচু স্তরের এজেন্ট ছিলো সে।”

জিলেট তার কণ্ঠটা ঝুঁজে পেলো। এটা ফিস্ফিসানি আর আত্নানাদের একটি মিশ্রণ। “এসব কি? তুমি কে?” সে বললো।

“ওহ, আরে পুরনো বন্ধু, এর কোনো দরকার নেই,” অস্ত্র হাতের লোকটা বললো। “আমি মি: অ্যাবোটের মুখের অঙ্গভঙ্গী দেখেই বুঝেছি যে, তোমার ব্যাপারে তার প্রথম দিককার সন্দেহটা যথার্থ। কারোর প্রথম প্রকাশটাই সব সময় বিশ্বাস করা হয়, তাই না অ্যাবোট? আপনার কথাই ঠিক। আমরা আরেকজন অসম্ভব লোককে ঝুঁজে পেয়েছি। আপনাদের সিস্টেমটা এরকম লোক খুব বিপজ্জনক হারেই উৎপাদন ক’রে চলেছে। সে-ই আমাদেরকে মেডুসা ফাইলগুলো দিয়েছে। আর সেই সূত্রেই আমরা বর্নের খোঁজ পেয়েছি।”

“তুমি করছো কি?” জিলেট চিৎকার ক’রে বললো। “তুমি এসব কি বলছো?”

“তুমি খুবই বিরক্তিকর, আলফ্রেড। তবে তুমি সবসময়ই ভালো স্টাফদের একজন ছিলো। তুমি জানো না কোন্ স্টাফ কার সাথে আছে, এটা খুবই খারাপ। তোমার মতো লোকে এটা কখনই করে না।”

“তুমি...” জিলেট মুখ ক’রে নিজের সিট থেকে উঠতে উদ্যত হলো। ইউরোপিয়ান লোকটা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো। লিমোজিনের ভেতরে শব্দটা আরো ভোতা শোনালো। আমলা ভদ্রলোক গড়িয়ে পড়ে গেলো সিটের নিচে। তার পেচার মতো চোখ স্থির হয়ে চেয়ে রইলো শূন্যে।

“আমার মনে হয় না আপনি তার জন্যে শোক প্রকাশ করবেন,” ইউরোপিয়ান লোকটা বললো।

“মনে হয় না,” অ্যাবোট পাল্টা বললো।

“বর্ন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি জানেন। কেইন বেঙ্গমানী করেছে। সে মুখ খুলছে। দীর্ঘ নিরবতার অবসান হয়েছে। মেডুসার মাথার সাপটি ঠিক করেছে এবার নিজেকেই ছোবল মারবে সে। অথবা, হতে পারে সে বিক্রি হয়ে গেছে। এটাও সম্ভব। তাই না? কার্লোস অনেক লোককেই কিনে থাকে, আপনার পায়ের নিচে প’ড়ে থাকা লোকটাও সেরকম একজন।”

“তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না। সেই চেষ্টাও কোরো না।”

“জানার আর কিছু নেই। আমরা এখন সবটাই জানি। ডেন্টা, চার্লি...কেইন। তবে নামগুলো আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা কখনও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। কেবল রয়ে গেলো চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা—যে সিদ্ধান্ত নেয় তাকে সরিয়ে ফেলা। আপনার কথা বলছি। বর্ন ফাঁদে পড়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে সে।”

“সিদ্ধান্ত নেবার আরো অনেক লোক আছে। তাদের নাগাল পাবে সে।”

“যদি সে তা করে, তবে তারা তাকে দেখামাত্রই গুলি করবে। যে লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার চেয়ে ভয়ংকর কিছু আর নেই। সে আপনাদের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে। এ ব্যাপারে কার্লোসের কাছে প্রমাণ রয়েছে। বর্ন আপনাদের লোক। তার উৎসটা মেডুসা ফাইলের আর বাকি সব কিছুর মতোই খুব স্পর্শকাতর।”

বৃদ্ধলোকটা ঞ্চ কুচকালো। সে ভয় পেয়ে গেছে, তার নিজের জীবনের জন্যে নয়, বরং এমনি কিছুর জন্যে যা সীমাহীনভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। “তুমি পাগল হয়ে গেছো,” সে বললো। “কোনো প্রমাণ নেই।”

“এটাই হলো খুঁত, আপনাদের খুঁত। কার্লোস খুবই হিসেবী। তার সদস্যরা যেকোনো গোপনীয় জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। আপনাদের দরকার ছিলো মেডুসার একজন লোককে, যে বেঁচে থাকবে এবং উধাও হয়ে যাবে। আপনি একজন লোককে বেছে নিলেন যার নাম বর্ন, কারণ তার উধাও হওয়ার সব কিছু মুছে ফেলা হবে, প্রতিটি রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হবে—অথবা এরকমটিই আপনি বিশ্বাস করেন। তবে আপনি হ্যানয়ের নিজস্ব ফিল্ড পারসোনেলের কথাটা বিবেচনায় রাখেন নি, যে কিনা মেডুসার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিলো। সেইসব রেকর্ডের অস্তিত্ব আছে। মার্চ ২৫, ১৯৬৮ সালে জেসন বর্নকে এক আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসার তাম কুয়ান-এর জঙ্গলে গুলি ক’রে হত্যা করে।”

সন্ধ্যাসী সামনের দিকে ঝুঁকে এলে আর কিছুই করার থাকলো না। ইউরোপিয়ান লোকটি গুলি ক’রে বসলো।

ব্রাউনস্টোন ভবনটার দরজা খুলে গেলে প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ড্রাইভার লোকটি হাসলো। হোয়াইট হাউজের সহকারী ট্রেডস্টোনে বসবাসরত বৃদ্ধলোকটার সঙ্গে বের হয়ে এলো। এই লোকটাকে তারা

ইয়াখটম্যান ব'লে ডাকে। খুনি জানে এখন প্রাইমারি এলার্মগুলো বন্ধ করা আছে। খুবই অল্প সময় তার হাতে আছে। দরজাটা বন্ধ হতেই এলার্ম সিস্টেমটা আবার সচল হয়ে যাবে।

“আপনাকে এগিয়ে দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে স্যার,” ইয়াখটম্যান তার সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বললো।

“আপনাকেও ধন্যবাদ, স্যার।”

এগুলোই ছিলো এই দু'জন মানুষের বলা শেষ কথা। সিঁড়ির পাশ থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভার পরপর দুটো গুলি করলো। ইয়াখটম্যান দরজার চৌকাঠ ধরে ব'সে পড়লো। হোয়াইট হাউজের লোকটা তার বুকের একপাশ ধরে রেখেছে। সেও দরজার চৌকাঠ ধ'রে কোনোরকম নিজের ভারসাম্য ধ'রে রাখার চেষ্টা করলো। ড্রাইভার ঘুরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে হোয়াইট হাউজের লোকটাকে শক্ত ক'রে ধরে তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দরজার ভেতরে টেনে নিয়ে গেলো। তারপর দরজার ভেতরের দিকের অংশটার দিকে ঘুরলো। সে জানে কি খুঁজতে হবে। সে ওটা পেয়ে গেলো। উপরের তাকের অংশটা দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে। সেখানে একটা মোটা ক্যাবল আছে। দরজাটা বন্ধ ক'রে ক্যাবলটার দিকে তাক ক'রে গুলি চালালো। গুলির শব্দটার অব্যবহিত পরেই স্পিকার থেকে ঘরঘর শব্দ হলো। তারপর স্কুলিসের। সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো। মনিটরগুলোর পর্দা এখন কালো হয়ে গেছে।

সিগনাল দেবার জন্যে সে দরজাটা খুললো। এটার দরকার আছে। ইউরোপিয়ান লোকটা রাস্তা দিয়ে হেটে এসে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ফয়ার আর হলওয়ার দিকে-তাকালো সে। এক সঙ্গে তারা দু'জন ফয়ার থেকে কার্পেটটা তুলে ধরলো। নিচে সিকিউরিটি যন্ত্রটা বসানো আছে। কোনো ব্যাক-আপ এলার্ম সচল হবে না। দু'জনেই জানে যদি আবিষ্কারটা করতে হয়, খুব দ্রুত করতে হবে। উপরতলা থেকে দরজা খোলার শব্দ হলে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। একটা নারী কণ্ঠের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

“ডার্লিং! আমি এইমাত্র খেয়াল করলাম ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি কি সেটা চেক ক'রে দেখবে?” একটু বিরতি। আবার মহিলা বললো, “আচ্ছা, ডেভিডকে কেন বলছো না?” আবারো বিরতি, একেবারে আগের মতোই নিখুঁত টাইমিং। “জেসুইটকে বিরক্ত করো না, ডার্লিং। ডেভিডকে বলো!”

দুটো পদশব্দ। নিরবতা। কাপড় সরানোর শব্দ। ইউরোপিয়ান লোকটি সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য করলো। একটা বাতি নিভে গেলো। ডেভিড। জেসুইট...সন্ন্যাসী!

“মহিলাকে ধরো!” সে ড্রাইভারকে গর্জে বললো। ঘুরে নিজের অস্ত্রটা হলওয়ার শেষপ্রান্তের দরজার দিকে তাক করলে ড্রাইভার সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গেলো। একটা গুলির শব্দ হলো। শক্তিশালী একটা অস্ত্র থেকে—সাইলেন্সারের

ভৌতা কোনো শব্দ নয়। ইউরোপিয়ান লোকটা উপরের দিকে তাকালো। ড্রাইভার লোকটা নিজের কাঁধ ধরে রেখেছে। গলগল ক'রে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। তার পিস্তলটা হাতে ধরা, সিঁড়ির উপরে থেকে কয়েকবার থুথু ফেললো সে।

হলওয়ার শেষপ্রান্তের দরজাটা ধপাস ক'রে খুলে গেলো। তীব্র আতংকে মেজর দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার হাতে একটা ফাইল ফোল্ডার। ইউরোপিয়ান লোকটি দু'বার গুলি চালালো। গর্জন ওয়েব হুমড়ি খেয়ে পেছন দিকে প'ড়ে গেলো। তার গলাটা ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে গেছে, হাত থেকে ফোল্ডারটা ছিটকে পড়লে কাগজপত্রগুলো তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লো। রেইনকোট পরা লোকটা সিঁড়ির দিকে ড্রাইভারের কাছে ছুটে গেলো। উপরের রেলিংয়ে ধূসর চুলের মহিলা মাথায় আর ঘাড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে পড়ে আছে। “তুমি কি ঠিক আছো? তুমি হাটতে পারবে?” ইউরোপিয়ান লোকটি জিজ্ঞাস করলো।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে সায় দিলো। “কুণ্ঠীটা আমার কাঁধের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়েছে। তবে আমি সামলে নিতে পারবো।”

“তোমাকে পারতেই হবে!” আদেশ করলো তার উপরওয়াল। নিজের কোটটা খুলে ফেললো সে। “আমার কোটটা পরে নাও। আমি অ্যাবোটকে এখানে চাই! জলদি!”

“হায় ঈশ্বর!....”

“কার্লোস সন্ন্যাসীকে এখানে চায়!”

আহত লোকটি কোটটা পরে তীব্র যন্ত্রণা নিয়েই সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলো। ইউরোপিয়ান লোকটি তাকে দেখলো। নিশ্চিত হতে চাইছে কাজটা সে করতে পারবে কিনা। সে পারবে। সে একটা ষাড়। সব দিক থেকেই কার্লোসকে সম্ভ্রষ্ট করতে পারে সে। ড্রাইভার ডেভিড অ্যাবোটের মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে আসবে এই ভবনটার ভেতরে, এমনভাবে নিয়ে আসবে যেনো কোনো মাতালকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করা হচ্ছে। তারপর তাকে নিজের রক্তপাত বন্ধ ক'রে আলফ্রেড জিলেটের মৃতদেহটা নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

কার্লোসের লোকজন এরকম কাজ করতে সক্ষম। তারা সবাই ষাড়। অসম্ভ্রষ্ট ষাড়গুলো একজন লোকের মধ্যে নিজেদের জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

ইউরোপিয়ান লোকটি ঘুরে হলওয়ায়ে দিয়ে এগিয়ে চললো। কিছু কাজ করতে হবে। জেসন বর্ন নামের লোকটার চূড়ান্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

আশার চেয়েও এটা বেশি। প্রকাশিত ফাইলগুলো অবিশ্বাস্য। তাতে রয়েছে কল্পনায়ক কেইনের ব্যবহার করা প্রতিটি যোগাযোগের পদ্ধতি আর কোডগুলো। এখন আর তাকে কল্পনায়ক ব'লে মনে হচ্ছে না। কাগজগুলো একসাথে জড়ো করতে করতে ইউরোপিয়ান লোকটা ভাবলো। দৃশ্যগুলো সেট করা হলো।

অভিজাত লাইব্রেরিতে চারটা লাশ সাজিয়ে রাখা হলো। ডেভিড অ্যাবোট একটা চেয়ারে বসা অবস্থায়, তার দু'চোখ খোলা। তাতে তীব্র আতংক। এলিয়ট স্টিভেন্স দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াখটম্যানকে একটা টেবিলের উপরে শোয়ানো হলো। তার হাতে মুখখোলা হুইস্কির একটা বোতল। গর্জন ওয়েব হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে প'ড়ে আছে। তার হাতে তার বৃক্ষকেসটা ধরা।

যেরকম হিংস্রতাই ঘটে থাকুক না কেন, সেটিংটা একেবারে অপ্ৰত্যাশিত কিছুকেই ইঙ্গিত করবে। কথাবার্তার মাঝখানে এলোপাতারি গুলি চালানো হয়েছে। ইউরোপিয়ান লোকটা চামড়ার হাত দস্তানা পরে নিজের শৈল্পিক কাজটা আগ্রহ ভরে দেখে নিলো। আসলেই একটা শৈল্পিক কাজ হয়েছে। সে ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে প্রতিটি দরজার হাতল, নব, চকচক্ করা কাঠের উপরিভাগ মুছে ফেললো। এবার চূড়ান্ত টাচ দেবার সময়। সে একটা টেবিলের কাছে গেলো, যেখানে একটা সিলভার ট্রে'তে ব্র্যান্ডির গ্লাসগুলো রাখা আছে। একটা গ্লাস নিয়ে আলোর কাছে তুলে ধরলো। যেমনটি সে প্রত্যাশা করেছিলো, এটা একেবারে ছাপহীন। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে প্লাস্টিকের ছোট্ট একটা কেস্ বের ক'রে সেখান থেকে একটা স্বচ্ছ টেপের টুকরো বের করলো। সেটাও আলোর সামনে তুলে ধরলো। এই তো আছে, একেবারে ছবির মতোই পরিষ্কার—এগুলো যেকোনো ছবির মতোই অকাটা।

এগুলো নেয়া হয়েছে জুরিখের গেইমেনশেফট ব্যাংকের অফিসের একটা পেরিয়ারের গ্লাস থেকে। এগুলো জেসন বর্নের ডান হাতের আঙুলের ছাপ। ইউরোপিয়ান লোকটি সেই স্বচ্ছ টেপটা গ্লাসে চেপে ধরলো, তারপর আশ্বে ক'রে সেটা তুলে ফেললো। আশ্বে সে গ্লাসটা আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলো। ছাপটা নিখুঁতভাবে গ্লাসে লেগে গেছে।

সে গ্লাসটা এক কোণে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে আশ্বে ক'রে ফেলে দিলো। হাটু মুড়ে ব'সে গ্লাসের ভাঙা টুকরোগুলো দেখলো। কয়েকটা সরিয়ে, বাকিগুলো কার্পেটের নিচে রেখে দিলো।

এগুলোই যথেষ্ট।

অধ্যায় ২১

“এবার,” বর্ন বিছানায় সুকেসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, “এখান থেকে আমাদেরকে চলে যেতে হবে।”

মেরি চেয়ারে ব’সে আছে। সে সংবাদপত্রের আর্টিকেলটা থেকে কয়েকটি অংশ বেছে নিয়ে সেগুলো আবারো পড়লো। তার মনোযোগ একবারেই নিখুঁত। সে গোথ্রাসে গিলছে, নিজের বিশ্লেষণের ব্যাপারে আরো বেশি আস্থাশীল হচ্ছে।

“আমার কথাই ঠিক, জেসন। কেউ আমাদেরকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে।”

“এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। আমরা এখানে অনেকক্ষণ ধরে আছি। এক ঘণ্টার মধ্যে এই পত্রিকাটি হোটেলের সবার কাছেই পৌঁছে যাবে। আর সকালের পত্রিকাটা তো হবে আরো খারাপ। হেলাফেলা করার সময় এখন নয়। হোটেল লবিতে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে, তোমাকে অনেকেই দেখেছে। তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও।”

মেরি উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু নড়লো না। তার বদলে সে আবারো নিজের জায়গায় ব’সে পড়লো, তাকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করলো সে। “আমরা পরে অনেক কিছু নিয়েই কথা বলবো,” দৃঢ়ভাবে বললো সে। “তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে জেসন, আমি জানতে চাচ্ছি কেন?”

“বলেছি তো, তোমাকে সেটা বলবো,” সে কোনো রকম দেরি না করেই জবাব দিলো, “কারণ, আমিও মনে করি তোমাকে এটা জানতে হবে, বুঝলো!”

সে চোখ দুটো পিট পিট করলো। তার আচম্কা রাগে একটু অবাকই হয়েছে সে। “হ্যাঁ, অবশ্যই,” ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো সে।

তারা লবিতে অবস্থিত লিফটে ঢুকলো। মার্বেলের ফ্লোরটা দৃষ্টিতে এলে বর্নের মনে হলো তারা একটা খাঁচায় আছে। তাদেরকে সবাই দেখে ফেলছে, তাদের অবস্থা খুবই নাজুক। লিফট থামলেই তারা ধরা পড়ে যাবে। তারপরই বুঝতে পারলো কেন তার এরকম তীব্র অনুভূতি হচ্ছে। নিচের বাম দিকে একটা ফ্রন্টডেস্ক আছে। দ্বাররক্ষী ঠিক তার পেছনেই বসা। তার ডান পাশে রয়েছে একগাদা সংবাদপত্র। তাদের কাছে যে সংবাদপত্রটি আছে ওখানেও সেটা রয়েছে। দ্বাররক্ষী একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে পড়ছে আর টুথপিক দিয়ে নিজের দাঁত খোঁচাচ্ছে। তার মনোযোগ সবকিছু বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক কেলেকারীটার দিকেই যে ধাবিত হবে সেটা নিশ্চিত।

“সোজা হেটে যাবে,” জেসন বললো। “থামবে না, সোজা দরজার দিকে চলে যাবে। আমি বাইরে তোমার সাথে দেখা করবো।”

“হায় ঈশ্বর,” দ্বাররক্ষীকে দেখে বললো মেরি।

“যতো দ্রুত সম্ভব আমি তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেবো।”

মেরির হিলের শব্দটা জেসন কোনোভাবেই কামনা করছে না। জেসন দ্বাররক্ষীর সামনে আসতেই লোকটা মুখ তুলে তাকালে জেসন তার দৃষ্টিপথ আটকে দাঁড়ালো।

“খুব ভালো সময় কেটেছে,” সে ফরাসিতে বললো, “তবে আমার খুব তাড়া আছে, আজরাতে আমাকে গাড়ি চালিয়ে লিওঁতে যেতে হবে। মোট বিলের সাথে এই পাঁচশো ফ্রাঁও রাখেন। বোনাস রেখে যাওয়ার মতো সময় আমার নেই।”

এই অর্থনৈতিক টোপটা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করলো। দ্বাররক্ষী খুব দ্রুত বিলটা হাজির করলো। জেসন টাকা দিয়ে উপুড় হয়ে সুকেসটা নিতে যেতেই দ্বাররক্ষীর মুখ থেকে বের হওয়া অস্ফুট একটা শব্দ শুনে তাকালো। লোকটা তার ডান পাশে স্থপন করা সংবাদপত্রে মেরির ছবিটার দিকে চেয়ে কাঁচের দরজাটার দিকে আবার তাকালো। মেরি বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বিস্মিত দৃষ্টি এবার বর্নের দিকে ফিরলো। তাদের চোখাচোখি হলে লোকটা আচমকা ভয় পেয়ে গেলো।

জেসন সোজা কাঁচের দরজাটার দিকে চলে গেলো। কাঁধ দিয়েই সেটা ধাক্কা মেরে খুলে পেছনের ডেস্কের দিকে তাকালো। দ্বাররক্ষীটি টেলিফোন ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে।

“চলো!” সে মেরিকে চিৎকার ক’রে বললো। “একটা ক্যাব দ্যাখো!”

তারা হোটেল থেকে পাঁচ ব্লক দূরে ঝুই লেকুর্বে এসে একটা পেলো। বর্ন একজন অনভিজ্ঞ আমেরিকান পর্যটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ভাঙা ভাঙা ফরাসি ব্যবহার করলো যেটা তাকে ভালোয়্যা ব্যাংকে বেশ সাহায্য করেছিলো। সে ড্রাইভারকে বোঝালো যে, সে আর তার পেতিত এমি সেন্ট্রাল প্যারিস থেকে দূরে কোথাও নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন সময় কাটাতে চাচ্ছে। হয়তো ড্রাইভার তাদেরকে সেরকম কয়েকটা জায়গার সন্ধান দিতে পারবে।

ড্রাইভার তাই করলো। “একটা ছোট্ট পাখি নিবাস আছে, সেটা লে মলিনোয়া’র বাইরে। নামটা হলো লা মেইসোয়া কোয়ারি,” সে বললো। “আরেকটা আছে আইভরি সুরসিয়া’তে, আপনি হয়তো সেটা পছন্দ করবেন। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি, মঁসিয়ে। অথবা মঁক্রজের অবার্জ দু কোয়েঁ। ওটা খুবই চমৎকার।”

“তাহলে প্রথম জায়গাটাতাই নিয়ে চলুন,” জেসন বললো। “এটাই তো আপনার প্রথম মনে এসেছে। কতোক্ষণ লাগবে?”

“পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না, মঁসিয়ে।”

“ভালো।” বর্ন মেরির দিকে চেয়ে নিচু কণ্ঠে বললো, “তোমার চুলটা বদলে ফেলো।”

“কি?”

“চুলটা বদলে ফেলো। খোপা ক’রে নাও, অথবা পেছনের দিকে টেনে রাখো। যাইহোক, এরকম কিছু একটা করো। পাশের আয়নাটা দিয়ে দেখে নাও। জলদি!”

কিছুক্ষণ পরে লম্বা দীর্ঘ চুলগুলো একেবারে টেনে পেছনে নিয়ে যাওয়া হলো । মাথার পেছনে একটা রাবার দিয়ে খোপার মতো ক'রে বেঁধে রাখা হলো চুলগুলো । জেসন তার দিকে মৃদু আলোতে তাকালো । “তোমার লিপস্টিকটা মুছে ফেলো । সবটা ।”

সে একটা টিসু নিয়ে মুছে ফেললো । “ঠিক আছে?”

“হ্যা । তোমার কাছে কি কোনো আই ক্র পেনসিল আছে?”

“অবশ্যই ।”

“তোমার ক্রগুলো মোটা ক'রে নাও । একটু । আধ ইঞ্চির মতো বাড়িয়ে নাও । শেষ প্রান্তটি একটু বাকিয়ে দিও ।”

আবারো সে তার কথামতো কাজ করলো । “এবার?” মেরি জানতে চাইলো ।

“ভালো,” তাকে ভালো ক'রে দেখে সে জবাব দিলো । পরিবর্তনটা খুব সামান্য হলেও বেশ কার্যকরী । মেরি একজন নরম শান্ত মেয়ে থেকে উগ্র আর কর্কশ নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো । অন্ততপক্ষে সংবাদপত্রে ছাপা হওয়া ছবির সাথে কেউ তাকে প্রথম দেখায় মেলাতে পারবে না । আর এটাই হলো আসল কথা ।

“আমরা যখন মউলিনিয়ঁ’তে পৌঁছাবো,” সে নিচুস্বরে বললো, “জলদি বের হয়ে যাবে । ড্রাইভার যেনো তোমাকে দেখতে না পায় ।”

“একাজ করার জন্যে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে না?”

“যা বলছি কেবল তাই করো ।”

আমার কথা শোনো, মেয়ে । আমি ইলাম বহুরূপি, যার নাম কেইন, যেসব জিনিস তোমাকে শেখানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই সে সব জিনিস আমি তোমাকে শেখাতে পারবো । আমি আমার রঙ বদলে ফেলতে পারি যেকোনো পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে । আমি গন্ধ শুকে বাতাস চিনে ফেলতে পারি । আমি মানুষের তৈরি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিজের পথ খুঁজে নেবো । আলফা, ব্রাভো, চার্লি, ডেল্টা...ডেল্টা’তে চার্লি আর চার্লিতে কেইন । আমি কেইন । আমি মৃত্যু । তোমাকে আমার অবশ্যই বলতে হবে আমি কে, আর সেটা বললেই তোমাকে আমি হারাবো ।

“ডার্লিং, কি দেখছো?”

“কি?”

“তুমি আমার দিকে চেয়ে আছো । তুমি শ্বাস নিচ্ছে না । তুমি কি ঠিক আছো?”

“দুঃখিত,” অন্য দিকে তাকিয়ে সে বললো । “আমি আমাদের পরিকল্পনাটা নিয়ে ভাবছি । ওখানে যাবার পর আমি কি করবো সেটা ভালো ক'রে আমাকে জানতে হবে ।”

তারা পাশ্চ নিবাসে এসে পৌঁছালো । ডান দিকে একটা পার্কিংলট আর বেড়া দেয়া আছে । দেরি ক'রে ডিনার করতে আসা কয়েকজন লোক এসেছে । বর্ন একটু সামনে ঝুঁকে দেখলো ।

“আমাদেরকে পার্কিং এলাকায় নামিয়ে দাও,” ড্রাইভারকে সে বললো ।

“ঠিক আছে, মঁসিয়ে,” ড্রাইভার বললো ।

বৃষ্টিটা এখন কুয়াশার মতো হয়ে গেছে । গাড়িটা চলে গেলে বর্ন আর মেরি পাস্থ নিবাসের পাশে একটা বোঁপের দাঁড়িয়ে রইলো যতোক্ষণ না গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো । জেসন সুকেসটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো ।

“অপেক্ষা করো এখানে,” বর্ন বললো ।

“তুমি কোথায় যাচ্ছে?”

“একটা ট্যাক্সির জন্যে ফোন করতে ।”

দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা তাদেরকে মঁতেরুজ জেলায় নিয়ে গেলো । এই ড্রাইভার তাদের দু’জনকে দেখে মোটেও খুশি হচ্ছে না । মফস্বল থেকে আসা কোনো দম্পতি সস্তা কোনো লজ খুঁজছে । সে যদি পত্রিকা তুলে এক ফরাসি-কানাডিয়ান মেয়ের ছবিসহ খবরটা পড়ে, যাতে জুরিখে তিনটি খুনের সাথে তাকে জড়িয়ে খবর দেয়া হয়েছে, তারপরও সে তার গাড়ির পেছনের সিটে বসা মেয়েটাকে দেখে চিনতে পারবে না ।

যে রকম ভাবা হয়েছিলো অবার্জ দু কোয়ঁ সেরকম নয় মোটেও । এটা কোনো গ্রাম্য পাস্থ নিবাসের মতো দেখতে নয় । বরং, এটা একটা বড়সড় ফ্ল্যাট, মহাসড়কের সিকি মাইল দূরে অবস্থিত । এখানে টাকার বিনিময়ে অতিথিদের পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে । মিথ্যে নাম পরিচয় দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাটা সম্ভব হবে ব’লে ধরে নেয়া যায় ।

তারা ভুয়া নামে রেজিস্ট্রেশন করলে তাদেরকে একটা সস্তা রুম দেয়া হলো যেখানকার আসবাবগুলো বিশ ফ্রাঁর উপরে হবে না । দেয়ালগুলো নিম্নমানের ফরমিকা দিয়ে মোড়ানো । এই জায়গাটার একমাত্র ইতিবাচক দিকটি হলো নিচের হল ঘরে একটা আইসমেশিন আছে । তারা জানে মেশিনটা কাজ করছে, কারণ দরজা বন্ধ হবার পরও তারা এটার ঘর্ঘর্ শব্দটা শুনতে পাচ্ছে ।

“ঠিক আছে । এবার বলো, কে আমাদেরকে মেসেজ পাঠাচ্ছে?” বর্ন জানতে চাইলো । তার হাতে হুইস্কির গ্লাস ।

“আমি যদি জানতাম তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম,” একটা ছোট্ট ডেস্ক চেয়ারে ব’সে মেরি বললো । জেসনকে খুব ভালো ক’রে দেখছে সে । “এটার সাথে তুমি কেন এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার কানেকশান থাকতে পারে ।”

“যদি তাই হয়ে থাকে তবে এটা একটা ফাঁদ ।”

“এটা কোনো ফাঁদ নয় । এপফেলের মতো একজন লোক এরকম কোনো ফাঁদ পাততে পারে না ।”

“আমি অবশ্য এ ব্যাপারে অতোটা নিশ্চিত নই,” বর্ন প্লাস্টিকের একটা চেয়ারে ব’সে বললো । “কোয়েনিগ করেছে । সে আমাকে ওখানকার ওয়েটিং রুমে দেখেছে ।”

“সে একজন ঘুষখোর ফুট সোলজার, ব্যাংকের কোনো অফিসার নয় । সে একা একাই কাজ করে । এপফেল তা করে না ।”

জেসন মুখ তুলে তাকালো । “কি বলতে চাচ্ছে?”

“এপফেল’র বক্তব্যটা তার উপরওয়ালার নির্দেশেই দেয়া হয়েছে । সেটা ব্যাঙ্কের নামে করা হয়েছে ।”

“তুমি যদি নিশ্চিত হও তবে চলো জুরিথে ফোন করি ।”

“তারা সেটা চায় না । হয় তাদের কাছে কোনো জবাব নেই, নয়তো তারা সেটা দেবে না । এপফেলের শেষ কথাটা ছিলো, তার আর এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই । এটাও মেসেজটার একটা অংশ । আমাদেরকে অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করতে হবে ।”

বর্ন মদে চুমুক দিলো । তার এলকোহলের দরকার আছে । কিছুক্ষণ পরেই তাকে কেইন নামের একজন খুনির গল্প বলতে হবে । “তাহলে আমরা কাছে ফিরে যাচ্ছি?” সে বললো । “সেই ফাঁদে আবার ফিরে যাচ্ছি ।”

মেরি ডেস্ক থেকে সিগারেট তুলে নিলো । “তুমি মনে করছো তুমি জানো কে, তাই না? এজন্যেই তুমি পালাচ্ছো, না?”

“দুটো প্রশ্নের জবাব হলো, হ্যাঁ ।” সময় এসে গেছে । মেসেজটা পাঠিয়েছে কার্লোস । আমি হলাম কেইন আর তোমাকে আমার ছেড়ে চলে যেতে হবে । আমি তোমাকে হারাবো । তবে প্রথমে জুরিখ আর তোমাকেও সেটা বুঝতে হবে । “এ আর্টিকেলটা আমাকে খুঁজে বের করার জন্যে লেখা হয়েছে ।”

“এটা নিয়ে আমি তোমার সাথে তর্ক করবো না,” মেরি বললো । কথার মাঝখানে কথা বলাতে বর্ন একটু অবাকই হলো । “ভাবার মতো সময় আমার আছে । তারা জানে এভিডেন্সটা ভূয়া—একেবারেই হাস্যকর । জুরিখ পুলিশ আশা করে আমি এক্সুগি কানাডিয়ান অ্যান্ধাসির সাথে যোগাযোগ করি—” মেরি থামলো । তার হাতের সিগারেটটা জ্বালানো হয় নি । “হায় ঈশ্বর, জেসন, তারা তো সেটাই চায়, আমরা যেনো সেটাই করি!”

“কে চায়?”

“যে আমাদের কাছে মেসেজটা পাঠিয়েছে । তারা জানে এ্যান্ধাসিতে ফোন না ক’রে আমার আর কোনো উপায় থাকবে না । কানাডিয় সরকারের আশ্রয়ে যেতে হবে । আমি এই কথাটা ভাবি নি তার কারণ আমি ইতিমধ্যেই এ্যান্ধাসিতে ফোন করেছি ডেনিস করবেলিয়া নামের একজনের কাছে । আর তার কাছে বলার মতো কিছুই ছিলো না । সে কেবল তাই করেছে যা আমি বলেছি । আর কিছু না । তবে সেটা ছিলো গতকালকের, আজকের নয় ।” মেরি বিছানার পাশের টেবিলের দিকে গেলো ।

বর্ন চেয়ার থেকে দ্রুত উঠে তার হাতটা ধ’রে ফেললো । “এটা করো না,” বেশ জোর দিয়ে সে বললো ।

“কেন নয়?”

“কারণ তোমার ধারণা ভুল।”

“আমার ধারণাই ঠিক, জেসন! আমাকে সেটা প্রমাণ করতে দাও।”

বর্ন তার সামনে এসে দাঁড়ালো। “আমার মনে হয় আমি যা বলি সেটাই তোমার শোনা উচিত।”

“না!” সে চিৎকার করে বললে মেরি একটু চমকে উঠলো। “আমি সেটা এখন শুনতে চাই না। এখন নয়!”

“একঘণ্টা আগে প্যারিসে তুমি কেবল এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিলে। শোনো বলছি!”

“একঘণ্টা আগে আমি ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম। তুমি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। আমি জানি এটা থামানো না গেলে তুমি বারবার এরকম করবে। তুমি কিছু কথা শোনো, ছবি দেখো, টুকরো টুকরো ঘটনা তোমার মনে পড়ে যা তুমি বোঝো না। তুমি কেবল নিজেকে দুশ্চিন্তে। তুমি কি, কে, এটা কেউ প্রমাণ করার আগপর্যন্ত তুমি শুধু নিজেকেই দুশ্চিন্তে... অন্যেরা তোমাকে ব্যবহার করছে, যারা তোমাকে বলির পাঠা বানাবে। তবে এমন কেউও তো আছে যে তোমাকে সাহায্য করতে চায়, আমাদেরকে সাহায্য করতে চায়। এটাই হলো মেসেজটা! আমি জানি আমার কথাই ঠিক। আমি সেটা তোমার কাছে প্রমাণ করতে চাই। আমাকে সেটা করতে দাও!”

বর্ন মেরির হাতটা ধরে চুপ করে রইলো। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। তার চমৎকার মুখটা যন্ত্রণা আর অর্থহীন আশায় পূর্ণ। তার চোখে আকুলতা। তবে তাদের জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমি হলাম কেইন... “ঠিক আছে, তুমি ফোন করতে পারো। তবে সেটা হতে হবে আমার কথা মতো।” সে তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে অবার্জ দু কোয়ে’র ফ্রন্টডেস্কে ফোন করলো। “ক্রম ৩৪১ থেকে বলছি। আমি এইমাত্র প্যারিসে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেলাম। তারা কিছু দিনের জন্যে আমাদের সাথে যোগ দিতে এখানে আসছে। নিচের হলে কি তাদের জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করা যাবে? চমৎকার। তাদের নাম হলো বৃগস্, এক আমেরিকান দম্পতি। আমি নিচে এসে অগ্রিম টাকা পরিশোধ করে যাচ্ছি, ঘরের চাবিটা আমাকে দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, দারুণ। ধন্যবাদ আপনাকে।”

“তুমি করছো কি?”

“তোমার কাছে একটা কিছু প্রমাণ করতে,” সে বললো। “আমাকে একটা পোশাক দাও,” সে আবার বললো। “সবচেয়ে লম্বা যেটা আছে তোমার কাছে।”

“কি?”

“তুমি যদি তোমার ফোনটা করতে চাও তো আমি যা বললাম তাই করো।”

“তুমি পাগল হয়ে গেছো।”

“আমি সেটা মানছি,” সে বলেই সুটকেস থেকে প্যান্ট আর শার্ট বের করলো।
“পোশাকটা দাও তো, প্রিজ।

পনেরো মিনিট বাদে, ৩৪১ নাম্বার ঘর থেকে ছয় দরজা পরে, মি: আর মিসেস বৃগসের ঘরটা প্রস্তুত হয়ে গেলো। জামাকাপড়গুলো ঠিকমতো রাখা হয়েছে। বেছে নেয়া কিছু বাতি জ্বালিয়ে রাখা হলো, বাকিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক ক’রে জেসন তাদের ঘরে ফিরে এলো। মেরি টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। “সেট ক’রে ফেলেছি।”

“তুমি কি করেছো?”

“যা আমি করতে চেয়েছি। যা আমাকে করতে হতো। এখন তুমি তোমার ফোনটা করতে পারো।”

“দেরি হয়ে গেছে। ধরো সে নেই, তাহলে?”

“আমার মনে হয় সে থাকবে। না থাকলে তারা তোমাকে তার বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবে। আটোয়ার টেলিফোন লগে তার নাম আছে। থাকারই কথা।”

“আমারও তাই মনে হয়।”

“আমি তোমাকে কি বলেছি সেটা কি তোমার মনে আছে?”

“হ্যা, তবে এটা কোনো ব্যাপার নয়, এটা প্রাসঙ্গিকও নয়। আমি জানি আমার ধারণা ভুল নয়।”

“আমরা সেটা দেখবো। কেবল আমি যা বললাম তা বলো। আমি তোমার পাশে থেকে তোমার কথা শুনছি। ফোন করো।”

মেরি ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলো। সাত সেকেন্ড পরেই সে এ্যাম্বাসিতে লাইন পেয়ে গেলো। ওপাশ থেকে ডেনিস করবেলিয়ার কণ্ঠটা শোনা গেলো। রাত সোয়া এগারোটা বেজে গেছে।

“ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তুমি কোথায়?”

“তাহলে তুমি আমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিলে?”

“আমি তোমার ফোনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। এই জায়গাটা একেবারে হট্টগোলে পূর্ণ হয়ে আছে। আজকের বিকেল পাঁচটা থেকে আমি এখানে অপেক্ষা করছি।”

“এ্যালানও তাই করেছিলো। অটোয়াতে।”

“এ্যালান কে? তুমি কি বলছো? তুমি আছো কোথায়?”

“প্রথমে আমি জানতে চাইবো তুমি আমাকে কি বলবে।”

“বলবো?”

“তোমার কাছে আমার জন্যে একটা মেসেজ আছে, সেটা কি?”

“কি মেসেজ?”

মেরির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। “জুরিখে আমি কোনো খুন করি নি। আমি...”

“তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, এখানে আসো! আমরা তোমাকে সব ধরনের নিরাপত্তা দেবো। এখানে তোমাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।”

“ডেনিস, আমার কথা শোনো! তুমি আমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিলে, করছিলে না?”

“হ্যা, অবশ্যই।”

“কেউ তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে, তাই না?”

কোনো সাড়া শব্দ নেই। কিন্তু করবেলিয়া যখন কথা বললো তখন তার কণ্ঠটা একটু শান্ত শোনালো। “হ্যা, সে বলেছে। তারা বলেছে।”

“তারা তোমাকে কি বলেছে।”

“তোমার এখন আমাদের সাহায্যের দরকার আছে। খুবই দরকার।”

মেরি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “তারা আমাকে সাহায্য করতে চায়?”

“আমাদের মাধ্যমে,” করবেলিয়া জবাব দিলো, “তুমি বলছো সে তোমার সাথেই আছে, তাহলে?”

বর্নের মুখটা তার কাছই ছিলো। সে কান পেতে করবেলিয়ার কথা শুনছে। মাথা নেড়ে সাই দিলো সে।

“হ্যা,” সে জবাব দিলো। “আমরা একসাথেই আছি, তবে সে কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে গেছে। এটা মিথ্যে। তারা তোমাকে সেটাই বলেছে, তাই না?”

“তারা যা বলেছে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে, রক্ষা করতে হবে। তারা তোমাকে সাহায্য করতে চায়। তারা তোমার জন্যে একটা গাড়ি পাঠাতে চাচ্ছে। আমাদের কূটনৈতিকদের একটি গাড়ি।”

“তারা কারা?”

“তাদেরকে আমি নামে চিনি না। চেনার কথাও নয়। তবে আমি তাদের র‍্যাঙ্ক জানি।”

“র‍্যাঙ্ক?”

“স্পেশালিস্ট, এফএস-ফাইভ। এরচেয়ে বেশি তুমি জানতে পারো না।”

“তুমি তাদেরকে বিশ্বাস করো?”

“হায় ঈশ্বর, হ্যা! তারা অটোয়ার মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে। তাদের অর্ডারগুলো এসেছে অটোয়া থেকে।”

“তারা এখন এম্বাসিতে আছে?”

“না, তারা বাইরে আছে।” করবেলিয়া থামলো। “হায় ঈশ্বর, তুমি কোথায় আছো, মেরি?”

বর্ন আবারো মাথা নাড়লে মেরি কথা বললো। “আমরা মট্রুজের অবার্জ দু কোয়েঁতে আছি। বৃগস্ নামে।”

“আমি এক্ষুণি তোমার জন্যে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

“না, ডেনিস!” মেরি বাঁধা দিয়ে বললো। জেসনের দিকে তাকালে সে তাকে তার নির্দেশ মতো কথা চালিয়ে যেতে ইশারা করলো।

“সকালে পাঠিও। খুব সকালে—এখন থেকে চার ঘণ্টা পরে।”

“আমি সেটা করতে পারবো না! তোমার নিজের ভালোর জন্যেই।”

“পারতেই হবে। তুমি বুঝতে পারছো না। সে ফাঁদে পড়ে গেছে। খুব ভয়ে আছে। এখন পালাতে চাইছে। সে যদি জানে আমি তোমাকে ফোন করেছি তবে সে এখনই পালাবে। আমাকে একটু সময় দাও। আমি তাকে ধরা দেবার জন্যে রাজি করতে পারবো। সে খুবই বিভ্রান্তির মধ্যে আছে, তবে সে জানে আমার কথাই ঠিক।” মেরি কথাটা বলেই বর্নের দিকে তাকালো।

“লোকটা কি ধরণের বানচোত?”

“খুবই ভয়ংকর রকমের,” মেরি জবাব দিলো। “এমন একজন যার ব্রেইন ওয়াশ করা হয়েছে। আমার সময়ের দরকার। আমাকে সেটা দাও।”

“মেরি...?” করবেলিয়া থেমে গেলো। “ঠিক আছে, সকালের প্রথম দিকে। ধরো ... ছয়টা বাজে। আর মেরি, তারা কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে চায়। তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।”

“আমি জানি। গুডনাইট।”

মেরি ফোনটা রেখে দিলো।

“এখন আমরা অপেক্ষা করবো,” বর্ন বললো।

“আমি জানি না তুমি কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে। সে অবশ্যই এফএস-ফাইভকে ডাকবে, আর তারাও এখানে এসে হাজির হবে। তুমি কি আশা করো? সে কি করবে, কি করার কথা ভাবছে, সেটা তোমাকে বলবে।”

“এই সব এফএস-ফাইভ কূটনৈতিকরাই আমাদের কাছে মেসেজটা পাঠিয়েছে?”

“আমার ধারণা যারা মেসেজটা পাঠিয়েছে তারা আমাদেরকে তাদের কাছেই নিয়ে যাবে। অথবা যারা পাঠিয়েছে তারা যদি খুব বেশি দূরে থাকে তাহলে আমাদেরকে তাদের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেবে। আমি আমার পেশাদারি জীবনে এরকম নিশ্চিত আর কখনই ছিলাম না।” বর্ন তার দিকে তাকালো। “আমি আশা করি তোমার কথাই ঠিক, কারণ তোমাকে নিয়েই আমার যতো চিন্তা। যদি তোমার বিরুদ্ধে জুরিখের এভিডেন্সগুলো কোনো মেসেজের অংশ না হয়ে থাকে, যদি এটা আমাকে খুঁজে বের করার জন্যে করা হয়ে থাকে—জুরিখ পুলিশ যদি এটা বিশ্বাস করে—তাহলে করবেলিয়াকে এইমাত্র তুমি যে বললে আমি একজন ভয়ংকর মানুষ, আমি ঠিক সেটাই হবো। আমার চেয়ে আর কেউ চায় না তোমার কথাটা ঠিক হোক। তবে আমার মনে হয় না, তোমার কথা ঠিক।”

দুটা বেজে তিন মিনিট পরে, মোটেলের করিডোরের লাইটটা ফটকাতে ফটকাতে নিভে গেলে দীর্ঘ হলওয়াটে একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। সিঁড়ি ঘরের ফাকফোকরগুলোই এখন একমাত্র আলোর উৎস। বর্ন তাদের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো, তার হাতে পিস্তল, ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে করিডোরটা দেখলো সে। মেরি তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালো, কেউ কোনো কথা বলছে না।

পায়ের শব্দগুলো ভোঁতা কিন্তু শোনা যাচ্ছে। খুব সতর্ক আর হিসেব করে দু'জোড়া পা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই, ডিমলাইটের আলোতে দু'জন লোকের অবয়ব দেখা গেলো। মেরি অজান্তেই চাপা একটা আত্নানাদ করলে জেসন তার মুখটা চেপে ধরলো। মেরি দু'জনের মধ্যে যেকোনো একজনকে চিনতে পেরেছে। যে মানুষটাকে সে কেবল একবারই দেখেছিলো। জুরিখের স্টেপডেকস্ট্রাসে, আরেকজন লোক তার মৃত্যুদণ্ড দেবার আদেশ করার ঠিক আগে। এটা হলো সেই সোনালি চুলের লোকটা, যাকে বর্নের রুমে পাঠানো হয়েছিলো। এখন এই বদমাশটাকে পাঠানো হয়েছে তার হাত ফস্কে যাওয়া টার্গেটটাকে চিহ্নিত করার জন্যে। তার বাম হাতে ছোট্ট একটা পেন্সিল লাইট, ডান হাতে লম্বা নলের একটা অস্ত্র, সাইলেন্সার লাগানো।

তার সঙ্গীটি ছোটোখাটো। অনেক বেশি শক্তসামর্থ্য, তার হাটা অনেকটা শিকারী পশুদের মতো। তার উপকোটের বুকের অংশটা খোলা। তার মাথাটা একটা টুপির কারণে ঢেকে আছে। মুখটা তাই পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। বর্ন সেই লোকটার দিকে তাকালো। তাকে খুব চেনা চেনা লাগছে তার। তার হাটা, মাথার ভঙ্গী। সেটা কি? কি? সে তাক্কে চেনে।

তবে ভাবার মতো সময় এখন নেই। লোক দুটো মি: আর মিসেস বৃগসের জন্যে রিজার্ভ করা ঘরটার দিকে এগোচ্ছে। সোনালী চুলের লোকটা দরজায় লেখা নাম্বারটার ওপর পেন্সিল লাইটটা ধরলো। তারপরই নব্বু আর লকটার দিকে আলো ফেললো।

এরপর যা ঘটলো তা তাকে অবাকই করলো। ছোটোখাটো লোকটা হাতে একটা চাবির রিং নিয়ে টর্চের আলোতে তুলে ধ'রে সঠিক চাবিটা বেছে নিলো। তার ডান হাতে সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্রটা যে ভারি ক্যালিবারের সেটা বর্ন বুঝতে পারলো। এই অস্ত্রটা অনেকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান গেস্টাপো বাহিনীর ব্যবহার করা লুগার পিস্তলের মতো। এর বুলেট স্টিল আর কংক্রিট ভেদ করতে পারে। এটার শব্দ এতোটাই ভোঁতা আর মৃদু হবে যে, টার্গেট বুঝতেই পারবে না তাকে গুলি করা হয়েছে। আশেপাশের কেউ তো টেরই পাবে না।

বেটে লোকটা চাবি ঢুকিয়ে আশেপাশে নিঃশব্দে ঘোরালো। তারপর অস্ত্রটা লকের দিকে তাক্ ক'রে পর পর তিনটি গুলি করলো। নিঃশব্দ গুলি। কেবল একটু

আলো হলো। লকটার চারপাশের কাঠ গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলে দরজাটা খুলে গেলে দু'জন খুনি বিদ্যুৎ বেগে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

একটু নিরবতা, তারপরই ভোঁতা একটা গুলির শব্দ হলো অন্ধকারেই। দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দেয়া হলেও বন্ধ হলো না। ভেতর থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ হলো। অবশেষে একটা বাতি খুঁজে পেয়ে জ্বালানো হলো অল্প সময়ের জন্যে, তারপরই একটা ল্যাম্প মেঝেতে ছুড়ে ফেলে হলে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। একজন ভয়ানক মানুষের অস্ফুট আর্তনাদ।

খুনি দু'জন হুড়মুড় ক'রে বের হয়ে এলো অস্ত্র দুটো তুলে ধরে। তাদের চোখেমুখে বিস্ময় আর ফাঁদে পড়ার আতংক। ভেতরে কেউ নেই। তারা সিঁড়ির কাছে যেতেই এইমাত্র হানা দেয়া ঘরটার পাশের ঘরের দরজাটা একটু খুলে গেলে একজন গেস্ট চোখ পিট পিট করতে করতে বের হয়ে এলো। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেতরে চলে গেলে অন্ধকার হলওয়ে জুড়ে আবারো নিরবতা নেমে এলো।

বর্ন ঠায় দাঁড়িয়ে মেরি সেন জ্যাককে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মেয়েটা কাপঁছে, তার মাথা জেসনের বুকে। অবিশ্বাসে অনেকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে গেছে সে। জেসন আরো কয়েকটা মিনিট পার করলো যাতে মেরির কাঁপুনিটা একটু কমে গিয়ে সে ধাতস্থ হয়। সে আর অপেক্ষা করতে পারলো না। মেরিকে নিজের চোখেই দেখতেই হবে ঘটনাটা। অবশেষে সে বুঝতে পারবে। আমি হলাম কেইন। আমি হলাম মৃত্যু।

“আসো,” সে নিচু কণ্ঠে বললো।

তারা দু'জন একসঙ্গে ভাঙা দরজাটা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মেরি নির্বাক দাঁড়িয়ে রাইলো। দৃশ্যটা একই সঙ্গে তিস্ত আর হতবুদ্ধিকর। ঘরের ভেতর ডান দিকে মৃদু আলোতে একটা আবছা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। এটার পেছনের বাতিটা খুবই মৃদু আলোর তাই কেবল অবয়বটার আউটলাইনই দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাবার পর বোঝা গেলো অবয়বটা লম্বা গাউন পরা এক মেয়ের। কাপড়টা খোলা জানালা দিয়ে আসা বাতাসের কারণে একটু দুলছে।

জানালা। তার পাশে আরেকটা অবয়ব। সেটাও বাতাসে একটু আধটু নড়ছে।

“ওহ্ ঈশ্বর,” মেরি বললো। সে বরফের মতো জমে আছে। “বাতি জ্বালাও, জেসন।”

“কোনোটাই কাজ করছে না,” সে জবাব দিলো। “কেবল দুটো টেবিল ল্যাম্প; তারা একটা ভেঙে ফেলেছে।” সে অন্য ল্যাম্পটা খুঁজতে লাগলো। সেটা পাশের দেয়াল ঘেষে মেঝেতে পড়ে আছে। সে ওটা তুলে জ্বালালে মেরি কেঁপে উঠলো।

বাথরুমের দরজার সামনে মেরির গাউনটা একটা আঙুটার সাহায্যে টাঙানো আছে। সেটা বুলেটে ফুঁটো হয়ে গেছে। জানালার পাশে, বর্নের শার্ট আর প্যান্টটা জানালার ফ্রেমের সাথে আঁটকে রাখা হয়েছে এমনভাবে যেনো কোনো মানুষ

দাঁড়িয়ে আছে। শার্টের হাতা দুটো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। শার্টটার বুকে কয়েকটা বুলেটের চিহ্ন। কম পক্ষে এক ডজন হবে।

“এই হলো তোমার মেসেজ,” জেসন বললো। “এবার তো জানতে পারলে এটা কি। আমার মনে হয় এখন তোমার উচিত সেটাই করা যেটা আমি বলবো।”

মেরি তার কথার কোনো জবাব দিলো না। তার বদলে সে আশ্তে আশ্তে পোশাকটার দিকে হেটে গিয়ে সেটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক’রে দেখলো, যেনো এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আচম্কা সে ঘুরে দাঁড়ালো। তার চোখে জল।

“না! এটা ভুল! একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে! অ্যাম্বাসিতে ফোন করো।”

“কি?”

“যা বললাম তাই করো। এক্ষুণি!”

“চুপ করো, মেরি। তোমাকে বুঝতে হবে।”

“না, কোনো বোঝার দরকার নেই! তোমাকে বুঝতে হবে! এটা এভাবে ঘটতো না। এটা এভাবে হতে পারে না।”

“তাই তো হয়েছে।”

“অ্যাম্বাসিতে ফোন করো! ঐ যে, ওখান থেকে ফোনটা নিয়ে এক্ষুণি ফোন করো। করবেলিয়াকে চাও। দ্রুত। ঈশ্বরের দোহাই! তোমার কাছে আমার যদি কোনো মূল্য থাকে, যা বললাম তাই করো!”

বর্ন তার কথা ফেলতে পারলো না। “তাকে আমি কি বলবো?” ফোনের কাছে যেতে যেতে সে জানতে চাইলো।

“আগে তাকে পাও! এটা নিয়েই তো আমি আশংকা করছি...ওহু ঈশ্বর। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি!”

“নাম্বারটা বলো?”

সে তাকে নাম্বারটা দিলে জেসন ডায়াল করলো। রিং হচ্ছে। যখন লাইন পাওয়া গেলো অপারেটর তীব্র ভয়ে কথাবার্তা গুলিয়ে ফেললো। এক পর্যায়ে তার কথা কিছুই বোঝা গেলো না। অপারেটরের আশেপাশে চিৎকার চেষ্টামেচি আর আদেশ নির্দেশ শোনা যাচ্ছে। ইংরেজি এবং ফরাসিতে। কয়েক সেকেন্ড পরেই সে বুঝতে পারলো।

কানাডিয়ান অ্যাম্বাসির অ্যাটাশি ডেনিস করবেলিয়া মর্টেই’র অ্যাম্বাসি অফিস থেকে রাত ১টা ৪০মিনিটে বের হতেই গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে।

“এটা হলো মেসেজটার অন্য দিক, জেসন,” মেরি ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বললো। তার দিকে চেয়ে আছে। “এখন তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো। কারণ কেউ একজন আছে যে তোমার সাথে দেখা করতে চায়। তোমাকে সাহায্য করতে চায়। একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছে, আমাদের কাছে নয়, আমার কাছে তো নয়ই। কেবল তোমার কাছে। আর কেবল তুমিই সেটা বুঝতে পারবে।”

অধ্যায় ২২

ওয়াশিংটন ডিসির সিদ্ধটিঙ্ক স্টেটের জনাকীর্ণ হিলটন হোটেল এসে পৌছালো একে একে চারজন লোক। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা লিফটে ক'রে গেলো, নিজেদের গন্তব্যের দুয়েক তলা উপরে অথবা নিচে থামলো তারা। বাকি পথটুকু গেলো পায়ে হেটে। ডিসির বাইরে দেখা করার সময় তাদের নেই। সংকটটা একেবারেই অভাবনীয়। ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ানের বেঁচে থাকা কিছু লোক রয়ে গেছে। বাকিরা সবাই মৃত। নিউইয়র্কের নিরিবিলি শান্ত এক এলাকায় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

দুটো মুখ পরিচিত। একজন আবার অনেক বেশি পরিচিত। প্রথমজন কোলোরাডোর বয়োবৃদ্ধ সিনেটর, দ্বিতীয়জন বৃগেডিয়ার জেনারেল আই.এ. ক্রফোর্ড—আরউইন আর্থার, সবার কাছে যে আয়রন আর্থার এ্যাজ নামে পরিচিত—আর্মি ইন্টেলিজেন্সের স্পোকস্ম্যান এবং জি-টু ডাটা ব্যাংকের ডিফেন্ডার। বাকি দু'জন লোক একেবারেই অপরিচিত, কেবল তাদের জগতেই তারা পরিচিত। একজন মধ্যবয়সী নেভাল অফিসার, পঞ্চম নেভাল ডিস্ট্রিক্টের ইনফরমেশন অ্যাটাশি। চতুর্থ এবং শেষ লোকটি সিআইএ'র ছেচলিশ বছর বয়স্ক এক অফিসার, যে একটা লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক গ্রেনেড বিস্ফোরণে তার পাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সেই সময় সে মেডুসা অপারেশনে একজন ছদ্মবেশি এজেন্ট ছিলো। তার নাম আলেকজান্ডার ককলিন।

ঘরে কোনো কনফারেন্স টেবিল নেই। এটা একটা সাধারণ মানের শোবার ঘর। দুটো বিছানা ছাড়াও একটা সোফা, দুটো চেয়ার এবং একটা কফি টেবিল আছে। এরকম একটি মিটিং করার জন্যে ঘরটা খুবই বেমানান। কোনো কম্পিউটার নেই, যোগাযোগের কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিও নেই যে, লন্ডন, প্যারিস অথবা ইস্তাম্বুলে মুহূর্তে যোগাযোগ করা যাবে। এটা একটা হোটেল রুম। আর এখানেই ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ানের গোপন মিটিংটা বসছে।

সিনেটর সোফার শেষপ্রান্তে বসলো, নেভাল অফিসার বসলো অন্যপ্রান্তে। ককলিন একটা চেয়ারে গুঁটিসুটি মেরে ব'সে লাঠিটা তার দু'পায়ের ফাঁকে রাখলো। বৃগেডিয়ার জেনারেল ক্রফোর্ড বসলো না, দাঁড়িয়ে রইলো। তার চেহারা আরক্তিম, চোয়াল প্রচণ্ড রাগে শক্ত হয়ে আছে।

“আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছি,” বললো সিনেটর। চোখ দুটো ঘষে নিলো, সারা রাত না ঘুমানোর ফলে এখন বেশ ঘুম ঘুম লাগছে। “এটা আমাদের

করতেই হতো। আমরা আজ রাতে মিটিং করছি। আমাদের সবকিছু বলুন। আপনারা প্রত্যেকেই। আপনিই আগেই শুরু করেন, জেনারেল। এসব হচ্ছে কি?”

“মেজর ওয়েব তার গাড়িতে ওঠার কথা ছিলো ২৩০০ ঘণ্টায়, সেভেনটি সেকেন্ড এবং লেক্সিংটন স্ট্রটের মোড়ে। সময়টা ঠিক করাই ছিলো। কিন্তু তিনি আর আসেন নি। ২৩৩০ ঘণ্টায় ড্রাইভার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে কারণ মেজরকে নিউ জার্সির এয়ারফিল্ডে যেতে হবে, দেরি করলে সেখানে যাওয়া যাবে না। ঠিকানাটা ড্রাইভারের মনে ছিলো—কারণ তাকে ঠিকানাটা ভুলে যেতে বলা হয়েছিলো—সে ওখানে গিয়ে দেখে দরজাটা খোলা। সিকিউরিটি বোল্টটা বন্ধ। ভেতরে ঢুকে সে ফয়ারে রক্ত আর সিঁড়িতে মহিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখে। হলওয়ে দিয়ে অপারেশন রুমে গিয়ে বাকি মৃতদেহগুলো আবিষ্কার করে সে।”

“ঐ লোকটা খুব দ্রুত একটা প্রোমোশন পাবার আশা করতে পারে,” নেভাল অফিসার বললো।

“আপনি এটা কেন বললেন?” সিনেটর জানতে চাইলো।

ক্রফোর্ড জবাব দিলো। “তার বুদ্ধিগতি বেশ ভালো। সে সঙ্গে সঙ্গে পেন্টাগনে ফোন করে ডিমিস্টিক কন্ট্রোল ট্রান্সমিশনে কথা বলার জন্যে চাপাচাপি করে। সে আমাদের ফোনে পাবার আগে কাউকে কিছু বলেও নি।”

“তাকে ওয়ার কলেজে দিয়ে দিন, আরউইন,” ককলিন মুখ বেঁকিয়ে বললো।

“আপনার ওখানকার বেশিরভাগ ক্লাউনের চেয়ে সে অনেক বেশি মেধাবী।”

“এটা তো কোনো ঠাট্টা হলো না, ককলিন,” সিনেটর তিক্ত কণ্ঠে বললো, “বরং ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণাত্মক কথা বলছেন। বলে যান, জেনারেল।”

ক্রফোর্ড সিআইএ’র লোকটার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলো। “আমি নিউইয়র্কের পল ম্যাকলারেনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে ওখানে যাওয়ার আদেশ করেছে, বলেছি আমি পৌছানোর আগপর্যন্ত যেনো সে কিছু না করে। তারপর আমি ককলিন আর জর্জকে ফোন করে এখানে চলে আসি।”

“আমি ম্যানহাটনের ব্যুরোর প্রিন্ট টিমকে ডেকেছি,” ককলিন বললো। “ঐ টিমটাকে আমরা এর আগেও ব্যবহার করেছি। তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়। আমি তাদেরকে বলি নি আমরা কি খুঁজছি, তবে তাদেরকে বলেছি জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে, তারা যা কিছুই পাক, আমাদেরকে সেটা দিতে।” সিআইএ’র লোকটা থেমে গেলো। হাতের লাঠিটা নেভাল অফিসারের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। “তারপর জর্জ তাদেরকে সাইট্রিশিট নাম দিয়ে দেয়। সেসব নাম এফবিআই’র ফাইলে আছে। তারা এমন একটা নাম পেয়েছে আমরা যেটা কোনোভাবেই আশা করি নি, আমরা সেটা কামনাও করি নি...বিশ্বাসই হতে চায় না।”

“ডেল্টার নাম,” সিনেটর বললো।

“হ্যা,” নেভাল অফিসার একমত হয়ে বললো। “আমি যে নামগুলো তাদেরকে দিয়েছি সেগুলো এমন সব মানুষের যারা যতো দূরেই থাকুক, ট্রেডস্টোনের ঠিকানাটা জানে। এর মধ্যে আমাদের সবার নামও রয়েছে। ঘরটা খুঁজে কেবল মাত্র একটা জিনিসই পাওয়া গেছে। একটা ভাঙা ব্র্যান্ডির গ্লাস। কয়েকটা মাত্র টুকরো, তাও আবার ঘরের এক কোণে একটা পর্দার নিচে ছিলো। আঙুলের ছাপটা এসব টুকরোর মধ্যেই পাওয়া গেছে। তৃতীয় আর তর্জনীর, ডান হাতের।”

“আপনি একদম নিশ্চিত?” সিনেটর আস্তে ক’রে জিজ্ঞেস করলো।

“আঙুলের ছাপ কখনো মিথ্যে বলে না, স্যার,” অফিসার বললো। “ওগুলো ওখানে আছে। টুকরোগুলোতে এখনও ব্র্যান্ডি লেগে রয়েছে। এই ঘরের বাইরে, ডেল্টা হলো এমাত্র ব্যক্তি যে সেভেনটি ফাস্ট স্ট্রটের ব্যাপারে জানে।”

“আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি? অন্যদের হয়তো কিছু বলার থাকতে পারে।”

“কোনো সম্ভাবনা নেই,” বৃগেডিয়ার জেনারেল বাঁধা দিয়ে বললো। “অ্যাবোট এটা কখনই প্রকাশ করতো না, আর এলিয়ট স্টিভেন্স ওখানে পৌছানোর পনেরো মিনিট আগে ঠিকানাটা জানতোই না। তার চেয়েও বড় কথা এটা সে করলে নিজের মৃত্যুই ডেকে আনতো।”

“মেজর ওয়েবের ব্যাপারটা কি?” সিনেটর জানতে চাইলো।

“মেজর,” ক্রফোর্ড জবাব দিলো, “তিনি কেনেডি এয়ারপোর্টে নামার পর পরই একমাত্র আমাকেই রেডিও ক’রে ঠিকানাটা জানিয়েছিলেন। আপনি তো জানেনই এটা হলো জি-টু ফ্রিকোয়েন্সির এবং অন্য কেউ এটা রিসিভ করতে পারে না। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, উনিও প্রাণ হারিয়েছেন।”

“হ্যা, তাতো ঠিকই।” সিনেটর আবারো মাথা ঝাঁকালেন। “এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কেন?”

“আমাকে একটা যন্ত্রণাদায়ক বিষয় তুলতে হচ্ছে,” বৃগেডিয়ার জেনারেল ক্রফোর্ড বললো। “গুরুতে আমি ঐ প্রার্থীর ব্যাপারে অতোটা উৎসাহী ছিলাম না। আমি বুঝি ডেভিড বেশ যোগ্যই ছিলো, তার চিন্তাভাবনাটাও আমি বুঝতাম। তবে আপনাদের যদি স্মরণে থাকে তাহলে জানেন, সে আমার পছন্দের ছিলো না। আমি তাকে বেছে নিই নি।”

“আমি জানতাম না আমাদের কাছে এতো বেশি চয়েজ ছিলো,” সিনেটর বললো। “আমাদের একজন লোক ছিলো—একজন যোগ্য লোক—যে স্বেচ্ছায় একটি দীর্ঘমেয়াদী গোপন অপারেশনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জড়িত করেছিলো নিজেকে। এরকম কতোজন লোকের অস্তিত্ব আছে?”

“আমাদের আসলে আরো বেশি ভারসাম্যপূর্ণ একজনকে খুঁজে বের করা উচিত ছিলো,” বৃগেডিয়ার পাল্টা বললো। “এটা আমি সে সময় বলেও ছিলাম।”

“তখন বলেছিলেন,” ককলিন বললো, “আপনার নিজস্ব সংজ্ঞায় একজন ভারসাম্যপূর্ণ একজনের কথা যা আমি সেই সময়েই বলেছিলাম যে এটা হলো অচল একটি কথা।”

“আমরা দু’জনেই মেডুসা’তে ছিলাম, ককলিন,” ক্রফোর্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বললো নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলো, “আপনার অসাধারণ অর্শুদৃষ্টি নেই। ডেন্টার ফিল্ডের কাজকর্ম বিরামহীন এবং খোলামেলাভাবেই শত্রুভাবাপন্ন ছিলো। আপনার চেয়ে আমিই এটা বেশি ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলাম।”

“বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার এটা করার অধিকার ছিলো। আপনি যদি সায়গনে না থেকে বেশিরভাগ সময় ফিল্ডে থাকতেন তো ব্যাপারটা বুঝতেন।”

“এটা হয়তো আপনাকে অবাক করবে,” বৃগেডিয়াঁর বললো, “তবে আমি সায়গনের বড় বড় বোকামীগুলোকে ডিফেন্ড করছি না—কেউ সেটা করবে না। আমি এমন এক ধরনের আচরণের বর্ণনা করার চেষ্টা করছি যা সেভেনটি ফাস্ট স্ট্রুট-এর ঘটনার আগের রাতের একটা বিষয়ে নিয়ে যাবে।”

সিআইএ’র লোকটার চোখ ক্রফোর্ডের উপরে। সে মাথা নাড়তেই তার শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবটা উধাও হয়ে গেলো। “আমি জানি আপনার কথাটা ঠিক। দুঃখিত। এটাই হচ্ছে আসল কথা, তাই না? এটা আমার জন্যে সহজ ছিলো না। আমি ডেন্টার সাথে আধডজন সেকশনে কাজ করেছি, অ্যাবোটের চোখে মেডুসার কর্মকাণ্ড ধরার পড়াও অনেক আগে আমি তার সাথে নম পেনের স্টেশনে ছিলাম। নম পেনের পরে সে আর আগের মতো রইলো না। এজন্যে সে মেডুসাতে যোগ দিয়েছিলো। এজন্যেই সে স্বেচ্ছায় কেইন হতে চেয়েছিলো।”

সোফায় বসা সিনেটর সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। “আমি এটা শুনেছি, তবুও আমাকে আবার বলুন। প্রেসিডেন্টকে সব জানতে হবে।”

“মেকং নদীর পাই-এ তার বউ আর দুই সন্তান খুন হয়, বিমানের বোমা বর্ষণে—কেউ জানে না কোন্ পক্ষ এটা করেছে—পরিচয়টা কখনও উন্মোচিত হয় নি। সে যুদ্ধকে ঘৃণা করতো, এসবের সাথে জড়িত সবাইকে ঘৃণা করতো। সে একেবারে উন্মত্ত হয়ে যায়।” ককলিন একটু থেমে বৃগেডিয়াঁরের দিকে তাকালো। “আমার মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, জেনারেল। সে আবারো উন্মত্ত হয়ে গেছে। এটা তার-ই কাজ।”

“কোনটা?” সিনেটর কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

“বিস্ফোরণটা,” ককলিন বললো। “ঐ বিস্ফোরণটা। সে তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। তার ঘৃণা তাকে পেয়ে বসেছিলো। এটা খুব কঠিন নয়। আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সে ঐসব লোককে, সেই মহিলাকে খুন করেছে। একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে সে। তাদের কেউই এটা প্রত্যাশা করে নি। সম্ভবত, উপর তলায় থাকা মহিলাটি ছাড়া। সে হয়তো চিৎকার চোঁচামেচিটা শুনতে পেয়েছিলো। সে আর

ডেল্টা নয়। আমরা একটা মিথ তৈরি করেছিলাম যার নাম কেইন। এখন আর সে কোনো মিথ নয়। এখন সে সত্যি হয়ে উঠেছে।”

“এতো মাস পরে...” সিনেটর হেলান দিয়ে বললো। তার কথাটা মিঁইয়ে গেলো। “সে কেন ফিরে এলো? কোথেকে ফিরে এলো?”

“জুরিখ থেকে,” ক্রফোর্ড জবাবে বললো। “ওয়েব জুরিখে ছিলো। আর আমার মনে হয় সে-ই একমাত্র লোক যে তাকে নিয়ে এসেছে। ‘কেন’, সেটা আমরা হয়তো কোনো দিনই জানতে পারবো না।”

“সে জানে না আমরা কারা,” সিনেটর প্রতিবাদ ক’রে বললো। “তার একমাত্র যোগাযোগ ছিলো ঐ ইয়াক্টম্যান, তার বউ আর ডেভিড অ্যাবোট।”

“আর অবশ্যই ওয়েব,” জেনারেল কথার সাথে যোগ করলো।

“এটা কোনো ব্যাপার নয়,” ককলিন বললো। “সে জানে একটা বোর্ড আছে। ওয়েব হয়তো তাকে বলে থাকবে আমরা কারা কারা আছি তাতে। আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন রয়েছে—ছয় মাস পর কয়েক মিলিয়ন ডলার। ডেল্টা এটাকে যথার্থ সমাধান বলেই বিবেচনা করবে। সে আমাদেরকে ঘায়েল ক’রে উধাও হয়ে যেতে পারে। কোনো চিহ্ন থাকবে না।”

“আপনি এতোটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন?”

“কারণ, প্রথমত সে ঐ হত্যাগুলো করেছে,” ইন্টেলিজেন্সের লোকটা জবাবে বললো। তার কণ্ঠটা এখন উঁচুতে উঠে গেছে। “আমরা তার আঙুলের ছাপ পাওয়া ব্যাণ্ডির গ্রাসের টুকরো পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, এটা একটা ক্লাসিক ফাঁদ, শত শত বৈচিত্র্য রয়েছে তাতে।”

“আপনি কি এটা বুঝিয়ে বলবেন?”

“আপনি চূপ থাকবেন,” জেনারেল আর কথা না বলে থাকতে পারলো না। ককলিনের দিকে তাকালো সে। “যতোক্ষণ না আপনার শত্রু এটা সহ্য করতে পারে, নিজেকে উন্মোচিত করে।”

“আমরা তার শত্রু?”

“এখন তো আর এটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না,” নেভাল অফিসার বললো। “কারণ যাই হোক না কেন, ডেল্টা আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। এটা আগেও ঘটেছে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এটা সচরাচর হয়ে থাকে না। আমরা জানি এখন কি করতে হবে।”

সিনেটর আরেকবার সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। “আপনি কি করবেন?”

“তার ছবি কখনও ছড়িয়ে দেয়া হয় নি,” ক্রফোর্ড বললো। “আমরা এখন সেটা ছড়িয়ে দেবো। সব স্টেশনে, লিসেনিং পোস্টে, আমাদের সব ইনফর্মার আর সোর্সদের কাছে। সে কোথাও না কোথাও যাবে। সে যে সব জায়গা চেনে সেসব জায়গা থেকেই শুরু করবে। অন্য একটা পরিচয় কিনতে চাইবে। সে টাকা খরচ

করবে। তাকে পাওয়া যাবেই। যখনই তাকে পাওয়া যাবে, পরিষ্কার অর্ডার দেয়া হবে।”

“আপনি তাকে তখন নিয়ে আসবেন?”

“আমরা তাকে খুন করবো,” ককলিন সোজা বললো। “আপনি ডেল্টার মতো কোনো লোককে জীবিত ধরে আনতে পারেন না। অন্যকোনো সরকার সেটা করুক সেই ঝুঁকিও আপনি নেবেন না। বিশেষ করে সে কি জানে, তা যদি আপনার মনে থাকে।”

“আমি প্রেসিডেন্টকে সেটা বলতে পারবো না। আইন-কানুন বলেও তো কিছু আছে।”

“ডেল্টার জন্যে নয়,” এজেন্ট বললো। “সে আইনের উর্ধ্বে। পরিত্রাণের উর্ধ্বে।”

পরিত্রাণের উর্ধ্বে—

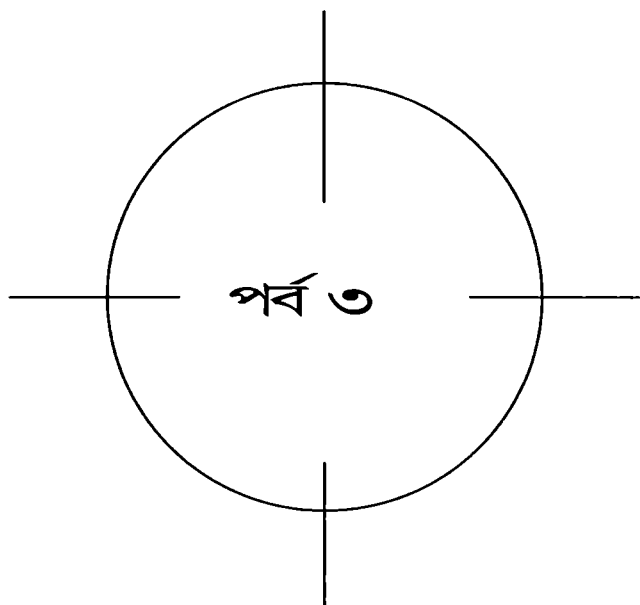
“ঠিক তাই, সিনেটর,” জেনারেল বললো। “পরিত্রাণের উর্ধ্বে। আমার মনে হয় কথাটার অর্থ আপনি জানান। আপনি ঠিক করবেন প্রেসিডেন্টের কাছে এটা বলবেন, নাকি বলবেন না। ভালো হয়—”

“আপনাকে সব কিছু আবিষ্কার করতে হবে,” অফিসারকে থামিয়ে দিয়ে সিনেটর বললো। “গত সপ্তাহে আমি অ্যাবোটের সাথে কথা বলেছিলাম। সে আমাকে জানিয়েছিলো ডেল্টার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। জুরিখ, ব্যাঙ্ক, ট্রেডস্টোনের নাম উল্লেখ করাটা, সবই গুটার অংশ, তাই নয় কি?”

“ছিলো, এখন সেটা বাতিল করা হয়েছে,” ক্রফোর্ড বললো। “সেভেনটি ফাস্ট স্ট্রট-এর প্রমাণটা যদি আপনি যথেষ্ট মনে না করেন তাহলে কি আর বলার আছে। ডেল্টা আমাদেরকে পরিষ্কার একটা সিগনাল দিয়েছিলো যে, সে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু সে তা করে নি। আপনি আর কি চান?”

“আমি একদম নিশ্চিত হতে চাই।”

“আর আমি চাই তার মৃত্যু।” ককলিন কথাটা নরম করে বললেও খুব কঠিন শোনালো। “সে কেবল আমাদের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গই করে নি, সে একটা গর্তে ডুবে আছে। গন্ধ শুকছে। সে হলো কেইন। আমরা ডেল্টা নামটি অনেক ব্যবহার করেছি—এমনকি বর্নও নয়, খালি ডেল্টা—আমার মনে হয় সেটা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। গর্ডন ওয়েব তার ভাই ছিলো। তাকে খুঁজে বের করুন। হত্যা করুন।”



অধ্যায় ২৩

রাত তিনটা বাজার দশ মিনিট আগে বর্ন অবার্জদু কোঁয়ের ফ্রন্টডেস্কে গেলেও মেরি প্রবেশদ্বারের দিকেই চলে গেলো। কাউন্টারে কোনো সংবাদপত্র নেই দেখে বর্ন একটু স্বস্তি পেলো। তবে পেছনে বসা লেটনাইট ক্লার্ক ঠিক প্যারিসের ঐ লোকটার মতোই। টেকো মাথার, গাট্রাগোটা ধরণের। চোখ দুটো বোজা বোজা। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে সে। তবে এই রাতটা সে অনেক দিনই মনে রাখবে, বর্ন ভাবলো—উপর তলার ঘরটার ক্ষয়ক্ষতি বাদেই, যেটা সকালে আবিষ্কার করা হবে। একজন নাইট ক্লার্কের নিশ্চয় কোনো গাড়ি আছে।

“আমি এইমাত্র কুঁয়ে’তে ফোন করেছি,” জেসন বললো। তার হাতটা কাউন্টারের উপরে। একজন ক্ষিপ্ত লোক সে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। “আমাকে এক্সুগি হোটেল ছাড়তে হবে, এক্সুগি একটা ভাড়া করা গাড়ি দরকার আমার।”

“কেন নয়?” লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো। “আপনি কোন্টা পছন্দ করবেন, মঁসিয়ে? একটা সোনার রথ অথবা জাদুর কার্পেট?”

“কি বললেন?”

“আমরা ঘর ভাড়া দেই, গাড়ি ভাড়া দেই না।”

“আমাকে সকালের আগেই কুঁয়ে’তে পৌছাতে হবে।”

“অসম্ভব। যদি না কোনো পাগল ট্যাক্সিচালক আপনাকে এই রাতবিরাতে নিয়ে যেতে রাজি হয়।”

“আমার মনে হয় না আপনি বুঝতে পারছেন। আটটার মধ্যে আমি আমার অফিসে হাজির থাকতে না পারলে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। খুবই সমস্যায় পড়ে যাবো। এজন্যে আপনাকে টাকা দিতেও রাজি আছি।”

“আপনি সমস্যায় প’ড়ে গেছেন, মঁসিয়ে।”

“অবশ্যই। এখানে নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে তার নিজের গাড়িটা আমাকে ধার দেবে, ধরণ...এক হাজার, পনেরোশ’ ফ্রাঁ।”

“এক হাজার...পনেরোশ’, মঁসিয়ে?” লোকটার অর্ধনির্মিলিত চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো এবার। “নগদ, মঁসিয়ে?”

“স্বাভাবিকভাবেই। আমার সঙ্গী গাড়িটা আগামীকালকেই ফেরত দিয়ে যাবে।”

“তাড়াহড়ার কিছু নেই, মঁসিয়ে।”

“গোপনীয়তার জন্যে টাকা দেয়া হবে।”

“আমি জানবো না গাড়িটা কোথায় যাচ্ছে,” ক্লার্ক বাঁধা দিয়ে বললো। “সত্যি কথা বলতে কি আমার রেনল্ট গাড়িটা খুব বেশি নতুন নয়। সম্ভবত সেটা সবচাইতে দ্রুতগতির গাড়িও নয়। তবে কাজ চলবে।”

বহুরূপী তার রঙটা আবারো বদলালো। সে সম্পূর্ণ অন্য একজন লোকের মতো আচরণ করছে এখন। কিন্তু এখন সে জানে সে কে আর সে সেটা বুঝতেও পারছে।

সকাল বেলা। গ্রামের পাশ্চ নিবাসে কোনো উষ্ণ ঘর নেই। জানালা দিয়ে কোনো রোদ এসেও ঢুকে না। পাশেই আছে সেন-জামেইন-এনলায়ে। তারা ব’সে আছে ছোট্ট পার্কিং এলাকায়, জায়গাটা ফাঁকা একটা রাস্তার পেছনে। গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বের হচ্ছে।

আমার জীবন শুরু হয়েছে ছয় মাস আগে, ছোট্ট একটা ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে, যার নাম ইল দ্য পোর্ট নোয়ে...এ কথা দিয়ে শুরু করলো।

নিরব একটা ঘোষণা দিয়ে শুরু করলো : আমি কেইন নামে পরিচিত।

সে সবটাই বললো, তার মনে পড়ে এরকম কোনো কিছুই বাদ দিলো না। আর্জেন্টাইন-এর মোমবাতিপূর্ণ রেস্টোরাঁয় ব’সে জ্যাকুলিন লাভিয়ার বলা কথাটা শুনে তার মনের পর্দায় যে ছবি ভেসে উঠেছিলো সেটাও বাদ দিলো না। নামগুলো, ঘটনাসমূহ, শহরগুলো...হত্যাকাণ্ডগুলো।

“সবই খাপ খেয়ে যায়। এমন কিছু নেই যা আমি জানি না। আমার মাথায় এমন কিছু নেই যেটা বের করার চেষ্টা করতে পারি। এটাই সত্য।”

“এটাই সত্য,” মেরি প্রতিধ্বনি করলো।

জেসন তাকে খুব কাছ থেকে দেখলো। “তুমি কি দেখছো না, আমাদের ধারণা ভুল?”

“হতে পারে। তবে ঠিকও হতে পারে, তোমারটা ঠিক, আমারটা ঠিক।”

“কিসের ব্যাপারে?”

“তোমার ব্যাপারে। আমাকে এটা আবারো বলতে হচ্ছে, শাস্তভাবে, যৌক্তিকভাবে। তুমি আমাকে ভালো ক’রে চেনার আগেই আমার জন্যে তোমার নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলো। তুমি যেরকম লোকের বর্ণনা দিচ্ছে, এটা তো সেরকম কোনো লোকের কাজ হতে পারে না। যদি সেই লোকটার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে সে আর ঐ মানুষটি নেই।” মেরির চোখে আকুলতা। যদিও তার কণ্ঠটা নিয়ন্ত্রিত “তুমি নিজেই এটা বলেছো, জেসন। ‘যে মানুষের স্মৃতি নেই, তার কাছে তার অস্তিত্বও নেই।’ হয়তো এটাই তুমি মুখোমুখি হচ্ছে। তুমি কি এ থেকে

পালাতে পারো?”

বর্ন মাথা নাড়লো। ভয়ংকর মুহূর্তটা এসে গেছে। “হ্যা,” সে বললো। “তবে একা। তোমাকে নিয়ে নয়।”

মেরি সিগারেটে টান দিয়ে তাকে ভালো ক’রে দেখলো, তার হাত কাঁপছে। “বুঝলাম। তাহলে এটাই তোমার সিদ্ধান্ত?”

“সেটাই তো হওয়া উচিত।”

“তুমি বীরেচিতভাবে উধাও হয়ে যাবে যাতে আমার কোনো ক্ষতি না হয়।”

“সেটাই।”

“তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি নিজেকে কি মনে করো, অ্যা?”

“কি?”

“তুমি নিজেকে কি ভাবো?”

“আমি এমন একজন লোক যাকে তারা কেইন ব’লে ডাকে। অনেক সরকার আমাকে চায়, তাদের কাছে আমি দাগী আসামী—এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত। ওয়াশিংটনের লোকেরা আমাকে খুন করতে চায় কারণ তারা মনে করছে আমি মেডুসার ব্যাপারে জানি; কার্লোস নামের এক গুণ্ডাঘাতক আমাকে গলায় গুলি ক’রে খুন করতে চাচ্ছে, কারণ আমি তার অনেক ক্ষতি করেছি। এটা একটু ভাবো। আমি কতোক্ষণ এইসব লোকদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো ব’লে তুমি মনে করো? এভাবে কি তুমি তোমার জীবনটা শেষ করতে চাও?”

“মোটাই না!” চিৎকার ক’রে মেরি বললো। তার বিশেষণী মাথায় কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে নিশ্চিত। “আমি জুরিখে যা করি নি তার জন্যে সুইস কারাগারে পঞ্চাশ বছর ধরে পচতে অথবা ফাঁসিতে ঝুলবো।”

“জুরিখের ব্যাপারটা সামলানোর একটা পথ রয়েছে। আমি এটা নিয়ে ভেবেছি আমি এটা করতে পারবো।”

“কিভাবে?” সে সিগারেটটা এসট্রেতে ফেলে দিলো।

“ঈশ্বরের দোহাই, তাতে কি আসে যায়? একটা স্বীকারোক্তি। আমি নিজেকে ধরা দেবো। পরে আবার জবানবন্দীটা অস্বীকার করবো!”

“না, সেভাবে নয়।”

“কেন নয়?”

মেরি তার মুখটা ধরলো। তার কণ্ঠটা এখন আরো নরম আর শান্ত। “কারণ আমি আমার ধারণাটা আবারো প্রমাণ করতে পেরেছি। অপরাধীরাও তার অপরাধের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। তুমি যা করার কথা বললে সেটা কেইন নামের লোকটা কখনও করবে না। যে কারোর জন্যেই হোক না কেন, সে এটা করবে না।”

“আমিই কেইন!”

“আমি যদি জোর করেও তোমার সাথে এ বিষয়ে একমত হই, তারপরও তুমি

তা নও ।”

“অনিবার্য পুনর্বাসন? মস্তিষ্ক-বিকৃত একজনের? সব স্মৃতি হারানো একজনের? সেটা সত্যই । কিন্তু আমাদের যারা খুঁজছে, তাতে তো আর তারা খেমে যাবে না । ট্গার টানতেও বাঁধা দেবে না ।”

“সেটা হবে খুবই খারাপ, আর সেটা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত নই ।”

“তাহলে তুমি সত্যের অন্বেষণ করছো না ।”

“আমি দুটো সত্য খুঁজছি, মনে তুমি সেটা বুঝতে পারছো না । আমি এগুলোর সাথে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো কারণ আমি দায়ি । দু’জন লোক নৃশংসভাবে খুন হয়েছে কারণ তারা তোমার এবং তোমার কাছে পাঠানো একটা মেসেজের মধ্যে এসে পড়েছিলো । আর সেটা হয়েছে আমার মাধ্যমেই ।”

“তুমি করবেলিয়া’র মেসেজটা দেখেছো । কতোগুলো বুলেটের ছিদ্র রয়েছে তাতে? দশটি, পনেরোটি?”

“তাহলে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে! তুমি ফোনে তার কথা শুনেছো, আমিও শুনেছি । সে মিথ্যে বলে নি, সে আমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে । তোমার জন্যে যদি নাও হয়, তো আমার জন্যে ।”

“এটা...সম্ভব ।”

“যেকোনো কিছুই সম্ভব । আমার কাছে কোনো জবাব নেই, কেবল পার্থক্য হলো, ব্যাপারগুলো কখনও ব্যাখ্যা করা যাবে না—অথচ ব্যাখ্যা করা উচিত । তুমি নিজের সম্পর্কে যা বলেছো, তা হয়তো তুমি নও ।”

“আমিই সেই লোক ।”

“আমার কথা শোনো-। তুমি আমার খুবই প্রিয়, ডার্লিং । এটা আমাদের অন্ধ ক’রে দিতে পারে, আমি সেটা জানি । তবে আমি আমার নিজের সম্পর্কেও কিছু জানি । আমি কোনো বাচ্চা মেয়ে নই । এ পৃথিবীর একটা বড় অংশ আমি দেখেছি । আর আমাকে যারা আকর্ষণ করে তাদেরকে খুব ভালোভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি ।” সে একটু খেমে তার কাছ থেকে সরে গেলো । “আমি একজন লোককে নির্খাতিত হতে দেখেছি—নিজের দ্বারা, অন্যের দ্বারা—আর সে চিৎকার ক’রে কাঁদতেও পারে না । তবে তুমি সেগুলোকে অন্যের উপর চাপিয়ে দাও নি, কেবল নিজে নিজে বয়ে বেরিয়েছো । বরং তুমি নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত করো, বোঝার ঠোঁট করো, আর এটা কোনো ঠাণ্ডা মাথার খুনির মনমানসিকতা হতে পারে না । তুমি আমার জন্যে যা করেছো, যা করতে চাও, সেটার সাথেও এটা খাপ খায় না । আমি জানি না তুমি এর আগে কি ছিলে, অথবা কি অপরাধ তুমি করেছো, তবে তুমি তা নয়, যা তুমি বিশ্বাস করো । আমি এমন মানুষকে ভালোবাসি যাকে ভালো করেই জানি, চিনি । তুমি কেবল সেটা আবারো নিশ্চিত করলে । কোনো খুনি এমন প্রস্তাব করবে না, যা তুমি এইমাত্র করলে । আর সেই প্রস্তাবটা, স্যার, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান

করছি।”

“তুমি একটা বোকা মেয়ে!” জেসন চটে গেলো। “আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি; তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো না! ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে কিছু একটা করতে দাও!”

“আমি সেটা করতে পারি না! এভাবে তো নয়ই...” আচম্কা মেরি ভেঙে পড়লো। তার ঠোট দুটো কাঁপতে লাগলো। “আমার মনে হয় আমি এইমাত্র সেটা করেছি।” সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো।

“কি করেছো?” বর্ন রেগেমেগে বললো।

“আমাদের দু’জনকে কিছু একটা দাও,” তার দিকে ফিরলো সে। “আমি সেটা এইমাত্র বলেছি। এটা দীর্ঘদিন ধরেই আছে। ‘অন্যেরা তোমাকে যা বিশ্বাস করাতে চায়...’ ”

“তুমি কি বলছো এসব?”

“তোমার অপরাধগুলো...অন্যেরা তোমাকে যা বিশ্বাস করাতে চায়।”

“ওগুলো আমিই করেছি, ওগুলো আমার নিজস্ব অপরাধ।”

“দাঁড়াও। হয়তো ওগুলো সংঘটিত হয়েছে, তবে তোমার দ্বারা নয়? হয়তো আলামতগুলো সাজানো—জুরিখে আমাকে যেভাবে ফাঁসানো হয়েছে, সাজানো হয়েছে সব—ওগুলো অন্য কারোর অপরাধ। জেসন—তুমি জানো না কখন তুমি তোমার স্মৃতি হারিয়েছো।”

“পোর্ট নোয়ে’তে।”

“না, সেখানে তুমি তোমার স্মৃতি হারাও নি। ওখান থেকে তোমার শুরু হয়েছে। পোর্ট নোয়ে’র আগের কথা বলছি। এটা অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে। এটা তোমাকে, আর লোকে তোমাকে যা ভাবে, সবই ব্যাখ্যা করতে পারবে।”

“তুমি ভুল করছো। যে স্মৃতি, যে ছবি আমার মাঝে ফিরে আসে সেটা কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না।”

“হতে পারে তোমাকে যা বলা হয়েছে, তুমি কেবল সেটাই মনে করতে পারছো,” মেরি বললো। “বারবার, অজস্রবার তোমাকে সেটা বলা হয়েছে। যতোক্ষণ না অন্য কিছু তোমার মধ্যে থাকে। ফটোগ্রাফ, রেকর্ডিং, দৃশ্যগত এবং শব্দগত উদ্দীপনা।”

“তুমি একজন চলতে ফিরতে পারা, কাজ করতে সক্ষম কুমড়াপটাশের কথা বলছো যাকে ব্রেইনওয়াশ করা হয়েছে। সেটা আমি নই।”

মেরি তার দিকে তাকালো, নরম করে বললো, “আমি একজন বুদ্ধিমান, এবং প্রচণ্ড অসুস্থ এক লোকের কথা বলছি। যার ব্র্যাকথ্রাউন্ড অন্যলোকের চিন্তাভাবনা সাথে খাপ খেয়ে যায়। তুমি কি জানো এরকম লোকজন কতো সহজে পাওয়া যায়?

তারা সব হাসপাতালে, প্রাইভেট মানসিক আশ্রমে আর মিলিটারি ওয়ার্ডে আছে ।” সে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো । “ঐ সংবাদপত্রের আর্টিকেলটায় অন্য আরেকটা সত্যের কথা বলছে । আমি কম্পিউটারের উপরে বেশ দক্ষ । আমি যদি কোনো বিকৃত উদাহরণ খুঁজি যা বিচ্ছিন্ন ফ্যাক্টরগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে আমি জানবো সেটা কিভাবে করা হয়েছে । পক্ষান্তরে, কেউ এমন একজন লোককে খুঁজছে যে স্মৃতিভ্রষ্ট, যার ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা, ভাষা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, তাহলে মেডিকেল ডাটা ব্যাংক সে রকম কারোর খোঁজ দিতে পারবে । ঈশ্বর জানে, তোমার মতো কেস খুব বেশি নেই; হয়তো খুবই কম । হতে পারে কেবলমাত্র একটিই । তবে একজনকেই তারা খুঁজছে । যা তাদের দরকার ।”

গ্রামীণ এলাকাটার দিকে তাকালো বর্ন, নিজের মনের লৌহ দরজাটা খুলে উঁকি মারার চেষ্টা করলো । মেরি যে আশার কথা বলছে সেটার সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা করলো সে । “তুমি কি বলতে চাচ্ছে আমি একটা পুণরুৎপাদিত হওয়া বিভ্রান্তি,” সে কথাটা নির্বিকারভাবে বললো ।

“এটা হলো শেষ ফলাফল, তবে আমি তা বলছি না । আমি বলছি, এটা সম্ভব যে, তোমাকে ম্যানিপুলেট করা হয়েছে, মানে তোমার মস্তিষ্কের উপর কিছু একটা করা হয়েছে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে । এটা অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করবে ।” সে বর্নের হাতটা স্পর্শ করলো । “তুমি আমাকে বলো, অনেক সময় নাকি তোমার ভেতর থেকে কিছু বের হয়ে আসতে চায়—তোমার মাথাটা ফাটিয়ে দিতে চায় ।”

“কথাবার্তা—বিভিন্ন জায়গার দৃশ্য, নাম—তারা অনেক কিছু উস্কে দেয় ।”

“জেসন এটা কি সম্ভব নয় যে, তারা ভূয়া কিছু উস্কে দিচ্ছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে? কিন্তু তুমি মুক্তি পাচ্ছে না । তুমি সেগুলো স্পষ্টভাবে দেখতেও পাও না । কারণ সেগুলো তোমার নয় ।”

“আমার তাতে সন্দেহ আছে । আমি কি করতে পারি সেটা আমি দেখছি । আমি সেগুলো আগেও করেছি ।”

“তুমি সেগুলো অন্য কারণেও করতে পারো ।...তোমার নিকৃটি করি, আমি আমার জীবন নিয়ে শংকিত! আমাদের দু’জনের জীবন নিয়েই ।...ঠিক আছে । তুমি ভাবতে পারো, অনুভব করতে পারো । এখন অনুভব করো, ভাবো! আমার দিকে তাকাও, বলো তুমি তোমার ভেতরটা দেখেছো, তোমার ভেতরকার ভাবনা আর অনুভূতিগুলো, আর তুমি কোনো সন্দেহ ছাড়াই জানো যে, তুমি কেইন নামের একজন খুনি! তুমি যদি তা করতে পারো—তবে আমাকে জুরিখে নিয়ে যাও । সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নাও । আমার জীবন থেকে বের হয়ে যাও! আর সেটা যদি না পারো, তাহলে আমার সাথেই থাকো, আমাকে সাহায্য করতে দাও । আর ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ভালোবাসো । ভালোবাসা, জেসন ।”

বর্ন তার হাতটা ধরলো । যেনো এক রাগী বাচ্চা ছেলে শক্ত ক’রে ধরে রেখেছে

তার হাতটা। “এটা ভাবার অথবা অনুভবের প্রশ্ন নয়। আমি গেইমেনশেফটের একাউন্টটা দেখছি। এন্ট্রিগুলো অনেকদিন আগের। সেগুলোর সাথে আমি যা জানি, সবই খাপ খেয়ে যায়।”

“কিন্তু সেই একাউন্টটা আর ঐসব এন্ট্রি গতকালকে অথবা গত সপ্তাহে, কিংবা ছয় মাস আগেও তৈরি করা হতে পারে। তুমি তোমার সম্পর্কে যা পড়েছো, যা শুনেছো সবই ঐ সব লোকের সাজানো হতে পারে, যারা তোমাকে কেইনের জায়গায় দেখতে চায়। তুমি কেইন নও। তবে তারা তোমাকে সেরকমই ভাবতে চায়। তবে এমন কেউও আছে যারা জানে তুমি কেইন নও। আর তারা সেটাই তোমাকে বলার চেষ্টা করছে। আমার কাছেও প্রমাণ রয়েছে। আমার প্রেমিক বেঁচে আছে, কিন্তু দু’জন বন্ধু মারা গেছে, কারণ তারা তোমার এবং যে তোমাকে মেসেজটা পাঠিয়েছে তার মাঝখানে এসে পড়েছিলো। তারা তোমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তারা মারা গেছে ঐসব লোকের হাতে যারা তোমাকে কার্লোসের কাছে কেইনের বদলে বলি দিতে চায়। তুমি বলছো সবই খাপ খেয়ে যায়। আসলে খাপ খায় না, জেসন, তবে আমারটা খাপ খায়। এটা তোমার অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করে।”

“বারুদবিহীন একটা ফাঁপা শেল, যার এমন কি নিজের স্মৃতিও নেই, সে মনে করে তার সেটা আছে? যার ভেতরের শয়তানগুলো বের হয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছে? এটা তো খুব সুখকর সম্ভাবনা নয়।”

“ওগুলো শয়তান নয়, মাই ডার্লিং। ওগুলো তোমারই অংশ—রাগ, ভয়, চিৎকার করছে বের হয়ে আসার জন্যে, কারণ তারা তোমার নয়, যা তুমি শেলের ভেতরে ঢুকিয়েছো।”

“আমি যদি সেই শেলটা ভেঙে ফেলি, আমি কি খুঁজে পাবো?”

“অনেক কিছু। কিছু ভালো কিছু খারাপ। আর প্রচুর সংখ্যক থাকবে ক্ষত। তবে কেইন ওখানে থাকবে না, সেটা আমি তোমাকে বলতে পারি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, ডার্লিং। দয়া ক’রে হাল ছেড়ে দিও না।”

সে দূরত্ব বজায় রাখলো, একটা কাঁচের দেয়াল তাদের দু’জনের মাঝখানে। “কিন্তু আমাদের ধারণা যদি ভুল হয়ে থাকে? তাহলে কি হবে?”

“সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। অথবা খুন করবে। আমি পরোয়া করবো না।”

“আমি তোমাকে ভালোবাসি।”

“জানি। এজন্যেই আমি ভয় পাই না।”

“আমি লাভিয়ার অফিস থেকে দুটো ফোন নাম্বার খুঁজে পেয়েছি। প্রথমটি জুরিখের, দ্বিতীয়টি প্যারিসের। ভাগ্য ভালো থাকলে ওগুলো আমাকে আমার দরকারী একটা নাম্বারের সন্ধান দিতে পারবে।”

“নিউইয়র্ক? ট্রেডস্টোন?”

“হ্যা, জবাবটা ওখানেই আছে। আমি যদি কেইন না হই, তবে ঐ নাম্বারের কেউ না কেউ জানে আমি কে।”

তারা এই ভেবে গাড়িতে ক’রে প্যারিসে ফিরে এলো যে, নিরিবিলি গ্রামীণ এলাকা থেকে প্যারিসের জনাকীর্ণ এলাকাটাই বেশি নিরাপদ হবে। সোনালী চুলের এক মেয়ে, চশমা পরা, খুবই আকর্ষণীয় এবং দৃঢ়চেতা এক নারী, মেকআপ আর চুল বাঁধার ধরণ পাল্টে ফেলে সে হয়ে গেছে সরবোনের কোনো ছাত্রি। এই মতমার্ত্তে-তে এরকম ছাত্রি সচরাচর দেখা যায়। তারা রুই দ্য মায়েস্তের টেরাসে একটা ঘর নিলো, ব্রাসেল্‌সের এক বিবাহিত দম্পতি হিসেবে তারা রেজিস্টার্ড হলো।

ঘরে ঢুকে তারা কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো। তারা যা দেখছে আর টের পাচ্ছে তাতে কথা বলার কোনো দরকার নেই। তারা একত্রে জড়িয়ে পড়েছে অষ্টপৃষ্ঠে। একটা গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। একজন পড়লে, আরেকজনও তার সাথে পড়ে যাবে। অতল গহ্বরে।

বর্ন তার চুলের রঙ বদলাতে পারে নি সময়ের অভাবে। “আমাদেরকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে,” বললো সে। “একটু ঘুমাতে হবে। অনেক কাজ করতে হবে আজ।”

তারা মিলিত হলো। বেশ শান্তভাবে, ধীরে ধীরে আর পরিপূর্ণভাবেই। দু’জনেই বিছানায় বেশ ছন্দময় ভঙ্গীতে ব্যাকুল হয়ে উঠলো একে অন্যকে পেতে। এক সময় একটা আসন ঠিক করার সময় যখন এলো দু’জনেই হেসে ফেললো। প্রথমে বিব্রতকর হাসি, তারপর নিজেদের বোকামীর কথা ভেবে হেসে উঠলো তারা। যতো সময় গড়ালো একে অন্যকে আরো বেশি তীব্রভাবে জড়িয়ে ধরলো। একে অন্যের মাঝে ব্যাকুলভাবে হারিয়ে যেতে চাইলো, যেনো যে অন্ধকার আর ঝড়ো বাতাস তাদেরকে জাপটে ধরে রেখেছে চারপাশ থেকে, সেটা থেকে তারা এভাবেই পরিত্রাণ পাবে। আচম্কা তারা বাস্তব জগৎ ছেড়ে এমন একটা জগতে প্রবেশ করলো যা অসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে তাদের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছে। চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল দিন আর নীল রঙের জলরাশি অন্ধকারকে প্রতিস্থাপিত করলো। অবশেষে এরকম একটা জগৎ খুঁজে পেলো তারা।

নিঃশেষ হয়ে দু’জনেই ঢলে পড়লো ঘুমে। ঘুমের মধ্যেও একে অন্যের হাত ধ’রে রাখলো তারা।

নিচের রাস্তার যানবাহনের হর্ন আর হৈ হল্লা টের পেয়ে বর্নই আগে জেগে উঠে হাত ঘড়িতে সময় দেখলো। একটা বেজে দশ মিনিট বেজে গেছে। দুপুর। তারা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। সম্ভবত তাদের দরকারের চেয়েও কম সেটা। তবে যথেষ্টই বলা চলে। দিনটা হবে খুবই দীর্ঘ, অনেক কাজ করতে হবে, তবে কি

করবে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। সে কেবল জানে তার কাছে দুটো ফোন নাম্বার আছে যা তাকে তৃতীয় আরেকটা নাম্বারের সন্ধান দেবে। নিউইয়র্কের।

মেরি তার পাশে শুয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সে তার দিকে ফিরলো। মেরির ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে। কী চমৎকার লাগছে তাকে। বর্ন তার ঠোঁটে চুমু খেলো। চোখ দুটো বন্ধ থাকলেও মেরি সাড়া দিলো গভীর চুম্বনের সাথে।

“তুমি হলে একটা ব্যাণ্ড, আমি তোমাকে রাজকুমার বানাবো,” সে ঘুমঘুম কণ্ঠে বললো। “নাকি অন্য কোনো পথ আছে?”

“আমার বর্তমান আকৃতি ব্যাণ্ডের মতো নয়।”

“তাহলে তুমি ব্যাণ্ডই থাকো। লাকিয়ে বেড়াও ছোট্ট ব্যাণ্ড। কিভাবে লাফাও সেটা আমাকে দেখাও তো।”

“কোনো প্রলোভনে নয়, আমি কেবল মাছি ধ’রে খাওয়ার জন্যেই লাফাই।”

“ব্যাণ্ডেরা মাছি খায় নাকি? মনে হয় খায়। ঘোৎ ঘোৎ ক’রে তারা কাঁপে। কি বিচ্ছিরি।”

“আসো, চোখ খেলো। আমাদের দু’জনকেই এখন লাফাতে শুরু করতে হবে। আমাদেরকে শিকারে বের হতে হবে।”

মেরি চোখ দুটো পিটপিট ক’রে খুলে বললো, “শিকার, কার জন্যে?”

“আমার জন্যে,” সে বললো।

রুই লাফায়েতের একটা ফোনবুথ থেকে মি: বৃগস্ নামের একজন জুরিখের একটা নাম্বারের ফোন করলো। বর্ন জানে জ্যাকুলিন লাভিয়া ঐ নামটা জানাতে কোনো সময় নষ্ট করবে না। জুরিখে এটা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

রিংয়ের শব্দ হতেই জেসন ফোনটা মেরির হাতে ধরিয়ে দিলো। মেরি জানে তাকে কি বলতে হবে। এটা না বলে তার আর কোনো উপায় নেই। ইন্টারন্যাশনাল অপারেটরের কণ্ঠটা লাইনে শোনা গেলো।

“আমি দুঃখিত, যে নাম্বারটাতে আপনি ফোন করেছেন সেটা আর সচল নেই।”

“এটা খুবই জরুরি, অপারেটর। আপনার কাছে কি অন্য কোনো নাম্বার আছে?”

“টেলিফোনটা সচল নেই, মাদাম। অন্য কোনো বিকল্প নাম্বারও নেই।”

“হয়তো ভুল কোনো নাম্বার দেয়া হয়েছে। এটা খুবই জরুরি। এই নাম্বারটা যার বা যাদের, সেই নামটা কি আপনি দিতে পারবেন?”

“এটা সম্ভব নয়।”

“বললাম না, খুবই জরুরি। আমি কি আপনার পদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা

বলতে পারি?”

“টনি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এই নাম্বারটা তালিকায় অপ্রকাশিত একটি নাম্বার। গুড আফটারনুন, মাদাম।”

লাইনটা কেটে গেলো। “লাইন কেটে গেছে,” মেরি বললো।

“এটা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগবে,” রাস্তার এদিক-ওদিক চেয়ে বর্ন জবাব দিলো। “চলো, এখান থেকে।”

“তুমি মনে করছো তারা এটা ট্রেস করতে পারবে? প্যারিসে? একটা পাবলিক ফোনে?”

“তিন মিনিটেই একটা এক্সচেঞ্জ ডিস্ট্রিক্টটা বের করতে পারবে, চার মিনিটে ব্রকগুলো।”

“তুমি কি ক’রে জানো?”

“বলতে পারলে তো বলতামই। এবার চলো।”

“জেনসন। একটু দূরে গিয়ে দেখি না কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে?”

“কারণ আমি জানি না কিসের জন্যে দেখবো, আর তারাই বা কি করবে। তাদের কাছে একটা ছবি আছে। তারা এই এলাকার সবখানে লোকজন ছড়িয়ে দিতে পারে।”

“আমাকে তো পত্রিকার ছবিগুলোর মতো দেখাচ্ছে না।”

“তোমাকে না। আমাকে দেখাচ্ছে। চলো।”

তারা লোকজনের ভীড় ঠেলে দশব্রক দূরে বুলেভার্দ মলেশার্ভের আরেকটা ফোন বুথের কাছে চলে এলো। এবার আর কোনো অপারেটরের মাধ্যমে নয়। এটা প্যারিসের একটা নাম্বার। স্মেরি কয়েন ঢুকিয়ে ডায়াল করলো।

কিন্তু লাইনের কথাটা দারুণ অবাক করলো মেরিকে :

“লা রেসিদেশ দু জেনেরাল ভিলিয়ে। বজুঁখ?... আলো? আলো?”

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেরি কথা বলতে পারলো না। সে কেবল ফোনটার দিকে চেয়ে রইলো। “জেমেস্ট্রিউজ,” ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বললো সে। “উনে এরেওয়ে।” সে ফোনটা রেখে দিলো।

“ব্যাপার কি?” কাঁচের দরজাটা খুলে বর্ন জিজ্ঞেস করলো। “কি হয়েছে? কে সে?”

“কিছুই বুঝতে পারছি না,” মেরি বললো। “আমি ফ্রান্সের সবচাইতে সম্মানিত এবং ক্ষমতাধর এক ব্যক্তির বাড়িতে ফোন করেছি।”

অধ্যায় ২৪

“আদ্র্বে ফ্রাঁসোয়া ভিলিয়ার্স,” একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে মেরি আবারো বললো। তারা তাদের টেরাসের ঘরে ফিরে এসে অবিশ্বাস্য তথ্যটা হজম করার চেষ্টা করছে। “তিনি সায়ারের গ্র্যাজুয়েট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন নায়ক। প্রতিরোধ সংগ্রামের কিংবদন্তী। আলজেরিয়া নিয়ে দ্য গলের সাথে বিরোধের আগে তিনি গলের সম্ভাব্য একজন উত্তরসূরি ছিলেন। জেসন, এরকম একজন লোককে কার্লোসের সাথে জড়ানো একেবারেই অবিশ্বাস্য।”

“কানেকশনটা তো আছে। বিশ্বাস করো।”

“এটা একেবারেই কঠিন। ভিলিয়ার্স ফ্রান্সের খুবই পুরনো, সপ্তদশ শতকের অভিজাত এক পরিবারের সদস্য। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য। তিনি আইন মেনে চলা মিলিটারি ব্যক্তিত্ব। এটা অনেকটা ডগলাস ম্যাকআর্থারকে মাফিয়া বন্দুকবাজদের সাথে জড়ানোর মতো। এটা একেবারেই অসম্ভব।”

“তাহলে অন্য কিছু দেখা যাক। দ্য গলের সাথে তার বিরোধটা কি ছিলো?”

“আলজেরিয়া। ষাট দশকের শুরুর দিকে তিনি ওএএস-এর সাথে জড়িত ছিলেন—একজন আলজেরিয়ান কর্নেল সালানের অধীনে। তারা ইভিয়ান চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলো যাতে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়। তারা বিশ্বাস করতো আলজেরিয়া আইনত ফ্রান্সেরই।”

“‘আলজেরিয়ার উন্মাদ কর্নেল,’ ” বর্ন বললো। কথাটা কোথেকে এলো সে জানে না।

“এটা তোমার কাছে কিছু মনে হচ্ছে?”

“হ্যাঁ, তবে আমি জানি না সেটা কি?”

“ভাবো,” মেরি বললো। “কেন ‘উন্মাদ কর্নেল’ কথাটা তোমার মনে পড়লো? এতো দ্রুত!”

তার দিকে অসহায়ের মতো তাকালো জেসন। তারপরই কথাট তার মনে উদয় হলো। “বোমা বর্ষণ...অনুপ্রবেশ। উস্কানি দাতারা। তুমি সেগুলো স্টাডি করো; তুমি মেকানিজমটা স্টাডি করো।”

“কেন?”

“আমি জানি না।

“তোমাকে যা শেখানো হোতো সেটার উপর ভিত্তি করেই কি তুমি সিদ্ধান্ত নিতে?”

“আমারও তাই মনে হয়।”

“কি ধরণের সিদ্ধান্ত? তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে?”

“বিশৃঙ্খলা।”

“এটা তোমার কাছে কি অর্থ বহন করে? বিশৃঙ্খলার কথা বলছি।”

“আমি জানি না! আমি ভাবতে পারছি না!”

“ঠিক আছে...ঠিক আছে। অন্য সময়ে এটা নিয়ে আমরা ভাববো।”

“সময় তো হবে না; চলো ভিলিয়ার্সকে নিয়ে কথা বলি। আলজেরিয়ার পরে কি হয়েছিলো?”

“দ্য গলের সাথে তার একধরণের সমঝোতা হয়েছিলো। ভিলিয়ার্স সরাসরি সম্ভ্রাসের সাথে জড়িত ছিলেন না। তার মিলিটারি রেকর্ড ছিলো খুবই অসাধারণ। যে কারণে তাকে একটু ছাড় দেয়া হয়। ফ্রান্সে ফিরে আসেন তিনি—তাকে আসলে স্বাগতই জানানো হয়—একজন পরাজিত যোদ্ধা, তবে কাজটা দেশপ্রেম থেকেই করেছিলেন। আবাবো তার কমান্ড ফিরে পান তিনি, রাজনীতিতে যোগ দেয়ার আগে তাকে একজন জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়।”

“তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, তারপর?”

“এজন মুখপাত্র বলতে পারো। একজন বয়স্ক মুখপাত্র। এখনও তার শিকড় মিলিটারিতে প্রোথিত। ফ্রান্সের ক্ষয়িষ্ণু মিলিটারিতে এখনও তার প্রভাব রয়েছে।”

“হাওয়ার্ড লিল্যান্ড,” জেসন বললো। “এটাই তোমার কার্লোসের সাথে কানেকশন।”

“কিভাবে? কেন?”

“কারণ লিল্যান্ডকে হত্যা করা হয় কুয়ে দরুসে অস্ত্র মওজুদ আর রপ্তানীর ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে।”

“এটা তো খুবই অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। এরকম একজন একজন মানুষ...” মেরির কণ্ঠটা মিঁয়ে গেলো। সে কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। “তার ছেলে খুন হয়, সেটা ছিলো রাজনৈতিক বিষয়। আজ থেকে ছয় বছর আগে।”

“আমাকে বলো সেটা।”

“তার গাড়িটা রুই দুবাকে বিস্ফোরিত হয়। খবরটা সব পত্রিকায়ই ছাপা হয়েছিলো। সেও ছিলো রাজনীতিতে সক্রিয়, তার বাবার মতোই একজন রক্ষণশীল। সব সময় সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্টদের বিরোধীতা করতো। সে পার্লামেন্টে তরুণ সদস্য ছিলো। সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পক্ষে একটা বাঁধা হিসেবে আবির্ভূত হয়, খুবই জনপ্রিয় ছিলো। আকর্ষণীয় আর অভিজাত এক ব্যক্তিত্ব ছিলো সে।”

“তাকে কে খুন করলো?”

“অনুমাণ করা হয় এটা কমিউনিস্ট উগ্রপন্থীদের কাজ। সে বামপন্থীদের একটি লেজিস্লেশনে বাঁধা দিয়েছিলো। তার মৃত্যুর পর সেই লেজিস্লেশনটা পাস হয়ে যায়। অনেকেই ভাবে এজন্যেই ভিলিয়ার্স আর্মি ছেড়ে দিয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেমবলিতে

যোগ দেন। এটা অবশ্য খুবই বিসদৃশ্য ব'লে মনে হয়। হাজার হোক তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিলো; তুমি কোনোভাবেই ভাবতে পারো না তিনি একজন পেশাদার গুপ্তহত্যাকারীর সাথে জড়িত আছেন।”

“আরো কিছু ব্যাপার আছে। তুমি বলছো তিনি প্যারিসে ফিরে আসলে তাকে স্বাগত জানানো হয়, কারণ তার সাথে সরাসরি সন্ত্রাসের সম্পর্ক ছিলো না।”

“যদি তিনি তা ক’রে থাকেন,” মেরি বাঁধা দিয়ে বললো। “এটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছিলো। ফরাসিরা তাদের দেশ আর বিছানার ব্যাপারে অনেক বেশি উদার। আর তিনি ছিলেন তাদের নায়ক। সেটা তুমি ভুলে যেয়ো না।”

“কিন্তু একবার যে সন্ত্রাসী সে চিরকালই সন্ত্রাসী, সেটাও ভুলে যেয়ো না।”

“আমি একমত নই। মানুষ বদলায়।”

“কিছু কিছু ব্যাপারে নয়। কোনো সন্ত্রাসী কখনই ভুলে যায় না সে কতোটা কার্যকরী। সে ওসবের মধ্যেই বেঁচে থাকে।”

“আমি এক্ষুণি নিজেকে জিজ্ঞেস করবো কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।”

“তাহলে সেটা কোরো না।”

“তবে আমি ভিলিয়ার্সের ব্যাপারে নিশ্চিত। আমি তাকে ধরছি।” বর্ন বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনবুকটা তুলে নিলো। “চলো দেখি, তার নাম্বারটা লিস্টেড নাকি প্রাইভেট। তার ঠিকানাটা আমার দরকার।”

“তুমি তার ধারে কাছেও যেতে পারবে না। তিনি যদি কার্লোসের লোক হয়ে থাকেন তবে তাকে প্রহরা দিয়ে রাখা হবে। তারা তোমাকে দেখামাত্রই গুলি করবে। তাদের কাছে তোমার ছবি আছে, ভুলে গেছো?”

“সেটা তাদের কোনো সাহায্যে আসবে না। তারা যা খুঁজছে সেটা তা নয়। এই তো। ভিলিয়ার্স, এ. এফ. পার্ক মঁশিউ।”

“তারপরও আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু জানি মহিলা যাকে ফোন করে সে অবশ্যই লাভিয়াকে ভড়কে দিয়েছে।”

“অথবা মহিলাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যাবে যেখানে সে যা খুশি তাই করতে পারবে।”

“তোমার কাছে কি এটা অদ্ভুত ব'লে মনে হয় না যে, তাকে নাম্বারটা দেয়া হবে।”

“এই রকম পরিস্থিতিতে নয়। কার্লোস চায় তার ড্রোনরা জানুক সে ঠাট্টা করছে না। সে কেইনকে চায়।”

মেরি উঠে দাঁড়ালো। “জেন্সন, ‘ড্রোন’ কি?”

“বর্ন তার দিকে তাকালো। “আমি জানি না...তবে মনে হয়, অন্ধভাবে যে অন্য আরেকজনের হয়ে কাজ করে।”

“অন্ধভাবে? মানে, না দেখে?”

“না জেনে । ভাবে সে একটা অন্য কিছু করছে ।”

“এমনভাবে করা হয় যাতে ট্রেস্ করা না যায় ।”

“হ্যা, তাই ।”

“জুরিখে সেটাই হয়েছিলো । ওয়াল্টার এপফেল ছিলো একজন ড্রোন । সে চুরির কাহিনীটা ছড়িয়েছে না জেনেই ।”

“কোন্ কাহিনীটা?”

“এটা খুব ভালো অনুমাণ যে, তোমাকে এমন একজনের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হলো যাকে তুমি ভালোভাবেই চেনো ।”

“ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান,” জেসন বললো । “আমরা আবার ভিলিয়ার্সের কথায় ফিরে যাই । কার্লোস আমাকে গেইমেনশেফটের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে । তার মানে সে ট্রেডস্টোন সম্পর্কে জানে । ভিলিয়ার্সও তা জানে, সেটার বেশ ভালো সম্ভাবনা আছে । সে যদি তা না জানে তবে হয়তো তাকে আমাদের জন্যে খুঁজে বের করার একটা পথ রয়েছে ।”

“কিভাবে?”

“তার নাম । তুমি যা বললে তিনি যদি আসলেই তাই হয়ে থাকেন তবে তিনি এটার সম্পর্কে বেশ ভালোই জানেন । অন্যর অব ফ্রান্সের পণ্ডতুল্য কার্লোসের সাথে গাটছড়া বেঁধেছেন তার হয়তো কোনো কারণ রয়েছে । আমি পুলিশের কাছে, পত্রপত্রিকার কাছে যাওয়ার হুমকি দেবো ।”

“তিনি এটা সোজা অস্বীকার করবেন । বলবেন এটা জঘন্য মিথ্যে ।”

“বলতে দাও তাকে । এটা আসলে মিথ্যে নয় । তার নাম্বারটা লাভিয়ার অফিসে ছিলো । তাছাড়া, কোনো রকম অস্বীকার করা হবে তার জন্যে মৃত্যুর শামিল ।”

“আগে তো তাকে তোমার পেতে হবে ।”

“পাবো । মনে রেখো, আমি হলাম বহুরূপী ।”

পার্ক মঁশিউ’র বৃক্ষশোভিত রাস্তাটা কোনো না কোনোভাবে একটু পরিচিত ব’লে মনে হচ্ছে । তবে এমন নয় যে, সে এই রাস্তাটা দিয়ে এর আগে হেটে গেছে । বরং, এটার পরিবেশ তার খুব চেনা চেনা লাগছে । দুই সারি চমৎকার পাথরের বাড়িঘর, চকচকে দরজা-জানালা, আলোঝলমলে ঘরদোর । ছাদ থেকে অর্কিড ঝুলে আছে । এটা ধনীদেব এলাকা । সে এরকম একটা এলাকার সাথে পরিচিত । এটা তার কাছে অন্য রকম কিছু অর্থ বহন করে ।

৭টা ৩৫ বাজে, ঠাণ্ডা মার্চের রাত, আকাশ পরিস্কার, বহুরূপী এই কাজের জন্যে একটা পোশাক পরেছে । বর্নের সোনালী চুল একটা ক্যাপে ঢাকা, তার কাঁধটা

একটা জ্যাকেটের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। সেই জ্যাকেটটার পেছনে একটা মেসেঞ্জার সার্ভিসের নাম লেখা আছে। তার কাঁধে একটা খালি ক্যানভাস ব্যাগ।

তাকে দুটি অথবা তিনটি স্টেপে যেতে হবে, যদি সে প্রয়োজন মনে করে তবে হয়তো চারটাতেও যেতে হবে। খামগুলো সত্যিকারের খাম নয়। কিন্তু ব্রশিউরগুলো বতিয়ো মোশের বিজ্ঞাপন কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয়। ওগুলো সে একটা হোটেল লবি থেকে তুলে নিয়েছে। জেনারেল ভিলিয়ার্সের বাড়ির আশেপাশে কয়েকটা বাড়ি সে বেছে নেবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে, সেই সব বাড়ির মেইল বক্সে ব্রশিউরগুলো ফেলে দেবে। যা দেখবে সবই তার চোখ রেকর্ড ক'রে রাখবে, সবকিছুর উপরে তার লক্ষ্য একটাই। ভিলিয়ার্সের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি রকম? কে জেনারেলকে গার্ড দেয় এবং কতোজন দেয়?

যেহেতু সে ধরে নিয়েছিলো হয় লোকগুলো গাড়িতে নয়তো পোস্টের সামনে হাটতে থাকবে, তাই সেরকম কাউকে দেখতে না পেয়ে খুবই অবাক হলো বর্ন। আদ্র্ণে ফ্রাঁসোয়া ভিলিয়ার্স, জাঁদরেল মিলিটারি জেনারেল, কার্লোসের ঘনিষ্ঠ একজন, তার বাড়ির বাইরে কোনো ধরণের প্রহরার ব্যবস্থা নেই। যদি তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়ে থাকে তবে সেটা কেবলমাত্র বাড়ির ভেতরেই দেয়া হয়। তার অপরাধের মাত্রার তুলনায় এরকম অরক্ষিত থাকার কারণ হতে পারে সে অনেক বেশি অহংকারী নয় তো বোকারহদ্দ।

পাশের বাড়িটার প্রবেশদ্বারের সিঁড়িতে উঠে গেলো জেসন। ভিলিয়ার্সের দরজাটা এখান থেকে বিশ ফিটের বেশি দূরে হবে না। সে দরজার ফাঁক দিয়ে ব্রশিউরটা ঢুকিয়ে দিয়ে ভিলিয়ার্সের বাড়ির জানালার দিকে তাকালো একটা মুখ, একটা মানুষ দেখার জন্যে। কাউকে দেখতে পেলো না।

বিশ ফিট দূরের দরজাটা আচম্কা খুলে গেলে বর্ন একটু নিচু হয়ে জ্যাকেটের ভেতর থেকে তার অস্ত্রটাতে হাত দিতে নিজেকে তার আস্ত একটা বোকা বলেই মনে হলো। সে যেমনটি দেখেছে আসলে তার চেয়ে বেশি কিছু আছে এখানে। কেউ এখানে নজরদারী করছে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু যে কথা সে শুনতে পেলো সেটা তাকে বলে দিলো ঘটনা সেরকম কিছু নয়। এক মধ্যবয়সী দম্পতি—ইউনিফর্ম পরিহিত মহিলা আর কালো জ্যাকেট পরা একজন পুরুষ—দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

“অ্যাস্ট্রেগুলো পরিস্কার কিনা দেখে নিও,” মহিলা বললো। “তুমি তো জানোই, উনি ছাই ভর্তি এস্ট্রে কি রকম ঘেন্না করেন।”

“উনি বিকেলে আড্ডা মেরেছেন,” লোকটা জবাব দিলো। “তার মানে ওগুলো ওঁর্তি হয়ে আছে।”

“ওগুলো গ্যারাজে নিয়ে গিয়ে পরিস্কার কোরো। তোমার হাতে সময় আছে। দশ মিনিটের আগে উনি নিচে নেমে আসবেন না। সাড়ে আটটার আগে তিনি নাঁতেরে’তে যাবেন না।”

লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জ্যাকেটের হাতা গোটাতে গোটাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। “দশ মিনিট,” সে আপন মনে বললো।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে আবাবো নিরবতা নেমে এলো আশেপাশে। জেসন উঠে দাঁড়ালো। ফুটপাথ দিয়ে হনহন ক’রে হেটে যেতে থাকা লোকটাকে দেখলো সে। নাঁতেরে জায়গাটা কোথায় সেটা সে জানে না। কেবল জানে জায়গাটা প্যারিসের কোনো মফস্বল হবে। ভিলিয়ার্স যদি সেখানে একা একা গাড়ি চালিয়ে যায় তবে ওখানে তার মুখোমুখি না হওয়ার কোনো কারণই নেই।

বর্ন তার কাঁধের ব্যাগটা অন্য কাঁধে সরিয়ে নিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে পড়লো। বাম দিকে মোড় নিয়ে রাস্তায় পা বাড়ালো। দশ মিনিট।

দরজাটা খুলে যেতেই জেসন উইন্ডশিল্ড দিয়ে জেনারেল আঁদ্রে ফ্রাঁসোয়া ভিলিয়ার্সকে দেখতে পেলো। মাঝারি উচ্চতা আর ষাট-সত্তরের মতো বয়স হবে তার। বুকটা বেশ চওড়া। মাথায় কোনো টুপি নেই, ধূসর চুলগুলো ছোটো ছোটো ক’রে কাটা। মুখে সাদা চাপ দাড়ি। তার ভাবসাব সন্দেহাতীতভাবেই সামরিক টাইপের।

বর্ন তাকে দেখে একটু অবাকই হলো, কোন্ কারণে একজন লোক কার্লোসের মতো সন্ত্রাসীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখে, ভেবে পেলো না সে। কারণ যাইহোক না কেন, সেটা হবে খুবই শক্তিশালী, যেহেতু সে নিজে খুব শক্তিশালী—সরকারের ভেতরে তার শক্ত অবস্থান রয়েছে।

ভিলিয়ার্স ঘুরলো, গৃহকর্ত্রীর সাথে কথা বলে হাত ঘড়িটা দেখে বাড়ির সামনে দাঁড় করানো বড়সড় সিডান গাড়িটার কাছে যেতেই মহিলা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলো। গাড়িতে উঠতেই সেটা সাই ক’রে চলে গেলো। গাড়িটা সামনের ডান দিকে মোড় নেবার আগপর্যন্ত জেসন অপেক্ষা করলো। তারপর সে তার রেনল্ট গাড়িটা আস্তে ক’রে চালিয়ে নিয়ে গেলো সামনের গাড়িটার পেছনে পেছনে। একটা চার রাস্তার মোড়ে এসে ভিলিয়ার্সের গাড়িটা আবাবো ডান দিকে মোড় নিলো। এই কাকতালী ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চিত একটা পরিহাস আছে, যদি কেউ এরকম কোনো কিছুতে কিশ্বাস করে তো এটা একটা ভবিষ্যৎবাণী। জেনারেল ভিলিয়ার্স নাঁতেরের যে এলাকাটা বেছে নিলো সেটার সাথে সেন জার্মেইন লায়ের অনেক মিল আছে, যেখানে বারো ঘণ্টা আগে মেরি জেসনের কাছে অনুনয়বিনয় করেছিলো সে যেনো তার জীবন নিয়ে, মেরিকে নিয়ে হাল ছেড়ে না দেয়।

এই জায়গাটা বিশাল বিশাল মাঠ আর চারপাশে চমৎকার পাহাড়ে ঘেরা। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে সব। জেসনের মনে হলো এই জায়গাটা কাউকে পথরোধ করার জন্যে বেশ উপযুক্তই হবে। গাড়িটা অনুসরণ করা জেসনের জন্যে খুব একটা কষ্টসাধ্য কাজ ব'লে মনে হচ্ছে না। তাই কোয়ার্টার মাইল দূরত্ব বজায় রেখে সে অনুসরণ করতে লগলো, কিন্তু তারপরও জেনারেলের গাড়িটা খুব সামনে দেখে সে একটু অবাকই হলো। ভিলিয়ার্স তার গাড়িটার গতি কমিয়ে রাস্তা থেকে নেমে যাওয়া বনের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া একটা পথ দিয়ে ছুটে লাগলো। পথের শেষমাথায় পার্কিংলটটার ফ্লাডলাইটের আলোয় চোখে পড়লো দুটো পোস্টের সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা একটা সাইনবোর্ডের দিকে : লাবেলোয়া। জেনারেল এই গ্রামীণ এলাকার এসেছে কোনো এক রেস্টোঁরায় ডিনার করার জন্যে।

বর্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকেই পাশের ঝোঁপে গাড়িটা আড়াল ক'রে রাখলো। তাকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তার মনে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। সেটা ক্রমশ বাড়ছে। আচম্কা সে অসাধারণ এক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

হোটেল মঁক্রজে গত রাতে বিশাল এক ধরা খেয়েছে কার্লোস। তাই মনে হচ্ছে আর্দ্রে ভিলিয়ার্সকে জরুরি এক মিটিংয়ের জন্যে ডেকে আনা হয়েছে। হয়তো কার্লোস নিজেই আছে এখানে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে জায়গাটা বেশ সুরক্ষিত আর অবশ্যই এখানে সশস্ত্র প্রাহরী আছে। তাদের কাছে হয়তো তার ছবিও আছে, তাই তাকে দেখামাত্রই সবাই চিনে ফেলবে। গুলি চালাবে সঙ্গে সঙ্গে। অন্যদিকে, কার্লোসের একটা ঘাঁটি নিজের চোখে দেখা যাবে—অথবা স্বয়ং কার্লোসকেই—এই সুযোগটা হয়তো আর কখনই আসবে না। তাকে লাবেলোয়া'র ভেতরে যেতেই হবে। ঝুঁকিটা নেবার জন্যে তার ভেতরে প্রচণ্ড তাড়া অনুভব করলো সে। যেকোনো ঝুঁকি। এটা পাগলামী! কিন্তু সে তো সুস্থও নয়। স্মৃতিভ্রষ্ট এক উন্মাদ। কার্লোস। কার্লোসকে খুঁজে বের করো! হায় ঈশ্বর, কেন?

কোমরের পিস্তলটা টের পেলো সে। জ্যাকেটের পেছনে লেখাগুলো ঢাকার জন্যে গাড়ি থেকে বের হয়ে কোটটা পরে নিলো। সিট থেকে একটা টুপি নিয়ে সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পরে নিলো যাতে তার চেহারাটা সহজে বোঝা না যায়। তার ছবিটা যখন তোলা হয়েছিলো তখন কি তার চোখে চশমা ছিলো—জেসন ভাবলো। না, ছিলো না। প্রচণ্ড মাথা ধরার কারণে সে চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিলো। চশমাটা তার শার্টের পকেটেই আছে, দরকার হলে পরে নিতে পারবে। গাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে সে বনের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলো।

জেসন যতোই সামনের দিকে এগোলো রেস্টোরার ফ্লাডলাইটের আলো বনের গাছপালা ভেদ ক'রে ততোই উজ্জ্বল হতে লাগলো। বনের শেষপ্রান্তে এসে পড়লো সে, এখান থেকে রোস্টোরার এলাকাটা শুরু হয়েছে। জায়গাটা এই গ্রামীণ রেস্টোরার পাশের একটা অংশ। সারি সারি ছোটো ছোটো জানালা রয়েছে এপাশটাতে। ভেতরে মোমবাতির আলোতে ডিনার করা লোকজনদের দেখা যাচ্ছে। এরপরই তার চোখ গেলো দ্বিতীয় তলার দিকে। এটি ভবনটার মতো সমান আকৃতির নয়, কিছুটা অংশ খোলা। সেই খোলা জায়গাটাকে বিশাল একটা বারান্দা বলেই মনে হবে যে কারোর কাছে। বারান্দাটার পাশেই সুবিশাল একটা ঘর। সেখানকার জানালা দিয়েও মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরের লোকগুলো নিচের ঘরের ডিনার করা লোকগুলো থেকে একটু আলাদা।

তারা সবাই পুরুষ, কেউ ব'সে নেই, দাঁড়িয়ে আছে নয়তো ইতস্তত হেটে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে গ্লাস, সিগারেট। কতোজন আছে সেটা বলা অসম্ভব—দশজনের বেশি হবে, তবে বিশ জনের কম। এইতো সে। একটা জটলা থেকে আরেকটা জটলার দিকে যাচ্ছে। জেনারেল ভিলিয়ার্স তাহলে সত্যি কোনো মিটিংয়ের জন্যে এখানে এসেছে। তাদের এই মিটিংটা গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় তাদের ব্যর্থতা নিয়ে, যে ব্যর্থতার কারণে কেইন নামের লোকটা এখনও বেঁচে আছে।

তাহলে অস্বাভাবিকতাটি কি? প্রহরীরা কোথায়? তারা কতোজন, কোথায় তাদের স্টেশন? বর্ন রোস্টোরার সামনের দিকে চলে এলো। কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলো সে। এবার অন্য দিক দিয়ে রোস্টোরার পেছনে চলে এলো।

সেখানকার একটা দরজা খোলা আছে। সাদা জ্যাকেট পরা এক লোক সেই দরজাটা দিয়ে বের হয়ে এলে বর্ন দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে জ্বালালো। বর্ন ডানে-বায়ে আর উপরে তাকিয়ে দেখলো, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বাইরে কোনো রক্ষীও নেই। ঠিক যেমনটি ভিলিয়ার্সের বাড়ির আশেপাশে এবং ভেতরে ছিলো না।

আরেকজন লোক দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো। সেও সাদা জ্যাকেট পরে আছে। তবে মাথায় শেফের টুপি। তার কণ্ঠস্বরটা খুবই রাগী। তার ফরাসি উচ্চারণে গ্যাসকোনি টান আছে। “তুমি আয়েশ ক'রে সিগারেট খাচ্ছে! আর আমরা কাজ করতে করতে ঘেমে উঠছি! পেস্ট্রির কার্টটা তো একেবারেই খালি। সেটা এক্ষুণি ভরো, বানচোত!”

পেস্ট্রির লোকটা ঘুরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেটটা ফেলে ভেতরে চলে গেলো। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে ভেতরের আলোটা আর দেখা গেলো না। রইলো শুধু চাঁদের আলো। সেই আলোতে বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই সেখানে। কেউ পাহারাও দিচ্ছে না। এমন কি বিশাল দরজাটার সামনেও।

কার্লোস । কার্লোসকে খুঁজে বের করো । ফাঁদে ফেলো তাকে ।

সে এখন ভবনটার সামনের অংশ থেকে চল্লিশ ফিটেরও কম দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আর উপরের বিশাল বারান্দাটার রেলিং থেকে দশ ফিট নিচে । বাইরের দেয়ালে দুটো ভেন্টিলেটর আছে ধোঁয়া বের হবার জন্যে । সেগুলোর পাশেই আছে একটা ড্রেন পাইপ । সেটা চলে গেছে রেলিং পর্যন্ত । সে এই পাইপ বেয়ে উঠতে পারবে, তবে কোট পরে নয়, তাই জেসন কোটটা এবং টুপিটা খুলে পায়ের কাছে রেখে ঘাস দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিলো । এবার সে পাইপটা বেয়ে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে উঠে যেতে লাগলো । রেলিং থেকে যখন মাত্র আঠারো ইঞ্চি দূরে তখনই নিচের দরজাটা ধপাস ক'রে খুলে গেলো । এক লোক বের হয়ে এলো টলতে টলতে । তার পেছন পেছন সেই সাদা টুপি পরা শেফ । সে চিৎকার করছে ।

“বানচোত! তুমি হলে মাতাল, বুঝলে, আস্ত একটা মাতাল! সারা রাত ধরে তুমি মদ খেয়েছো! ডাইনিং রুমের মেঝে জুড়ে পেস্টি পড়ে আছে । সব কিছু তছনছ হয়ে আছে । বের হয়ে যাও ।”

দরজাটা ধপাস ক'রে বন্ধ হয়ে গেলো আবার । জেসন এতক্ষণ ধরে পাইপে ঝুলে রইলো । তার পা আর হাত ব্যথা করছে । যেমে উঠছে কপাল । নিচের মাতাল লোকটা শেফের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অশ্লীল কিছু একটা দেখালো কিন্তু বুঝতে পারলো লোকটা সেখানে নেই । তার চোখ ঘুরতে ঘুরতে দেয়ালের দিকে গেলো । বর্নের দিকে চোখ পড়তেই সে চোখ পিট পিট ক'রে আবারো তাকালো । জেসনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো । লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করলো । চোখ দুটো বন্ধ ক'রে আবারো তাকালো । তারপর যেনো অনেকটা নিশ্চিত হলো দেয়ালের দৃশ্যটা আসলে তার অতিরিক্ত মদের কুপ্রভাব । সে ঘুরে চলে যেতে গেলো ।

বর্ন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো । পুণরায় ওঠার জন্যে উদ্যত হতেই তার স্বস্তিটা তিরোহিত হলো । তার পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে । ব্যথাটা অগ্রাহ্য করেই রেলিংয়ের একটা বার ধরতে পারলে খুব সহজেই বারান্দায় উঠে এলো । বারান্দাটা একেবারে ফাঁকা ।

এই বারান্দাটা বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে ডাইনিং করার জন্যে বানানো হয়েছে । দশ থেকে পনেরোটি টেবিল রাখার ব্যবস্থা আছে সেখানে । বারান্দার মাঝখানে বড় দরজাটা সে নিচের বন থেকে দেখেছে । ভেতরের মানুষগুলো এখন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে । কয়েক মুহূর্তের জন্যে জেসনের মনে হলো কোনো এলার্ম বেজেছে কিনা—নাকি তারা তার জন্যেই অপেক্ষা করছে । সে নিজের অস্ত্রটাতে হাত রাখলো । একটুও নড়লো না । কিন্তু কিছুই হলো না । চুপিসারে সে দরজার দিকে এগোলো । দরজার কাঁচের প্যানটার দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলো সে ।

যা দেখতে পেলো সেটা তাকে সম্মোহিত করলো, তবে মোটেও ভীতিকর কিছু নয়। লোকগুলো সারি ক’রে দাঁড়িয়ে আছে—তিনটি সারি। একেক সারিতে চারজন করে—সবাই আদ্র্ণে ভিলিয়ার্সের দিকে তাকিয়ে আছে। সে সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে তেরোজন লোক, বারোজন লোক কেবল দাঁড়িয়ে নেই বরং সামরিক প্যারেডের মতো এটেনশন হয়ে আছে। সবাই বৃদ্ধলোক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। কেউই ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় নেই। তার বদলে প্রত্যেকের কলারেই রিবন আর রেজিমেন্টাল র‍্যাঙ্কের স্মারক লাগানো আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা সবাই কমান্ড করতে অভ্যস্ত—ক্ষমতাবান। এই সব লোক যদি কার্লোসের চালা হয়ে থাকে তবে বলতেই হয়, কার্লোসের রিসোর্স একেবারেই অসাধারণ আর মারাত্মকভাবেই বিপজ্জনক।

আলজেরিয়ার উন্মাদ কর্নেল—তাদের আর কি আছে? যে স্মৃতি নিয়ে তারা তাড়িত হচ্ছে সেটার অস্তিত্ব নেই। যে যুদ্ধের কথা তারা স্মরণ করে সেটা আর চলছে না। অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

জেনারেল তার কণ্ঠটা চড়া করলে জেসন কাঁচের ওপর পাশ থেকে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলো। কথাগুলো এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

“...আমাদের উপস্থিতি, আমাদের উদ্দেশ্য, সবই বোধগম্য। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি আমাদের নীতির পক্ষে, আর এই ঐক্য খুবই দৃঢ়। আমাদের কথা শুনতে হবে! আমাদের যেসব ভাই দেশমাতৃকার জন্যে জীবন দিয়েছে তাদের স্মরণে বলছি, আমরা আমাদের দেশকে বাধ্য করবো তাদেরকে স্মরণ করতে। যারা আমাদের বিরোধীতা করে তারা আমাদের শক্তি সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই অবগত আছে। আমরা এখন ঐক্যবদ্ধ। আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছি যারা আমাদের আগে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তারা যেনো শান্তিতে থাকে। আর আমরা, আমরা এখনও যুদ্ধের মধ্যে আছি...বন্ধুগণ : আমি আপনাদেরকে আমাদের লেডি অব ফ্রান্সকে দেবো!”

এক সঙ্গে সবাই সম্মতিসূচক ধ্বনি তুললো। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাঝ থেকে আরেকটা কণ্ঠ উচ্চারিত হলো। তার সাথে বাকিরা তাল মেলালো। সেটা একটা গানের অংশ।

আলোয়্যাঁ এফোঁয়া দ্য লা পাত্রি,
লো জুখ দ্য গ্লোয়ে এন্তে এরাইভ...

বর্ন মুখটা সরিয়ে ফেললো। ঘরের ভেতরের কথাবার্তা আর দৃশ্যে সে অসুস্থ বোধ করলো। গৌরবের জন্যে জীবন বিসর্জন দাও। সহযোদ্ধার মৃত্যু আরো বেশি আত্মত্যাগ দাবি করে। এর দরকার আছে। এর মানে যদি হয় কার্লোসের সাথে আঁতাত তবে তাই হোক।

কোন জিনিসটা তাকে এতোটাইব্রত করলো? আচমকা কেন তার মধ্যে ক্রোধ আর হতাশা ভর করলো? তার ভেতরে কোন প্রণোদনা তাকে তাড়িত করলো? এরপরই সে বুঝতে পারলো। সে আদ্র্ণে ভিলিয়ান্সের মতো লোককে, এই ঘরের সব লোকগুলোকে ঘৃণা করে। তারা সবাই যুদ্ধ করে। তরুণদের কাছ থেকে তাদের জীবন চুরি করে...খুবই অল্পবয়সীদেরও।

কুয়াশাটা কেন আবার তাকে জাপটে ধরছে? তীব্র যন্ত্রণাটা কেন আবার ফিরে এলো? প্রশ্ন করার কোনো সময় এখন নয়। সেগুলো সহ্য করার মতো শক্তিও নেই। তাকে এসব তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, আদ্র্ণে ভিলিয়ান্সের ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। যার সাথে এক কুখ্যাত গুণ্ডাঘাতকের সম্পর্ক রয়েছে।

সে জেনারেলকে ফাঁদে ফেলবে। তাকে সব কিছু বলতে বাধ্য করবে। সে যা জানে তার সবই সে জেনে নেবে, হয়তো তাকে খুনও করবে। ভিলিয়ান্সের লোকেরা অল্পবয়সীদের কাছ থেকে তাদের মূল্যবান যৌবন চুরি করে। খুবই অল্প বয়সীদের কাছ থেকে। তারা বেঁচে থাকার আশা করতে পারে না। আমি আবাবো আমার গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছি, দেয়ালগুলোতে কাটা লাগানো। ওহ্ , ঈশ্বর, ওগুলো খুব কষ্ট দিচ্ছে আমাকে।

জেসন পাইপ বেয়ে নিচে নেমে গেলো। নামার সময় তার সমস্ত শরীরে সুতীব্র ব্যথা অনুভূত হলো। এসব ব্যথা এড়িয়ে তাকে এখন এই চাঁদের আলোয় পথে নামতে হবে, মৃত্যুর ফেরিওয়ালাকে ফাঁদে ফেলতে হবে।

অধ্যায় ২৫

রেস্তোরার প্রবেশপথ থেকে দূশ' গজ দক্ষিণে রেনল্ট গাড়িতে বর্ন অপেক্ষা করছে। গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই ভিলিয়ার্সকে সে দেখলো ড্রাইভিং সিটে। বাকিরাও একে একে যার গাড়িতে ক'রে চলে গেছে ইতিমধ্যেই। ষড়যন্ত্রকারীরা বিজ্ঞাপন ক'রে বেড়ায় না। আর বৃদ্ধ লোকটি হলো একেবারে খাঁটি একজন ষড়যন্ত্রকারী।

এইতো, গাড়িটার হেডলাইট জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। নিজের গাড়ির হেডলাইটটা বন্ধ রেখে জেসন পিছু নিতে শুরু করলো। কিছু দূর যাবার পর গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো জেসন। নিরিবিবি গ্রামীণ এলাকাটা দুই মাইল সামনেই। সেখানে তাকে খুব দ্রুত পৌছাতে হবে।

এগারোটা দশ বাজে। তিন ঘণ্টা আগে চাঁদের আলোতে এই পাহাড় আর খোলা প্রান্তর ভেসে গিয়েছিলো। এখন সেই চাঁদটা ঠিক আকাশের মাঝখানে। সে পৌছে গেলো। জায়গাটা তার কাজের জন্যে খুবই কার্যকরী হবে। এখন প্রশ্ন হলো ভিলিয়ার্সের গাড়িটা কিভাবে থামানো যায়। জেনারেল বৃদ্ধ হলেও দুর্বল নয়। যদি কোনোভাবে বুঝে ফেলতে পারে, তবে ঘাসের উপর দিয়েই দৌড়ে পালাবে। সবকিছুই টাইমিংয়ের উপর নির্ভর করছে।

বর্ন তার রেনল্ট গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটিয়ে আচম্কা ইউ-টার্ন নিলো। অপেক্ষা করতে লাগলো হেডলাইটের আলো দেখার জন্যে। দূরে হেডলাইটটা দেখতে পেয়ে নিজের গাড়ির এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে স্টিয়ারিংটা এপাশওপাশ করতে করতে এগোলো সে। যেনো নিয়ন্ত্রণহীন কোনো ড্রাইভার গাড়িটা চালাচ্ছে। সোজা চালাতে পারছে না কোনোভাবেই। কিন্তু গতি ঠিকই বজায় আছে।

ভিলিয়ার্সের কোনো উপায় রইলো না। তার দিকে জেসনের গাড়িটা পাগলের মতো ছুটে আসতেই নিজের গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো। যখন দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে মাত্র বিশ ফিট বাকি তখনই জেসন আচম্কা গাড়িটা বাম দিকে ঘুরিয়ে ফেলে ব্রেক কষলো সঙ্গে সঙ্গে। পিচঢালা পথে টায়ারের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। তার গাড়িটা থেমে গেলে সে জানালা খুলে একটা আত্নানাদ করলো। সেটা না চিৎকার না কান্না। কোনো অসুস্থ লোক অথবা মাতালের কণ্ঠের মতো শোনালো। তবে তাতে কোনো ভীতিকর কিছু নেই। সে জানালায় কাঁচে হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। তার কোলে অস্ত্রটা।

ভিলিয়ার্সের গাড়ির দরজার শব্দটা সে শুনতে পেলো! বৃদ্ধ লোকটার হাতে কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় সে কোনো সন্দেহ করে নি। সংঘর্ষটা হয় নি ব'লে স্বস্তিবোধ করছে। জেনারেল নিজের গাড়ির হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রেখেই রেনল্টের বাম দিকের জানালার সামনে এসে হাজির হলো। তার কণ্ঠে উদ্ভিন্নতা।

“এসবের মানে কি? তুমি করছোটা কি? ঠিক আছো তো?” সে ফরাসিতে বলে বর্নের গাড়ির জানালার উপর হাত রাখলো।

“হ্যা, কিন্তু আপনি ঠিক নেই,” বর্ন ইংরেজিতে বললো অস্ত্রটা তাক ক'রে।

“কি...” বৃদ্ধ লোকটা আতকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। “তুমি কে, এসব কি?”

জেসন অস্ত্রসহ গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। “আপনার ইংরেজি বেশ ভালো দেখে আমি খুব খুশি হলাম। নিজের গাড়ির দিকে যান। সেটা রাস্তা থেকে নামিয়ে রাখুন।”

“যদি তা না করি?”

“এক্ষুণি আপনাকে খুন করবো আমি। আমাকে ক্ষ্যাপাতে খুব বেশি কিছু লাগে না।”

“তুমি কি রেড ব্লেড-এর লোক? অথবা বাদের মেইনহফের প্যারিস শাখার কেউ?”

“কেন? সেরকম কিছু হলে কি আপনি খুশি হবেন?”

“আমি তাদের থুথু দেই! তোমাকেও!”

“আপনার সাহস নিয়ে কেউ কোনো দিন সন্দেহ করে নি, জেনারেল। গাড়ির দিকে যান।”

“এটা সাহসের কোনো ব্যাপার নয়!” ভিলিয়ার্স একটুও না নড়ে বললো। “এটা যুক্তির কথা। আমাকে খুন ক'রে তুমি কিছুই অর্জন করতে পারবে না, অপহরণ ক'রে আরো কম অর্জন করবে। আমার পরিস্কার আদেশ দেয়া আছে। আমার স্টাফ আর পরিবার সেটা বেশ ভালোভাবেই বোঝে। ইসরায়েলিরা একদম ঠিক বলেছিলো। সন্ত্রাসীদের সাথে কোনো সমঝোতা নয়। বানচোত, তোমার অস্ত্রটা ব্যবহার করো! না হলে এখান থেকে এক্ষুণি চলে যাও!”

জেসন লোকটার দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো। “রেস্তোরার বলছিলেন ফ্রান্স কারোর তল্লিবাহক হবে না। কিন্তু সেই ফ্রান্সেরই এক জেনারেল অন্য একজনের তল্লিবাহক। জেনারেল আঁদ্রে ভিলিয়ার্স, কার্লোসের একজন মেসেঞ্জার। কার্লোসের সৈনিক, কার্লোসের সংযোগ। কার্লোসের তল্লিবাহক।”

ক্ষুদ্র দৃষ্টিটা আরো প্রসারিত হয়ে গেলো। তবে জেসন যে রকমটি আশা করেছিলো সেরকম নয়। স্কোভটা আচম্কা ঘৃণায় বদলে গেলো। কোনো হিস্টরিয়াগ্রাফ নয়, শুধু গভীর ঘৃণা। ভিলিয়ার্স সোজা বর্নের গালে একটা চড় বসিয়ে

দিলো। তারপর আরেকটা। থাপ্পরটার জোর এতোই বেশি যে, জেসন নিজের পায়ের ভারসাম্য রাখতে হিমশিম খেলো। বৃদ্ধলোকটা আরো এগিয়ে এলো, জেসনের হাতের অঙ্গটা সে গ্রাহ্যই করছে না। সোজা ঘুষি মারলো। পরপর কয়েকটা।

“শুয়োরের বাচ্চা!” চিৎকার ক’রে ভিলিয়ার্স বললো। “জঘন্য, নোংরা শুয়োর। বানচোত কোথাকার!”

“আমি গুলি করবো! খুন করবো! থামুন! থামুন!” বর্ন ট্গার টিপতে পারলো না, নিজের গাড়ির দিকে ফিরে গেলে তার কাঁধ গাড়িটার ছাদে চেপে ধরলো বৃদ্ধলোকটা, তার হাত দুটো এলোপাতারি চলতে লাগলো অজেসন বর্নের উপর।

“পারলে তাই কর—আস্পর্শ কতো! নোংরা! নর্দমার কীট!”

জেসন অঙ্গটা মাটিতে ফেলে হাত দুটো দিয়ে বৃদ্ধের মারগুলো আঁটকাতে লাগলো। তার উপর আক্রমণ! আচমকা সে বাম হাত দিয়ে বুড়োর ডান হাতের কজিটা ধরেই উল্টোদিকে মোচড় মারলো। ভিলিয়ার্স হঠাৎ এই আক্রমণে ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। হাতটার নাজুক অবস্থানের কারণে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লো। একটুও নড়লো না। তাদের দু’জনের মুখ একেবারে কাছাকাছি। মাত্র এক ইঞ্চি দূরত্বে।

“আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি কার্লোসের লোক নন? আপনি এটা অস্বীকার করছেন?”

ভিলিয়ার্স সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। বর্নের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়াতে চাইছে। তার চওড়া বুকটা দিয়ে জেসনের বুক জোরে আঘাত করলো সে। “আমি তোঁর বারোটা বাজাবো! শুয়োরের বাচ্চা!”

“আরে—হ্যাঁ অথবা না?”

বুড়ো একদলা থুথু মেরে বসলো বর্নের মুখের উপর। তার চোখের আগুনটা এখন কুয়াশা হয়ে গেছে, অশ্রু ছল ছল করছে।

“কার্লোস আমার ছেলেকে খুন করেছে,” ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বললো সে। “সে আমার একমাত্র ছেলেকে রুই দুবাকে খুন করেছে। আমার ছেলের জীবনটা ডিনামাইট দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে!”

জেসন আস্তে আস্তে তার হাতটা ছেড়ে দিলো। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সে শান্ত কণ্ঠে বললো। “গাড়িটা নিয়ে মাঠের ওখানে যান; আমাদেরকে কথা বলতে হবে, জেনারেল। কিছু একটা ঘটেছে যা আপনি জানেন না। আমাদের দু’জনেরই সেটা জানা উচিত।”

“কখনও না। অসম্ভব! কোনো কিছু ঘটে নি!”

“ঘটেছে,” বর্ন সিডানের সামনের সিটে ভিলিয়ার্সের পাশে ব’সে বললো।

“অবিশ্বাস্য একটা ভুল হয়ে গেছে! তুমি জানো না তুমি কি বলছো!”

“কোনো ভুল নয়—আমি কি বলছি সেটা আমি জানি, কারণ আমি নিজে নাম্বারটা খুঁজে পেয়েছি। এটা কেবল সঠিক নাম্বারই নয়, বরং চমৎকার একটি আড়াল। কোনো সুস্থ মানুষ আপনাকে কার্লোসের সাথে সম্পর্কিত করতেও সাহস করবে না। বিশেষ ক’রে আপনার ছেলের মৃত্যুর ঘটনাটা জানার পর। সে যে কার্লোসের হাতে মারা গেছে সেটা কি নিশ্চিত?”

“হ্যা। সুরেতও সেটা জানে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এবং ইন্টারপোলও নিশ্চিত। আমি নিজে রিপোর্টগুলো পড়েছি।”

“তাতে কি বলা ছিলো?”

“কার্লোস তার এক বন্ধুর হয়ে এই কাজটা করেছে। তখন সে রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলো। তুমি তো জানোই, আমার ছেলে উগ্রপন্থীদের বিরোধীতা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে।”

“উগ্রপন্থী?”

“উগ্রপন্থীরা সমাজতান্ত্রিকদের সাথে একটা অদ্ভুত কোয়ালিশন করেছিলো। আমার ছেলে এটা প্রকাশ ক’রে দিলে তারা তাকে খুন করে।”

“এজন্যেই কি আপনি আর্মি ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন?”

“অবশ্যই। বাবার কাজ ছেলে বহন করে, এটাই নিয়ম, কিন্তু আমার বেলায় হয়েছে উল্টো। আমি আমার ছেলের কাজ সমাধা করছি। সে কোনো সৈনিক ছিলো না, আমিও কোনো রাজনীতিবিদ নই। তবে আমি অস্ত্র আর বিস্ফোরকের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ না। সে আমার ধ্যানধারণা পোষণ করতো, আমার দর্শনকে গ্রহণ করেছিলো, আর এসবের জন্যই সে খুন হয়েছে। আমার কাছে আমার সিদ্ধান্তটা খুব পরিষ্কার। আমি আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে ধারণ করবো, রাজনীতিতে সেটা প্রতিষ্ঠিত করবো, আর তার শত্রুদেরকে মোকাবেলা করবো। সৈনিকেরা লড়াই করে, বুঝলে।”

“একজন সৈনিক তাহলে পেলাম।”

“কি বললে?”

“কিছু না।” বর্ন একটু থেমে আবার বলতে লাগলো। “রেস্তোরার ঐ লোকগুলো। তাদের দেখে মনে হলো তারাই ফ্রান্সের অর্ধেক আর্মি চালাতো।”

“তাই করতো তারা, মঁসিয়ে। তারা এক সময়ে সেন সায়াস-এর রাগী-তরুণ কমান্ডার নামে পরিচিত ছিলো। এই রিপাবলিকটা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, মিলিটারি হয়ে গেছে অযোগ্য। তাদের কথা যদি ফ্রান্স শুনতো তবে ফ্রান্সের আজ এই পতন হতো না। তারা ছিলো প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতা। তারা ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ করেছে। আফ্রিকায় যুদ্ধ করেছে।”

“তারা এখন কি করে?”

“বেশির ভাগই পেনশনে চলে, অনেকেই অতীত নিয়ে মোহাবিষ্ট। তারা মেরির কাছে প্রার্থনা করে এটা যেনো আবার না ঘটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারা এটা

ঘটতে দেখছে। মিলিটারিকে ছেটেছুটে পশু ক'রে ফেলা হয়েছে। কমিউনিস্ট আর সোশালিস্টরা পার্লামেন্ট জেঁকে ব'সে আছে। তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মস্কো এখানে কলকাঠি নাড়ে। একযুগেও এটা বদলাবে না। সর্বত্রই চলছে ষড়যন্ত্র। এটা এভাবে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া যায় না।”

“কেউ হয়তো এটাকে খুবই চরমপন্থী হিসেবে দেখবে।”

“কিসের জন্যে? বেঁচে থাকার জন্যে? শক্তি? সম্মান? এইসব শব্দ কি, তোমার কাছে পুরনো ব'লে মনে হয়?”

“আমি তা মনে করি না। তবে আমি বলতে পারি সেসবের দোহাই দিয়ে অনেক ক্ষতি করা হয়ে গেছে।”

“আমাদের দর্শন ভিন্ন কথা বলে, আর আমি সেসব নিয়ে তর্ক করতে পরোয়া করি না। তুমি আমার সহকর্মীদের কথা জানতে চেয়েছো, আমি বলেছি, এবার তোমার সম্পর্কে আমাকে বলো। তুমি জানো না পুত্র হারানোর শোক কেমন।”

তীব্র যন্ত্রণাটা ফিরে এলো। কিন্তু সে জানে না কেন।

“আমি সমব্যাধি হতে পারি,” জেসন বললো। “তবে এটা খাপ খেয়ে যায়।”

“তাৎক্ষণিকভাবে নয়! যেমনটি তুমি বললে। সুস্থ কোনো লোক আমাকে কার্লোসের সাথে ভাববে না। ঐ খুনি নিজেও তা ভাববে না। এই ঝুঁকিটা সে নেবে না। এটা অচিন্তনীয়।”

“একদম ঠিক। এজন্যেই আপনাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অচিন্তনীয়। আপনি হলেন চূড়ান্ত নির্দেশ দেবার মোক্ষম মাধ্যম।”

“অসম্ভব। কিভাবে?”

“আপনার ফোনে কেউ পরোক্ষভাবে, কোড ব্যবহার ক'রে কার্লোসের সাথে যোগাযোগ করে। নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয় সেই লোকটাকে ফোনে পাবার জন্যে। সম্ভবত যখন আপনি না থাকেন। আবার হয়তো আপনি থাকলেও সেটা করা হয়। আপনি কি নিজে আপনার ফোন ধরেন?”

ভিলিয়ার্স ভুরু তুললো। “আসলে আমি ধরি না। সেই নাম্বারটা তো নয়ই। অনেককেই তো এড়াতে হয়। আমার একটা প্রাইভেট লাইন আছে।”

“সেটা ধরে কে?”

“সাধারণত হাউজকিপার। অথবা তার স্বামী, সে বাটলার হিসেবে কাজ করে। আবার আমার ড্রাইভারও সে। আর্মিতে শেষ কয় বছর সে আমার ড্রাইভার ছিলো। তাদের কেউ না ধরলে আমার বউ ধরে। অথবা আমার সহকারী। প্রায়ই সে আমার বাড়িতে এসে কাজ করে। বিশ বছর ধরে সে আমার এডজুটেন্ট।”

“আর কে?”

“আর কেউ নেই।”

“গৃহপরিচারিকারা?”

“কেউই স্থায়ী নয়। তাদের দরকার হলে কিছু সময়ের জন্যে ভাড়া নেয়া হয়। ব্যাংকের সম্পদের চেয়ে ভিলিয়ার্সের নামের মধ্যে যে সম্পদ, তা অনেক বেশি।”

“পরিস্কার করে কয়জন মেয়ে?”

“দু’জন। তারা সপ্তাহে দু’বার আসে। তবে সবসময় একই লোক আসে না।”

“আপনার এডজুস্টেন্ট এবং ড্রাইভারের উপর নজর রাখুন।”

হাস্যকর! তাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত।

“ক্রুটাসেরও তাই ছিলো,” জেসন বললো।

“তুমি কি সিরিয়াস?”

“আমি খুবই সিরিয়াস। আপনাকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে। আমি যা বলছি সবই সত্যি।”

“তাহলে তুমি আমাকে সব বলো নি। বলেছো কি? যেমন তোমার নাম।”

“এটা খুব একটা জরুরি নয়। মনে রাখবেন, সব জানলে আপনি কষ্টই পাবেন।”

“কিভাবে?”

“আমি কার্লোসের অনুচরের ব্যাপারে মনে হয় না খুব বেশি ভুল করেছি—এ সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।”

বৃদ্ধলোক মাথা নেড়ে সায় দিলো। “এক নামহীন লোক আমাকে পথে ফাঁদে ফেলে অস্ত্রের মুখে এক অশ্লীল অভিযোগ তুলছে—আর সে আশা করছে আমি তার কথা মেনে নেবো। নামহীন এক লোকের কথা। যার চেহারাও আমি চিনি না। কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও নেই তার কাছে, কেবল বলছে কার্লোস তাকে খুন করতে মরিয়া হয়ে আছে। বলো, আমি কেন সেই লোকটাকে বিশ্বাস করবো?”

“কারণ,” বর্ন বললো। “সে যদি সেটা বিশ্বাস না করতো তবে সে আপনার কাছে আসার কোনো কারণই খুঁজে পেতো না।”

ভিলিয়ার্স জেসনের দিকে চেয়ে রইলো। “না, তার চেয়ে ভালো কারণ আছে। একটু আগে তুমি আমাকে আমার জীবন দিয়েছো। তুমি অস্ত্রটা ফেলে দিয়েছো, গুলি করো নি। কিন্তু ইচ্ছে করলেই সেটা তুমি করতে পারতে। খুব সহজেই। তবে আমি দেখেছি, তোমার চোখে ছিলো আমার সাথে কথা বলার আকুতি।”

“আমার মনে হয় না আমি কোনো আকুতি জানিয়েছি।”

“তোমার চোখে সেটা ছিলো। সব সময় চোখেই থাকে। খুব কমই সেটা মুখে বলা হয়। তোমার রাগটাও সত্যি ছিলো...আমারটার মতো।” বুড়ো এবার রাস্তা থেকে দশ গজ দূরে রেনল্ট গাড়িটার দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো। “আমার সাথে পার্ক মঁশিউতে আসো। আমার অফিসেই বাকি কথাগুলো বলবো। আমি কসম খেয়ে বলছি তুমি ঐ দু’জন সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছো। সিজার ক্রুটাসের ব্যাপারে অন্ধ ছিলো। আমি তা নই।”

“আমাকে যদি আপনার বাড়িতে যাবার সময় কেউ দেখে ফেলে তবে আমি খুন হয়ে যাবো। আপনিও।”

“আমার সহকারী আর ড্রাইভার চলে গেছে। তারা সকালের আগে আর বাড়িতে আসবে না। তারপরও, তুমি বাড়ির বাইরে থেকো। আমি ভেতরটা চেক করে দেখে এসে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাবো। আর যদি ভেতরে নিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু দেখি তবে বাড়িতে নেবো না তোমাকে। আমি বের হয়ে এসে গাড়ি নিয়ে চলে যাবো, তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। তারপর এক জায়গায় এসে আমরা থামবো। কথা বলবো।”

“আপনি কেন আমাকে পার্ক মঁশিউ’তে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?”

“তাহলে আর কোথায় নিয়ে যাবো? আমি অপ্রত্যাশিত মুখোমুখি হবার যে আশ্চর্য ওঠা তাতে বিশ্বাস করি। আরো একটা কারণও আছে। তুমি যা বললে আমি চাই আমার বউও সেটা শুনুক। সেও একজন নারী যোদ্ধা ছিলো। তার এমন এনটেনা আছে যা ফিল্ডর অফিসারের কাছে ধরা না পড়লেও তার কাছে ধরা পড়ে যায়। আমি তার বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করি। তোমার কথা শোনার পর সে হয়তো আচরণের কোনো ধরণ সম্পর্কে কিছু ধরতে পারবে।”

বর্নকে কথাটা বলতেই হলো। “আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলেছি একটা ভান করে। আপনি আমাকে আরেকটা ভান করে ফাঁদে ফেলতে পারেন। আমি কি করে জানবো পার্ক মঁশিউ কোনো ফাঁদ নয়?”

বৃদ্ধলোকটি একটুও ইতস্তত করলো না। “ফ্রান্সের একজন জেনারেল তোমাকে কথা দিচ্ছে। তোমার আর কি চাই। সেটা যদি তোমার কাছে যথেষ্ট বলে মনে না হয় তবে অস্ত্রটা নিয়ে কেটে পড়ো।”

“যথেষ্ট বলেই মনে হচ্ছে,” বর্ন বললো। “এজন্যে নয় যে, এটা একজন জেনারেলের কথা, বরং এটা এমন একজন লোকের কথা যার ছেলে রুই দুবাকে নিহত হয়েছে।”

প্যারিসে ফিরে আসার ভ্রমণটা জেসনের কাছে খুব দীর্ঘ বলে মনে হলো। তার মাথায় অসংখ্য ইমেজ হুড়োহুড়ি করেছে। সারা শরীর ঘেমে উঠছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়ে সেটা বুক থেকে পেটে গিয়ে গিট পাকালো। তার চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে।

আকাশে মৃত্যু...আকাশ থেকে। অন্ধকার নয়, চোখ ঝলসানো আলো। অরণ্যের নিরবতা...নদীর তীর। পাখির কিচির মিচির ডাকের পরই মেশিনের শব্দ। পাখি...মেশিন...আকাশ থেকে নেমে আসছে, চোখ ঝলসানো আলো। বিস্ফোরণ। মৃত্যু। অল্পবয়সীদের। খুবই অল্পবয়সীদের।

বন্ধ করো! স্টিয়ারিংটা ধরো! রাস্তার দিকে মনোযোগ দাও! কিছু ভেবো না! ভাবনটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক আর তুমি জানো না কেন।

তারা পার্ক দু'মশিউর বৃক্ষশোভিন লাইনে প্রবেশ করলো। ভিলিয়ার্সের গাড়িটা একশো ফিট সামনে। জেনারেলের বাড়ির বাম দিকে একটা খালি জায়গা আছে। সেই জায়গাটাতে তাদের দু'জনের গাড়ির স্থান সংকুলান হবে। ভিলিয়ার্স জানালা দিয়ে হাত বের ক'রে ইশারা করলো, জেসন যেনো তার পেছনে থাকে।

তারপরই জেসন দেখতে পেলো। প্রবেশপথের আলোর দিকে গেলো তাকালো সে। সেখানে একটা অবয়ব। সেই দৃশ্যটা এতোটাই চমকে যাবার মতো যে, তার হাতটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্ত্রের দিকে চলে গেলো।

তাকে তাহলে একটা ফাঁদে টেনে আনা হয়েছে? ফ্রান্সের জেনারেলের প্রতিশ্রুতি তাহলে একেবারেই মূল্যহীন?

ভিলিয়ার্স তার সিডানটা জায়গা মতো রাখলে বর্ন চারপাশে তাকালো। কেউ তার দিকে আসছে না। ধারে কাছেও কেউ নেই। এটা কোনো ফাঁদ নয়। এটা অন্য কিছু। বুড়ো সৈনিক যা জানে না এটা তারই একটা অংশ।

ভিলিয়ার্সের দরজার সামনে সিঁড়িতে এক অল্পবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে; খুবই আকর্ষণীয় এক মেয়ে। সে বিরতিহীন কথা বলে যাচ্ছে। সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে উদ্বিগ্নভাবে কিছু বলছে। লোকটা এমনভাবে মাথা নাড়ছে যেনো সব নির্দেশনা মেনে নিচ্ছে সে। এই লোকটা হলো লো ক্লাসিক-এর সুইচবোর্ডের ধূসর চুলের লোকটা। এই মুখটা জেসন খুব ভালো করেই চেনে। যদিও তাকে জানে না। এই মুখটা অন্য অনেকগুলো ছবি উস্কে দিলো...ছবিগুলো এতোটা হিংস্র আর মন্ত্রণাদায়ক যে, তাকে গত আধঘণ্টা ধরে রেনল্ট গাড়িতে সেটা কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে।

কিন্তু এটা আলাদা। এই মুখটা একটা ঘন অরণ্য আর রাতের আকাশের ছবি নিয়ে এলো। একের পর এক বিস্ফোরণ। বিরামহীন গুলির শব্দ।

বর্ন দরজার দিকে থেকে চোখটা সরিয়ে উইন্ডশিল্ড দিয়ে ভিলিয়ার্সের দিকে তাকালো। জেনারেল হেডলাইটটা বন্ধ ক'রে গাড়ি থেকে বের হচ্ছে। জেসন তার গাড়িটা নিয়ে জেনারেলের গাড়ির পেছনের বাম্পারে আলতো ক'রে আঘাত করলে জেনারেল পেছনে ফিরে তাকালো। জেসন তার হেডলাইটটা বন্ধ ক'রে ভেতরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে হাত উঁচিয়ে ধরলো—হাতের তালু নিচের দিকে তারপর সেটা দু'বার তুলে ধরলো। বুড়ো সৈনিককে বোঝাতে চাইলো গাড়িতেই যেনো থাকে সে। ভিলিয়ার্স মাথা নেড়ে সায় দিলে জেসন ভেতরের বাতিটা নিভিয়ে দিলো।

সে আবার প্রবেশদ্বারের সামনে তাকালো। লোকটা দুয়েক ধাপ নেমে এসে মেয়েটার কথা শুনছে। বর্ন এবার মেয়েটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। মধ্য বয়সী হবে। ছোটো ছোটো ক'রে তার কালো চুলগুলো বেশ স্টাইল ক'রে কাটা। গায়ের চামড়া সূর্যের আলোতে পোড়ানো। মেয়েটা বেশ লম্বা। তার দেহ ক্ষীণ, লম্বা টাইট ফিটিং পোশাকটা ভেদ ক'রে সুডৌল স্তন জোড়া বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে।

মেয়েটা যদি ভিলিয়ার্সের বাড়ির কেউ হয়ে থাকে তবে সে তার কথা উল্লেখ করে নি। তার মানে সে বাড়ির কেউ না। সে একজন অতিথি। সে জানে বুড়ো লোকটার বাড়িতে কখন আসতে হয়। এটা অনুচর থেকে অনুচর-এর কৌশলটার সাথে মিলে যায়। তার মানে মেয়েটার সাথে ভিলিয়ার্সের বাড়ির যোগাযোগ আছে। বুড়ো তাকে চিনবে। কিন্তু কতোটা ভালো ক'রে? জবাবটা অবশ্যই ভালো হবে না।

ধূসর চুলের সুইচবোর্ড অপারেটর শেষবার মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়ে পথের দিকে পা বাড়ালে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। বাড়ির দরজার সামনের সিঁড়িটার দিকে বর্ন তাকালো।

কেন এই বাড়ির সিঁড়ি আর দরজাটা তার কাছে অন্যকিছু মনে হচ্ছে? ছবিগুলো। বাস্তবিকই সেটা বাস্তব নয়।

বর্ন গাড়ি থেকে নেমে জানালার দিকে তাকালো। পর্দার কোনো নড়ন-চড়ন হয় কিনা দেখলো। কিছুই দেখা গেলো না। সে দ্রুত ভিলিয়ার্সের গাড়ির দিকে গেলো। জেনারেলের গাড়ির সামনের জানালার কাঁচ নিচে নামানো। জেনারেলের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

“তুমি এসব করছো কি?” জানতে চাইলো।

“আপনার বাড়িতে,” জেসন বললো। “এইমাত্র আমি যা দেখলাম তা কি আপনি দেখেছেন?”

“হ্যাঁ। তো?”

“মেয়েটা কে? তাকে চেনেন?”

“আশা তো করি চিনি! সে আমার স্ত্রী।”

“আপনার স্ত্রী?” বর্নের চোখে মুখে স্পষ্ট বিস্ময়।

“আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন...সে একজন বয়স্ক মহিলা। আপনি তার বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা রাখেন।”

“ঠিক তা নয়। আমি বলেছি সে একজন পুরনো সৈনিক। আর আমি অবশ্যই তাকে শ্রদ্ধা করি, তার বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা রাখি। কিন্তু সে হলো আমার দ্বিতীয় স্ত্রী—আমার যুবতী—আমার প্রথম বউ আট বছর আগে মারা গেছে।”

“ওহ্ ঈশ্বর...”

“আমাদের দু'জনের বয়সের তারতম্য নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সে দ্বিতীয় মাদাম ভিলিয়ার্স হিসেবে গর্বিত এবং সুখী। পার্লামেন্টে সে আমাকে বেশ সাহায্য করে।”

“আমি দুঃখিত,” বর্ন নিচু কণ্ঠে বললো। “হায় ঈশ্বর, আমি দুঃখিত।”

“কি ব্যাপারে? তুমি তাকে অন্য কারোর সাথে গুলিয়ে ফেলেছো নাকি? লোকে এরকম হরহামেশাই করে। সে তো খুবই আকর্ষণীয় একটা মেয়ে। আমি তাকে নিয়ে গর্বিত।” ভিলিয়ার্স দরজা খুলতে খুলতে বললো। “তুমি এখানে অপেক্ষা

করো। আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসি। সব ঠিক থাকলে আমি দরজা খুলে তোমাকে ইশারা করবো। আর যদি তা নয়, তবে আমি গাড়িটা নিয়ে সোজা চলে যাবো।”

বর্ন ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। “জেনারেল, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি। জানি না কিভাবে করবো, কিন্তু করতে হচ্ছে। আমি আপনাকে বলেছিলাম আপনার নাম্বারটা আমি একটা জায়গা থেকে পেয়েছিলাম, কিন্তু জায়গাটার নাম বলি নি। কার্লোস সেই জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।” বর্ন গভীর ক’রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবারো বলতে শুরু করলো। “এবার আমার প্রশ্নটা ভালো ক’রে ভেবে জবাব দেবেন। আপনার স্ত্রী কি লো ক্লাসিক থেকে কাপড় কেনে?”

“সেন অনরের?”

“হ্যাঁ।”

“মনে হয় না।”

“আপনি নিশ্চিত?”

“খুব। এমনকি ঐ দোকানের কোনো বিলও আমি কখনও দেখি নি। তবে সে আমাকে বলেছে ঐ দোকানের পোশাক আর ডিজাইনগুলো সে খুবই অপছন্দ করে। আমার বউ খুব ভালো ফ্যাশন সচেতন।”

“ওহ, ঈশ্বর।”

“কি?”

“জেনারেল আমি আপনার বাড়িতে যেতে পারবো না। আপনি খুঁজে পান না পান তাতে কিছু যায় আসে না। আমি ওখানে যেতে পারবো না।”

“কেন নয়? তুমি কি বলছো?”

“যে লোকটা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলো সে কার্লোসের অনুচর। লো ক্লাসিকে তাকে আমি দেখছি।”

জেনারেলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। নিজের বাড়ির দিকে তাকালো সে। কালো দরজাটা আর পিতলের হাতলগুলো ল্যাম্প পোস্টের আলোতে জ্বলজ্বল করছে।

ছোপছোপ দাগযুক্ত ভিখেরি নুয়েলি সুর সেইনের চার্চের ব্রোঞ্জ দরজার দিকে তার টুপিটা ছুড়ে মারলো।

দু’জন যাজকের ক্রুকটি উপেক্ষা ক’রে প্যাসেজওয়ে দিয়ে হেটে গেলো সে। দু’জন যাজকই হতাশ হলেন। ভিক্ষুকটি দ্বিতীয় সারির একটা আসনে ব’সে ক্রশ এঁকে হাটু মুড়লো। তার মাথাটা নোয়ানো, প্রার্থনারত। সে তার বাম হাতের হাতা গুটিয়ে ঘড়িটা দেখলো। তার বেশভূষার সঙ্গে এই ঘড়িটা একেবারেই বেমানান।

ঘড়িটা ডিজিটাল এবং অনেক দামি। কার্লোস এটা তাকে উপহার দিয়েছে। একবার সে কার্লোসের সাথে কনফেশনে বিশ মিনিট দেরি ক'রে এসছিলো। তাতে ক'রে কার্লোস খুব হতাশ হয়ে তাকে সময়জ্ঞান ঠিক রাখার জন্যে এই ঘড়িটা দিয়েছে। তাদের পরবর্তী সাক্ষাতে কার্লোস সেটা স্বচ্ছ পর্দার নিচ দিয়ে তাকে দিয়েছিলো।

সময় হয়ে গেছে। ভিক্ষুক উঠে দ্বিতীয় বুথের দিকে এগোলো। পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

“অ্যাস্বেলাস দোমিনি।”

“অ্যাস্বেলাস দোমিনি, ঈশ্বরের সন্তান,” চাপা কণ্ঠটা বললো। কালো কোট পরে আছে সে। “আপনার দিন কি ভালো যাচ্ছে?”

“দিন ফুরিয়ে আসছে, তবে ভালোই যাচ্ছে...”

“বেশ,” আবছায়া অবয়বটা কথার মাঝখানে বললো, “কি এনেছেন আমার জন্যে? আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি লক্ষ-লক্ষ ডলার দিয়েছি, অযোগ্য আর ব্যর্থ হবার জন্যে। মর্কজে কি হয়েছিলো? মঁতেইন-এর এ্যাম্বাসি থেকে যে মিথ্যে কথাটা বলা হয়েছিলো সেটার জন্যে কে দায়ি? কে সেটা গ্রহণ করেছিলো?”

“অবার্জ দু'কোয়ে-টা ছিলো একটা ফাঁদ, তারপরও কেউ খুন হয় নি। সেটা ঠিক কি তা জানা খুব কঠিন। করবেলিয়া নামের অ্যাটাশিটি যদি বার বার মিথ্যে তথ্য দিয়ে থাকে, তবে আমাদের লোকজন মনে করছে সে এ ব্যাপারটা না জেনেই করছে। সে মেয়েটার কাছে বোকা বনেছে।”

“তাকে কেইন বোকা বানিয়েছে! বর্ন প্রতিটি সোর্স ট্রেস করছে। ভূয়া ভূয়া তথ্য তাদেরকে গেলাচ্ছে। এভাবে প্রত্যেককে উন্মুক্ত করছে। কিন্তু কেন? কার কাছে? আমরা এখন জানি সে কি এবং কে? তবে সে ওয়াশিংটনে কিছু রিলে করছে না। সে প্রকাশ্য হতে অস্বীকার করছে।”

“একটা জবাব দেবার জন্যে আমাকে ফিরে যেতে হবে অনেক বছর আগে। তবে এটা সম্ভব সে তার কর্তাদের কাছ থেকে কোনোরকম নাক গলানোটা চাচ্ছে না। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স একে অন্যের সাথে খুব কমই যোগাযোগ ক'রে থাকে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে তথ্য বিক্রি ক'রে তিনচারগুন টাকা কমিয়েছে একই স্টেশনের কাছে। হয়তো কেইন অপেক্ষা করবে, যতোক্ষণ না একটা মাত্র এ্যাকশন নেয়ার সময় আসে। উপরওয়ালার সাথে কৌশল নিয়ে কোনো মতপার্থক্য থাকবে না।”

“বয়স আপনার বুদ্ধিসূদ্ধিকে ভোঁতা করে নি দেখছি, পুরনো বন্ধু। এজন্যেই আমি আপনাকে বার বার ডাকি।”

“কিংবা হয়তো,” ভিক্ষুক আবারো বলতে লাগলো, “সে আসলেই বেঈমানী করেছে।”

“আমার তা মনে হচ্ছে না, তবে তাতে কিছুই যায় আসে না। ওয়াশিংটন তাই মনে করে। অ্যাবোট মারা গেছে, ট্রেডস্টোনের সবাই মারা গেছে। কেইন একজন খুনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।”

“অ্যাবোট, মানে সল্যাসী?” ভিক্ষুক বললো। “অতীতের একটা নাম। সে বার্লিনে তৎপর ছিলো। ভিয়েনায় তাকে আমরা চিনতাম ভালো করেই। এই হলো আপনার জবাব, কার্লোস। যতোদূর সম্ভব সংখ্যা কামিয়ে আনাটা সল্যাসীর একটা স্টাইল। তাতে সম্ভাবনাগুলো অল্পতে নেমে আসে। সে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কাজ করতো যে, তার সার্কেলে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আপোষ করা হয়েছে। সে হয়তো কেইনকে কেবলমাত্র তার কাছেই রিপোর্ট করতে বলেছিলো। কয়েক মাসের নিরবতার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের যে বিভ্রান্তি ছিলো, এটা সেটাকেই ব্যাখ্যা করতো।”

“সেটা কি আমাদেরকেও ব্যাখ্যা করে? কয়েক মাসের নিরবতা, একদম তৎপরতা নেই।”

“কতোগুলো সম্ভাবনা আছে। অসুস্থতা, অবসাদ, নতুন কোনো প্রশিক্ষণের জন্যে ফিরে যাওয়া। এমনকি শত্রুপক্ষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া। মনে রাখবে, সল্যাসীর অসংখ্য কৌশল ছিলো।”

“তারপরও, মরার আগে সে তার এক সহযোগীকে বলে গেছে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে নাকি সে কিছুই জানে না। এমনকি লোকটা যে কেইন সে ব্যাপারেও নাকি সে নিশ্চিতও নয়।”

“সহযোগীটি কে?”

“জিলেট নামের একজন। সে আমাদের লোক। তবে অ্যাবোট সেটা জানতো না।”

“আরেকটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। এরকম লোকজনদের ব্যাপারে অ্যাবোটের বেশ ভালো ধারণা ছিলো। ভিয়েনাতে বলা হতো যে, ডেভিড অ্যাবোট পর্বতের উপরে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে একটা বেকারি খুঁজতো।”

“এটা সম্ভব। আপনার কথাগুলো স্বস্তিদায়ক। অন্যের যা দেখতে পায় না আপনি সেটা দেখতে পান।”

“আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। এক সময় আমি বেশ হোমড়াচোমড়া ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফেলেছি।”

“আপনি এখনও তাই করেন।”

“একজন বেহিসেবী—আমি আর কি বলতে পারি?”

“অবশ্যই অন্য কিছু।”

“তুমি খুবই অর্জদৃষ্টিসম্পন্ন, কার্লোস। আমাদের আরো অনেক আগেই দেখা হওয়ার দরকার ছিলো।”

“এখন আপনি বিনয়ী হচ্ছেন ।”

“সব সময়ই । আমি জানি তুমি আমার জীবনটা যেকোনো মুহূর্তে শেষ ক’রে দিতে পারো । তাই আমাকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে হয় । আর সেটা কেবল অভিজ্ঞতাপ্রসূত হলে হবে না ।”

“আপনি আমাকে কি বলবেন?”

“এটা হয়তো খুব মূল্যবান কিছু নয়, তবে এটা কিছু একটা । আমি বেশ ভালো পোশাক পরে দিনটা কাটিয়ে দিয়েছি অবার্জ দু’কোঁয়েতে । একটা লোক আছে সেখানে, মোটা এক লোক—সুরেত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ক’রে ছেড়ে দেয়—তার চোখ দুটোও খুব অস্থির ছিলো । সে খুব বেশি ঘামছিলো । তার সাথে আমি কথা বলেছি । পঞ্চাশের দশকে বানানো ন্যাটোর একটা আইডি-কার্ড তাকে দেখিয়েছিলাম । মনে হচ্ছে সে গতকাল রাত তিনটার দিকে এক সোনালী চুলের লোক আর এক মহিলার জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছে । বর্ননাটা আর্জেনতুইলে’র থেকে তোলা ছবির সাথে মিলে যায় ।”

“ভাড়া করা?”

“সেরকমই । গাড়িটা একদিন পর ফেরত দেয়ার কথা ।”

“এটা কখনই ঘটবে না ।”

“অবশ্যই না । তবে এটা একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়, দেয় না? কেইন কেন এভাবে একটা গাড়ি ভাড়া নিতে যাবে?”

“যতো দ্রুত সম্ভব, অনেক দূরে যাওয়ার জন্যে ।”

“তাহলে এই তথ্যটার কোনো মূল্য নেই,” ভিক্ষুক বললো । “কিন্তু সবার অলক্ষ্যে অনেক ভাবেই তো দ্রুত ভ্রমণ করার পথ খোলা আছে । আর বর্ন একজন লোভী ক্লার্ককে বিশ্বাস করবে, সেটা খুবই কম বিশ্বাসযোগ্য ব’লে মনে হচ্ছে । সে হয়তো খুব সহজেই সুরেত’র কাছে খবরটা দিয়ে পুরস্কারের টাকা বাগিয়ে নিতে পারে । অথবা অন্য কেউ ।”

“আপনার বক্তব্যটা কি?”

“আমার মনে হচ্ছে, বর্ন এই গাড়িটা নিয়েছে প্যারিসের কাউকে অনুসরণ করার জন্যে । লোকজনের ভীড়ে ঘোরাঘুরি না ক’রে, কারোর দৃষ্টিতে না প’ড়ে, এমন কোনো ভাড়া গাড়ি না নিয়ে যা ট্রেস করা যাবে—সে এই গাড়িটা নিয়েছে । একটা সাদামাটা কালো রেনল্ট গাড়ি কারোর চোখে পড়বে না । তবে কাকে দিয়ে তার খোঁজাটা শুরু করবে?”

আবছায়ার অয়বটা ঘুরলো । “লাভিয়া,” গুণ্ডঘাতক আস্তে ক’রে বললো । “এবং লো ক্লাসিকে যাদেরকে সে সন্দেহ করেছে । সেটাই একমাত্র জায়গা যেখান থেকে সে শুরু করবে । তাদেরকে নজরদারী করা হবে, আর কয়েক দিনের মধ্যে—কয়েক

ঘণ্টা সম্ভবত—একটা সাদামাটা কালো রেনল্ট গাড়ি দেখা যাবে, তাকেও পাওয়া যাবে। আপনার কাছে কি গাড়িটার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা রয়েছে?”

“পেছনের বাম দিকে তিনটি ফুটো রয়েছে।”

“ভালো, কথাটা ছড়িয়ে দিন। গ্যারাজ, পথঘাট, আর পার্কিংলটগুলো হেঁকে ফেলুন। যে ওটা খুঁজে পাবে তাকে আর এই জীবনে কাজ করতে হবে না।”

“এরকম বিষয় নিয়ে কথা বলাটা...”

একটা খাম পর্দার নিচ দিয়ে বের হয়ে এলো। “আপনার তত্ত্বটা যদি ঠিক হয় তাহলে এটাকে একটা উপহার হিসেবেই বিবেচনা করবেন।”

“আমার কথা ঠিক, কার্লোস।”

“আপনি কেন এতোটা নিশ্চিত?”

“কারণ কেইন তাই করে যা আপনি করেন—পুরনো দিনে আমিই সেরকমই করতাম। তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে।”

“তাকে হত্যা করা হবে,” গুপ্তঘাতক বললো। “টাইমিংয়ের সাথে মিল আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই পঁচিশে মার্চ আসছে। মার্চ ২৬, ১৯৬৮ সালে জেসন বর্নকে তাম কুয়ান জঙ্গলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। এখন অনেক বছর পর—আরেকজন জেসন বর্নকে শিকার করা হচ্ছে। আমাদের মতো আমেরিকানরাও তাকে খুন করার জন্যে মুখিয়ে আছে। তবে আমি ভাবছি এবার ট্গারটা টানবে কে।”

“তাতে কি কিছু আসে যায়?”

“আমি তাকে চাই,” আবছায়া অবয়বটা নিচু কণ্ঠে বললো। “সে কখনই আসল নয়। আর এটাই আমার বিরুদ্ধে তার অপরাধ। আমাদের লোকদেরকে বলে দিন, কেউ যদি তাকে খুঁজে পায়, তবে কোনো কিছু না করে খবরটা যেনো পার্ক মঁশিউ’তে জানিয়ে দেয়। তাকে চোখে চোখে রাখা হোক, কিন্তু কিছুই করা হবে না। আমি তাকে পঁচিশে মার্চে জীবিত চাই। সেদিন তাকে আমি নিজের হাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তার লাশটা আমেরিকানদের কাছে উপহার হিসেবে পাঠাবো।”

“কথাটা এক্সুগি ছড়িয়ে দেয়া হবে।”

“অ্যাস্লোস দোমিনি, ঈশ্বরের সন্তান।”

“অ্যাস্লোস দোমিনি,” ভিস্কুকটি বললো।

অধ্যায় ২৬

যুবকটির পাশে পাশে জ্যোৎস্না প্রাণিত রোয়ে দ্য বুলোয়ার পথ ধরে হাটছে বৃদ্ধ সৈনিক। যেহেতু অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে তাই কেউই কোনো কথা বলছে না—স্বীকার, চ্যালেঞ্জ, অস্বীকার, আর পুণরায় আশ্বস্ত করা হয়েছে। ভিলিয়ার্সকে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে, মানতে হচ্ছে, আবার বর্জনও করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে সে ক্ষেপেও যাচ্ছে—সে যে সব কথা শুনেছে তা যদি মিথ্যে হয় তবেই তার জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। কিন্তু সে কিছুই করলো না। সে একজন সৈনিক, হাল ছেড়ে দেয়া তার কাজ নয়।

এই তরুণটির কথায় অনেক সত্যতা আছে। এটা তার চোখ, তার কণ্ঠ শুনলেই বোঝা যায়। নামহীন লোকটা মিথ্যে বলছে না। অনিবার্য বৈদ্যমানটা ভিলিয়ার্সের বাড়িতেই আছে। এটা এমন অনেক কিছুকে ব্যাখ্যা করছে যা এর আগে সে প্রশ্ন করতেও সাহস করে নি। একজন বুড়ো প্রাণ খুলে কাঁদতে চাচ্ছে এখন।

স্মৃতিহীন লোকটার মধ্যে অবশ্য তেমন একটা পরিবর্তন অথবা নতুন কিছু জানার ব্যাপার নেই। বহুরূপী কোনো অনুরোধ করছে না। তার গল্পটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য, কারণ সেটা সত্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। কার্লোসকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। গুপ্তঘাতক যা জানে সেটা তাকে জানতে হবে। ব্যর্থ হলে তার কোনো জীবন থাকবে না। এর বাইরে সে আর কিছুই বলছে না। সেন মেরি অথবা পোর্ট নোরেয় কথা বলা হলো না।

তার বদলে কার্লোস সে যা জানে সব কিছু স্মরণ করলো। এই ব্যাপারে তার জ্ঞান এতো ব্যাপক যে, ভিলিয়ার্সকে যখন কথাগুলো বললো বুড়ো জেনারেল তখন বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। বুঝতে পেরেছিলো তথ্যগুলো খুবই গোপনীয়। বিদ্যমান অনেক তত্ত্বকে সেটা নাড়িয়ে দিলেও জেনারেলের মনে হয়েছে কথাগুলো সত্য। কারণ সেও এসব কিছু কিছু আগে থেকেই জানতো। তার ছেলের কারণে জেনারেলকে কার্লোসের উপর তার দেশের সবচাইতে গোপন ফাইলগুলো দেখার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। তবে স্মৃতিহীন লোকটার কথার সাথে সেই ফাইলের অনেক কথারই মিল নেই।

“যে মেয়েটার সাথে তুমি আর্জেন্টাইনে কথ্য বলেছো, যে আমার বাড়িতে ফোন করে থাকে, যে তোমার কাছে সব স্বীকার করেছে সে একজন অনুচর...”

“লাভিয়া,” বর্ন কথার মাঝখানে বললো।

জেনারেল থেমে গেলো। “ধন্যবাদ। সে তোমার ছবি তুলেছে।”

“হ্যাঁ।”

“তাদের কাছে আগে কোনো ছবি ছিলো না?”

“না।”

“তাহলে তুমি যেমন কার্লোসকে পাকড়াও করতে চাচ্ছে তেমনি কার্লোসও তোমাকে পাকড়াও করতে চাইছে। অথচ তোমার কাছে তার কোনো ছবি নেই। তুমি কেবল দু’জন কুরিয়ারকে চেনো। যার মধ্যে একজন আমার বাড়িতে আছে।”

“হ্যাঁ।”

বুড়ো মুখটা সরিয়ে নিলে আবারো নিরবতা নেমে এলো।

পথের শেষপ্রান্তে এসে পড়লো তারা, যেখানে একটা ছোটোখাটো হ্রদ আছে। হ্রদের চারপাশ কংক্রিটের ওরাকণ্ডয়ে দিয়ে বাঁধানো। ওয়াকওয়ের পাশে অনেকগুলো বেঞ্চ আছে বসার জন্যে। তারা নিরবে দ্বিতীয় বেঞ্চটার দিকে এগোলো। ভিলিয়ার্সই আগে মুখ খুললো।

“একটু বসি, এই বয়সে এতো শক্তি আমার নেই। এটা আমাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করে।”

“আপনার বিব্রত হওয়া উচিত না,” বর্ন তার পাশে বসতে বসতে বললো।

জেনারেল বর্নের দিকে তাকিয়ে বললো। “উচিত না জানি। তবে হই।” একটু চুপ থেকে জেনারেল আবার বললো, “বিশেষ ক’রে আমার বউয়ের সঙ্গে যখন থাকি।”

“সেটা অবশ্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়,” জেসন বললো।

“তুমি ভুল করছো,” বুড়ো বললো। “আমি বিছানার কথা বলছি না। কখনও কখনও আমি আমার কাজকর্ম কমিয়ে ফেলে কয়েক সপ্তাহের জন্যে উধাও হয়ে যাই—মেডিটেরিনিয়ানে কাটিয়ে আসি।”

“বুঝতে পারছি না।”

“আমি আর আমার বউ প্রায়ই আলাদা থাকি। অনেক দিক থেকেই আমরা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করি। আনন্দ লাভ করি, একে অন্যের মতো ক’রে।”

“আমি এখনও বুঝতে পারছি না।”

“আমি নিজেকে আরো বিব্রত করবো কি?” ভিলিয়ার্স বললো। “যখন এক বৃদ্ধলোক কোনো আকর্ষণীয় নারীর সাথে বসবাস করার ব্যাপারে অনীহা দেখায়, কয়েকটা বিষয় তখন বোধগম্য হয়ে ওঠে। অবশ্যই অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আছে, আমার ক্ষেত্রে পাবলিক এক্সপোজারও রয়েছে। বড় বড় বাড়িতে প্রবেশ, সেলিব্রিটিদের সাথে সহজেই বন্ধুত্ব করা।” বুড়ো একটু বিরতি দিলো। “সে কি কোনো প্রেমিক জুটিয়ে নিয়েছে?” জেনারেল নরম কণ্ঠে বলতে লাগলো আবার। “সে কি তরুণ আর শক্ত সামর্থ্য কারোর জন্যে মুখিয়ে আছে? যদি সে সেটা ক’রে থাকে, তবে সেটা মেনে নিতেই হয়—স্বস্তি লাভের জন্যে হলেও—কেবল আশা করি যে তার যেনো বুদ্ধিসুদ্ধি ঠিক থাকে। একজন নিবীৰ্য আর স্ত্রৈণ রাজনীতিক

মাতাল রাজনীতিকের চেয়েও বেশি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায়। তার মানে ঐ রাজনীতিক একদম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। উদ্বিগ্ন হবার আরো কিছু আছে। মেয়েটা কি আমার নাম ব্যবহার করছে?”

“তাহলে আপনি অনুভব করতে পারছিলেন?” শান্তকণ্ঠে বললো জেসন।

“অনুভব করা আর বাস্তবতা এক জিনিস নয়!” বুড়ো জেনারেল পাল্টা বললো।

“মাঠ পর্যবেক্ষণে এসবের কোনো স্থান নেই।”

“তাহলে আপনি আমাকে কেন এসব বলেছেন?”

“আজরাতে আমরা দু’জন যা দেখেছি তার একটা সরল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমি প্রার্থনা করি সেটাই যেনো ঠিক হয়। তবে আমার মন বলছে তা হবে না। আমি সেটা জানি, যখন তুমি আমাকে লো ক্লাসিকের কথা বললে, তখনই আমার মধ্যে কিছু যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার উদয় হয়েছিলো। গত দু’ঘণ্টা ধরে আমি নিজের সাথে লড়াই করেছি। সেটা করার আর কোনো মানে হয় না। এই মহিলার আগে আমার নিজের সন্তানের অবস্থান।”

“কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনি তার বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রাখেন। সে আপনাকে অনেক সাহায্য করে।”

“সত্য। আমি তাকে পাগলের মতো বিশ্বাস করতে চাই। দুনিয়ায় সবচাইতে সহজ কাজ হলো নিজেকে বোঝানো যে, তুমিই ঠিক। বুড়োদের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য।”

“আপনি তাহলে বুঝতে পারেন নি?”

“যে সাহায্য সে আমাকে করে, যে বিশ্বাস আমি তাকে করি তাতে তো আমি এরকমটি করতে পারি না,” জেসনের দিকে তাকালো সে। “কার্লোসের ব্যাপারে তোমার অসাধারণ জ্ঞান রয়েছে। আমি নিজের হাতে তাকে গুলি করতে চাই। কিন্তু লোকটা সম্পর্কে আমি ফাইলে যা পড়েছি তার সাথে তোমার কথার খুব কম মিলই রয়েছে। তারপরও বলতে হয় তোমার মনোযোগ তার দক্ষতা, তার পদ্ধতি আর খুন করার ধরনের ওপরই বেশি। তুমি কার্লোসের অন্য দিকটা এড়িয়ে গেছো। সে কোনো অস্ত্র বিক্রি করে না, সে বিক্রি করে একটি দেশের গোপনীয়তা।”

“আমি সেটা জানি,” বর্ন বললো। “এটা সেই দিক নয়—”

“উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি,” জেনারেল আবার বলতে লাগলো যেনো জেসনের কথাটা সে শুনতে পায় নি। “আমি ফ্রান্সের মিলিটারি এবং নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি সংক্রান্ত গোপন দলিলগুলো দেখেছি—সম্ভব আরো পাঁচজন লোক দেখেছে, যারা খুবই আস্থাভাজন। আমরা দেখেছি মস্কো এটা জানে, ওয়াশিংটন ওটা জানে, পিকিং জানে অন্য কিছু।”

“আপনি এইসব বিষয় নিয়ে আপনার বউয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন?” বর্ন অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

“অবশ্যই না। এসব পেপার যখন বাড়িতে নিয়ে আসলে একটা সিঁদুকে সেগুলো রাখতাম। আমি ছাড়া আর কেউ ঐ সিঁদুকটা খুলতে পারে না। তবে

এটার আরেকটা চাবি আছে আমার বউয়ের কাছে। অন্য কেউ যদি এসব জানে তো সেটা আমার বউই জানে।”

“আমার মনে হয় সেটা হোতো খুবই বিপজ্জনক। চাবি আর তথ্য, দুটোই আপনার বউয়ের কাছ থেকে জোর ক’রে আদায় করা যেতে পারে।”

“এর অবশ্য কারণও আছে। আমি যে বয়সে এসে পৌঁছেছি তাতে যেকোনো দিন শেষ সময় ঘনিয়ে আসতে পারে। আমার যদি কিছু হয় তো তাকে বলা আছে সে মিলিটারি কনসিলারকে ফোন ক’রে জানাবে। আমার অফিসে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা না আসা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবে।”

“সে কি দরজার পাশে থাকতে পারে না, একেবারে সিন্দুকের পাশেই থাকতে হবে?”

“আমার বয়সী লোকেরা নিজের ডেস্কেই বেশি মৃত্যুনরণ ক’রে থাকে।” ভিলিয়ার্স দু’চোখ বন্ধ করলো। “সে আমার নিজের স্ত্রী। একটা বাড়িতে, একটা জায়গায় থাকি, সে এরকম কিছু করবে সেটা কেউই বিশ্বাস করবে না।”

“আপনি নিশ্চিত?”

“অনেকটা। সে-ই আমাকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দিয়েছিলো। আমি বার বার আমাদের বয়সের পার্থক্যকার কথা বলেছি, তবে সে মানে নি। সে একটা প্রস্তাব দেয়, আমার কোনো সম্পত্তি দাবি করবে না ব’লে একটা কাগজে স্বাক্ষর করার কথা বলে। অবশ্য আমি তাকে দিয়ে সেই স্বাক্ষরটা করাই নি। আমার কাছে মুখে বলাটাই যথেষ্ট ছিলো। প্রবাদের কথাই ঠিক : বৃদ্ধলোক হলো বোকারহন্দ। তারপরও সব সময়ই সন্দেহ থাকতো, সেগুলো ভ্রমণ আর অপ্রত্যাশিতভাবে আলাদা থাকার সময় হোতো।”

“অপ্রত্যাশিত?”

“তার অনেক বিষয়ে আগ্রহ ছিলো। আজ থ্রেনোবেলে একটা ফ্রান্সো-সুইস জাদুঘর তো কাল আর্মস্টারডামের ফাইন আর্টসের একটা গ্যালারি, পরশু আবার মার্সেই’তে কোনো সমুদ্রবিজ্ঞানের উপর কনফারেন্স। এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে উত্তপ্তবাক্য বিনিময় হোতো। আমি চাইতাম সে প্যারিসেই থাকুক। আমার সাথে কোনো কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে যাক। আমি চাইতাম সে অবশ্যই যাবে। সে যেতো না। অন্য কোথাও চলে যেতো। যেনো কেউ তাকে অর্ডার দিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গাতে হাজির থাকতে হবে।”

থ্রেনোবেল—সুইস সীমান্ত সংলগ্ন একটি অঞ্চল, জুরিখ থেকে এক ঘণ্টার পথ। বুলোয়াঁ-সরমে-চ্যানেলের তীরে অবস্থিত, লন্ডনে থেকে এক ঘণ্টার পথ। মার্সেই...কার্লোস।

“মার্সেই’র কনফারেন্সটা কবে হয়েছিলো?” জেসন জানতে চাইলো।

“মনে হয় গত আগস্টে। মাসের শেষের দিকে।”

“২৬শে আগস্ট, বিকেল পাঁচটায়। এগ্যান্সের হাওয়ার্ড লিল্যান্ড মার্সেই’র ওয়াটারফ্রন্টে নিহত হন।”

“হ্যা, আমি জানি,” ভিলিয়ার্স বললো। “তুমি এটা আগেও বলেছো। আমি লোকটার মৃত্যুতে দুঃখিত, তবে তার বিচার বুদ্ধির উপর আমার আস্থা ছিলো না।” বুড়ো সৈনিক থেমে বর্নের দিকে তাকালো। “মাই গড,” সে বিড়বিড় ক’রে বললো। “সে তাহলে তার সাথেই ছিলো। কার্লোস তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। সে তার কাছে গিয়েছিলো। অক্ষরে অক্ষরে তার আদেশ পালন করেছে!”

“আমি অবশ্য এতোটা ভাবি নি,” জেসন বললো। “আমি কেবল ভেবেছিলাম সে একজন তথ্যদাতা, মানে তথ্য রিলে ক’রে থাকে—একজন অন্ধ রিলে। আমি এতোটা ভাবি নি।”

আচম্কা বৃদ্ধলোকটি চিৎকার ক’রে উঠলো। তার চিৎকারে আছে সুগভীর মর্ম যাতনা। দু’হাতে নিজের মুখটা ঢেকে ফেললো সে।

বর্ন কিছুই করলো না। কিছু করারও নেই। “আমি দুঃখিত,” সে কেবল এটাই বললো।

জেনারেল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বললো, “আমিও। আমার ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।”

“তার কোনো দরকার নেই।”

“আমার মনে হয় এ নিয়ে আর কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। যা করতে হবে আমি তাই করবো।”

“কি করবেন?”

জেনারেল উঠে দাঁড়ালো। তার চোয়ালটা খুব দৃঢ়। “তুমি কি সেটা জিজ্ঞেস করতে পারো?”

“আমাকে সেটা জিজ্ঞেস করতেই হবে।”

“সে যা করেছে তার জন্যে একটাই শাস্তি আছে। আমার ছেলের হত্যাকারীর সাথেই কেবল তার সংযোগ নেই সে এখন দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে। যে দেশের জন্যে সারাজীবন আমি লড়াই করেছি, সেবা করেছি।”

“আপনি তাকে খুন করবেন?”

“আমি তাকে খুন করবো। সে আমাকে সত্য কথাটা বলবে এবং সে মরবে।”

“সে সব কিছু অস্বীকার করবে।”

“আমার তাতে সন্দেহ রয়েছে।”

“এটা তো পাগলামী!”

“শোনো, আমি অর্ধশতাব্দী ধরে ফ্রান্সের শত্রুদের সাথে লড়াই ক’রে আসছি। তাদের মধ্যে ফরাসিও আছে। সত্যটা আমাকে শুনতেই হবে।”

“সে কি করবে বলে আপনি মনে করেন? আপনি বলবেন আর ঠাণ্ডা মাথায় সে সব স্বীকার করে নেবে?”

“সে কোনো কিছুই ঠাণ্ডা মাথায় করবে না। তবে সে রাজি হবে। সে এটা বলবেই।”

“কেন বলবে?”

“কারণ তাকে আমি যখন অভিযুক্ত করবো, সে আমাকে খুন করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর যখনই সে ঐ চেষ্টাটা করবে, আমি আমার ব্যাখ্যা পেয়ে যাবো। পাবো না?”

“আপনি সেই ঝুঁকিটা নেবেন?”

“আমাকে যে নিতেই হবে।”

“ধরুন সে আপনাকে খুন করার কোনো চেষ্টা করলো না?”

“এটা হবে না। আমরা দু’জনেই সেটা জানি। আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার জানি।”

“আমার কথা শোনেন,” জেসন বললো। “আপনি বলেছিলেন আগে আপনার ছেলে, তার কথাটা ভাবুন! খুনির পিছু নিন। তার অনুচরের নয়। ঐ মহিলা আপনার জন্যে বড় একটা ক্ষত। কিন্তু কার্লোস তার চেয়েও বড়। আপনার ছেলেকে যে খুন করেছে তাকে আগে ধরুন! তাহলে দু’জনকেই ধরতে পারবেন। বউকে এখন কিছু করবেন না। কার্লোস সম্পর্কে যা জানেন সেটা ব্যবহার করুন। আমার সাথে মিলে শিকার করুন তাকে। এ পর্যন্ত কেউ তার এতো কাছে আসতে পারে নি।”

“তুমি এমন কিছু চাইছো যা আমি দিতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে,” বুড়ো জেনারেল বললো।

“যদি আপনি আপনার ছেলের কথা না ভাবেন, যদি নিজের কথাই শুধু ভাবেন, তাহলে ঠিক আছে।”

“তুমি খুবই রুশ্বভাবে বলছো, মর্সিয়ে।”

“আমি ঠিকই বলছি, আর আপনিও সেটা জানেন।”

“হ্যা, তোমার কথাই ঠিক,” সে বললো। “খুবই রুঢ় কিন্তু ঠিক। খুনিটাকে ধরতে হবে, ঐ খানকিটাকে নয়। আমরা কিভাবে একসাথে কাজ করবো? শিকার করবো একত্রে?”

বর্ন স্বত্তিবোধ ক’রে চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করলো। “কিছু করবেন না। কার্লোস আমাকে সারা প্যারিস তন্ন তন্ন ক’রে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তার লোকদেরকে হত্যা করেছি। তার অনুচরদের প্রকাশ ক’রে ফেলেছি। একটা কনটাক্ট খুঁজে বের করেছি। আমি তার খুব কাছে এসে পড়েছি। আমরা যদি ভুল না করি, আপনার টেলিফোনটা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবে। এটা আমি নিশ্চিত করতে পারি।”

“কিভাবে?”

“আমি লো ক্লাসিকের আধডজন কর্মচারীকে পাকড়াও করবো। কয়েকজন কেরাণী, লাভিয়া, বারগোয়া এবং অবশ্যই সুইচবোর্ডের লোকটাকে। তারা মুখ খুলবে। আমিও মুখ খুলবো। তারপর আপনার ফোনটা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবে।”

“কিন্তু আমি কি করবো?”

“বাড়িতে থাকুন, বলবেন আপনার শরীর খারাপ। আর যখনই ঐ ফোনটা বাজবে, যে-ই জবাব দিক না কেন, আশেপাশে থাকবেন। কথাগুলো শুনবেন। কোডগুলো ধরার চেষ্টা করবেন। চাকর-বাকরদের প্রশ্ন করবেন তারা তাদেরকে কি বলেছে। আপনি নিজেও শুনতে পারেন। আপনি যদি কিছু শুনতে পান ভালো, তবে আপনি শুনতে পাবেন না হয়তো। লাইনে যে-ই থাকুক না কেন সে জানবে আপনি আছেন। তারপরও আপনি এই রিলেটাকে বিভ্রান্ত ক’রে দেবেন। সেটা নির্ভর করছে আপনার বউ কোথায় আছে তার উপর—”

“ঐ বেশাটা?” সৈনিকটি ক্ষিপ্ত হয়ে বললো।

“—কার্লোসকে তার বৃহৎ থেকে আমরা বের হয়ে আসতে বাধ্য করবো।”

“কিভাবে?”

“তার যোগাযোগের লাইনগুলোতে বিঘ্ন ঘটাবো। তার নিরাপদ এবং অচিন্তনীয় রিলেগুলোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবো, ফলে সে আপনার স্ত্রীর সাথে একটা মিটিং করতে চাইবে।”

“সে তার নিজের অবস্থানের কথা একটুও জানাবে না।”

“আপনার স্ত্রীকে তার বলতেই হবে।”

বর্ন থামলো। আরেকটা ভাবনা তার মাথায় এলো। “যদি খুব বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, তবে একটা ফোন কল আসবে, অথবা এমন একজন লোক আপনার বাড়িতে আসবে যাকে আপনি চেনেন না। আর তখনই আপনার বউ তাকে বলে দেবে অন্য কোথায় দেখা করবে। যখন এটা ঘটবে তখন তার কাছ থেকে চাপাচাপি ক’রে একটা নাম্বার নিয়ে নেবেন যাতে তাকে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বেশ সতর্ক থাকবেন। আপনি তাকে যেতে বাঁধা দেবেন না। তবে দরকার হলে তাকে যেনো পান সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করবেন। তাকে বলবেন খুবই স্পর্শকাতর মিলিটারি এক ব্যাপারে তার সঙ্গে আপনার কিছু কথা বলার দরকার হতে পারে। সেজন্যে একটা ফোন নাম্বার যেনো দিয়ে যায়, যাতে করে তার সাথে প্রয়োজনে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। এতে হয়তো সে খুবই আগ্রহী উঠবে।”

“এতে কি ফল পাওয়া যাবে?”

“সে কোথায় যাচ্ছে সেটা বলবে। হয়তো কার্লোসের ওখানেই সে যাবে। যদি কার্লোস নাও হয়, তার ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। তারপর সেই খবরটা আপনি আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমি আপনাকে একটা হোটেল আর রুম নাম্বার দেবো। রেজিস্ট্রির নামটা ভূয়া, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।”

“তুমি তোমার আসল নামটা কেন আমাকে বলছো না?”

“কারণ সচেতন বা অসচেতনভাবে যদি সেটা কখনও উল্লেখ করেন—আপনি মারা যাবেন?”

“আমি কোনো জরগ্রস্তবৃদ্ধ নই।”

“না, আপনি তা নন। কিন্তু আপনি বেশ আহত বোধ করছেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন জীবনে। আপনি হয়তো আপনার জীবন নিয়ে ঝুঁকি নিতে পারেন। আমি সেটা করতে পারি না।”

“তুমি খুবই অদ্ভুত মানুষ, মঁসিয়ে।”

“হ্যাঁ। আর শুনুন, আমাকে ফোন করে যদি দেখেন একটা মেয়ে ধরেছে তবে ঘাবড়াবেন না। সে জানবে আমি কোথায় আছি। আমরা মেসেজটার জন্য সময় ঠিক করে রাখবো।”

“একটা মেয়ে?” জেনারেল একটু অবাক হলো। “তুমি কোনো মেয়ে বা অন্যকারো সম্পর্কে তো কিছু বলো নি।”

“আর কেউ নেই। তাকে ছাড়া আমি বাঁচতাম না। কার্লোস আমাদের দু’জনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে আমাদের দু’জনকে খুন করার চেষ্টা করছে।”

“সে কি আমার ব্যাপারে কিছু জানে?”

“হ্যাঁ। সে-ই আমাকে বলেছিলো আপনার সাথে কার্লোসের সম্পর্কটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি ভেবেছিলাম আপনি কার্লোসের লোক।”

“হয়তো তার সাথে আমি দেখা করবো।”

“কার্লোসকে শেষ করার আগে নয়—যদি তাকে শেষ করতে পারি—আপনি হয়তো আমাদের দু’জনকে আর দেখতে পাবেন না। এরপর—যদি এরপর কিছু থাকে—আপনি হয়তো নিজেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না। আমি আপনার সাথে কোনো অসততা করছি না।”

“বুঝছি। আমি কার্লোসের সাথে জড়িত নই, এটা ভাবার জন্যে ঐ মেয়েটাকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দিও।”

বর্ন মাথা নেড়ে সায় দিলো। “আপনি কি নিশ্চিত হতে পারবেন যে, আপনার প্রাইভেট লাইনটাতে আঁড়িপাতা হচ্ছে না?”

“অবশ্যই। এটা নিয়মিতই চেক করা হয়।”

“যখনই আপনি আমার কাছ থেকে ফোন আশা করবেন ফোনে হ্যালো বলেই দু’বার গলা খাকারি দেবেন। তাহলে আমি জানবো ফোনটা আপনিই ধরেছেন। যদি কোনো কারণে আপনি কথা বলতে না পারেন, আমাকে বলবেন সকালে যেনো আমি আপনার সেক্রেটারিকে ফোন করি। আমি আপনাকে দশ মিনিট বাদেই ফোন করবো। নাশ্বারটা এবার বলুন?”

ভিলিয়র্স নাশ্বারটা দিলো। “তোমার হোটেল?” সে জানতে চাইলো।

“টেরাস। রুই দ্য মায়েস্ত্রো। মঁতমায়ে। রুম ৪২০।”

“কখন তুমি শুরু করবে?”

“যতো শীঘ্র সম্ভব। আজকের বিকেলে।”

“একেবারে নেকড়ের মতো হয়ে যাও,” বৃদ্ধ সৈনিক বললো। এমন ভাবে সামনে এগিয়ে এলো যেনো কোনো কমান্ডার তার অফিসারকে নির্দেশ দিচ্ছে। “দ্রুত আঘাত হানো।”

অধ্যায় ২৭

“ও এতো সুন্দর, আমাকে তার জন্যে কিছু একটা করতেই হবে,” টেলিফোনে মেরি চিৎকার ক’রে বললো। “ঐ চমৎকার যুবকটির জন্যেও। সে খুব সাহায্য করেছে। আমি আপনাকে বলছি পোশাকটা খুবই সাকসেস ফু হয়েছে। আমি খুবই কৃতজ্ঞ।”

“আপনার দেয়া বর্ণনা থেকেই করা হয়েছে, মাদাম,” লো ক্লাসিকের সুইচবোর্ডের এক সংস্কৃতিবান তরুণী জবাব দিলো। “আমি নিশ্চিত আপনি জেনাইন আর ক্রুদের কথা বলছেন।”

“হ্যা, অবশ্যই। জেনাইন আর ক্রুদ। আমার এখন মনে পড়েছে। আমি আমার ধন্যবাদ হিসেবে প্রতিটি নোট উপটোকন হিসেবে ড্রপ ক’রে দেবো। আপনি কি তাদের শেষ নামগুলো জানেন? মানে, খামে তো আর কেবল জেনাইন আর ক্রুদ লিখলে হবে না। হবে কি? আপনি কি জ্যাকুলিনকে জিজ্ঞেস করবেন?”

“এর কোনো দরকার হবে না, মাদাম। আমি তাদেরকে চিনি। জেনাইন ডলবার্ট আর ক্রুদ ওরিয়েল।”

“জেনাইন ডলবার্ট আর ক্রুদ ওরিয়েল,” মেরি নাম দুটো আবারো উচ্চারণ ক’রে জেসনের দিকে তাকালো। “জেনাইন তো ঐ চমৎকার পিয়ানোবাদককে বিয়ে করেছে, তাই না?”

“আমার মনে হয় না, মাদামোয়াজেল। ডলবার্ট অন্য কাউকে বিয়ে করেছে।”

“ও, তাই তো। আমি আসলে অন্য কারোর কথা ভাবছিলাম।”

“আমি মাদামের নামটা পুরোপুরি ধরতে পারি নি।”

“কি সব আবোল তাবোল বলছি। এখনও আপনাকে নামটাই বলা হয় নি!” মেরি ফোনটা একটু দূরে সরিয়ে চড়া গলায় বললো। “ডালিঁর্, তুমি এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে! দরুণ। আমি লো ক্লাসিকের চমৎকার এক মেয়ের সাথে কথা বলছিলাম...হ্যা, এফুণি আসছি, ডালিঁর্। সে ফোনটা মুখের ধরে এনে বললো, “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,” ফোনটা রেখে দিলো সে। “কেমন করলাম?”

“যদি কখনও ইকোনোমিস্ত্র ছাড়ার কথা ভাবো তবে সেল্‌সে যেয়ো,” প্যারিসের ফোন বুক ঘাটতে ঘাটতে বললো জেসন। “আমি তোমার বলা প্রতিটি কথা বিশ্বাস করবো।”

“বর্ণনাগুলো কি ঠিক আছে?”

“একটা হাড্ডিসার এবং খুবই পাতলা কজি। পিয়ানোবাদক হিসেবে ঢিল মারাটা ঠিকই আছে।”

“আমার মনে হয়েছিলো সে যদি বিবাহিত হয়ে থাক তবে তো ফোনটা তার স্বামীর নামে থাকবে।”

“তা নয়,” জেসন বাঁধা দিয়ে বললো। “এই যে এখানে। ডলবার্ট, জেনাইন, রুই লোসেরা।” জেসন ঠিকানাটা লিখে নিলো। “ওরিয়েল, ইংরেজি ‘ও’ অক্ষর, তাই না?”

“আমার তো তাই মনে হয়।” মেরি একটা সিগারেট ধরালো। “তুমি আসলেই তাদের বাড়িতে যাচ্ছে?”

বর্ন মাথা নেড়ে সায় দিলো। “তাদেরকে যদি আমি সেন অনরে থেকে তুলে নিই, কালিসে সেটা দেখে ফেলতে পারে।”

“বাকিদের কি করবে? লাভিয়া, বারগোয়া, সুইচবোর্ডের লোকটা।”

“তাদেরকে আগামীকাল ধরবো। আজকে কেবল গ্রাউন্ডস্‌ওয়েল।”

“কি?”

“তাদের সবাইকে কথা বলাতে হবে। চারপাশে কিছু কথা ভেসে বেড়াবে। ঠিক সময়ে ডলবার্ট আর ওরিয়েল পুরো স্টোরে সেটা ছড়িয়ে দেবে। আমি আরো দু’জনের সাথে আজ রাতে কথা বলবো। তারা লাভিয়া এবং সুইচবোর্ডের লোকটাকে ফোন করবে। আজ আমরা প্রথম শক্‌ওয়েভটা দেবো, তারপরে দ্বিতীয়টা। আজ বিকেলেই জেনারেলের ফোনটা বেজে উঠতে শুরু করবে। সকালের মধ্যে আতঙ্কটা পূর্ণতা লাভ করবে।”

“দুটো প্রশ্ন,” মেরি বিছানা থেকে উঠে তার কাছে এসে বললো। “তুমি লো ক্লাসিকের স্টোর আঁওয়ারে কি ক’রে ঐ দু’জন ক্লার্ককে ধরবে? আর আজ রাতে তুমি কাদেরকে ধরবে?”

“কেউ ডিপফ্রিজে বসবাস করে না,” বর্ন হাত ঘড়িটা দেখে জবাব দিলো। “বিশেষ ক’রে ফ্যাশন-হাউজগুলোতে। এখন ১১টা ১৫ বাজে; আমি ডলবার্টের এপার্টমেন্টে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবো। ওখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিয়ে ফোন করিয়ে বলবো সে যেনো এক্ষুণি বাড়িতে চলে আসে। খুবই জরুরি এবং ব্যক্তিগত একটা সমস্যা হয়েছে, তাকে এসেই সেটা সামলাতে হবে।”

“কি সমস্যা?”

“আমি জানি না, কিন্তু সমস্যা কার নেই, বলো?”

“ওরিয়েলের সাথেও একই জিনিস করবে?”

“সম্ভবত, এমনকি তার চাইতেও কার্যকরী কিছু।”

“তুমি আসলেই একটা চিজ, জেসন।”

“আমি খুবই সিরিয়াস,” বর্ন বললো। সে এখনও ফোনবুকে নাম খুঁজে যাচ্ছে। এক জায়গায় এসে থেমে গিয়ে বললো, “এই তো সে। ওরিয়েল, রুদ গিসেল। কোনো মন্তব্য নেই। রুই রেসিন। আমি তিনটার মধ্যে তাকে ধরতে পারবো। আমি তার কাছ থেকে চলে আসতেই সে সেন অনরে’তে চলে যাবে। ওখানে গিয়ে চিৎকার করতে শুরু করবে।”

“বাকি দু’জনের কি করবে? তারা কারা?”

“আমি হয় ওরিয়েল নয়তো ডলবার্টের কাছ থেকে অথবা দু’জনের কাছ থেকেই নাম দুটো নেবো। তারা সেটা জানবে না। কিন্তু সেটা দিয়েই আমি দ্বিতীয় শকুয়েভটা দেবো।”

জেসন রুই লোসেরা’র প্রবেশপথের অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। জেনাইন ডলবার্টের ছোট্ট এপার্টমেন্টের দরজা থেকে মাত্র পনেরো ফিট দূরে সেটা। কিছুক্ষণ আগে একজন সুপারিন্টেন্ড ডলবার্টের অফিসে ফোন ক’রে জানিয়েছে লিমোজিনে ক’রে এক লোক এসে দু’বার তার কথা জিজ্ঞেস ক’রে গেছে। সে আবারো আসবে। সে যদি আসে তো সুপারিন্টেন্ড কি করবে?

একটা কালো ট্যাক্সি এসে প্রবেশপথের সামনে থামলে হাড়িসার জেনাইন ডলবার্ট প্রায় লাফিয়েই গাড়ি থেকে নামলো। হরবর ক’রে দরজার সামনে এগোতেই জেসন তার পথ রোধ করলো।

“খুব জলদি দেখি এসে পড়লেন,” সে কথাটা বলেই তার বাহুটা ধরলো। “আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। ঐ দিন আপনি খুব সাহায্য করেছিলেন।”

জেনাইন ডলবার্ট তার দিকে চেয়ে রইলো। তার ঠোট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, মনে করার চেষ্টা করছে, তারপর বিস্মিত হয়ে বললো, “আপনি। আমেরিকান লোকটা না,” ইংরেজিতেই বললো। “মঁসিয়ে বৃগস্, তাই না? আপনিই কি—”

“আমি আমার ড্রাইভারকে বলেছি এক ঘণ্টার জন্যে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে। আমি আপনার সাথে একান্তে দেখা করতে চেয়েছিলাম।”

“আমার সাথে? আমার সাথে আপনার কি কাজ থাকতে পারে?”

“আপনি কি জানেন না? তাহলে এখানে কেন এভাবে ছুটে এলেন?”

“আপনি আজুর হাউজ থেকে এসেছেন না?” সে সতর্কভাবে জানতে চাইলো।

“হতে পারে।” বর্ন তার হাতে একটু জোরে চাপ দিলো। “আর?”

“আমি যা দেবো ব’লে কথা দিয়েছিলাম তা দিয়ে দেবো। এর চেয়ে বেশি কিছু না, আমরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম।”

“আপনি কি নিশ্চিত?”

“বোকার মতো বলবেন না! আপনি প্যারিসের ফ্যাশন হাউজগুলো চেনেন না। তারা একে অন্যের ব্যাপারে আজীবাজে কথা বলে, আপনার স্টুডিওতে নোংরা সব মন্তব্য করবে। সিজন আসার আগেই, লো ক্লাসিকে বারগোয়ার ডিজাইনগুলো আসার আগেই আপনার শপে প্রায় অর্ধেক ডিজাইন চলে যায়। আমি আর লো ক্লাসিকে কতো দিন থাকতে পারবো ব’লে মনে করেন? আমি লাভিয়ার দুই নাথার

মেয়ে। তার অফিসে ঢুকতে পারে যে কয়জন আমি তাদেরই একজন। আপনি আমাকে আপনার লস অ্যাঞ্জেলেসের শপে দেখেগুন রাখবেন, যেমনটি আপনি কথা দিয়েছেন।”

“আসুন একটু হাটি,” আলতো ক’রে তার হাতটা টেনে নিয়ে জেসন বললো। “আপনি ভুল করছেন, জেনাইন। আমি আজুর হাউজ ব’লে কখনও কোনো কিছুই নাম শুনি নি। আর কারোর ডিজাইন চুরি করার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। আমার খালি দরকার কিছু তথ্য।”

“হায় ঈশ্বর...”

“হাটতে থাকুন।” বর্ন এবার তার হাতটা শক্ত ক’রে ধরলো। “আমি বললাম না, আপনার সাথে আমার কথা আছে।”

“কিসের ব্যাপারে? আপনি আমার কাছ থেকে কি চান? আপনি আমার নামটা জানলেন কি ক’রে?” কথাগুলো এক নাগারে বের হয়ে এলো। “আমি আগেভাগে লাক্স-আওয়ারে বের হয়ে গেছি, আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে। আজকে আমাদের অনেক ব্যস্ততা। প্লিজ, আপনি আমার হাতে ব্যথা দিচ্ছেন।”

“দুঃখিত।”

“আমি যা বলেছি সেটা বোকার মতো হয়ে গেছে। পুরোটাই মিথ্যে। ওখানে আমরা অনেক গুজব শুনি। আমি আপনাকে পরীক্ষা ক’রে দেখছিলাম। আমি আসলেই সেটা করছিলাম। আপনাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম!”

“আপনি খুব সহজেই বোঝাতে পারেন দেখছি। ঠিক আছে, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি।”

“আমি লো ক্লাসিকের কাছে সৎ আছি। আমি সব সময়ই সৎ ছিলাম।”

“এটা তো খুবই ভালো একটা গুন, জেনাইন। আমি সততাকে শ্রদ্ধা করি। আমি ঐদিন আপনাকে বলছিলাম...তার নামটা যেনো কি?...সুইচবোর্ডের সেই চমৎকার লোকটা। তার নামটা কি? আমি ভুলে গেছি।”

“ফিলিপ,” সেল্‌সের মেয়েটা বললো। তার চোখেমুখে আতঙ্ক। “ফিলিপ দাঁজু।”

“ঠিক তাই। ধন্যবাদ আপনাকে।” তারা দুটো ভবনের মাঝখানে একটা সরু গলিতে এসে পড়লে জেসন তাকে ভেতরে নিয়ে গেলো। “একটু ভেতরে যাই। ঘাবড়াবেন না। খুব দেরি হবে না আপনার। আমি কেবল কয়েক মিনিট সময় নেবো আপনার কাছ থেকে।” তারা দশ কদম ভেতরে চলে গেলে বর্ন থামলো। জেনাইন ডলবার্ট ইটের দেয়ালে পিঠ ঠেকালো।

“সিগারেট?” পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের ক’রে জেসন বললো।

“ধন্যবাদ আপনাকে।”

সে তার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো। লক্ষ্য করলো মেয়েটার হাত কাঁপছে। “রিলাক্স হোন।”

“না, মানে, ঠিক আছে। আপনি আমার কাছ থেকে কি চান, মঁসিয়ে বৃগস্?”
 “গুরুতাই বলে রাখছি, নামটা বৃগস্ নয়। আপনার সেটা জানা উচিত।”
 “কেন আমি জানবো। আমার জানার দরকার নেই।”
 “আমি নিশ্চিত লাভিয়ার নাম্বার ওয়ান মেয়েটা আপনাকে কথাটা বলেছে।”
 “মনিকা?”

“শেষ নামটা ব্যবহার করুন। নির্দিষ্ট ক’রে বলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”
 “ব্রায়াল মনিকা,” জেনাইন বললো ভুরু তুলে। “সে কি আপনাকে চেনে?”
 “কথাটা তাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন না?”
 “ঠিক আছে, তাকেই করবো। এখন বলুন ব্যাপারটা কি?”

জেসন মাথা ঝাঁকালো। “আপনি আসলেই জানেন না, তাই না? লো ক্লাসিকের তিন-চতুর্থাংশ কর্মচারী আমাদের সাথে কাজ করে আর সবচাইতে জাদুঁরেল একজন কিছুই জানে না। এমন কি সে যোগাযোগও করে না। অবশ্য, কেউ হয়তো আপনাকে জানানোটা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেছে, তাই জানায় নি। এরকম হয়ে থাকে।”

“হয়েছে কি? কিসের ঝুঁকি? আপনি কে?”

“এখন আর সময় নেই। বাকিরা আপনাকে জানিয়ে দেবে। আমি এখানে এসেছি, কারণ আমরা আপনার কাছ থেকে কখনও কোনো রিপোর্ট পাই নি। যদিও আপনিই সব বড় বড় কাস্টমারদের সাথে কথা বলে থাকেন সারাদিন।”

“আপনি পরিষ্কার ক’রে বলুন তো, মঁসিয়ে।”

“ধরা যাক আমি একটি আমেরিকান, ফরাসি, ইংরেজ, ডাচ লোকদের গ্রুপের মুখপাত্র—এইমাত্র বলা প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক আর সামরিক লোকদেরকে হত্যা করেছে এমন এক খুনিকে ধরার জন্যে আমরা জাল গুটিয়ে এনেছি।”

“হত্যা? সামরিক, রাজনীতিক...” জেনাইনের মুখটা হা হয়ে গেলো। তার সিগারেটের ছাই ভেঙে পড়ে গেলো তার আড়ষ্ট হাতের উপর। “এসব কি? আপনি কি বলছেন? আমি এসব কিছুই শুনি নি!”

“আমি কেবল ক্ষমা চাইতে পারি,” বর্ন নরম কণ্ঠে বেশ আন্তরিকভাবে বললো। “কয়েক সপ্তাহ আগেই আপনার যোগাযোগ করা উচিত ছিলো। এটা আমার আগের লোকটার একটা ভুল। আমি দুঃখিত। এটা অবশ্যই আপনার কাছে একেবারেই অভাবনীয় ঠেকছে।”

“অবশ্যই তাই, মঁসিয়ে,” সেলস্ ক্লার্ক ফিস্ফিস্ ক’রে বললো। “আপনি যেসব কথা বলছেন আমার মাথায় সেসব কিছুই ঢুকছে না।”

“তবে এখন আমি বুঝতে পেরেছি,” জেসন বললো। “আপনার কাছ থেকে কারো সম্পর্কে কোনো কথা শোনা যাবে না। এবার এটা পরিষ্কার।”

“এটা মোটেও পরিষ্কার নয়।”

“আমরা কার্লোসকে প্রায় ধরে ফেলার পথে। ঐ খুনিটার নাম কার্লোস বুঝলেন।”

“কার্লোস?” ডলবার্টের হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেলো। শক্ দেয়া হয়ে গেছে।

“সে আপনাদের নিয়মিত একজন কাস্টমার। এ ব্যাপারে বেশ প্রমাণ আছে। আমরা সম্ভাবনাগুলো আট জনে নামিয়ে এনেছি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ফাঁদটা পাতা হবে। আমরা সবধরনের পূর্ব সতর্কতা নিয়েছি।”

“পূর্ব সতর্কতা...?”

“সব সময়ই তো জিম্মি করার একটা বিপদ থাকে। আমরা এটার সবই জানি। আমরা অনুমাণ করছি গোলাগুলি হবে। কিন্তু সেটা খুব সীমিত আকারে রাখা হবে তবে আসল সমস্যা হলো কার্লোস নিজেই। সে প্রতিজ্ঞা করেছে কখনও জীবিত অবস্থায় ধরা দেবে না। সে শরীরে বোমা নিয়ে পথে বের হয়। সেটাও হয়তো আমরা সামলাতে পারবো। আমাদের দক্ষ বন্দুকবাজরা ঘটনাস্থলেই থাকবে মাথায় একটা গুলি করলেই সব শেষ হয়ে যাবে।”

“উনে সুয়েল বোলে...”

আচম্কা বর্ন তার হাতঘড়িটা দেখলো। “আমি আপনার যথেষ্ট সময় নিয়ে ফেলেছি। আপনাকে শপে ফিরে যেতে হবে, আমাকেও আমার পোস্টে যেতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি আমাকে চেনেন না। আমি যদি লো ক্লাসিকে আসি তবে আমাকে একজন ধনী কাস্টমার হিসেবেই দেখবেন। কিন্তু আপনি যদি এমন কাউকে দেখেন, যে আমাদের টার্গেট ব’লে আপনার কাছে মনে হচ্ছে তখন সময় নষ্ট না ক’রে আমাকে বলবেন। আবোরো বলছি, আমি এসবের জন্যে দুঃখিত যোগাযোগ ভেঙে যাওয়ায় এটা হয়েছে। এরকমটি হয়ে থাকে।”

“উনে রাপচার...?”

জেসন মাথা নেড়ে সাই দিয়ে গলি থেকে বের হয়ে গেলো। থেমে পেছন ফিরে তাকিয়ে জেনাইনের দিকে তাকালো সে। নিশ্চল হয়ে দেয়ালে সঁটে আছে সে। যেনো শক্টা এখনও হজম করতে পারছে না।

ফিলিপ দাভুঁ। নামটা তার কাছে কোনো অর্থই বহন করে না, কিন্তু বর্ন সেটা না ভেবে পারলো না। বার বার আওড়াতে লাগলো সেটা, তার স্মৃতিতে কোনো ছবি ভেসে ওঠে কিনা চেষ্টা করলো...ফিলিপ দাভুঁ। কোনো কিছুই আসছে না। তারপরও কিছু একটা জেসনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। পেটে একটা গিট পাকিয়ে মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেলো।

রুই রেসিন-এর একটি কফি শপের জানালার পাশে সে ব’সে আছে। রাস্তার অপর দিকে পুরনো একটি ভবন থেকে রুদ ওরিয়েল বের হয়ে আসলেই সে এখান

থেকে উঠে বের হয়ে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়ে আছে। তার ঘরটা পাঁচ তলায়। সেই ফ্ল্যাটে সে আরো দু'জন লোকের সাথে থাকে সে। একটা ভাঙাচোড়া সিঁড়ি দিয়েই কেবল সেখানে যাওয়া যায়। সে যখন এসে পৌঁছাবে, বর্ন নিশ্চত সে হাটবে না।

ক্লদ ওরিয়েল জ্যাকুলিন হাভিয়ারের সাথে কথা বলার সময় দাঁতবিহীন ল্যান্ডলেডি ফোন করে তাকে জানিয়েছে তার পাঁচ তলার ঘরে ফার্নিচার ভাঙচুর চলছে। হয় সে বিশ মিনিটের মধ্যে এসে এটা থামাবে নয়তো স্থানীয় পুলিশ জঁদারেমেকে ডাকা হবে।

পনেরো মিনিট পর হাজির হলো সে। তার পিয়েরে কাদোয়াঁ সুটটা বাতাসে উড়ছে। লোকজনের ভীড় এড়িয়ে মেট্রো এক্সিট দিয়ে দৌড়ে আসছে সে।

জেসন কফি শপ থেকে বের হয়ে রাস্তাটা পার হয়ে ভাঙা সিঁড়িটা দিয়ে দ্রুত উঠে গেলো। চার তলায় পৌঁছাতেই সে ওপর তলা থেকে দরজায় আঘাত করার শব্দটা শুনতে পেলো।

“উভরেজ! উভরেজ! ভিতে, নম দ্য দিউ!” ওরিয়েল খেমে গেলো।

বর্ন সন্তর্পনে বাকি ধাপগুলো ডিঙিয়ে আরেকটু উপরে উঠে গেলে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ওরিয়েলকে দেখতে পেলো। ক্লার্কের দুর্বল শরীরটা দরজায় স্টেটে আছে। তার হাত দুটো দু'দিকে ছড়ানো। সে কাঠের দরজায় কান পেতে রয়েছে। জেসন তার পেছনে এসে আমলাতান্ত্রিক ফরাসিতে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “সূরেত! যেখানে আছো সেখানেই থাকো। অযাচিত কিছু যাতে না হয়, বুঝলে। আমরা তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদেরকে অনেক দিনে থেকেই নজরদারী ক'রে আসছি। আমরা ডার্করুমের ব্যাপারটা জানি।”

“না!” ওরিয়েল চিৎকার ক'রে বললো। “তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কসম খেয়ে বলছি! ডার্করুম?”

বর্ন তার হাতটা তুললো। “আপ্তে। চিৎকার করবে না!”

সে সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মতো কাজ করলো। রেলিংয়ের দিকে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালো। “আপনি আমাকে এতে জড়াতে পারেন না!” সেলস্ ক্লার্ক বলতে লাগলো। “আমি জড়িত নই। আমি তাদেরকে বার বার বলেছি এসব বাদ দিতে! একদিন তারা নিজেদেরকেই খুন করবে। ড্রাগ হলো গর্দভদের জন্যে! হায় ঈশ্বর, কোনো সাড়া শব্দ দেখি হচ্ছে না। মনে হয় তারা মরে গেছে!”

জেসন ওরিয়েলের খুব কাছে এসে হাত তুললো। “বললাম না চুপ থাকতে,” সে নিচু কণ্ঠে ককর্শভাবে বললো। “ভেতরে ঢোকো, চুপ থাকো! তা না হলে নিচের ঐ বুড়িটারই বেশি লাভ হবে।”

সেলস্ ক্লার্ক নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো। “কি?”

“তোমার কাছে চাবি আছে,” বর্ন বললো। “দরজা খুলে ভেতরে ঢোকো।”

“ভেতর থেকে আঁটকানো,” ওরিয়েল জবাব দিলো। “এরকম সময় এটা সব সমই আঁটকানো থাকে।”

“বোকা কোথাকার । দরজা খোলো । জলদি!”

ভীত খোরগোশের মতো ওরিয়েল পকেট হাতরাতে হাতরাতে চাবিটা খুঁজে পেলো । সে দরজাটা খুলে এমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো যেনো ঘরের ভেতরে লাশ পড়ে রয়েছে । বর্ন তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলো । ফ্ল্যাটের ভেতরটা একেবারেই আলাদা । বড়সড় একটা লিভিংরুম । দামি আসবাব আর লাল-হলুদ রঙের ভেলভেটের কুশন সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । এটা গোবরে পদ্মফুল । যৌনতার কাজে ব্যবহৃত একটা লিভিংরুম ।

“আমার হাতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে,” জেসন বললো । “কাজের কথা ছাড়া আর কিছু নয় ।”

“কাজের কথা?” ওরিয়েল জানতে চাইলো । তার ভাবসাব প্যারালাইজ রোগীর মতো । “এটা...এটা ডার্করুম? কিসের ডার্করুম?”

“ওটার কথা বাদ দাও । কাজের কথায় আসি ।”

“কিসের কাজ?”

“আমরা জুরিখ থেকে একটা খবর পেয়েছি, আমরা চাই তুমি এটা তোমার বান্ধবী লাভিয়াকে পৌছে দেবে ।”

“মাদাম জ্যাকুলিন? আমার বান্ধবী?”

“আমরা টেলিফোনকে বিশ্বাস করি না ।”

“কিসের ফোন? খবর? কি খবর?”

“কার্লোস ঠিকই বলেছে ।”

“কার্লোস? কার্লোস কে?”

“গুণ্ডঘাতক ।”

রুদ ওরিয়েল চিৎকার ক’রে উঠলো । মুখে হাত চাপা দিয়ে সে বললো, “আপনি বলছেন কি?”

“আন্তে!”

“আপনি এসব কি বলছেন আমাকে?”

তুমি হলে পাঁচ নাম্বার । আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি ।”

“পাঁচ কি? কিসের পাঁচ?”

“কার্লোসকে জাল ভেদ ক’রে পালাতে সাহায্য করার জন্যে । তারা ঘিরে ফেলছে । আগামীকাল, পরের দিন, সম্ভবত তার পরের দিন । তারা শপটা ঘেরাও করবে, প্রতি দশ ফিট অন্তর অন্তর দক্ষ বন্দুকবাজ থাকবে । ক্রশফায়ারটা হবে প্রাণঘাতী । সে যদি ভেতরে থাকে তবে ম্যাসাকার হয়ে যাবে । তোমরাও । তোমাদের সবাই, মারা পড়বে ।”

ওরিয়েল আবারো চিৎকার করলো । “আপনি কি চুপ করবেন! আমি জানি না আপনি এসব কি বলছেন! আপনি একজন উন্মাদ । আমি আর একটা কথাও শুনতে

চাই না—আমি কিছুই শুনি নি। কার্লোস, ক্রুশফায়ার...ম্যাসাকার! হায় ঈশ্বর, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে...আমার বাতাস দরকার!”

“তুমি টাকা পাবে। অনেক টাকা, বুঝলে। লাভিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দেবে। দারুণ ধন্যবাদ দেবে তোমাকে।”

“দাঁজু? সে আমাকে ঘৃণা করে! সে আমাকে ময়ূর ব'লে ডাকে। সুযোগ পেলেই অপমান করে।”

“এটা তার ছদ্মবেশ, আসলে সে তোমার ভক্ত—তুমি জানো না। সে হলো ছয় নাম্বার।”

“এই সব নাম্বারগুলো কি? এইসব নাম্বার নিয়ে কথা বলা বন্ধ করো!”

“আমরা তো কোনো নাম ব্যবহার করতে পারি না।”

“কারা পারে না?”

“আমরা যারা কার্লোসের জন্যে কাজ করি।”

ওরিয়েলের আঙুল দিয়ে রক্ত ঝরতেই সে আবারো কান ফাঁটা একটা চিৎকার দিলো। “আমি আর শুনবো না! আমি একজন টেইলর, একজন শিল্পী!”

“তুমি পাঁচ নাম্বার। আমরা যেমনটি বলবো তুমি তাই করবে, তা না হলে তুমি আর এই জীবনে এই রঙমহলটা আর দেখতে পাবে না।”

“অঁগহান!”

“চুপ করো! আমরা তোমার উপর খুশি। আমরা জানি তোমরা সবাই খুবই চাপের মধ্যে আছো। আসলে, আমরা বুককিপারকে বিশ্বাস করি না।”

“ত্রিগনোয়া?”

“প্রথম নামটা কেবল বলবে। গোপনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

“পিয়েরে। সে খুবই জঘন্য। সে টেলিফোন কলগুলো সামলায়।”

“আমরা মনে করতাম সে ইন্টারপোলের হয়ে কাজ করে।”

“ইন্টারপোল?”

“যদি সে তাই হয়ে থাকে, তবে তুমি দশ বছর জেল খাটবে। তোমাকে জীবন্ত খেয়ে ফেলা হবে, ক্রুদ।”

“অঁগহান!”

“চুপ করো! বারগোয়াঁকে কেবল জানিয়ে দিও আমরা কি ভাবছি। ত্রিগনোয়াঁর দিকে লক্ষ্য রাখবে। বিশেষ করে আগামী দু'দিন। সে যদি কোনো কারণে স্টোর থেকে বের হয়, সাবধান হয়ে যাবে। তার মানে ফাঁদটা চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে।” বর্ন দরজার দিকে গেলো, তার হাত পকেটে। “আমাকে ফিরে যেতে হবে, তোমাকেও। ছয় নাম্বারের মাধ্যমে এক নাম্বারকে আমার বলা কথাগুলো ব'লে দিও। কথাটা ছড়িয়ে দেয়া খুবই জরুরি।”

ওরিয়েল আবারো চিৎকার দিলো হিস্ট্রিয়াগ্রস্তের মতো। “নাম্বার! খালি নাম্বার! কিসের নাম্বার? আমি একজন শিল্পী, কোনো নাম্বার নয়!”

“তুমি ওখানে যতো দ্রুত সম্ভব চলে যাও, নইলে তোমার কোনো মুখ ব’লে কিছু থাকবে না। লাভিয়া, দাঁজু, বারগোয়ার কাছে যাও। জল্দি। তারপর অন্যদের কাছে।”

“অন্যদের আবার কি?”

“দুই নাম্বারকে জিজ্ঞেস করো।”

“দুই?”

“ডলবার্ট। জেনাইন ডলবার্ট।”

“জেনাইন। সেও?”

“ঠিক। সেও”

সেলস্ ক্লার্ক উদভ্রান্তের মতো হাত নেড়ে নেড়ে বললো, “এটা পাগলামী! আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না!”

“তোমার জীবনের মূল্য আছে, রুদ। আমি নিচের রাস্তায় অপেক্ষা করবো। ঠিক তিন মিনিট পরে এখান থেকে চলে যাবে। ফোনটা ব্যবহান করো না। সোজা লো ক্লাসিকে ফিরে যাও। তুমি যদি তিন মিনিট পরে না যাও আমি আবার ফিরে আসবো।” সে পকেট থেকে হাতটা বের করলে দেখা গেলো হাতে একটা পিস্তল। পিস্তলটা দেখেই ওরিয়েলের মুখ দিয়ে বুকের সমস্ত বাতাস বের হয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বর্ন ঘুরে ঘর থেকে বের হয়ে দরজাটা বন্ধ ক’রে চলে গেলো।

বছানার পাশে টেবিলের উপরে রাখা ফোনটা বেজে উঠলো। মেরি তার হাত ঘড়িতে তাকালো। ৮টা ১৫। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো। জেসন বলেছিলো সে তাকে ৯টা বাজে ফোন করবে। সন্ধ্যা নামার পরই লা টেরেস ছেড়ে সে ৭টার দিকে চলে গেছে মনিকা ব্রায়াল নামের এক সেলস্ ক্লার্ককে পাকড়াও করার জন্যে। শিডিউলটা একেবারেই হিসেব ক’রে করা। কেবল জরুরি প্রয়োজনেই সেটা বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। কিছু কি হয়েছে?

“এটা কি ৪২০ নাম্বার রুম?” ফোনে গভীর পুরুষ কণ্ঠটা জানতে চাইলো।

মেরির স্বস্তিটা ফিরে এলো। কণ্ঠটা আদ্র্ণে ভিলিয়ার্দের। জেনারেল বিকেলের দিকে ফোন ক’রে জেসনকে বলতে বলেছে যে, লো ক্লাসিকে ভীতিটা বেশ ভালোমতোই ছড়িয়ে পড়েছে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে তার বউকে ছয়বার ফোন করা হয়েছে। যখনই সে ফোনটা তুলে নিয়েছে সিরিয়াস কথাবার্তা হালকা রসিকতায় বদলে গেছে।

“হ্যা,” মেরি বললো। এটা ৪২০ নাম্বার।”

“ক্ষমা করবে, আমরা এর আগে কথা বলি নি।”

“আমি জানি আপনি কে?”

“আমিও তোমার সম্পর্কে জানি। আমি কি তোমাকে একটা ধন্যবাদ দিতে পারি?”

“আমি বুঝেছি। আপনার ধন্যবাদ আমি গ্রহণ করলাম।”

“আসল কথায় আসি। আমি আমার অফিস থেকে ফোন করছি। আর অবশ্যই এটার কোনো এক্সটেনশন লাইন নেই। আমাদের দু’জনের বন্ধুকে বোলো, সংকটটা বাড়ছে। আমার বউ নিজের ঘরে আছে। বলছে তার শরীর খারাপ। যদিও ফোনে তাকে বেশ সুস্থই মনে হচ্ছে। আমি ফোন তুললেই তারা সতর্ক হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই আমি ক্ষমা চেয়ে বলেছি আমি একটা ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় না আমার বউ আমার কথাটা বিশ্বাস করেছে। তবে সে আমাকে কোনো প্রশ্ন করার মতো অবস্থায় নেই। আমাদের দু’জনের মধ্যে এক ধরনের অকথিত লড়াই চলছে। এটা খুবই হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বর যেনো আমাকে শক্তি দেন।”

“আমি কেবল আপনাকে বলবো উদ্দেশ্যের কথাটা স্মরণ রাখতে,” মেরি অনেকটা রেগেই বললো। “আপনার ছেলের কথাটা স্মরণ করুন।”

“হ্যাঁ,” বুদ্ধ শান্ত কণ্ঠে বললো। “আমার ছেলে। আর সেই বেশ্যাটা, যে দাবি করে তার স্মৃতিকে সে শ্রদ্ধা করে।”

“ঠিক আছে। আপনি আমাকে যা বললেন সেটা আমি আমাদের বন্ধুকে জানিয়ে দেবো। সে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আপনাকে ফোন করবে।”

“প্রিজ,” ভিলিয়ার্স বাঁধা দিয়ে বললো। “আরো কিছু আছে। এজন্যেই আমি তোমাকে ফোন করেছি। দু’দু’বার আমার যখন বউ ফোনে ছিলো তখন কণ্ঠটা আমার কাছে অর্থবহ ব’লে মনে হয়েছে। দ্বিতীয়টি আমি চিনতে পেরেছি। কণ্ঠটা শুনে আমার একটা চেহারা মনে পড়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। সে সেন অনরের সুইচবোর্ডে কাজ করে।”

“আমরা তার নামটা জানি। প্রথমজন কে?”

“সেটা খুবই অদ্ভুত। আমি কণ্ঠটা চিনি না। তবে কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। কণ্ঠটা খুবই অদ্ভুত, চাপা আর অনেকটা আদেশমূলক। কমান্ডটা আমাকে ভাবিয়েছে। সেই কণ্ঠটা আমার বউয়ের সাথে কোনো কথপোকথন করে নি। সেটা কেবল একটা অর্ডার করেছে। লাইনে আমি যেতেই সেটা বদলে যায়। তাড়াতাড়ি বিদায় ব’লে কেটে দেয়া হয়। তবে কথাটা আমি ঠিকই শুনেছি। কণ্ঠটা যেকোনো সৈনিকের জন্যেই সুপরিচিত। আমি কি পরিষ্কার ক’রে বোঝাতে পেরেছি?”

“মনে হয়,” মেরি আস্তে ক’রে বললো। সে জানে বুদ্ধ যদি বুঝতে পারে সে কি ভাবছে তবে সেটার যে চাপ তার উপর পড়বে তা সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে।

“এটা নিশ্চিত করবেন, মাদামোয়াজেল,” জেনারেল বললো, “এটা কিলার পিগ,” ভিলিয়ার্স থেমে গেলো। তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার পরের কথাগুলো এমন শোনালো যে, শক্তসামর্থ্য লোকটার কণ্ঠ অনেকটা ভঙ্গুর ব’লে মনে হলো। “সে...আমার বউকে...আদেশ করছে...” বুদ্ধ সৈনিকের কণ্ঠটা আটকে

গেলো। “ক্ষমা করবে। তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়ার কোনো অধিকার আমার নেই।”

“আপনার সেই অধিকার রয়েছে,” মেরি বললো, আচম্কাই সে সতর্ক হয়ে উঠলো। “যা-ই ঘটেছে সেটা আপনাকে অনেক যন্ত্রণা দিচ্ছে কারণ কাউকে কথাট বলতে পারছেন না।”

“আমি তোমাকে বলছি, যদিও তোমাকে সেটা বলা ঠিক হচ্ছে না।”

“আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনার সাথে কথা চালিয়ে যেতে। আমাদের একজন আপনার সাথে থাকুক সেটা চাইছি। কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয়। আমি জানি আপনি সেটা বোঝেন। পিজ্জ, নিজেকে ঠিক রাখুন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনার সাথে আমাদের বন্ধুর কোনো সংযোগ যেনো প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হলে আপনার জীবন বিপন্ন হবে।”

“আমার মনে হয় আমি ইতিমধ্যেই আমার জীবনটা হারিয়ে ফেলেছি।”

“সা সেন্ট এবসার্ড,” মেরি বেশ কড়া ক’রে বললো। যেনো বৃদ্ধের গালে একটা চড় বসিয়ে দেবার মতো। “ভূ এত উঁ সোলদাত! আরেতেজ্জ কা ইমিদিয়েতেন!”

“সেন্ট লিনক্রইস্তিস কুই করিয়ে লো মোভোয়া এলেভিয়া। ভু আভেজ বুঁ রেসোয়া।”

“অন দিত কুই ভু এত উঁ জোয়াঁ। জো লো ক্রোয়া।”

লাইনে নিরবতা নেমে এলে মেরির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। ভিলিয়ার্স যখন আবার কথা বললো মেরির শ্বাসপ্রশ্বাস আবার সচল হলো।

“আমাদের দু’জনের বন্ধুটি খুবই ভাগ্যবান। তুমি একজন অসাধারণ মেয়ে।”

“মোটোও না। আমি কেবল চাই আমার বন্ধু আমার কাছে ফিরে আসুক। এতে অসাধারণ কোনো ব্যাপার নেই।”

“সম্ভবত তোমার কথাটা ঠিক নয়। তবে আমিও তোমার বন্ধু হতে চাই। তুমি একজন বৃদ্ধকে মনে করিয়ে দিয়েছো সে কে আর কি। অথবা একসময় সে কি ছিলো। এবং আবারো তাকে সেরকম হতে হবে। আমি তোমাকে আবারো ধন্যবাদ দিচ্ছি।”

“আপনাকে স্বাগতম...বন্ধু।” মেরি ফোনটা রেখে দিলো। সে খুবই উদ্ভিগ্ন বোধ করছে এখন। ভিলিয়ার্স পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা মোকাবেলা করতে পারবে ব’লে তার মনে হচ্ছে না। সে যদি তা না পারে, খুনি জানবে তার লোকজন কতো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। সে লো ক্লাসিকের সবাইকে বলে দেবে প্যারিস ছেড়ে চলে যেতে, উধাও হয়ে যেতে। অথবা সেন অনরে’তে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ফলাফল একই।

যাই ঘটুক না কেন, কোনো জবাব, নিউইয়র্কের কোনো ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কোনো মেসেজ’র মর্মবাণী উদ্ধার করা যাবে না। যে লোকটাকে সে ভালোবাসে সে আবারো ফিরে যাবে তার গোলকধাঁধায়। চলে যাবে তাকে ছেড়ে।

অধ্যায় ২৮

বর্ন দেখলো মেয়েটা তার হোটেলে ফিরে যাচ্ছে। এখানেই সে থাকে। মনিকা ব্রায়াল। জাকুলিন লাভিয়ার এক নাম্বার মেয়ে। জেনাইন ডলবার্টের চেয়ে একটু বেশি শক্তপোক্ত। তাকে সে শপে দেখেছে, মনে পড়লো। মেয়েটার পদক্ষেপ খুব দ্রুত। নিজের অভিজ্ঞতার উপর তার আস্থা আছে। জেসন বুঝতে পারলো কেন সে লাভিয়ার এক নাম্বার।

মোকাবেলাটা হবে সংক্ষিপ্ত। মেসেজটার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় শকুওয়েভ দেবার পালা। সে ফুটপাতে নির্বিকার দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে তাকে অতিক্রম করতে দিলো। রাস্তায় খুব বেশি ভীড় নেই। তবে একেবারে ফাঁকাও নয়। পুরো ব্লকটায় সম্ভবত আধ ডজন লোক আছে। মেয়েটাকে একাকী করাটা খুবই জরুরি।

সে মেয়েটার পিছু নিতে শুরু করলো। যখন হোটেলের প্রবেশদ্বার ত্রিশ ফিট দূরে, মেয়েটার পাশে এসে হাটার গতি কমিয়ে দিলো সে।

“এক্ষুণি লাভিয়ার সাথে যোগাযোগ করো,” সে তার দিকে তাকিয়ে ফরাসিতে বললো।

“কি বললেন? আপনি কি বললেন? কে আপনি, মঁসিয়ে?”

“থেনো না! হাটতে থাকো। প্রবেশপথটা অতিক্রম করো।”

“আপনি জানেন আমি কোথায় থাকি?”

“খুব কমই আছে যা আমরা জানি না।”

“আমি যদি ভেতরে ঢুকি? দরজায় এক জন ডোরম্যান আছে—”

“লাভিয়াও আছে,” বর্ন তাকে বাঁধা দিয়ে বললো। “তুমি তোমার চাকরি হারাবে, আর সেন অনরের কোথাও কাজ জুটাতে পারবে না। সেটা তোমার জন্যে বেশ সমস্যারই হবে।”

“আপনি কে?”

“আমি তোমার কোনো শত্রু নই,” জেসন তার দিকে তাকালো। “আমাকে শত্রু বানিয়ে না।”

“আপনি। আমেরিকান লোকটি! জেনাইন...রুদ ওরিয়েল!”

“কার্লোস,” বর্ন বাক্যটা সমাপ্ত করলো।

“কার্লোস? এসব পাগলামীর মানে কি? পুরো বিকেলটা জুড়ে খালি কার্লোস আর কার্লোস! আর খালি নাম্বার! আর নাম্বার! প্রত্যেকেরই নাকি নাম্বার আছে,

অথচ কেউ তা শোনে নি! ফাঁদের কথা বলা হচ্ছে, অস্ত্রধারী লোকদের কথা বলা হচ্ছে! এটা তো পাগলামী!”

“এটাই হবে। হাটতে থাকো। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।”

মেয়েটা তাই করলো। “জ্যাকুলিন আমাদের সাথে কথা বলেছে,” মেয়েটা বললো। তার কণ্ঠে দুঃশ্চিন্তার ছাপ। “সে আমাদের সবাইকে বলেছে এটা একেবারেই পাগলের কাজ। আপনি, মানে আপনারা লো ক্লাসিককে ধ্বংস করতে চান। অন্য হাউজগুলো অবশ্যই আপনারাদের টাকা দিয়েছে এটা করার জন্যে।”

“এছাড়া তার কাছ থেকে তুমি আর কি আশা করো?”

“আপনি একজন ভাড়াটে লোক। সে আমাদেরকে সত্য কথাটাই বলেছে।”

“সে কি তোমাকে তোমার মুখটাও বন্ধ করতে বলে নি? এসব কিছুই যেনো কারো কাছে না বলো?”

“অবশ্যই বলেছে।”

“তার চেয়ে বড় কথা হলো, পুলিশের সাথে যেনো যোগাযোগ না করো। যদিও এটাই এই পরিস্থিতিতে সবচাইতে যুক্তিযুক্ত কাজ হতো।”

“হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই...”

“স্বাভাবিকভাবে নয়,” বর্ন দ্বিমত পোষণ করলো। “দ্যাখো, আমি কেবল একজন রিলে। সম্ভবত তোমার চেয়ে উচ্চপদে নই। আমি এখানে তোমাকে পটাতে আসি নি। আমি একটা মেসেজ দিতে এসেছি। আমরা ডলবার্টের উপর একটা পরীক্ষা করছি; তাকে ভূয়া তথ্য দিয়েছি।”

“জেনাইন?” মনিকা ব্রায়াল খুবই অবাধ হয়ে জানতে চাইলো। “সে যে কথা বলেছে, সেটা তো অবিশ্বাস্য! ক্রুদের হিস্টরিয়াগ্রাফ চিৎকারের মতোই—যে কথা সে বলেছে, তার মতোই। কিন্তু জেনাইন যা বলেছে ক্রুদ বলেছে তার ঠিক উল্টো।”

“আমরা জানি। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। সে আঁজুর-এর কথা বলেছিলো।”

“আঁজুর হাউজ?”

“আগামীকালকে তাকে বাজিয়ে দেখবে। তার মোকাবেলা করবে।”

“মোকাবেলা করবো?”

“যা বলেছি তাই করবে। এটার সাথে ওটার সম্পর্ক থাকতে পারে।”

“কোন্টার সাথে?”

“ফাঁদটার সাথে। আঁজুর ইন্টারপোলের সাথে কাজ ক’রে থাকতে পারে।”

“ইন্টারপোল? ফাঁদ? এটা তো ঐসব পাগলের প্রলাপ! কেউ জানে না আপনি এসব কি বলছেন!”

“লাভিয়া জানে। এক্সুগি তার সাথে যোগাযোগ করো।” তারা ব্লকের শেষ মাথায় এসে পড়লে জেসন তার হাতটা স্পর্শ করলো। “আমি এখান থেকে

তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি হোটেলে ফিরে গিয়ে লাভিয়াকে ফোন করবে। তাকে বলবে, ব্যাপারটা যেরকম ভেবেছিলাম তার চেয়েও সিরিয়াস। সব কিছু ভেঙে পড়ছে। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো কেউ একজন বেঈমানী করেছে। এ্যালবার্ট নয়, ক্লার্কদের কেউ নয়। উঁচু পদের কেউ হয়তো। সে সব কিছু জানে।”

“বেঈমানী? এর মানে কি?”

“লো ক্লাসিকের একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। তাকে বলবে সতর্ক থাকতে। সবাইকে। যদি সে তা না করে তবে সেটা আমাদের সবাইকে শেষ ক’রে দেবে।” বর্ন তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেলো। ওপাশে গিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা দরজা দিয়ে দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ভেতরে ঢুকেই সে উঁকি মেরে বাইরে তাকালো। মনিকা ব্রায়াল হোটেলের ভেতর ঢুকছে। দ্বিতীয় শকুওয়েভের প্রথম ভীতিটা শুরু হয়ে গেছে। মেরিকে ফোন করার সময় হয়ে গেছে এখন।

“আমি খুব উদ্ভিগ্ন আছি, জেসন। এটা উনাকে একেবারে বিপর্যস্ত ক’রে ফেলছে। ফোনে উনি একেবারে ভেঙে পড়ছিলেন। উনি বউয়ের দিকে তাকালে কি হবে বলো? উনি এখন কি ভাবছেন, কি করছেন?”

“সে সামলাতে পারবে এটা,” বর্ন বললো। শাম্প এলিসির একটা ফোনবুথ থেকে সে কথা বলছে। “সে যদি তা না করে, আমি তাকে খুন করবো। আমার আসলে মুখটা বন্ধ রাখা উচিত ছিলো, তার বউকে ধরার দরকার ছিলো।”

“তুমি সেটা করতে পারতে না। তুমি দাঁজুকে সিঁড়ির ধাপে দেখেছো, তুমি ভেতরে যেতে পারতে না।”

“আমি কিছু একটা ভাবতে পারতাম। যেমনটি আমরা একমত হয়েছি। এসব ব্যাপারে আমি খুবই কার্যকরী।”

“কিন্তু তুমি তো কিছু একটা করছো! তুমি ভীতি সৃষ্টি করেছো, যারা কার্লোসের অর্ডার পালন করে তাদেরকে প্রকাশ ক’রে ফেলেছো। কাউকে এই ভীতিটা থামাতে হবে। এমনকি তুমি বলেছো তুমি মনে করো না জ্যাকুলিন লাভিয়া যথেষ্ট উপরের লোক। জেসন, তুমি কাউকে দেখতে পাবে, তুমি জানতে পারবে। তাকে তুমি ধরতে পারবেই!”

“আমিও তাই আশা করি। হায় ঈশ্বর, আমি সেরকম আশাই করি। আমি জানি আমি কি করছি। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে...” বর্ন থামলো। কথাটা বলতে তার ঘেন্না লাগছে। তবে কথাটা তাকে বলতেই হবে। “আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। আমার একটা অংশ বলছে ‘নিজেকে বাঁচাও,’ বাকি অংশটা বলছে, ‘কার্লোসকে ধরো।’”

“শুরু থেকেই তো তুমি এরকম করছো, তাই না?” মেরি নরম কণ্ঠে বললো।

“আমি কার্লোসকে পরোয়া করি না!” চিৎকার ক’রে বললো জেসন। “এটা আমাকে পাগল ক’রে ফেলছে।”

“ডার্লিং, ফিরে আসো।”

“কি?” বর্ন ফোনটার দিকে তাকালো। আবারো সেটা শুরু হয়েছে। আকাশটা বেশ গাঢ়। একসময় এটা খুবই উজ্জ্বল ছিলো, চোখ ঝলসানো ছিলো। পাখির কিচির মিচির আর যন্ত্রের শব্দ...

“জেসন।”

“কি?”

“ফিরে আসো। প্লিজ, ফিরে আসো।”

“কেন?”

“তুমি খুব ক্লান্ত। তোমার বিশ্রামের দরকার।”

“আমাকে পিয়েরে ব্রিগনোয়ার কাছে যেতে হবে। সে হলো বুককিপার।”

“আগামীকালকে যোয়ো।”

“না। আগামীকালকে ক্যাপটেনদেরকে ধরতে হবে।” সে এটা কি বললো? ক্যাপটেনদেরকে। সেনাদল। ভীতসন্ত্রস্ত লোকজন হুড়োহুড়ি করছে। তবে এটা একমাত্র পথ। বহরুপী একজন উস্কানীদাতা।

“আমার কথা শোনো,” মেরি বললো। তার কণ্ঠ খুব দৃঢ়। “তোমার কিছু একটা হচ্ছে। এটা আগেও হয়েছে। আমরা দু’জনেই সেটা জানি। আর সেটা যখন ঘটে তখন সেটা তোমাকে থামাতে হয়। এটাও আমরা জানি। হোটেলে ফিরে আসো। প্লিজ।”

বর্ন চোখ দুটো বন্ধ ক’রে ফেললো। রাতের আকাশে তারা দেখতে পেলো সে। কোনো চোখ ঝলসানো আলো নেই।

“আমি ঠিক আছি। আমি ঠিক আছি এখন। কেবল কয়েকটা বাজে মুহূর্ত, এই যা।”

“জেসন, কারণটা কি?” মেরি শান্ত কণ্ঠে বললো।

“জানি না।”

“তুমি এইমাত্র ব্রায়াল মেয়েটাকে দেখেছো। সে কি তোমাকে কিছু বলেছে? এমন কিছু যাতে তোমার মধ্যে অন্য কোনো ভাবনা এসে ভর করেছে?”

“আমি নিশ্চিত নই। আমি এতোটা ব্যস্ত ছিলাম যে, কি ভাববো বুঝতে পারি নি।”

“ভাবো, ডার্লিং।”

“বর্ন চোখ দুটো বন্ধ ক’রে মনে করার চেষ্টা করলো। কোনো কিছু কি আছে? “মেয়েটা আমাকে উস্কানীদাতা বলেছে,” জেসন বললো, কেন এই শব্দটা তার মধ্যে ফিরে এলো সে জানে না। “কিন্তু আমি তো সেটাই, তাই না? আমি তো সেটাই করছি।”

“হ্যা,” মেরি একমত হয়ে বললো ।

“আমাকে কাজটা চালিয়ে যেতে হবে । ত্রিগনোয়াঁ এখন থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে থাকে । দশটা বাজার আগেই তাকে আমার ধরতে হবে ।”

“সতর্ক থেকো,” মেরি উদাস হয়ে বললো ।

“ঠিক আছে । তোমাকে ভালোবাসি ।”

“তোমার উপর আমার আস্থা আছে,” মেরি বললো ।

রাস্তাটা একেবারে শান্ত । ব্লকটা দোকানপাট আর ফ্ল্যাট-এর মিশ্রনে একটি এলাকা, দিনের বেলায় লোকসমাগম থাকলেও, রাতে একেবারে ফাঁকা ।

ত্রিগনোয়াঁতে পিয়েরের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে পৌছালো জেসন । সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে একটা মৃদুর আলোর ফয়ারে এসে পড়লো । এক সারি পিতলের মেইলবক্স আছে ডান দিকে । প্রতিটার উপরেই নাম-ঠিকানা লেখা । জেসন নামগুলো থেকে পিয়েরেরটা খুঁজে পেয়ে কালো বোতামটা দু'বার টিপলে দশ সেকেন্ড পরেই স্পিকার থেকে একটা কণ্ঠটা শোনা গেলো ।

“উই?”

“মঁসিয়ে ত্রিগনোয়াঁ, সিলভু প্রেইত?”

“ইসি ।”

“তেলোথামে, মঁসিয়ে । জে নে পুরা পাস কুইতার মা বাইসাইক্লেত ।”

“তেলোথামে? পোর মোয়ে?”

পিয়েরে ত্রিগনোয়াঁ খুব একটা টেলিগ্রাম পেয়ে থাকে না । তাই কথাটা শুনে সে বিস্মিত হলো । তার বাকি কথাগুলো আর বোঝা গেলো না । তবে তার কাছাকাছি একটা নারী কণ্ঠ শোনা গেলো । টেলিগ্রাম মানেই যে খুব খারাপ খবর, এটা ভেবে আতকে উঠেছে সে ।

বর্ন এপার্টমেন্টের ঘোলা কাঁচের দরজার সামনে অপেক্ষা করছে । কয়েক সেকেন্ড পরেই বর্ন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো । ত্রিগনোয়াঁর পায়ের শব্দ । দরজাটা খুলে গেলে জেসনকে আড়াল ক'রে ফেললো সেটা । টেকো মাথার নাদুনুদুন শরীরের একজন মেইলবক্সের কাছে হেলে দুলে হেটে গেলো । ৪২ নাম্বারের কাছে এসে থামলো লোকটা ।

“মঁসিয়ে ত্রিগনোয়াঁ?”

মোটো লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো । “একটা টেলিগ্রাম! আমার কাছে একটা টেলিগ্রাম এসেছে!” সে জোরে জোরে বললো । “আপনিই কি সেটা নিয়ে এসেছেন?”

“চালাকিটা করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি । তবে সেটা আপনার মঙ্গলের জন্যেই । আমি চাই নি আপনাকে আপনার পরিবার আর স্ত্রী'র সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করি ।”

“জিজ্ঞাসাবাদ?” বুককিপার বিস্মিত হলো। তার চোখেমুখে ভয়। “আমাকে? কি জন্যে? এসব কি? আপনি আমার বাড়িতে কেন এসেছেন? আমি আইন মান্যকারী একজন নাগরিক!”

“আপনি সেন অনরিতে কাজ করেন? লো ক্লাসিক নামের একটা ফার্মে?”

“হ্যাঁ। আপনি কে?”

“চাইলে আপনি আমার অফিসে আসতে পারেন,” বর্ন বললো।

“আরে, আপনি আসলে কে?”

“ব্যুরো অব ট্যাক্সেশন এবং রেকর্ডের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটোর। জালিয়াত এবং ষড়যন্ত্র ডিভিশনে আছি। আমার সাথে আসুন—নিচে অফিসের গাড়ি আছে।”

“আপনার সাথে যাবো? আমি তো কোনো জ্যাকেট বা কোট পারি নি! আমার স্ত্রী, সে টেলিগ্রামের জন্যে অপেক্ষা করছে।”

“চাইলে সেটা তার কাছে পাঠাতে পারেন। এখন আমার সঙ্গে আসুন। আমি সারাদিন ধরে এ কাজে লেগে রয়েছি। এটা এখন শেষ করতে চাই।”

“প্রিজ, মঁসিয়ে। আমি কোথাও যাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করছি না! আপনি বলেছিলেন আপনার কিছু প্রশ্ন আছে। আমাকে প্রশ্ন করুন, উপরে যেতে দিন। আপনার অফিসে যাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।”

“কয়েক মিনিট লাগবে তাহলে,” জেসন বললো।

“আমি বউকে ফোন ক’রে বলে দিচ্ছি, বলবো এটা ভুল ক’রে এসেছে।” ত্রিগনোয়া বলেই একটু হাসার চেষ্টা করলো। “অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। কয়েক মিনিটে কীইবা এসে যায়? এবার বলুন মঁসিয়ে, ব্যাপারটা কি? আমার বুক-গুলো খুবই নিখুঁত, একদম! একাউন্ট-এর কাজের জন্যে আমি দায়ি নই। সেটা আলাদা একটা ফার্ম করে। সে আলাদা একটা ফার্মে আছে। সত্যি বলতে কি আমি তাকে কখনও পছন্দ করি নি। সে কথায় কথায় কসম খায়। বুঝলেন তো কি বললাম। কিন্তু তার পরেও, সেটা আমি বলার কে?”

“গুরুত্বই বলছি,” বর্ন সরাসরি বলতে শুরু করলো। “প্যারিস ছেড়ে যাবেন না। যদি ব্যক্তিগত অথবা পেশাগত কাজে আপনাকে বাইরে যেতে বলা হয়, তবে আমাদেরকে জানাবেন। সত্যি বলতে কি, এটার অনুমতি দেয়া হবে না।”

“আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন, মঁসিয়ে!”

“মোটাই না।”

“প্যারিস ছাড়ার তো আমার কোনো কারণ নেই—এরকম কাজের জন্যে আমার হাতে এখন তেমন টাকা-পয়সাও নেই—আমাকে এরকম কথা বলাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে। আমি করেছি কি?”

“ব্যুরো আজ সকালে আপনার বুকগুলো তলব করেছিলো। প্রস্তুত হন!”

“তলব করেছে? কি জন্যে? প্রস্তুতই বা হবো কেন?”

“তথাকথিত একজন সাপ্লামারকে পেমেন্ট দিয়েছেন যার ইনভয়েসগুলো জাল। মার্চেন্ডাইজটা কখনই রিসিভ করা হয় নি—রিসিভ করা হবেও না—পেমেন্টগুলো জুরিখের একটা ব্যাংকে চলে গেছে।”

“জুরিখ? আরে, এসব কি বলছেন, আমি তো কিছুই জানি না! আমি জুরিখের জন্যে কোনো চেক প্রস্তুত করি নি।”

“সরাসরি নয়। আমরা সেটা জানি। তবে কোনো অস্তিত্বহীন ফার্মের জন্যে সেগুলো রেডি করাটা কতোটাই না সহজ। টাকাগুলো পেইড করা হয়েছে, তারপর জুরিখে চলে গেছে।”

“প্রতিটি ইনভয়েস-এ মাদাম লাভিয়ার স্বাক্ষর থাকে! আমি নিজে কিছু পে করি না!”

“এখন তো দেখছি আপনিই ঠাট্টা করছেন,” সে বললো।

“কসম খেয়ে বলছি! এটা হাউজের পলিসি। যে কাউকে জিজ্ঞেস ক’রে দেখতে পারেন! মাদাম অথোরাইজ না করলে লো ক্লাসিক কোনো কিছু পে করে না।”

“তাহলে আপনি বলছেন যে, আপনারা সরাসরি মাদামের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে থাকেন।”

“স্বাভাবিকভাবেই!”

“আর মাদাম কার কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে থাকে?”

ত্রিগনোয়া দাঁত বের ক’রে হাসলো। “বলা হয় ঈশ্বরের কাছ থেকে। অবশ্যই এটা ঠাট্টা ক’রে বলা হয়।”

“আমি চাইবো, আপনি একটু সিরিয়াস হবেন। লো ক্লাসিকের আসল মালিক কারা?”

“পার্টনারশিপ ব্যবসা। মাদাম লাভিয়ার অনেক ধনী বন্ধু আছে। তারা তাকে টাকা দেয়। আর রেনে বারগোয়ার প্রতিভা তো আছেই।”

“সেইসব বিনিয়োগকারী কি নিয়মিত দেখা সাক্ষাত ক’রে থাকে? তারা কি নীতিনির্ধারণী কোনো কিছুতে অংশ নেয়? সম্ভবত কোনো ফার্মের ব্যাপারে তদবির করে, ব্যবসার প্রয়োজনে?”

“আমি জানবো না, মঁসিয়ে। স্বাভাবিক, সবারই তো বন্ধুবান্ধব আছে।”

“আমরা হয়তো ভুল লোককে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি,” বর্ন বললো। “এমনও হতে পারে, আপনি এবং মাদাম লাভিয়াকে কেউ ব্যবহার করছে।”

“কিসের জন্যে ব্যবহার করছে?”

“জুরিখে টাকা পাচারের কাজে। ইউরোপের একজন ভয়ংকর খুনির একাউন্টে।”

ত্রিগনোয়া আংকে উঠলো। “আরে, এসব কি বলছেন?”

“আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। বিশেষ ক’রে আপনি। আপনিই চেকগুলো প্রস্তুত করেন, অন্য কেউ নয়।”

“কেবল এপ্রভাল হলেই করি!”

“ইনভয়েসগুলোর বিপরীতে আপনি কি মার্চেভাইজগুলো কখনও চেক ক’রে দেখেছেন?”

“এটা আমার কাজ নয়!”

“তাহলে, আপনি সাপ্লাইয়ের জন্যে যেসব পেমেণ্ট ইস্যু করেন সেগুলো কখনও দেখেন না।”

“আমি কখনও কিছু দেখি না! আমার কাছে ইনিশিয়াল দিয়ে পাঠানো হলেই কেবল আমি পে করি!”

“আপনি এবং লাভিয়া প্রতিটি পুরনো ফাইল খুঁজে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কারণ আপনারা দু’জনেই—বিশেষ ক’রে আপনি—কেস্ খাবেন।”

“কেস্? কিসের কেস্?”

“প্রয়োজনীয় রিট-এর অভাবের জন্যে। এটাকে বলতে পারেন হত্যাকাণ্ডে সহযোগীতা করা।”

“হত্যা—”

“গুপ্তহত্যা। জুরিখের একাউন্টটা কার্লোস নামের এক গুপ্তঘাতকের। আপনি, পিয়েরে ত্রিগনোয়া, আর আপনার বর্তমান বস্ মাদাম জ্যাকুলিন লাভিয়া সরাসরি ইউরোপের সবচাইতে ভয়ংকর খুনিকে টাকা পয়সা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক সহযোগীতা দিয়েছেন। ইলিচ রামিরেজ সানচেজ। আলিয়াস কার্লোস।”

“অঁউগ!...” ত্রিগনোয়ারের চোখ দুটোতে ভয় আর আতঙ্ক জেঁকে বসলো। “সারাটা বিকেলে...” সে ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে বললো। “লোকজন আমার চারপাশে ছোট্টাছুটি করেছে, উদভ্রান্তের মতো মিটিং করেছে, আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছে। আমার বুথের সামনে দিয়ে যাবার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে দেখেছে। ওহ্ ঈশ্বর।”

“আপনার জায়গায় আমি হলে আমি এক মুহূর্তও দেরি করতাম না। খুব জলদিই সকাল হবে, শুরু হবে আপনার জীবনের সবচাইতে কঠিন দিন।” জেসন বাইরের দরজা দিয়ে বের হয়ে একটু থামলো। তার হাত দরজার নবের উপর। “আপনাকে উপদেশ দেয়াটা আমার কাজ নয়, তবে আপনার জায়গায় আমি হলে আমি এফুগি মাদাম লাভিয়ার সাথে যোগাযোগ করতাম। আপনাদের দু’জন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেন—এটাই হয়তো কেবল করতে পারেন। পথেঘাটে যেকোনো জায়গায় খুনখারাবির ব্যাপারটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।”

বহুদূর পী রাস্তার দিকে পা বাড়ালে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তার মুখে এসে লাগলো।

কার্লোসকে ধরো। ফাঁদে ফেলো। কেইন হলো চার্লি আর ডেন্টা হলো কেইন।

ভূয়া!

নিউইয়র্কের একটা নাম্বার খুঁজে বের করো। ট্রেডস্টোন খুঁজে বের করো।
একটা মেসেজের অর্থ উদ্ধার করো। থেরককে খুঁজে বের করো।

জেসন বর্নকে খুঁজে বের করো।

নুয়েলি সুর সেইন-এর চার্চের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরা দাঁড়ি কামানো এক বৃদ্ধলোক হুড়মুড় করে প্রবেশ করলো সেখানে। ভেতরে লম্বা যাজক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে যাজকের মনে হলো লোকটাকে সে এর আগেও দেখেছে। তবে ঠিক চিনতে পারলো না। গতকালকে এক নোংরা ভিক্ষুক এসেছিলো, একই আকারের, ঠিক একই...না এই বৃদ্ধের জুতা চক্‌চক্‌ করছে। তার সাদা চুলগুলো ভালো করে আঁচড়ানো। তার সুটটা পুরনো ফ্যাশনের হলেও বেশ দামি।

“অ্যাস্কেলিয়াস ডোমিনি,” কনফেকশন বুথের পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বৃদ্ধ বললো।

“যথেষ্ট!” পর্দার পেছনে আবছায়া অবয়বটা বললো। “সেন অনরে থেকে কি জানতে পারলেন?”

“খুব কমই, তবে তার মেথডগুলো শ্রদ্ধা করি।”

“কোনো ধরণ আছে?”

“সেটা পরে বোঝা যাবে। এমন সব লোকদেরকে সে বেছে নিয়েছে যারা কিছুই জানে না, আর তাদের মাধ্যমেই একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফেলেছে। আমি বলবো, লো ক্লাসিকে আর কোনো কর্মতৎপরতা যাতে না হয়।”

“স্বাভাবিকভাবেই,” ওপাশ থেকে বলা হলো। “কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা কি?”

“বিশৃঙ্খলা ছাড়া?” বৃদ্ধ জানতে চাইলো। “আমার মনে হয়, যারা কিছু জানে তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে সে। ব্রায়াল নামের মেয়েটা কথাগুলো ব্যবহার করেছে। সে বলেছে, আমেরিকানটি তাকে বলেছে সে যেনো লাভিয়াকে বলে তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। কার এতো সাহস আছে? গত রাতটা তো ছিলো একেবারে পাগলামী, আপনি তো জানেন সেটা। বুককিপার আর ত্রিগনোয়া পাগল হয়ে গেছে। লাভিয়ার বাড়ির বাইরে রাত দুটোর সময় অপেক্ষা করছিলো তারা, আর লাভিয়া যখন ব্রায়ালের হোটেল থেকে ফিরছিলো তখন তাকে রীতিমতো শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করেছে। পথেই চিৎকার চোঁচামেচি করেছে, কান্নাকাটি করেছে।”

“লাভিয়া নিজেও খুব ভালো আচরণ করে নি। সে যখন পার্ক মঁশিউঁতে ফোন করেছিলো তখন সে নিজেও খুব একটা নিয়ন্ত্রিত ছিলো না। তাকে আবার ফোন করতে বারণ করা হয়েছে। কেউই যেনো সেখানে ফোন না করে...কখনই না।”

“আমরা কথাটা শুনেছি। আমাদের মধ্যে হাতে গোনা যে ক’জন নাম্বারটা জানে তারা এটা ভুলে গেছে।”

“নিশ্চিত থাকবেন, ভুলে যেনো যায়।” আবছায়া অবয়বটা আচম্কা উঠে দাঁড়ালো। “অবিশ্বাস ছড়ানো হচ্ছে, অবশ্যই! এতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠে না। সে কনট্যাক্টগুলো পিকআপ করবে, তাদের কাছ থেকে জোর ক’রে তথ্য আদায় করার চেষ্টা করবে। যখন একজন ব্যর্থ হবে, তাকে আমেরিকানদের কাছে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পরের জনকে ধরবে। তবে সে একাই কাজটা করবে। এটা তার অহংয়েরই অংশ। সে একটা উন্মাদ। এবং মোহগ্রস্ত।”

“হতে পারে সে দুটোই,” বৃদ্ধ বললো। “তবে সে একজন পেশাদারও বটে। সে যখন ব্যর্থ হবে তখন তার কর্তাদের কাছে নামগুলো পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং, আপনি তাকে ঘায়েল করুন অথবা নাই করুন, তাদেরকে ঘায়েল করা হবে।”

“তারা মরবে,” গুপ্তঘাতক বললো। “তবে বারগোঁয়া নয়। সে অনেক বেশি মূল্যবান। তাকে বলবেন এথেন্সে চলে যেতে। সে জানে কোথায় যেতে হবে।”

“আমি কি তাহলে পার্ক মঁশিউ’র স্থলাভিষিক্ত হবো?”

“সেটা অসম্ভব। তবে কিছু দিনের জন্যে আপনি আমার চূড়াগু সিদ্ধান্তগুলো কয়েক জনের কাছে পৌঁছে দেবেন।”

“প্রথমজন হলো বারগোঁয়া, এথেন্সে।”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে লাভিয়া আর দাঁজুকে মার্ক করা হলো?”

“হ্যাঁ। টোপ খুব কমই বেঁচে থাকতে পারে। তারাও পারবে না। লাভিয়া আর দাঁজুকে কভার করে এরকম দুটো দলের কাছে আপনি আরেকটা মেসেজ রিলে করবেন। তাদেরকে বলবেন, আমি তাদের দিকে লক্ষ্য রাখছি সারাক্ষণ। কোনো ভুল যেনো না হয়।”

এবার বৃদ্ধলোকটা চুপ মেরে গেলো। “আমি আশ্রয় চেষ্টা করেছি, কার্লোস। রেনল্টটা দেড় ঘণ্টা আগে মঁতমার্জের একটা গ্যারেজে পাওয়া গেছে। গতরাতে সেটা নিয়ে আসা হয়েছে।”

বৃদ্ধলোকটা ওপাশ থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো। “আমি ধরে নিচ্ছি আপনি সেটাকে নজরদারী করার জন্যে ব্যবস্থা নিয়েছেন—এমনকি এখন, এই মুহূর্তেও।”

মৃদুভাষী ভিক্ষুক আস্তে ক’রে হাসলো। “আপনার শেষ ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমি একজন বন্ধুকে ভাড়া করেছি, চমৎকার একটা গাড়িসহ। সে আবার তার পরিচিত তিনজনকে নিয়োগ করেছে, চারজনে মিলে ছয় ঘণ্টার শিফটে গ্যারাজের বাইরে, রাস্তায় নজরদারী করছে। তারা অবশ্য কিছু জানে না। কেবল জানে তাদেরকে যেকোনো সময় রেনল্টটা অনুসরণ করতে হবে।”

“আপনি আমাকে হতাশ করেন নি।”

“সেটা আমি করতে পারি না। আর যেহেতু পার্ক মঁশিউ’রটা বাদ দিতে হয়েছে, তাদেরকে আমার নিজের ফোন নাম্বার দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। সেটা কোয়ার্টারের একটা বন্ধ ক্যাফের নাম্বার। মালিক আর আমি বহু পুরনো বন্ধু। আমি প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবো মেসেজের জন্যে, আর সে কখনও আপত্তি জানাবে না। আমি জানি সে তার ব্যবসার টাকা কোথেকে পেয়েছে। আর কাকে খুন করতে হয়েছে সেটা পাবার জন্যে।”

“আপনার আচরণ বেশ ভালো। আপনার অনেক গুণ আছে।”

“আমার সমস্যাও আছে, কার্লোস। যেহেতু আমাদের কেউ পার্ক মঁশিউ’তে ফোন করতে পারছি না, তাই আপনার সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে? বিশেষ ক’রে রেনল্টের ব্যাপারটা যদি জানাতে হয়।”

“হ্যা, সমস্যাটার ব্যাপারে আমি সচেতন আছি। আপনি যে বোঝাটা নিতে চাচ্ছেন সেটার ব্যাপারে কি সচেতন আছেন?”

“সেটা না পেলেই বেশি খুশি হতাম। আমার একমাত্র আশা যখন এইসব মিটে যাবে, কেইন মারা যাবে, আপনি তখন আমার অবদানগুলো মনে রাখবেন, আর আমাকে খুন না ক’রে নাম্বারটা বদলে ফেলবেন।”

“আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান।”

“পুরনো দিনে এটাই আমার বেঁচে থাকার প্রধান মাধ্যম ছিলো।”

গুণঘাতক সাতটি সংখ্যা ফিস্ফিস্ ক’রে বললো। “আপনি হলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, যে এই নাম্বারটা জানে। স্বাভাবিকভাবেই এটা ট্রেস করা যাবে না।”

“সঙ্গত কারণেই। কে আশা করবে একজন ভিক্ষুকের কাছে এটা আছে?”

“প্রতিটি ঘণ্টা আপনাকে আরো ভালো মানের জীবন ব্যবস্থার কাছাকাছি নিয়ে আসবে। জালটা গুটিয়ে আনা হচ্ছে। প্রতিটি ঘণ্টা তাকে ফাঁদের কাছে নিয়ে আসছে। কেইন ধরা পড়বে। যে লোক এটা সৃষ্টি করেছে তার মুখের সামনে তার লাশটা ছুড়ে ফেলা হবে। শেষে, সে কেবল একজন পাপেট হিসেবেই থাকবে, খুবই মূল্যবান পাপেট। সে ছাড়া আর সবাই জানে এটা।”

বর্ন ফোনটা তুলে নিলো। “হ্যা?”

“ক্রম ৪২০?”

“বলে যান, জেনারেল।”

“ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বউ আর যোগাযোগ করেছে না—অন্ত তপক্ষে ফোনে তো নয়ই। আমাদের সামনে ফোনটা দু’বার বাজলে উভয় ক্ষেত্রেই আমার বউ আমাকে বলেছে ফোনটা ধরতে। সে আর কথা বলতে চাচ্ছে না।”

“কে ফোন করেছিলো?”

“একজন কেমিস্ট একটা প্রেসক্রিপশনের ব্যাপারে, আর একজন সাংবাদিক একটা ইন্টারভিউয়ের জন্যে। সে কোনোটাই জানে নি।”

“আপনি কি এমন ভাব লক্ষ্য করেছেন যে, সে আপনাকে দিয়ে ফোন ধরানোর মাধ্যমে আসলে আপনাকে ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করছে?”

ভিলিয়ার্স থেমে গেলো। তার জবাবটা এলো রাগের সাথে। “হ্যাঁ, সে আমাকে বলেছে সে বাইরে লাঞ্চ করবে, জর্জ সিন্ধ-এ একটা রিজার্ভেশন আছে তার। আমি তাকে সেখানে পাবো, যদি সে ওখানে যেতে মনস্থির করে।”

“সে যদি যায়, আমি সেখানে প্রথমে যেতে চাই।”

“আমি তোমাকে জানিয়ে দেবো।”

“আপনি বলছেন, সে আর ফোনে যোগাযোগ করছে না। ‘অন্ততপক্ষে ফোনে তো নয়ই।’ মনে হয় এটাই বলেছেন। এ দিয়ে কি আপনি কিছু বোঝাতে চেয়েছেন?”

“হ্যাঁ। ত্রিশ মিনিট আগে বাড়িতে এক মহিলা এসেছিলো। আমার বউ তার সাথে দেখা করতে অনীহা প্রকাশ করলেও দেখা করেছে। আমি এক ঝলক তার মুখটা দেখেছি। তারা পার্লারে বসেছিলো। তবে সেটাই যথেষ্ট। মহিলা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিলো।”

“তার বর্ণনা দিন।”

ভিলিয়ার্স বর্ণনা দিলো।

“জ্যাকুলিন লাভিয়া,” জেসন বললো।

“আমিও সেরকম ভেবেছি।”

“আমি বুঝতে পারছি না সে কেন আপনার বাড়িতে যাবে। এটা তো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এটা আমার মাথায় ঢুকছে না। যদি না সে নিজের ইচ্ছেয় গিয়ে থাকে। আর কোনো ফোন করা হবে না সেটা জেনেই হয়তো গিয়েছে।”

“আমারও তাই মনে হয়েছে,” বৃদ্ধ জেনারেল বললো। “তাই আমার মনে হলো একটু খোলা জায়গায় হেটে অসি, উন্মুক্ত বায়ুর জন্যে। আমার সাথে আমার সহকারী ছিলো। তবে আমার চোখ খোলা ছিলো। লাভিয়াকে অনুসরণ করা হয়েছে। চারটা বাড়ির পরে একটা গাড়িতে দু’জন লোক বসেছিলো। গাড়িটাতে ওয়্যারলেসের ব্যবস্থা ছিলো। আমি এন্টেনাটা দেখেছি। ঐসব লোক এমনতেই বসে ছিলো না। তারা আমার বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখছিলো।”

“আপনি কিভাবে জানলেন যে, লাভিয়া তাদের সাথে আসে নি?”

“আমরা নিরিবিলা একটা পথের উপর থাকি। লাভিয়া যখন এলো আমি তখন সিটিং রুমে বসে কফি খাচ্ছিলাম। তাকে দৌড়ে আসতে শুনেছি। জানালার কাছে গিয়ে আমি একটা ট্যাক্সিকে চলে যেতে দেখেছি। সে ট্যাক্সিতে ক’রে এসেছে। তাকে অনুসরণ করা হয়েছে, বুঝলে।”

“সে কখন বাড়ি থেকে বের হয়েছে?”

“বের হয় নি, এখনও বাড়িতে আছে আর লোকগুলোও বাইরে অপেক্ষা করছে।”

“কি রকম বাড়িতে আছে তারা?”

“সিতরো। ধূসর রঙের। লাইসেন্স প্লেটের প্রথম তিনটি অক্ষর হলো এন.ওয়াই.আর।”

“পাখিরা আকাশে উড়ছে, একটা কনট্যাক্টকে অনুসরণ করা হচ্ছে। পাখিগুলো এলো কোথেকে?”

“বুঝলাম না, কি বললে?”

জেসন মাথা ঝাঁকালো। “আমি ঠিক নিশ্চিত নই। মনে কিছু করবেন না। লাভিয়া চলে যাবার আগেই আমি সেখানে যাবার চেষ্টা করবো। আপনি আমাকে যতোটুকু সম্ভব সাহায্য করার করেন। আপনার বউকে বলেন তার সাথে আপনার কয়েক মিনিট কথা বলতে হবে। তার পুরনো বন্ধুকে আরো কিছুক্ষণ থাকতে বাধ্য করুন। যেকোনো কিছু বলুন। তাকে চলে যেতে দেবেন না। এটা নিশ্চিত করুন।”

“আমি আশ্রয় চেষ্টা করবো।”

বর্ন ফোনটা রেখে মেরির দিকে তাকালো। “এটা কাজ করছে। তারা একে অন্যকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। লাভিয়া পার্ক মঁশিউ’তে গেছে আর তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।”

“আকাশে পাখি উড়ছে,” বললো মেরি। “এ দিয়ে তুমি কি বুঝিয়েছো?”

“আমি জানি না। এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। হাতে এখন সময় নেই।”

“আমার মনে হয়, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেসন।”

“এখন নয়।” বর্ন চেয়ার থেকে তার কোট আর টুপিটা তুলে নিলো। সে ওগুলো পরে ব্যুরোর ড্রয়ার খুলে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নিলো। অস্ত্রটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। স্মরণ করলো। ছবিগুলো আবার ভেসে এলো তার মনের পর্দায়। জুরিখ। ব্যানহফস্ট্রাস এবং ক্যারিলিয়ন দুলাক; ড্রেই এলপেনহসার লাওয়েনস্ট্রাস। স্টেপডেকস্ট্রাসের নোংরা বোর্ডিং-হাউজ। অস্ত্রটা এসবেরই প্রতীক। এসবের জন্যে জুরিখে তার জীবনটা প্রায় খোয়াতে বসেছিলো সে।

কিন্তু এটা প্যারিস। জুরিখে যা শুরু হয়েছে সেটা এখনও চলছে।

কার্লোসকে খুঁজে বের করো। কার্লোসকে ফাঁদে ফেলো। কেইন হলো চার্লি। আর ডেল্টা হলো কেইন।

ভূয়া। তোমার নিকুচি করি, ভূয়া!

ট্রেডস্টোন খুঁজে বের করো। একটা মেসেজ খুঁজে বের করো। একজন লোককে খোঁজো।

অধ্যায় ২৯

ট্যাক্সিটা পার্ক মঁশিউ'র ভিলিয়ার্সের বাড়ির সামনে এসে থামলো। জেসন পেছনের সিটে ব'সে আছে। পথের দু'পাশে সারি সারি পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো সে কিন্তু ধূসর রঙের কোনো সিতরো চোখে পড়লো না যার নেমপ্লেটে এন.ওয়াই.আর লেখা।

কিন্তু ভিলিয়ার্স আছে। নিজের বাড়ি থেকে চারটা বাড়ির পরে একা দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ সৈনিক।

দু'জন লোক...একটা গাড়িতে, আমার বাড়ি থেকে চারটা বাড়ি দূরে।

ভিলিয়ার্স এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখানে গাড়িটা ছিলো। এটা একটা সিগনাল।

“আরেতেজ, সিল ভু প্লেইত,” বর্ন ড্রাইভারকে বললো। “লো ভিউ লাবাস। জো ভিউ পার্লার আভেক, লুই।” সে জানালার কাঁচ নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। “মঁসিয়ে?”

“ইংরেজিতে বলেন,” ভিলিয়ার্স ট্যাক্সিটার দিকে এগিয়ে এসে জবাব দিলো।

“কি হয়েছে?” জেসন জিজ্ঞেস করলো।

“আমি তাদেরকে আঁটকে রাখতে পারি নি।

“তাদেরকে?”

“আমার বউ আর লাভিয়া এক সঙ্গে বের হয়ে গেছে। যদিও অনেক চেষ্টা করেছে। আমি বউকে বলেছি জর্জ সিঙ্ক-এ আমি তাকে ফোন করবো। খুব জরুরি একটা ব্যাপারে তার মতামত দরকার আমার।”

“সে কি বললো?”

“বললো জর্জ সিঙ্ক-এ যাবে কিনা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। তার বন্ধু তাকে নুইলে সুর সেইনের চার্চে গিয়ে এক যাজকের সাথে দেখা করার জন্যে চাপাচাপি করছে। সে বলেছে তার বন্ধুকে সঙ্গ দেয়াটা খুবই দরকার।”

“আপনি কি নিষেধ করেছিলেন?”

“অনেক। আর আমাদের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম সে আমার চিন্তাভাবনাটা ধরতে পেরেছে। সে বলেছে, ‘তোমার যদি মনে হয় আমি ওখানে যাচ্ছি না, তবে তুমি চার্চে ফোন ক’রে জেনে নিও। আমি নিশ্চিত, কেউ আমাকে চিনতে পারবে, তুমি ফোন করলে আমাকে ডেকে দেবে।’ সে কি আমাকে পরীক্ষা করছে?”

বর্ন ভাবার চেষ্টা করলো। “হতে পারে। কেউ হয়তো তার সাথে সেখানে দেখা করবে। কিন্তু তাকে একটা ফোন করাটা ঠিক হবে না। তারা কখন চলে গেছে?”

“পাঁচ মিনিট আগে । সিতরৌ’তে থাকা দু’জন তাদেরকে অনুসরণ করেছে ।”

“তারা কি আপনার গাড়িটা নিয়ে গেছে?”

“না । আমার বউ একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেছে ।”

“আমি সেখানে যাচ্ছি,” জেসন বললো ।

“আমারও মনে হয় তুমি সেখানে যাও,” ভিলিয়ার্স বললো । “আমি চার্চটার ঠিকানা খুঁজে বের করেছি ।”

বর্ন ড্রাইভারকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ দিয়ে বললো, “নুয়েলি সুর সেইন চার্চে দ্রুত পৌছানোটা আমার জন্যে খুবই জরুরি । যতো দ্রুত পারো যাও । জানো তো সেটা কোথায়?”

“অবশ্যই, মঁসিয়ে । এটা এই এলাকার সবচাইতে সুন্দর চার্চ ।”

“তাহলে দ্রুত যাও, আরো পঞ্চাশ ফ্রাঁ দেবো ।”

“আমরা একেবারে পরীর ডানায় ভর ক’রে উড়ে চলে যাবো, মঁসিয়ে!”

তারা উড়েই চলে গেলো । পথে কেবল কিছু যানবাহনের কারণে তাদের যাত্রায় একটু বিঘ্ন ঘটলো । চার্চের খুব কাছে আসতেই জেসন ড্রাইভারকে বললো, “আন্তে ।” তার মনোযোগ চার্চটা নয়, বরং তার সামনের কয়েকটা গাড়ির পরে একটা গাড়ির দিকে । গাড়িটা এক পাশে মোড় নেবার সময় সে এটাকে দেখলো । ধূসর রঙের সিতরৌ গাড়ি । সামনের আসনে দু’জন লোক বসা ।

তারা একটা ট্রাফিক লাইটের সামনে এসে পড়লো । জেসন পঞ্চাশ ফ্রাঁ’র একটা নোট ড্রাইভারকে দিয়েই গাড়ি থেকে নেমে বললো, “আমি ফিরে আসছি । ট্রাফিক বাতিটা বদলে গেলে আন্তে ক’রে সামনে এগিয়ে যাবে, আমি চলতি গাড়িতেই উঠে পড়বো ।”

বর্ন একটু নিচু হয়ে গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে একটু এগিয়ে দেখতে পেলো নেমপ্লেটে লেখা আছে এন.ওয়াই.আর । এরপরে ৭৬৮ সংখ্যাটা । কিছুক্ষণের জন্যে এই সংখ্যাটা কোনো গুরুত্ব বহন করলো না । ট্যাক্সি ড্রাইভার বাতিটা জ্বললে গাড়িটা চালিয়ে জেসনের পাশে চলে এলো । চারপাশে সবগুলো গাড়ি সাই সাই ক’রে চলতে শুরু করেছে । জেসন দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকে পড়লো । “তুমি বেশ ভালো কাজ করেছো,” সে ড্রাইভারকে বললো ।

“কি এমন করেছি বুঝতে পারছি না ।”

“হৃদয়ঘটিত ব্যাপার । হাতেনাতে বিশ্বাসঘাতককে ধরতে হবে ।”

“চার্চে, মঁসিয়ে? কলিকাল আর কাকে বলে ।”

তারা চার্চের একেবারে কাছে এসে পড়লো । সিতরৌটা মোড় নিতেই তাদের মধ্যে একটা ট্যাক্সি, যাত্রীরা প্রায় একই রকম । জেসনের একটু খটকা লাগলো । দু’জন লোক বেশ খোলামেলাভাবেই উঁকি মারছে গাড়ির ভেতর থেকে । যেনো, কার্লোসের সৈনিকেরা চাইছে ট্যাক্সিতে থাকা কেউ জানুক তারা এখানে আছে ।

অবশ্যই! ভিলিয়ার্সের বউ ট্যাক্সিতে আছে লাভিয়ার সাথে। আর সিতরোঁতে থাকা দু'জন লোক চাচ্ছে ভিলিয়ার্সের বউ জানুক তারা তাদের পেছনেই আছে।

বর্নের গাড়িটা চার্চের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়লে ড্রাইভার বললো, “আমি কি করবো, মঁসিয়ে?”

“ঐ খালি জায়গাটাতে যাও,” জেসন পার্কিং এলাকাটা দেখিয়ে বললো। ভিলিয়ার্সের বউয়ের ট্যাক্সিটা এক সেন্টের মূর্তির সামনে এসে থামলো। ভিলিয়ার্সের বিস্মিত বউ প্রথমে বের হলো ট্যাক্সি থেকে। আর ফ্যাকাসে মুখের লাভিয়া বের হলো তার পর পরই। সে একটা কমলা রঙের বড় সানগ্লাস পরেছে, হাতে সাদা একটা পার্স। তবে তাকে আর অভিজাত লাগছে না। তার উঁচু কঁরে রাখা চুলগুলো সোজা ছেড়ে দেয়া আছে মুখের দু'পাশে। তার মোজা জোড়া ছেঁড়াফাড়া। প্রায় তিনশো ফিট দূরে থাকলেও বর্ন তার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে।

সিতরোঁটা ট্যাক্সিকে অতিক্রম কঁরে একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে থামলো। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো লোক বের হলো না। তার বদলে ট্রান্স থেকে একটা ধাতব রড বের হয়ে এলো। একটা রেডিও এন্টেনা সচল করা হচ্ছে। কোড পাঠানো হচ্ছে সুরক্ষিত ফ্রিকোয়েন্সিতে। জেসন মস্ত্রোমুগ্ধ হয়ে গেলো, দৃশ্যটা দেখে নয়, বরং অন্য কিছু জন্মে। তার কানে কিছু শব্দ শোনা যেতে লাগলো, এমন এক জায়গা থেকে সেগুলো আসছে যে জায়গাটা জেসন চেনে না। কিন্তু শব্দগুলো আসছে।

আলমানাককে বলছি, ডেন্টা; আলমানাককে বলছি, ডেন্টা। আমরা জবাব দেবো না। আবারো বলছি, নেগেটিভ, ব্রাদার। অর্ডার অনুযায়ী জবাব দেবে। পরিত্যক্ত, পরিত্যক্ত। এটাই শেষ কথা। আলমানাককে বলছি, ডেন্টা। তুমি খতম, ব্রাদার। জাহান্নামে যাও। ডেন্টা আউট। যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে।

আচম্কা তার চারপাশে অন্ধকার ঘিরে ধরলে সূর্যের আলোটা উধাও হয়ে গেলো। চার্চের কোনো টাওয়ার দেখা যাচ্ছে না আর। সব কিছু নড়ছে। সব কিছু। তাকেও নড়তে হবে। না নড়লে মরে যাবে। পালাও! ঈশ্বরের দোহাই, পালাও!

তাদেরকে বের কঁরে নিয়ে আসো। এক এক কঁরে। হামাণ্ডি দিয়ে ভয়কে জয় করো। মারাত্মক ভয়। সংখ্যাগুলো কমিয়ে আনো। অ্যাবোট এটা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিলো। চাকু, তার, হাটু, বুড়ো আঙুল; তুমি ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটা জানো। মৃত্যু।

কম্পিউটারের কাছে মৃত্যু হলো একটা পরিসংখ্যান। আর তোমার কাছে কেবল টিকে থাকাটা।

সন্ধ্যাসী।

সন্ধ্যাসী।

সূর্যের আলোটা আবার উঁকি দিলে তার চোখ ঝলসে গেলো কিছুক্ষণের জন্যে। সে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, তার চোখ একশো গজ দূরে ধূসর রঙের সিতরোঁটার

দিকে। এই দৃশ্যটা দেখা খুব কঠিন। কেন এটা এতোটা কঠিন? কুয়াশা, ঘোলাটে...এখন আর কোনো অঙ্ককার নেই তবে আছে অভেদ্য কুয়াশা। সে গরম। সে ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা! নিজের মাথাটা ঝাঁকালো সে। আচমকাই সে সচেতন হয়ে উঠলো কোথায় আছে সে, কি করছে। তার মুখটা জানালায় ঠেস দেয়া; তার নিঃশ্বাসে কাঁচটা ঘোলাটে হয়ে গেছে।

আমি কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে যাচ্ছি,” বর্ন বললো। “এখানেই থেকে।”

“আপনি চাইলে সারা দিন থাকবো, মঁসিয়ে।”

জেসন তার জ্যাকেটের কলারটা তুলে মাথার টুপিটা সামনের দিকে টেনে চশমাটা পরে নিলো। রাস্তার পাশে একটা ধর্মীয় বাজারের পাশ দিয়ে হেটে গেলো। এক মা আর তার বাচ্চা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জেসন তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকে সিতরৌটা বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। পার্ক মঁশিউ থেকে যে ট্যাক্সিটা এসেছে সেটা নেই। ভিলিয়ার্সের বউ সেটা বিদায় ক’রে দিয়েছে। বর্নের কাছে এটা একটু অস্বাভাবিক ব’লেই মনে হলো, কারণ এখানে ট্যাক্সি পাওয়াটা খুব সহজ নয়।

তিন মিনিট পর, কারণটা পরিষ্কার হলো...আর সেটা খুবই আশংকাজনক। ভিলিয়ার্সের বউ হন হন ক’রে চার্চ থেকে বের হয়ে সোজা চলে গেলো সিতরৌটার কাছে। সামনে বসা লোকটার সাথে কথা বলে পেছনের দরজাটা খুললো সে।

পার্সটা। একটা সাদা পার্স! ভিলিয়ার্সের বউয়ের হাতে একটা সাদা পার্স যেটা কিছুক্ষণ আগেও লাভিয়ার হাতে ছিলো। গাড়ির পেছনে উঠে বসতেই গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললো।

জ্যাকুলিন লাভিয়া কোথায়? তার পার্সটা কেন ভিলিয়ার্সের বউয়ের হাতে? বর্ন সামনের দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেলো। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক ক’রে দিলো। একটা ফাঁদ? লাভিয়াকে যদি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তবে ঐসব অনুসরণকারীদের পেছনেও কেউ হয়তো আছে।

সে রাস্তার চারপাশে তাকালো। ফুটপাথে চলতে থাকা লোকজনকে নিরীক্ষণ করলো। তারপর প্রতিটি গাড়ি, ড্রাইভার আর যাত্রী। তেমন কিছুই দেখতে পেলো না। সে আসলে অতি সতর্ক আচরণ করছে। নুয়েলি সুর সেইন তার জন্যে কোনো ফাঁদ নয়। সে কাউন্টার থেকে সরে গিয়ে চার্চের দিকে পা বাড়াতেই থেমে গেলো, তার পা দুটো মাটির সাথে আঁটকে রইলো যেনো। কালো সুট, সাদা কলার আর কালো টুপি পরা এক যাজক চার্চের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। টুপিটার কারণে তার মুখের অনেকটা অংশ ঢেকে আছে। সে এই লোকটাকে এর আগেও দেখেছে। খুব বেশি দিন আগে নয়। কোনো বিস্মৃত অতীতে নয় বরং সাম্প্রতিক সময়ে। কয়েক সপ্তাহ, কয়েক দিন...কয়েক ঘণ্টা। কোথায় সেটা? কোথায়? সে তাকে চেনে! তার হাটাটা, মাথাটা একটু হেলে রাখা, প্রশস্ত কাঁধটা, খুবই চেনা চেনা লাগছে। সে অজ্ঞ হাতের লোকটা! কোথায় সেটা?

জুরিখ? ক্যারিলিওন দুলাক? দু'জন লোক মানুষজনের ভীড় ঠেলে ধৈয়ে আসছে। মৃত্যুদূত। একজন গোল্ডরিমের চশমা পরা। এটা সেই লোকটা নয়। সেই লোকটা তো মরে গেছে। তাহলে কি ক্যারিলিওন দুলাকের অন্য লোকটি? অথবা গুইসান কুয়ের লোকটা? ধর্ষণকারী এক পশু। এই লোকটা কি সেই লোক? নাকি অন্য কেউ। কালো কোট পরা এক লোক অবার্জ দু'কোঁয়ের করিডোরে, যেখানে আলো ছিলো। একটা সিঁড়ি ছিলো। একটা ফাঁদ। একটা উল্টো ফাঁদ। যেখানে সেই লোকটা অন্ধকারে গুলি করেছিলো এই ভেবে যে, সে একটা লোককে দেখেছে। এটা কি সেই লোকটা?

বর্ন জানে না। সে কেবল জানে এই পাদ্রীকে এর আগেও দেখেছে। তবে কোনো পাদ্রী হিসেবে নয়। সশস্ত্র এক লোক হিসেবে।

কালো সুট পরা খুনি পাথরের পথটার শেষপ্রান্তে, কংক্রিটের মূর্তির সামনে আসতেই সূর্যের আলোতে তার চেহারাটা কিছুক্ষণের জন্যে পরিষ্কার দেখা যেতেই জেসন একেবারে বরফের মতো জমে গেলো। গায়ের চামড়াটা। খুনির গায়ের চামড়াটা শ্বেতাঙ্গদের মতো নয়। সেটা সূর্যের আলোতেও পোড়ানো নয়, জন্মগত। লাতিন!

বর্ন এই দৃশ্যটা দেখে তীব্র আতংকে প্যারালাইজ হয়ে গেলো। সে চোখের সামনে ইলিচ রামিরেজ সানচেজকে দেখছে।

কার্লোসকে ধরো। তাকে ফাঁদে ফেলো। চার্লির জন্যে কেইন আর কেইনের জন্যে ডেন্টা।

জেসন তার কোটের বোতাম খুলে কোমরের বেল্টের রাখা অস্ত্রের উপর হাত রেখে দৌড়ে লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে সরাতে সামনের দিকে এগোতে লাগলো। ডাস্টবিন থেকে কিছু খুঁজছে এমন একটা ভিক্ষুককে অতিক্রম করলো সে—ভিক্ষুক! ভিক্ষুকের হাতটা তার পকেটে ঢোকানো। বর্ন ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলো তার হাতে একটা লম্বা নলের পিস্তল, সূর্যের আলোতে সেটা চক্চক করছে। ভিক্ষুকটার হাতে অস্ত্র! অস্ত্রটা সে তুলে ধরলো, তার দৃষ্টি স্থির। জেসন দৌড়ে পথে দাঁড় করানো একটা ছোট গাড়ির আড়ালে চলে যেতেই তার কানের পাশ দিয়ে বুলেটের ভোঁতা শব্দগুলো শুনতে পেলো। নিমিষেই লোকজনের মধ্যে তীব্র আতংক আর দৌড়া দৌড়ি শুরু হয়ে গেলো। বর্ন দুটো গাড়ির মাঝখানে নিচু হয়ে রইলো। ভিক্ষুকটি দৌড়ে পালাচ্ছে এখন।

কার্লোসকে ধরো। তাকে ফাঁদে ফেলো। কেইন হলো...!

জেসন উঠে দাঁড়ালো, ছুটে গেলো সামনের দিকে, সামনের সবকিছু সরিয়ে দিয়ে ছুটে চললো গুণ্ডাঘাতকের দিকে। সে থেমে গেলো, তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। বিভ্রান্ত আর ক্ষোভ তার বুকটা চেপে ধরলো যেনো। মাথার তীব্র যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এলো। সে কোথায়? কার্লোস কোথায়! তারপরই সে তাকে দেখতে পেলো। খুনি একটা বড় কালো রঙের সিডান গাড়ির পেছনে উঠে বসেছে। জেসন রাস্তার গাড়িগুলোর ছাদ আর ট্রান্সকের উপর দিয়েই সেই গাড়িটার দিকে পাগলের মতো ছুটে

চললো। হঠাৎ করেই তার গতি রোধ হলো দুটো গাড়ির সংঘর্ষের কারণে। এই ফাঁকে কালো সিডানটা ধরা ছোয়ার বাইরে চলে গেলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইলিচ রামিরেজ সানচেজ দ্রুতবেগে চলে গেলো চোখের সামনে দিয়ে।

জেসন পুলিশের হুইসেল শুনে ফিরে তাকালো পেছনে। চারদিকে থেকেই পুলিশ ছুটে আসছে। রাস্তার লোকজন আহত হয়েছে অথবা খুন হয়েছে। অস্ত্র হাতের ভিক্ষুকটি তাদের লক্ষ্য ক'রে এলোপাতারি গুলি করেছে।

লাভিয়া! বর্ন আবারো দৌড়াতে শুরু করলো। এবার তার গন্তব্য চার্চের দিকে। গোথিক চার্চের ভেতরে ঢুকেই সে দেখতে পেলো চারদিকে মোমবাতি জ্বালানো। উঁচু উঁচু দেয়ালের উপরের জানালা থেকে সূর্যের আলো এসে ভেতরে ঢুকেছে। সে দুই দিকের বেষ্টগুলোর মাঝখান দিয়ে হেটে গেলো। প্রার্থনারত মানুষজনকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো। সিলভার রঙের চুল আর কড়া মেকআপের এক মহিলাকে খুঁজছে সে।

কিন্তু লাভিয়াকে কোথাও দেখা গেলো না। যদিও সে চার্চ থেকে বের হয় নি। চার্চের ভেতরেই কোথাও আছে। জেসন ঘুরে পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো দীর্ঘাকায় এক পাদ্রী সহজ ভঙ্গীতে হেটে আসছে। জেসন তার পথ রোধ করলো।

“ক্ষমা করবেন, ফাদার,” সে বললো। “আমি একজনকে হারিয়ে ফেলেছি।”

“ঈশ্বরের ঘরে কেউ হারায় না, স্যার,” পাদ্রী হেসে জবাব দিলো।

“সে আসলে হারায় নি। আমিই তাকে হারিয়ে ফেলেছি। সে এই চার্চেরই কোথাও আছে। আমি তাকে না পেলে সে খুবই ভড়কে যাবে। তার বাড়িতে জরুরি একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আপনি কি এখানে অনেকক্ষণ ধরে আছেন, ফাদার?”

“হ্যা। এক ঘণ্টা ধরেই তো আছি।”

“কয়েক মিনিট আগে দু'জন মহিলা এসেছিলো। একজন খুবই লম্বা, খুবই আকর্ষণীয়, হাল্কা রঙের কোট পরা। মাথায় কালো রঙের স্কার্ফ আছে। অন্যজন একটু বয়স্ক। খুব বেশি লম্বা নয়, রোগাপাতলা। আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন?”

পাদ্রী মাথা নেড়ে সায় দিলো। “হ্যা। বয়স্ক মহিলার চোখেমুখে বিষন্নতা ছিলো। তার মুখটা বিবর্ন আর বিষাদে ভরা ছিলো।”

“আপনি কি জানেন সে কোথায় গেছে?” তার অল্পবয়সী বন্ধু তো চলে গেছে দেখলাম।”

“একজন ধর্মভীরু বন্ধু, বলতে পারেন। সে ঐ বেচারিকে কনফেশন করতে নিয়ে গেছে। তাকে বুথের ভেতরে যেতে সাহায্য করেছে। কঠিন সময়ে পরিশুদ্ধ আত্মা আমাদেরকে সবধরণের শক্তি যোগায়।”

“কনফেশনে?”

“হ্যা—ডান দিকের দ্বিতীয় বুথটা। সে বার্সেলোনার একজন অতিথি ফাদারের কাছে কনফেশন করতে এসেছিলো। সেই ফাদারও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দুঃখের সাথেই জানাচ্ছি, উনি আজকে স্পেনে ফিরে যাচ্ছেন...” পাদ্রী ভুরু

তুলে বললো, “এটা কি অদ্ভুত নয়? কিছুক্ষণ আগে আমি ফাদার ম্যানুয়েলকে চলে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা তার জায়গায় এখন অন্য কেউ আছে। ভাববেন না, আপনার বাস্কবী ভালো একজনের সঙ্গেই আছেন।”

“আমিও সে ব্যাপারে নিশ্চিত,” বর্ন বললো। “ধন্যবাদ, ফাদার। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করবো।” জেসন কনফেশনাল বুথগুলোর দিকে চলে গেলো। তার চোখ পড়লো দ্বিতীয় বুথটার দিকে। একটা সাদা রঙের ফিতা বলে দিচ্ছে ভেতরে কেউ আছে। একটি আত্মা পরিশুদ্ধ হচ্ছে। সামনের সারিতে ব’সে পড়লো সে, তারপর হাটু মুড়ে সামনের দিকে এগোলো। মাথাটা আস্তে ক’রে ঘুরিয়ে চার্চের পেছনের দিকে তাকালো। পাদ্রীটি প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনোযোগ রাস্তার হৈহুল্লার দিকে। জেসন বুথের পদটি একটু সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারলো। যা দেখার আশা করেছিলো তাই দেখতে পেলো। কেবল পদ্ধতিটাই একটা প্রশ্ন রেখে গেছে।

জ্যাকুলিন লাভিয়া মরে গেছে, তার শরীরটা বুথের ভেতরের প্রার্থনা স্টলের উপর মাথা রেখে পড়ে রয়েছে। তার মুখটা একপাশে কাত করা। চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা। তার কোটটা রক্তে ভেসে আছে। অস্ত্রটা একটা লম্বা চিঠি খোলার চাকু। সেটা তার বাম স্তনের উপরে বিদ্ধ হয়ে আছে।

পায়ের কাছে তার পার্সটা পড়ে আছে—দশ মিনিট আগে যে সাদা পার্সটা তার হাতে ছিলো সেটা নয়। বরং ফ্যাশনেবল একটা পার্স। এর কারণটা খুবই পরিষ্কার জেসনের কাছে। ভেতরে কতোগুলো কাগজ আছে। তার করুণ আত্মহত্যার কথাটা লেখা আছে তাতে। এই মহিলা এতোটাই দুঃখেকষ্টে ছিলো যে নিজের জীবনের ভার আর বইতে পারছিলো না। ঈশ্বরের সামনেই সে জীবনাবসান ঘটিয়েছে। কার্লোস একেবারে নিখুত কাজ করেছে। অসাধারণ তার কাজ।

বর্ন পদটি ভিজিয়ে দিয়ে বুথ ছেড়ে চলে গেলো। চার্চের কোনো একটা টাওয়ার থেকে সকালের বেলটা বাজতে শুরু করলো।

ট্যাক্সিটা নুইলে সুর সেইন-এর রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে চলছে। পেছনের সিটে ব’সে আছে জেসন, তার চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। অপেক্ষা করাটা উদ্দেশ্যহীন, সম্ভবত মারণঘাতিও বটে। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কৌশলও বদলে যায়, আর সেগুলো একটা মারাত্মক দিকে মোড় নেয়। জ্যাকুলিন লাভিয়াকে অনুসরণ করা হয়েছে। তার মৃত্যুটা ছিলো অনিবার্য তবে একটু জলদি হয়ে গেছে। সে এখনও মূল্যবান ছিলো। তারপরই বর্ন বুঝতে পারলো। সে কার্লোসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে খুন হয় নি, খুন হয়েছে কার্লোসের কথা না শোনার জন্যে। সে পার্ক মঁশিউ’তে গিয়েছিলো—এটাই ছিলো তার ক্ষমার অযোগ্য ভুল।

লো ক্লাসিকে আরেকজন রিলে আছে, ফিলিপ দাঁজু নামের একজন ধূসর চুলের সুইচবোর্ড অপারেটর। যার মুখটা দেখে জেসনের মানসপটে হিংস্র কিছু ছবি, অন্ধকার আর ধ্বংসযজ্ঞের শব্দ ভেসে উঠেছিলো। সে বর্নের অতীতে ছিলো, এ ব্যাপারে জেসন নিশ্চিত। আর এজন্যেই শিকার পর্বটা খুব সতর্কতার সাথে করা হবে। সেই লোকটা তার কাছে কি মানে রাখতে পারে সে ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে একজন রিলে, আর তাকেও নজরদারি করা হচ্ছে, যেমনটি লাভিয়াকে নজরদারি করা হয়েছিলো। আরেকটা ফাঁদের জন্যে বাড়তি একটা টোপ। ফাঁদটা গুটিয়ে ফেললে টোপটাকে পরিত্যাগ করা হয়।

তারা কি কেবল দু'জনই ছিলো? নাকি আরো কেউ আছে? হয়তো অস্পষ্ট, মুখহীন এক ক্লার্ক, যে কিনা আসলে ক্লার্ক নয়, অন্য কিছু? একজন সাপায়ার, যে সেন অনরে'তে অনেক সময় কাটায় ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে, কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও সে করে। অথবা সেই ডিজাইনার রেনে বারগোয়াঁ।

বর্ন হঠাৎ করেই অড়ষ্ট হয়ে গেলে। সাম্প্রতিক একটি স্মৃতি জেগে উঠলো। বারগোয়াঁ। শ্বেতাঙ্গদের মতো চামড়া নয় যার, প্রশস্ত কাঁধ...সরু কোমর। শক্ত দুটো পা দিয়ে খুব দ্রুত চলাফেরা করতে পারে সে, অনেকটা পশুদের মতো, একটা বিড়ালের মতো।

এটা কি সম্ভব? তাহলে কি বাকি মিলগুলো কেবলই কল্পনা, চেনা কোনো ছবির সাথে এমনিতেই মিলে গেছে যার জন্যে তাকে কার্লোস ব'লে মনে হচ্ছে? গুপ্তঘাতক কি তার রিলেদের কাছেও অচেনা—নিজের লোকদের মধ্যেই মিশে থাকে, প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে? তাহলে কি বারগোয়াঁই?

তাকে এক্ষুণিই ফোন করতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি করবে তো তার জবাবটাও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তবে সে ফোনটা নিজে করতে পারবে না। ঘটনাগুলো যেভাবে দ্রুত ঘটে যাচ্ছে তাতে ক'রে নিজেকে তার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিজের তথ্যগুলো নিজের কাছেই রেখে দিতে হবে।

“কোনো ফোনবুথ দেখলেই গাড়িটা থামাবে,” সে ড্রাইভারকে বললো।

“ঠিক আছে, মিসিয়ে। তবে আমাকে ফ্লিট গ্যারাজে রিপোর্ট করতে হবে। এটা আপনাকে একটু বুঝতে হবে।”

“বুঝেছি।”

“ঐ যে একটা ফোনবুথ।”

“গাড়িটা রাখো ওখানে।”

লাল রঙের ফোনবুথটা দেখতে অনেকটা ডলস্‌হাউজের মতো। বর্ন হোটেল টেরাসের ৪২০ নম্বার রুমে ফোন করলে মেরি ফোনটা ধরলো।

“কি হয়েছে?”

“সব খুলে বলার মতো সময় নেই। আমি চাই তুমি লো ক্লাসিকে ফোন ক'রে

রেনে বারগোয়ার খোঁজ করো। সম্ভবত সুইচবোর্ডে দাঁজু থাকবে। তুমি একটা নাম ব'লে বলবে তুমি লাভিয়ার প্রাইভেট ফোনে এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেো কিন্তু পাচ্ছেো না। বলবে এটা খুবই জরুরি। তার সাথে তোমাকে কথা বলতে হবে।”

“তাকে পেলে কি বলবো?”

“মনে হয় না তাকে পাবে। যদি পাও ফোনটা রেখে দেবে। আর যদি দাঁজু বলে সে নেই তবে তাকে বলবে কখন তাকে পাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাকে তিন মিনিট পরে ফোন করছি।”

“ডার্লিং, তুমি কি ঠিক আছো?”

“আমার খুবই গভীর এক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। পরে তোমাকে জানানাবো।” জেসন তার ঘড়িতে চোখ রাখলো। ত্রিশ সেকেন্ড পরে সে তার নিজের কাউন্টডাউনটা শুরু করলো। হিসেব ক'রে দেখলো তার হার্টবিট সেকেন্ডে আড়াই বার হচ্ছে। দশ সেকেন্ডের মাথায় সে ডায়াল করতে শুরু করলো। চার সেকেন্ডের মাথায় কয়েনটা ঢোকালো। আর টেরাসের সুইচবোর্ড অপারেটরের সাথে কথা বললো মাইনাস পাঁচে। মেরি ফোনট তুলে নিলো।

“কি হয়েছে?” সে জানতে চাইলো। “আমি ভেবেছিলাম তুমি এখনও কথা বলছো?”

“খুব অল্প কথা। আমার মনে হয় দাঁজু খুবই সতর্ক হয়ে আছে। তার কাছে হয়তো কতোগুলো প্রাইভেট নাম্বার আছে। তবে আমি জানি না। কিন্তু তাকে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ব'লে মনে হচ্ছে।”

“সে কি বললো?”

“বারগোয়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কাপড় খুঁজতে গেছে। সে সকালেই বের হয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহের আগে ফিরে আসবে না।”

“এটা সম্ভব যে, আমি তাকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে শতশত মাইল দূরে এক জায়গায় এইমাত্র দেখেছি।”

“কোথায়?”

“একটা চার্চে? সে যদি বারগোয়া হয়ে থাকে তবে সে খুবই ধরালো কোনো হাতিয়ার ব্যবহার ক'রে গেছে।”

“তুমি এসব কি বলছো?”

“লাভিয়া মারা গেছে।”

“হায় ঈশ্বর! তুমি এখন কি করবে?”

“আমি চিনি এরকম একজন লোকের সাথে কথা বলবো। তার মাথায় যদি ঘিলু ব'লে কোনো কিছু থাকে তবে সে আমার কথা শুনবে। তাকে হত্যা করার জন্যে চিহ্নিত ক'রে রাখা হয়েছে।”

অধ্যায় ৩০

“দাঁজু।”

“ডেন্টো? আমি ভাবছি...মানে, মনে হচ্ছে তোমার কণ্ঠটা আমি কোথাও শুনেছি।”

সে এটা বললো! নামটা বলা হলো। যে নামটা তার কাছে কোনো অর্থই বহন করে না, তারপরও এখন সেটা হয়ে গেছে সবকিছু। দাঁজু জানে। ফিলিপ দাঁজু এক বিস্মৃত অতীতের অংশ। কেইন হলো চার্লি আর ডেন্টো হলো কেইন। ডেন্টো! সে এই লোকটাকে চিনতো। এই লোকটার কাছেই জবাবটা রয়েছে! আলফা, ব্রাতো, কেইন, ডেন্টো, ইকো, ফক্সট্রট...

মেডুসা।

“মেডুসা,” সে আস্তে ক’রে বললো। বার বার এই নামটা যেনো তার কানে এক নিরব চিৎকার করছে।

“প্যারিস তাম কুয়ান নয়, ডেন্টো। আমার কাছে তোমার আর কোনো ঋণ নেই। কোনো কিছু পাবার চেষ্টাও করো না। আমরা এখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের কর্মচারী।”

“জ্যাকুলিন লাভিয়া মারা গেছে। কার্লোস তাকে খুন করেছে নুয়েলি সুর সেইন-এর চার্চে, আধঘণ্টা আগে।”

“এসব বলার চেষ্টাও করো না। দুই ঘণ্টা আগে জ্যাকুলিন ফ্রান্স ছেড়ে চলে গেছে। সে নিজে আমাকে ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিলো। সে বারগোয়ার সাথে যোগ দিচ্ছে—”

“ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে কাপড় কেনার জন্যে?” কথার মাঝখানে জেসন বললো।

দাঁজু চুপ মেরে গেলো। “মেয়েটা ফোন ক’রে রেনেকে চাইছিলো। তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি। এতে কোনো কিছু বদলাবে না। আমি তার সাথে কথা বলেছি, সে ওরলি থেকে ফোন করেছিলো।”

“তাকে এই কথাটা তোমাকে বলার জন্যে বলা হয়েছিলো। তার কথাবার্তা শুনে কি তাকে খুব বেশি নিয়ন্ত্রিত ব’লে মনে হয় নি?”

“সে একটু বিমর্ষ ছিলো। আর সেটা তোমার চেয়ে ভালো অন্য কেউ জানে না। তুমি এখানে বেশ অসাধারণ কাজই করেছো, ডেন্টো। অথবা কেইন। কিংবা তুমি নিজেকে যে নামে পরিচয় দিচ্ছে এখন। অবশ্যই সে স্বাভাবিক ছিলো না। এজন্যেই তো তাকে কয়েক দিনের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।”

“এজন্যেই সে মরেছে। এরপর মরবে তুমি।”

“গত চব্বিশ ঘণ্টা তোমার ছিলো। এখন আর সেটা তোমার নয়।”

“লাভিয়াকে অনুসরণ করা হয়েছিলো। তোমাকেও তাই করা হচ্ছে। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করা হচ্ছে।”

“যদি তাই করা হয়ে থাকে তবে সেটা আমার নিজের সুরক্ষার জন্যেই।”

“তাহলে লাভিয়া কেন মরলো?”

“আমার মনে হয় না সে মরেছে।”

“সে কি তবে আত্মহত্যা করেছে?”

“কখনই না।”

“নুয়েলি সুর সেইনের চার্চে ফোন ক’রে জেনে নাও। জিজ্ঞেস করবে কনফেশনে গিয়ে এক মহিলা আত্মহত্যা করেছে কিনা। আমি তোমাকে পরে ফোন করছি।” বর্ন ফোনটা রেখে বুথ থেকে বের হয়ে গেলো। পথে নেমেই একটা ট্যাক্সির খোঁজ করলো। দশ ব্লক দূরে গিয়ে দাঁজুকে দ্বিতীয় বারের মতো ফোন করা হবে। মেডুসার লোকটা এতো সহজে পটবে না।

ডেন্টা? আমার মনে হয় আমি তোমার কণ্ঠটা কোথাও শুনেছি...প্যারিস তাম কুয়ান নয়। তাম কুয়ান...তাম কুয়ান, তাম কুয়ান! কেইন হলো চার্লি, ডেন্টা হলো কেইন। মেডুসা!

বন্ধ করো। এসব ভেবো না...তুমি এসব ভাবতে পারবে না। সেটা কি, কেবল তাই নিয়ে মাথা ঘামাও। এখন। কেবল তুমি। অন্যেরা কি বলে সেটা নয়—এমন কি তুমি নিজে নিজেকে কি ভাবো তাও নয়। শুধু বর্তমান। এখনকার লোকটা তোমাকে একটা উত্তর দিতে পারবে।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কর্মচারি...

এটাই হলো আসল কথা।

আমাকে বলো! ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলো! সে কে? আমার চাকরিদাতা কে, দাঁজু?

একটা ট্যাক্সি এসে তার সামনে থামলে জেসন দরজা খুলে ঢুকে পড়লো।

“প্রেস ভেদোয়া,” সে বললো, জানে জায়গাটা সেন অনরের খুব কাছেই। এই জায়গাটার কাছাকাছি থাকাটা খুবই জরুরি। তার একটা বাড়তি সুবিধা আছে। এক ঢিলে দুটো পাখি মারার মতো ব্যাপার। দাঁজু বুঝবে তাকে যারা অনুসরণ করেছে তারা তাকে খুন করবে। কিন্তু সেইসব লোকেরা জানবে না যে, অন্য আরেকজন তাদেরকে অনুসরণ করছে।

ভেদোয়া এলাকাটি যথারীতি জনাকীর্ণ। ওখানে একটা ফোনবুথ দেখতে পেয়ে বর্ন ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লো। লো ক্লাসিকে ফোন করলো সে। নুয়েলি সুর সেইন থেকে ফোন করার চৌদ্দ মিনিট পার হয়ে গেছে।

“দাঁজু?”

“কনফেশন করার সময় একজন মহিলা নিজের জীবন সংহার করেছে, এটা কেবল আমি জানতে পেরেছি।”

“আরে, তুমি দেখছি এখনও নিশ্চিত হতে পারছো না।”

“আমাকে সুইচবোর্ডটা ধরার সময় দাও।” লাইনটা প্রায় চার সেকেন্ডের জন্যে কেটে গেলো। দাঁজু আবার ফিরে এলো। “সাদা চুলের এক মধ্যবয়সী মহিলা। দামি পোশাক পরা। একটা সেন লরেন-এর পার্স। এরকম দশ হাজার মহিলা রয়েছে প্যারিসে। আমি কি ক’রে বুঝবো না যে তুমি তাদের একজনকে খুন করো নি?”

“ওহ্ তাতো ঠিকই। আমি তাকে পুতুলের মতো তুলে চার্চে নিয়ে গেছি। একটু যুক্তিবাদী হও, দাঁজু। আসো বিষয়টা নিয়ে কথা বলি। ঐ পার্সটা তার নয়। সে একটা সাদা চামড়ার ব্যাগ বহন করছিলো। সে তার প্রতিপক্ষের কোনো ফ্যাশন হাউজের পণ্য বিজ্ঞাপন ক’রে বেড়াবে না।”

“আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইছো। ঐ মহিলা জ্যাকুলিন লাভিয়া নয়।”

“তার ব্যাগের কাগজপত্র তাকে অন্য কেউ হিসেবে চিহ্নিত করছে। লাশটা খুব জলদিই দাবি করা হবে। কেউ লো ক্লাসিককে স্পর্শ করবে না।”

“কারণ তুমি এরকমটি বলছো তাই?”

“না, কারণ এটা আমার জানা কার্লোসের পাঁচটি খুনে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।” আসলেই সে জানে। এটা খুবই ভীতিকর ব্যাপার। একটা লোককে সরিয়ে ফেলা হবে, পুলিশ বিশ্বাস করবে সে-ই একজন। হত্যাকাণ্ড রহস্যময়। খুনি অজ্ঞাত। তারপর তারা খুঁজে পাবে খুনি আসলে অন্য কেউ। এই ফাঁকে কার্লোস অন্য কোনো দেশে চলে যাবে। আরেকটা কন্ট্রাস্ট সমাধা করা হবে। লাভিয়া হলো এই পদ্ধতির একটি বৈচিত্র্য। এই যা।”

“অনেক কথা বলছো, ডেন্টা। তুমি কখনও এতো কথা বলতে না।”

“তুমি যদি আরো তিন চার সপ্তাহ সেন অনরতে থাকো—যা তুমি করবে না—তাহলে তুমি দেখতে পাবে কিভাবে এসব শেষ হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একটা প্লেন ক্র্যাশ অথবা নৌকা ডুবি। লাশগুলো এমন অবস্থায় থাকবে যে, চেনা যাবে না কিংবা উধাও হয়ে যাবে। তবে কারা মারা গেছে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। লাভিয়া আর বারগোয়া। তবে একজন অবশ্যই মারা যাবে—মাদাম লাভিয়া। মঁসিয়ে, তোমাকে বলছি, তুমি প্যারিসের মর্গে তালিকাটা আরেকটু বাড়িয়ে দেবে।”

“আর তুমি?”

“পরিকল্পনা অনুযায়ী আমিও মৃত। তারা তোমার মাধ্যমে আমাকে মারার আশা করছে।”

“যুক্তিযুক্ত। আমরা দু’জনেই মেডুসা থেকে এসেছি, তারা সেটা জানে—কার্লোস সেটা জানে। এটা ধরে নেয়া হচ্ছে যে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে।”

“এবং তুমি চিনতে পারবে আমাকে।”

দাঁজু চুপ থাকলো। “হ্যাঁ,” সে বললো। “যেমনটি বলেছি, আমরা এখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের কর্মচারি।”

“সেই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি।”

“কোনো কথা নয়, ডেল্টা। তবে পুরনো দিনের দোহাই—তাম কুয়ানে তুমি আমাদের জন্যে যা করেছো, তার জন্যে বলছি—একজন মেডুসানের উপদেশ মেনে নাও। প্যারিস ছাড়া, নয়তো তুমি মারা যাবে।”

“আমি সেটা করতে পারছি না।”

“তোমার করা উচিত। আমার যদি সুযোগ থাকতো তবে আমি নিজেই টৃগারটা টিপে দিতাম, এজন্যে ভালো টাকাও পেতাম।”

“তাহলে আমি তোমাকে সেই সুযোগ দেবো।”

“আমি যদি সেই হাস্যকর জিনিসটা খুঁজে পাই তবে আমাকে ক্ষমা ক’রে দিও।”

“তুমি জানো না আমি কি চাই অথবা এটা পাবার জন্যে আমি কতোটা ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক।”

“তুমি যা-ই চাও না কেন এজন্যে তোমাকে বেশ ঝুঁকি নিতে হবে। তবে আসল বিপদ হলো তোমার শত্রুর। আমি তোমাকে চিনি, ডেল্টা। আমাকে সুইচবোর্ডে ফিরে যেতে হবে। তোমার শিকারপর্ব ভালো হোক, এই কামনা করি, তবে—”

এখন তার কাছে থাকা একমাত্র অস্ত্রটা ব্যবহার করার মুহূর্তটি এসে গেছে। একমাত্র হুমকি যা দাঁজকে লাইনে ধরে রাখবে। “পার্ক মঁশিউ বাদ দেয়ার পরে এখন কার কাছ থেকে নির্দেশনা পাবে?”

দাঁজুর নিরবতার জন্যে উত্তেজনাটা আরো বেড়ে গেলো। যখন সে জবাব দিলো তার কণ্ঠটা খুব মৃদু শোনালা। “তুমি কি বললে?”

“এজন্যেই লাভিয়া খুন হয়েছে, বুঝলে। এজন্যে তুমিও খুন হবে। কার্লোস তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তুমি অনেক বেশি জেনে গেছো। সে পার্ক মঁশিউ’তে গিয়েছিলো, তাই সে খুন হয়েছে। তুমিও পার্ক মঁশিউ’তে গিয়েছো, তুমিও মরবে। সে তোমাকে ব্যবহার করবে আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে। তারপর সে তোমাকে খুন ক’রে আরেকটা লো ক্লাসিক সেটআপ ক’রে আরেকজন মেডুসানকে যুগিয়ে নেবে। তোমার কি এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে?”

এবারের নিরবতাটি আরো বেশি দীর্ঘ হলো। মনে হলো মেডুসার লোকটি নিজেকে প্রশ্ন করছে। “তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও? আমাকে ছাড়া। তুমি জানো জিম্মি ক’রে কোনো লাভ হবে না। তারপরও তুমি যা জেনেছো তা দিয়ে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছো, অবাধ করছো। আমি বাঁচি আর মরি তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। সুতরাং তুমি চাচ্ছেটা কি?”

“তথ্য। যদি তোমার কাছে সেটা থাকে, তাহলে আমি আজ রাতেই প্যারিস ছাড়বো। কি কার্লোস কি তুমি, আর কখনও আমার কোনো কথা শুনবে না।”

“কোন তথ্য?”

“আমি যদি এখন জানতে চাই তবে তুমি মিথ্যে বলবে। তবে আমি জানতে চাইবো যখন তোমার সাথে আমার দেখা হবে। তখন দয়া ক’রে সত্য কথা বলো।”

“আমার গলায় তার পঁচিয়ে ধরে সত্য কথা বলাবে?”

“লোকজনের ভীড়ের মধ্যে?”

“লোকজন? দিনের বেলায়?”

“এখন থেকে এক ঘণ্টা পরে। লুভরের বাইরে। সিঁড়ির কাছে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে।”

“লুভরে? লোকজনের ভীড়ে? তুমি মনে করছো আমার কাছ থেকে তথ্যটা পেলে তুমি দূরে কোথাও চলে যাবে? তুমি আশা করতে পারো না আমি আমার চাকরিদাতার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করি?”

“তোমার নয়। আমার।”

“ট্রেডস্টোন?”

সে জানে। ফিলিপ দাঁজুর কাছে জবাবটা আছে। শান্ত থাকো। তোমার উদ্বেগটা প্রকাশ করো না।

“সেভেনটি-ওয়ান,” জেসন যোগ করলো। “খালি একটা সহজ প্রশ্ন, তারপরই আমি উধাও হয়ে যাবো। আর তুমি যখন আমাকে সত্যি জবাবটা দেবে—বিনিময়ে আমিও তোমাকে কিছু দেবো।”

“তুমি আমার কাছ থেকে কি চাচ্ছে?”

“যে তথ্যটা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। এটার অবশ্য কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে বিশ্বাস করো, আমি যখন বলবো তখন তুমি এটা ছাড়া আর বাঁচতে পারবে না। পার্ক মঁশিউ, দাঁজু।” -

আবারো নিরবতা। বর্ন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলো ধূসর চুলের মেডুসান তার সুইচবোর্ডের দিকে চেয়ে আছে। প্যারিস জেলার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নামটি বার বার তার কানে প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। পার্ক মঁশিউ’তে খুন হয়েছে। দাঁজু সেটা জানে। সে আরো জানে নুয়েলি সুর সেইনের নিহত মহিলাটি লাভিয়া।

“সেই তথ্যটা কি হতে পারে?”

“তোমার চাকরিদাতার পরিচয়। খামে ক’রে একটা নাম আর যথেষ্ট প্রমাণ সিলগালা ক’রে একজন এটর্নিকে দেবে, যাতে তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সেটা না খোঁজা হয়। আর যদি কোনোভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তবে তাকে বলা হবে সেটা খুলতে। এটা তোমার সুরক্ষা, দাঁজু।”

“আচ্ছা,” মেডুসান লোকটা আস্তে ক’রে বললো। “কিন্তু তুমিই না বললে লোকজন আমার উপর নজর রাখছে। অনুসরণ করছে।”

“লুকিয়ে রাখো নিজেকে। তাদেরকে সত্যটা বলে দাও। তোমার কাছে একটা নাম্বার আছে ফোন করার জন্যে, আছে না?”

“হ্যা, এক লোকের নাম্বার আছে,” বয়স্ক লোকটার কণ্ঠস্বর একটু চড়া হলো ।

“তাকে ফোন করো, আমি যা বললাম ঠিক তাই তাকে বলো...কেবলমাত্র বিনিময়ের কথাটা বাদ দিয়ে । বলবে আমি তোমার সাথে যোগাযোগ ক’রে তোমার সাথে দেখা করতে চাইছি । এক ঘণ্টা পরে লুভরের বাইরে । সত্যি কথাটাই বলবে ।”

“তুমি একটা উন্মাদ ।”

“আমি জানি আমি কি করছি ।”

“তুমি সব সময় তাই করো । তুমি তোমার নিজের ফাঁদ পেতে নিজের বিপদ ডেকে আনো ।”

“সেটা হলে তো তুমি পুরস্কার পাবে ।”

“অথবা নিজের মৃত্যু ডেকে আনা হবে । যদি তুমি যা বলছো তাই হয় ।”

“তাহলে দ্যাখো, সেটা হয় কিনা । আমি তোমার সাথে কনটাষ্ট করবো, যেভাবেই হোক । তাদের কাছে আমার ছবি আছে । তারা জানবে কখন আমি এটা করবো । কোনো অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির চেয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিই বেশি ভালো ।”

“এখন আমি ডেন্টার কথা শুনছি,” দাঁজু বললো । “সে নিজের জন্যে কোনো ফাঁদ তৈরি করবে না । সে অস্কের মতো ফায়ারিং স্কোয়াডে হেটে যাবে না ।”

“না, সে তা করবে না,” বর্ন একমত হলো । “তোমার কোনো উপায় নেই, দাঁজু । এক ঘণ্টা । লুভরের বাইরে ।”

কোনো ফাঁদের সফলতা লুকিয়ে থাকে এর সহজ-সরলতার উপরে । পাল্টা ফাঁদটাও সেজন্যে অবশ্যই সহজ সরল হতে হয় ।

সেন অনরের লো ক্লাসিকের বাইরে অপেক্ষা করার সময় কথাটা তার মনে এলো । সে ড্রাইভারকে ব্রকটা দু’বার ঘুরিয়ে আনতে বলেছিলো, একজন আমেরিকান পর্যটক যার বউ এখানকার কোনো এক ফ্যাশন হাউজে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো সে কোনো একটি দোকান থেকে বের হয়ে আসলে তাকে খুঁজে পাবে ।

কিন্তু সে খুঁজে পেলো কার্লোসের অনুচরদের । কালো রঙের একটি সিডান থেকে বের হয়ে থাকা এন্টেনাটা প্রমাণ আর বিপদের চিহ্ন । পেছনের সিটে ব’সে সে গাড়ির ভেতরে দু’জন লোককে দেখতে পেলো । তারা যে অন্য যেকোনো লোকের মতো নিছক অপেক্ষা করছে না সেটা বোঝা গেলো তারা কোনো কথা বলছে না দেখে ।

ফিলিপ দাঁজু রাস্তায় নেমে এলো । তার মাথায় ধূসর রঙের টুপি । সে রাস্তার দিকে এক ঝলক চেয়ে দেখলো । বর্নকে যেনো বলছে সে লুকিয়ে বের হয়েছে । সে একটা নাম্বারে ফোন করেছিলো । সে তার চম্কে দেয়া তথ্যটা রিলে ক’রে

দিয়েছে। তাকে যে এখানে কোনো গাড়ি থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে সেটা সে জানে।

বোঝাই যাচ্ছে ফোন ক'রে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনা হয়েছে। সেটা তার ঠিক পাশে এসে থামলো। দাঁজু ড্রাইভারকে কিছু একটা বলেই গাড়িতে উঠে বসলে রাস্তার ওপাশে একটা এন্টেনা তাড়াহুড়া ক'রে উঠে এলো, শিকার পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করতেই সিডানটাও পিছু পিছু ছুটলো। এই ব্যাপারটাই জেসনের দরকার ছিলো। সে ঝুঁকে ড্রাইভারের সাথে কথা বললো। “আমি ভুলে গিয়েছিলাম,” সে বিব্রত হয়ে বললো। “আমার বউ বলেছিলো সে লুভরে যাবে। পরে এখানে শপিং করবে। হায় ঈশ্বর, আমার আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে! আমাকে লুভরে নিয়ে যাও, প্লিজ?”

“মেই কুয়ে, মর্সিয়ে, লো লুভর।”

সাইন নদীর তীরে এসে জেসনের ট্যাক্সিটা কালো রঙের সিডানটা অতিক্রম করলো। অতিক্রম ক'রে যাবার সময় জেসন দেখতে পেলো যা তার দেখার দরকার ছিলো। ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা মাইক্রোফোন হাতে অনবরত কথা ব'লে যাচ্ছে। কার্লোস নিশ্চিত ফাঁদটাতে যেনো কোনো ফাঁক না থাকে।

তারা লুভরের বিশাল প্রবেশদ্বারের সামনে এসে পড়লো। “অন্য ট্যাক্সিগুলোর পেছনে লাইন ক'রে এগোও,” জেসন বললো।

“কিন্তু ওগুলো তো ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে, মর্সিয়ে। আমার তো প্যাসেঞ্জার আছেই। আমি আপনাকে—”

“যা বললাম তাই করো,” বর্ন বললো। পঞ্চাশ ফ্রাঁ'র একটা নোট বাড়িয়ে দিলো সে।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা লাইনে নিয়ে রাখলো। কালো রঙের সিডানটা ডান দিকে বিশ গজ দূরে আছে। মাইক্রোফোন হাতে থাকা লোকটা এখন জানালার কাঁচ নামিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে। জেসন তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে যা দেখতে পেলো সেটাই সে আশা করেছিলো। পশ্চিম দিকে, কয়েকশো গজ দূরে ধূসর রঙের একটা গাড়ি, যে গাড়িটা লাভিয়াকে অনুসরণ করেছিলো। সেই গাড়িটার এন্টেনা নামিয়ে রাখা হয়েছে। কার্লোসের সৈনিকেরা মাইক্রোফোন হাতে আর ব্যস্ত নেই। কালো সিডানটার এন্টেনাও নামানো। যোগাযোগ করা হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে দেখাটা নিশ্চিত করা হয়েছে। চারজন লোক। এরা হলো কার্লোসের কামলা।

বর্ন লুভরের সামনে মানুষজনের দিকে মনোযোগ দিলো। সঙ্গে সঙ্গেই অভিজাত পোশাক পরা দাঁজুকে দেখতে পেলো। সে ধীরে ধীরে সতর্কভাবে পায়চারী করছে প্রবেশপথের সিঁড়ির বাম পাশে।

এখন। ভুল তথ্যটা পাঠানোর সময় হয়েছে। “লাইন থেকে বের হয়ে যাও,” জেসন আদেশ করলো।

“কি বললেন, মর্সিয়ে?”

“আমি যা বললাম ঠিক তাই যদি করো তবে তোমাকে আরো দুশো ফ্রাঁ দেবো। সামনের দিকে যাও। তারপর দুটো মোড় নেবে বাম দিকে, পরের সারিতে আবার ফিরে আসবে।”

“আমি বুঝতে পারছি না, মর্সিয়ে!”

“তোমার তো বোঝার দরকারও নেই। তিনশো ফ্রাঁ পাবে।”

ড্রাইভার আর কোনো কথা না বলে জেসনের কথামতো কাজ করলো। বর্ন তার অস্ত্রটা কোমর থেকে বের করে নিয়ে সেটা দুই হাটুর মাঝখানে রাখলো। সাইলেন্সারটা চেক করে দেখলো।

“আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন, মর্সিয়ে?” ট্যাক্সিটা ঘুরে আবারো লুভরের প্রবেশপথের দিকে ঢুকতে গেলে বিস্মিত ড্রাইভার বললো।

“আপ্তে,” জেসন বললো। “সামনের বিশাল ধূসর রঙের গাড়িটা দেখেছো?”

“অবশ্যই।”

“সেটাকে আপ্তে করে ঘুরে আসো ডান দিক দিয়ে।” বর্ন বাম দিকের দরজার কাছে এসে নামিয়ে দিলো জানালাটা। তার মুখ আর অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখলো। দুটোই সে উন্মুক্ত করবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

ট্যাক্সিটা সিডানের ঠিক পাশে চলে এলে জেসন অস্ত্রসহ হাতটা বের করলো। ধূসর সিডানটার পেছনের ডান দিকটা লক্ষ্য করে গুলি চালালো সে। পরপর পাঁচটি ভোঁতা শব্দ জানালার কাঁচ গুড়িয়ে ঢুকে গেলো। ভড়কে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো ভেতরের দু'জন লোক। তারা নিচু হয়ে গাড়ির মেঝেতে শুইয়ে পড়লো। তবে তারা তাকে দেখে ফেলেছে। এটাই হলো ভুল তথ্য।

“এখান থেকে বের হয়ে যাও!” তিনশো ফ্রাঁ ছুড়ে দিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ড্রাইভারকে চিৎকার করে বললো জেসন। ট্যাক্সিটা সাঁই করে লুভরের প্রবেশপথ দিয়ে বের হয়ে যেতে লাগলো।

এবার।

জেসন পেছনের দরজাটা খুলে পাথরের মেঝেতে গড়িয়ে নেমে পড়লো। নামার আগে ড্রাইভারকে তার শেষ নির্দেশনাটি দিয়ে গেলো সে। “যদি বাঁচতে চাও তো এখান থেকে এম্ফুগি চলে যাও!”

ট্যাক্সিটা উদভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করলো। ড্রাইভার চিৎকার করছে। দুটো পার্ক করা গাড়ির মাঝখানে বর্ন ঝাঁপ দিলো। ধূসর সিডান থেকে নিজেকে আড়াল করে ফেললো সে। এবার আপ্তে করে উঠে বসলো। গাড়িগুলোর জানালা দিয়ে উঁকি মারলো। কার্লোসের লোকেরা খুব দ্রুত নিজেদের সামলে নিয়েছে। তারা ট্যাক্সিটা দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা শক্তিশালী সিডানটা দিয়ে ওটার পিছু নিতে শুরু করলো। গাড়ির এন্টেনা আবার উঠে গেছে। প্রবেশপথের সিঁড়ির সামনে থাকা অন্য সিডানটাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ট্যাক্সিটা খুব দ্রুত সাইন নদীর তীর ধরে ছুটতে শুরু করলো। তার পেছন পেছন সিডানটাও।

কয়েক মিনিটের ব্যাপার...তার কেবল কয়েক মুহূর্ত সময় আছে যদি তার বিশ্বাস মতো সব কিছু হয়। দাঁজু! কনট্যাক্টটা তার ভূমিকা পালন করেছে—তার ক্ষুদ্র ভূমিকা—আর ঠিক জ্যাকুলিন লাভিয়ার মতো সে পরিত্যাজ্য।

বর্ন দুটো গাড়ির মাঝখান থেকে উঠে কালো রঙের সিডানটার দিকে দৌড়ে গেলো। পঞ্চাশ গজের বেশি দূরত্ব হবে না। সে দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছে। তারা ফিলিপ দাঁজুর দিকে ছুটে যাচ্ছে, সে পায়চারী করছে মার্বেল পাথরের সিঁড়ির পাশেই। একটা অব্যর্থ বুলেট দাঁজুর জীবনটা কেড়ে নেবে। জেসন দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। তার ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢোকানো, অস্ত্রটা ধরে রেখেছে।

কার্লোসের সৈনিকেরা কেবলমাত্র কয়েক গজ দূরে। দাঁজু কিছু বেঝে ওঠার আগেই কাজটা ক'রে ফেলবে তারা।

“মেডুসা!” বর্ন চিৎকার ক'রে বললো। দাঁজু না বলে সে কেন এটা বললো সে জানে না। “মেডুসা—মেডুসা!”

দাঁজু চমকে তাকালো, তার চোখেমুখে আতঙ্ক। কালো সিডানটার ড্রাইভার অস্ত্র বের ক'রে জেসনের দিকে তাক করলো এবার। একই সময়ে তার সঙ্গীটি তাক করলো দাঁজুর দিকে। বর্ন তার ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শূন্যের মধ্যেই সে গুলি করলো। তার নিশানা একেবারে নিখুঁত। দাঁজুর দিকে ছুটে আসা লোকটা একটু পিছিয়ে গেলো। তার পাটা যেনো প্যারানাইজ হয়ে গেছে এমনভাবে টলে মেঝেতে পড়ে গেলো সে। জেসনের মাথার উপর দিয়ে দুটো ভোঁতা শব্দ ছুটে এলো। বুলেট দুটো তার পেছনে স্টিলের মধ্যে বিদ্ধ হলো। সে বাম দিকে গাড়িয়ে দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাক ক'রে পর পর দু'বার সে টুগার টিপলে ড্রাইভার চিৎকার দিলো। তার মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে দৌড়াদৌড়ি আর হৈহল্লা শুরু হয়ে গেছে। মা-বাবারা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে লুভরের ভেতরে ছুটে যাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেজন্যে রক্ষীরাও ভেতর থেকে বাইরে বের হতে পারছে না। বর্ন উঠে দাঁড়িয়ে দাঁজুকে খুজলো। বয়স্ক লোকটা মেঝেতে হামাগুঁড়ি দিয়ে সটকে পড়ছে লোকজনের ভীড়ের মধ্যে। তার হাতে একটা অস্ত্র। এই লোকটাই তাকে তার প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারবে। ট্রেডস্টোন। ট্রেডস্টোন!

সে ধূসর চুলের মেডুসান লোকটার কাছে পৌছে গেলো। “উঠে দাঁড়াও!” আদেশের সুরে বললো। “চলো, এখান থেকে বের হই!”

“ডেন্টা!...সে কার্লোসের লোক! আমি তাকে চিনি, আমি তাকে ব্যবহার করেছি! সে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো!”

“আমি জানি। আসো! দ্রুত! অন্যেরা খুব জলদি এসে পড়বে। তারা আমাদের খুঁজবে। আসো আমার সাথে!”

বর্ন চোখের কোণে কিছু একটা দেখতে পেয়ে ঘুরতেই নিজের অজান্তেই দাঁজুকে ধরে নিচু ক'রে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক কালো অবয়ব তাদের লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালো। তাদের চারপাশে মার্বেল আর

গ্রানাইটের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো। এটা তো সেই লোকটা! প্রশস্ত কাঁধ, সরু কোমর কালো সুট আর কালো টুপি পরা অশ্বেতাস্র লোকটা। কার্লোস!

কার্লোসকে ধরো! তাকে ফাঁদে ফেলো!

ভূয়া!

ট্রেডস্টোন খুঁজে বের করো! একটা মেসেজ খুঁজে বের করো, একজন মানুষের জন্যে! জেসন বর্নকে খুঁজে বের করো!

সে একেবারে পাগল হয়ে যাচ্ছে! ভয়ঙ্কর বর্তমানের সাথে অস্পষ্ট সব ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তাকে একেবারে উন্মাদ ক'রে ফেলছে। তার মনের দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। একবার আলো আরেকবার অন্ধকার। তার মাথার তীব্র ব্যথাটা আবার ফিরে এলো। সে সাদা রুমালে মুখ ঢাকা কালো সুট পরা লোকটার পিছু নিলো। এরপরই সে চোখ দুটো আর অস্ত্রের নলটা দেখতে পেলো। তিনটি কালো বৃত্ত তার দিকে লেজার রশ্মির মতো তাক করে আছে যেনো। বারগোয়া?...এটা কি বারগোয়া? অথবা জুরিখের... কিংবা...সময় নেই!

সে বাম দিকে একটু ঝুঁকে ডান দিকে ঝাঁপ দিলো গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্যে। বুলেটগুলো পাথরে আঘাত করার শব্দ হলে জেসন একটা থামানো গাড়ির নিচে গড়িয়ে চলে গেলো। দু'চাকার মাঝখান দিয়ে সে কালো অবয়বটাকে দৌড়ে চলে যেতে দেখলো। একটু হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িটার নিচ থেকে বের হয়ে লুভরের সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেলো।

সে একি করলো? দাঁজু চলে গেছে! কিভাবে এটা হলো? পাল্টা ফাঁদটা আসলে কোনো ফাঁদই নয়। তার নিজের কৌশল তার বিরুদ্ধেই ব্যহার করা হয়েছে, তাকে একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে এরকম এক লোক তার হাত থেকে ফস্কে চলে গেছে। সে কার্লোসের সৈনিককে অনুসরণ করেছে, কিন্তু কার্লোস অনুসরণ করেছে তাকে! সেন অনরে থেকেই। তার মধ্যে একটা শূন্যতা জেঁকে বসলো। এরপরই সে কথাগুলো শুনতে পেলো। তার খুব কাছে থাকা একটা গাড়ির পেছন থেকে সেটা বলা হলো। ফিলিপ দাঁজুকে দেখতে পেলো সে।

“তাম কুয়ান কখনও খুব দূরে নয় বলেই মনে হচ্ছে। আমরা এখন কোথায় যাবো, ডেন্টা? আমরা তো এখানে থাকতে পারবো না।”

তারা রুই পিলোয়া'র একটা জনাকীর্ণ ক্যাফের পর্দাঘেরা বুথের ভেতর ব'সে আছে। জায়গাটা সরু একটা গলিতে অবস্থিত। দাঁজু তার দ্বিতীয় গ্লাস ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিলো। তার কণ্ঠ নিচু আর সতর্ক।

“আমার এশিয়াতে ফিরে যাওয়া উচিত,” সে বললো। “সিন্সাপুরে অথবা হংকং-এ কিংবা সেইচিলেসে হতে পারে। ফ্রান্স আমার জন্যে কখনও খুব বেশি ভালো ছিলো না। এখন তো সেটা একেবারে মারণঘাতি হয়ে উঠেছে।”

“তোমাকে হয়তো সেটা নাও করতে হতে পারে,” বর্ন বললো হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে। “আমি বেশ জোর দিয়েই বলছি। আমি যা জানতে চাই তুমি তা বলবে। আমি তাহলে তোমাকে—” সে থেমে গেলো। তার একটু দ্বিধা হলো। না, তাকে বলতেই হবে। “কার্লোসের পরিচয়টা দিয়ে দেবো।”

“আমি মোটেও আগ্রহী নই,” জেসনকে খুব ভালোভাবে দেখে মেডুসান লোকটা জবাব দিলো। “আমি যা বলার তোমাকে বলবো। কেন আমি চেপে রাখবো? অবশ্যই আমি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে যাবো না। তবে আমার কাছে যদি এমন তথ্য থাকে যাতে ক’রে কার্লোসকে ঘায়েল করা যায় আমি সেটা তোমাকে বলবো, এতে ক’রে পৃথিবীটা আমার জন্যে বেশ নিরাপদ হয়ে উঠবে, তাই নয় কি? ব্যক্তিগতভাবে আমি এসবে জড়িত থাকতে চাই না।”

“তুমি একটুও কৌতুহলী নও?”

“হয়তো একাডেমিক্যালি, তোমার চোখের ভাষা ব’লে দিচ্ছে আমি শক্ পাবো। সুতরাং আমাকে তোমার প্রশ্নটা করো তারপর আমাকে অবাক করো।”

“অবাক নয়, তুমি শক্ পাবে।”

আচমকা দাঁজু নামটা বললো। “বারগোয়া?”

জেসন নির্বাক হয়ে লোকটার দিকে চেয়ে রইলো। দাঁজু বলতে শুরু করলো।

“আমি এটা অনেকবার ভেবেছি। তার সঙ্গে যখনই আমি কথা বলতাম অবাক হয়ে তাকে দেখতাম। অবশ্য প্রতিবারই আমার এই ভাবনাটি বাতিল ক’রে দিতাম।”

“কেন?” বর্ন জানতে চাইলো।

“মনে রাখবে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না—আমার কেবল মনে হতো এটা ভুল। সম্ভবত আমি অন্য কারোর চেয়ে রেনে বারগোয়ার কাছ থেকেই কার্লোসের ব্যাপারে বেশি জেনেছি। সে কার্লোসকে নিয়ে মোহগুস্ত ছিলো। অনেক বছর ধরেই সে কার্লোসের হয়ে কাজ করেছে। খুবই আস্থাভাজন তার। সে তাকে নিয়ে অনেক কথা বলতো, এটাই আমার সমস্যা ছিলো।”

“কার্লোস অন্য লোক সেজে নিজের প্রশংসা করতো, অহংবোধ, বুঝলে?”

“এটা সম্ভব, তবে আমি বারগোয়াকে কার্লোস ভাবতে পারতাম না।”

“তুমি নামটা বলেছো, আমি না।”

দাঁজু হাসলো। কোনো কিছু নিয়ে তোমার ভাববার নেই, ডেল্টা। তোমার প্রশ্নটা করো।”

“আমি ভেবেছিলাম এটা বারগোয়াই হবে। আমি দুঃখিত।”

“দুঃখিত হয়ো না। হয়তো সে তা হতেও পারে। তবে সেটা আর আমার কাছে কোনো মানে রাখে না। কয়েক দিনের মধ্যে আমি এশিয়ায় ফিরে যাবো। যেভাবেই পারি সেই ব্যবস্থা করতে পারবো। আমরা মেডুসানরা খুবই করিৎকর্মা, তাই না?”

জেসন জানে না কেন, তবে আদ্র্ণে ভিলিয়ার্সের জীর্ণ মুখটা তার চোখে ভেসে উঠলো। সে তাকে কথা দিয়েছিলো সে যা জানবে তা বৃদ্ধকে জানাবে। সে আর সুযোগটা পাবে না।

“ভিলিয়ার্সের বউ কিভাবে খাপ খায়?”

দাঁজু ভুরু তুললো। “এনজেলিক? পার্ক মঁশিউ’র, তাই না?”

“কিভাবে—”

“সেসব আর এখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

“আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।”

“ভিলিয়ার্সের বউয়ের ব্যাপারটা কি?” বর্ন বললো।

“তুমি কি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছো? গায়ের রঙ?”

“তার গায়ের রঙ সূর্যের আলোয় পোড়া।”

“সে তার চামড়ার রঙ ওভাবেই রাখতো। রিভিয়েরা, গৃক দ্বীপ, কোস্তা দেল সল জিস্তাদ। জন্মগতভাবেই তার গায়ের রঙ ওরকম।”

“এটা খুবই আকর্ষণীয়।”

“এটা খুব সফল অস্ত্রও বটে। এটা তাকে আড়াল ক’রে রাখে। তার জন্যে কোনো হেমন্ত কিংবা শীত নেই, কোনো ফ্যাকাশে কিংবা বিবর্ণ মুখ নেই। সবসময়ই একই রকম গায়ের রঙ।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে?”

“যদিও আকর্ষণীয় এনজেলিক ভিলিয়ার্সকে একজন প্যারিসীয় ব’লে ধরে নেয়া হয়, আসলে সে তা নয়। সে একজন হিসপ্যানিক। ভেনেজুয়েলিয়ান।”

“সানচেজ,” ফিসফিস ক’রে বললো বর্ন। “ইলিচ রামিরেজ সানচেজ।”

“হ্যা। বলা হয়ে থাকে সে কার্লোসের চাচাতো বোন এবং চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তার প্রেমিকা। একটা গুজব আছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র তাকেই কার্লোস পরোয়া করে।”

“আর ভিলিয়ার্স নিজের অজ্ঞাতে তার হাতে ব্যবহৃত হয়?”

“মেডুসার কথা, ডেন্টা?” দাঁজু মাথা নেড়ে সায দিলো। “হ্যা, ভিলিয়ার্স তাই ছিলো। কার্লোস অসাধারণভাবেই ফরাসি সরকারের খুবই স্পর্শাকাতর ডিপার্টমেন্টের ভেতরে তার অনুচরদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তার নিজের ফাইলের ব্যাপারেও সে বেশ ভালোভাবে অবগত আছে।”

“অসাধারণই বটে,” জেসন বললো। “কারণ এটা একেবারেই অচিস্তনীয়।”

“একদম।”

বর্ন একটু সামনে ঝুঁকে এসে মদের গ্রাসটা দু’হাতে ধরে বললো, “ট্রেডস্টোন। এবার আমাদের ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান সম্পর্কে বলো।”

“আমি কি আর বলতে পারবো?”

“তারা যা জানে সব । কার্লোস যা জানে সবটা ।”

“আমার মনে হয় না আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো । আমি এ সম্পর্কে শুনেছি । টুকরো টুকরো কিছু । কেবল মেডুসা সম্পর্কিত খবরগুলোতে আগ্রহ দেখিয়েছি ।”

“তুমি কি শুনেছো? টুকরো টুকরো খবরগুলো জোড়া লাগিয়ে বলো, কি শুনেছো?”

“আমি যা শুনেছি, যা বুঝেছি সেটা সবসময় সঙ্গতিপূর্ণ নয় । তারপরও আমার কাছে মনে হয়েছে কথাগুলো সত্য ।”

“যেমন?”

“যখন আমি তোমাকে দেখেছি আমি বুঝেছিলাম । ডেন্টা আমেরিকানদের সাথে একটা লোভনীয় চুক্তি করেছিলো । আরেকটা লোভনীয় চুক্তি, আগেরটার চেয়ে আলাদা, সম্ভবত ।”

“খুলে বলো ।”

“এগারো বছর আগে, সায়গনে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, ঠাণ্ডা মাথার ডেন্টা হলো মেডুসানদের মধ্যে সবচাইতে উচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত । অবশ্যই তুমি সবচাইতে বেশি যোগ্য ছিলে বলেই আমি জানতাম । তাই ধরে নিচ্ছি তুমি নিজের মূল্য নিয়ে দরকষাকষি করেছিলো । তুমি এখন যা করছো তার চেয়েও কঠিন কিছু করেছিলে ।”

“যেমন? তুমি যা শুনেছিলে তা থেকে বলো ।”

“আমরা যা জানি সল্যাসী সেটা মারা যাবার আগে নিশ্চিত ক’রে গেছে, এটাই কেবল তোমাকে বলতে পারি । এর সাথে আগের প্যাটার্নগুলোর মিল রয়েছে ।”

বর্ন মদের গ্লাসটা তুলে ধরে দাঁজুর দৃষ্টি এড়ালো । সল্যাসী । জিঙ্কস করো না । সল্যাসী মারা গেছে । সে যেই হোক না কেন, এখন আর সে প্রাসঙ্গিক নয় । “আমি আবাবো বলছি,” জেসন বললো । “আমি কি করছি ব’লে তারা মনে করছে?”

“আরে ডেন্টা, আমি চলে যাচ্ছি । এটা উদ্দেশ্যবিহীন—”

“প্লিজ,” বর্ন বাঁধা দিয়ে বললো ।

“বেশ । তুমি কেইন হতে রাজি হলে । একজন কাল্পনিক খুনি, সীমাহীন খুনের চুক্তির তালিকা রয়েছে যার কোনো অস্তিত্বই নেই । কার্লোসকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সেই সূত্রে তাকে টোপ দিয়ে কাছে টেনে এনে ঘায়েল করাই ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য । এটা ছিলো আমেরিকানদের সাথে তোমার চুক্তি ।”

বর্নের মনের দরজাটা খুলে গেলো । কিন্তু খুব দূরে । তারপরও গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটু আলো উঁকি দিচ্ছে ।

“তাহলে আমেরিকানরা হলো—” বর্ন কথাটা শেষ করলো না এই আশায় যে, বাকিটা দাঁজু নিজেই শেষ করবে ।

“হ্যা,” মেডুসান বললো। “ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান। স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর কনসুলার অপারেশনের পর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের সবচাইতে নিয়ন্ত্রিত ইউনিট। যে ব্যক্তি মেডুসা সৃষ্টি করেছিলো সেই একই ব্যক্তি এটি তৈরি করেছে। ডেভিড অ্যাবোট।”

“সন্ধ্যাসী,” জেসন আস্তে ক’রে বললো আপন মনে। তার মনের আরেকটা দরজা খুলে যাচ্ছে।

“অবশ্যই। সে ছাড়া আর কে মেডুসায় ডেল্টা হিসেবে পরিচিত একজনকে কেইনের ভূমিকা নেবার জন্যে বলতে পারতো? যেমনটি বলেছি, তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম সেটা।”

“একটা ভূমিকা—” বর্ন থেমে গেলো। আলোটা আরো তীব্র হলো। উষ্ণ কিন্তু চোখ ঝলসানো নয়।

দাঁজু একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। “এসবই আমি শুনেছি। এটা বলা হয় যে, জেসন বর্ন যে কারণে এসাইনমেন্টটা নিয়েছিলো ব’লে আমি জানতাম সেটা সত্যি নয়। আমি সেখানে ছিলাম। তারা ছিলো না। তারা সেটা জানতে পারবে না।”

“তারা কি বলে? তুমি কি শুনেছো?”

“তুমি একজন আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসার, সম্ভবত মিলিটারির। তুমি কি ভাবতে পারো? তুমি। ডেল্টা! আমি বারগোয়াকে বলেছিলাম এটা অসম্ভব, তবে আমি নিশ্চিত নই সে আমার কথাটা বিশ্বাস করেছে কিনা।”

“তুমি তাকে কি বলেছিলে?”

“যা আমি বিশ্বাস করি। যা আমি এখনও বিশ্বাস করি। এটা টাকার জন্যে নয়—যতো টাকাই হোক না কেন, এই কাজটা তুমি টাকার জন্যে করতে রাজি হও নি—অবশ্যই অন্য কিছু আছে। এগারো বছর আগে অনেকে যে কারণে মেডুসায় এসেছিলো তুমি ঠিক একই কারণে এটা করেছো। তোমার কাছে আগে কিছু ছিলো এরকম কোনো কিছু ফিরে পাবার জন্যে কোথাও কোনো দলকে শেষ ক’রে দেয়ার জন্যে। আমি জানি না। আর আমি আশাও করি না তুমি এটা নিশ্চিত করবে। তবে সেটাই আমি ভাবছি।”

“তোমার কথা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে,” জেসন বললো। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা হিমশীতল বাতাস তার চারপাশের কুয়াশা সরিয়ে দিচ্ছে। এসব কথাবার্তা যৌক্তিক বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছে। এটা হতে পারে সেই মেসেজটা। প্রেরককে খুঁজে বের করো। ট্রেডস্টোন খুঁজে বের করো!

“যা আমাদেরকে ডেল্টার কাহিনীতে ফিরিয়ে আনে,” দাঁজু আবার বলতে লাগলো। “সে কে? সে কি? এই শিক্ষিত, শান্ত মানুষটি গভীর অরণ্যে নিজেকে একটি মারাত্মক অস্ত্রে রূপান্তর করে ফেললো। আমরা কখনও সেটা বুঝবো না।”

“এ ছাড়া আর কিছু কি তুমি বলতে পারো? তারা কি ট্রেডস্টোন-এর সঠিক ঠিকানা জানে?”

“অবশ্যই। আমি বারগোয়ার কাছ থেকে সেটা জেনেছি। নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রটের একটি বাড়ি। যার নাম্বার ১৩৯। এটা কি ঠিক নয়?”

“সম্ভবত...আর কিছু?”

“একমাত্র তুমি যেটা জানো, কৌশলটা। যা আমি ধরতে পারি নি।”

“যেমন?”

“আমেরিকানরা মনে করে তুমি চোখ পাল্টিয়েছো, মানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভালোভাবে বলতে গেলে, তারা চায় কার্লোস বিশ্বাস করুক তুমি চোখ পাল্টিয়েছো।

“কেন?” সে খুব কাছে এসে পড়েছে। এই তো সেটা!

“কেইন দীর্ঘ দিন ধরে নিরব ছিলো, তারপর তহবিল চুরি করলো, তবে প্রধাণত নিরবতা।”

এটাই সেই মেসেজটা। নিরবতা। পোর্ত নোয়ের কয়েকটা মাস। জুরিখের হটগেলটা। প্যারিসের উন্মাদগ্রস্ততা। কেউ জানে না আসলে কি ঘটেছিলো। তাকে বলা হচ্ছিলো বের হয়ে আসার জন্যে। প্রকাশ্য হতে। তুমি ঠিক বলেছো মেরি। আমার ভালোবাসা। তুমি শুরু থেকেই ঠিক ব’লে আসছো।

“তাহলে আর কিছু নেই?” বর্ন জানতে চাইলো। নিজের কণ্ঠের অধৈর্য ভাবটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলো। সে এখন মেরির কাছে ফিরে যাবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

“আমি এ-ই জানি—তবে দয়া ক’রে বোঝার চেষ্টা করো আমাকে খুব বেশি বলা হয় নি কখনও। আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ আমার মেডুসার ব্যাপারে জ্ঞান রয়েছে—আর এটা প্রতিষ্ঠিত যে কেইন মেডুসা থেকে এসেছে—তবে আমি কখনই কার্লোসের ইনার সার্কেলের অংশ ছিলাম না।”

“তুমি যথেষ্ট কাছাকাছি ছিলে। ধন্যবাদ তোমাকে।” জেসন কিছু ফরাসি মুদ্রা টেবিলে রেখে বুথ থেকে বের হতে উদ্যত হলো।

“আরেকটা ব্যাপার আছে,” দাঁজু বললো। “আমি নিশ্চিত নই এটা প্রাসঙ্গিক হবে কিনা, তবে তারা জানে তোমার নাম জেসন বর্ন নয়।”

“কি?”

“২৫শে মার্চ। তুমি কি মনে করতে পারছো না? মাত্র দু’দিন বাকি আছে। এই দিনটি কার্লোসের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথটা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সে পচিশে মার্চে তোমার লাশ চায়। সেদিন সে লাশটা আমেরিকানদের কাছে পাঠাতে চায়।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে?”

“১৯৬৮ সালের ২৫শে মার্চে জেসন বর্নকে তাম কুয়ানে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। তুমি তাকে হত্যা করেছিলে।”

অধ্যায় ৩১

মেরি দরজা খুলতেই দেখে জেসন তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় বাদামী চোখ দুটোতে রয়েছে ভয় আর কৌতুহল। মেরি জানে। একটা জবাব আছে। জেসন ফিরে এসেছে তাকে সেই কথাটা বলতে। ঘরের ভেতর ঢুকতেই মেরি দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

“এটা ঘটেছে,” বললো মেরি।

“ঘটেছে,” তার কাছে এলো বর্ন। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলো তারা। তাদের দু'জনের মধ্যকার নিরবতা অনেক কথা বলে দিলো। “তোমার কথাই ঠিক,” সে মেরির কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো। “অনেক কিছুই আছে যা আমি জানি না—হয়তো কখনও জানবো না—তবে তোমার কথাই ঠিক। আমি কেইন নই, কারণ কেইন ব'লে কেউ নেই। কখনও ছিলোও না। যে কেইনের কথা তারা বলে। তার কখনও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। সে একটা কাল্পনিক চরিত্র, কার্লোসকে টেনে আনার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি হলাম সেই সৃষ্টি। মেডুসার এক লোক যে ডেল্টা নামে পরিচিত, সে কেইন হতে রাজি হয়েছিলো। আমি সেই লোক।”

মেরি জড়িয়ে ধরে রাখলো তাকে। “‘কেইন হলো চার্লি...’” সে কথাটা আশ্তে ক'রে বললো।

“‘আর ডেল্টা হলো কেইন,’” কথাটা শেষ করলো জেসন। “তুমি আমাকে এটা বলতে শুনেছো?”

মেরি মাথা নেড়ে সাই দিলো। “হ্যাঁ। সুইজারল্যান্ডে একরাতে তুমি ঘুমের মধ্যে চিৎকার ক'রে বলেছিলে। তুমি কখনও কার্লোসের নাম বলো নি। কেবল কেইন...ডেল্টা। আমি পরের দিন সকালবেলা তোমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও তুমি কিছু বলো নি। কেবল জানালার বাইরে চেয়ে থাকলে।”

“কারণ আমি বুঝতে পারি নি। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তবে মেনে নিয়েছি। এটা অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করে।”

সে আবারো মাথা নেড়ে সাই দিলো। “উস্কানীদাতা। যে কোডটা তুমি ব্যবহার করেছিলে, অদ্ভুত একটি পদবাচ্য। কিন্তু কেন? তুমি কেন?”

“‘কোথাও কোনো একজনকে খতম করতে।’ এটাই সে বলেছে।”

“কে বলেছে?”

“দাঁজু।”

“পার্ক মঁশিউ’র সিঁড়িতে যে লোকটা ছিলো, সে? সুইচবোর্ড অপারেটর?”

“মেডুসার লোক । আমি তাকে মেডুসায় থাকাকালীন সময় থেকেই চিনতাম ।”

“সে কি বলেছে?”

বর্ন তাকে সব খুলে বললে মেরির চোখেমুখে একটা স্বস্তির ভাব দেখতে পেলো । তার মধ্যে একধরনের আনন্দের বর্ধিতপ্রকাশ টের পাওয়া গেলো ।

“জেসন!” মেরি চিৎকার ক’রে বললো । দু’হাতে তার মুখটা ধরলো । “ডালির্! আমার বন্ধু আমার কাছে ফিরে এসেছে! এটাই আমরা জানতাম, এটাই আমরা অনুভব করতাম!”

“ঠিক সব বলা যাবে না,” সে বললো তার গাল স্পর্শ ক’রে । “আমি তোমার কাছে জেসন, আমার কাছে বর্ন, কারণ এই নামটাই আমাকে দেয়া হয়েছে । কারণ আমার আর কোনো নাম নেই তাই এটা ব্যবহার করতে হচ্ছে । তবে নামটা আমার নয় ।”

“এটাও সৃষ্টি করা হয়েছে?”

“না, সে সত্যিকারের । তারা বলছে আমি তাকে তাম কুয়ানে হত্যা করেছি ।”

“তার অবশ্যই কোনো কারণ ছিলো ।”

“আমিও তাই আশা করি । আমি জানি না । হয়তো ওটাই ছিলো সেই জিনিস যা আমি খতম করার চেষ্টা করেছি ।”

“এতে কিছুই যায় আসে না,” মেরি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো । “এটা অতীতের, দশ বছর আগের । এখন আসল কাজ হলো ট্রেডস্টোন-এ তোমাকে পৌছাতে হবে কারণ তারা তোমার নাগাল পাবার জন্যে চেষ্টা করছে ।”

“দাঁজু বলেছে আমেরিকানরা মনে করছে আমি তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছি । হয় মাস ধরে আমার কাছ থেকে কোনো রকম সাড়া-শব্দ পায় নি তারা, জুরিখ থেকে মিলিয়ন ডলার তুলে নেয়া হয়েছে । তারা অবশ্যই ভাববে আমি হলাম তাদের কাছে সবচাইতে ব্যবহুল ভুল ।”

“কি ঘটেছে সেটা তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো । তুমি তো জানতে না যে, চুক্তি ভঙ্গ করছো; তা না হলে তুমি একটুও এগোতে পারবে না । এটা অসম্ভব । তুমি যে প্রশিক্ষণ নিয়েছো সবই অর্থহীন হয়ে যাবে ।”

বর্ন তার কোটাট খুলে বেল্ট থেকে অস্ত্রটা বের করলো । সেটার দিকে তাকিয়ে সে অসুস্থ বোধ করলো । সে জিনিসটা ব্যুরোর ড্রয়ারে রেখে দিয়ে মেরির দিকে তাকিয়ে রইলো ।

“তাদের কাছে আমি কি বলবো?” সে জানতে চাইলো । “জেসন বর্ন বলছি । যদিও আমি জানি এই নামের লোকটাকে আমি নিজেই খুন করেছি । কিন্তু এই নামটাই আপনারা আমাকে দিয়েছেন...আমি দুগ্ধখিত জেন্টেলমেন, মার্সেই’তে যাবার পথে আমার কিছু একটা হয়েছিলো । আমি কিছু একটা হারিয়েছি—আমার স্মৃতি ।

এখন আমার মনে পড়েছে আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিলো, কিন্তু সেটা কি আমার তা মনে পড়ছে না। কেবল ‘কার্লোসকে ধরো,’ কার্লোসকে ফাঁদে ফেলো!’ কথাটা ছাড়া। এসব কথা শুনে আপনারা হয়তো মনে করছেন আমার সব মনে প’ড়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে বিশাল এক বিবর্তকর পরিস্থিতির মধ্যে আপনাদেরকে ফেলে দেবে।” বর্ন আয়নার দিকে থেকে ফিরে মেরির দিকে তাকালো। “আমি ঠাট্টা করছি না। আমি কি বলবো, বলো?”

“সত্য কথাটা,” মেরি জবাব দিলো। “তারা এটা মেনে নেবে। তারা তোমার কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। তারা তোমার নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। হয় মাসের ব্যাপারটার জন্যে ওয়াশবার্নকে পোর্ত নোয়ে’তে টেলিগ্রাম করো। সে সব কিছু রেকর্ড ক’রে রেখেছে—একেবারে বিস্তারিতভাবে।”

“সে হয়তো জবাব দেবে না। আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিলো। তার কাছে আমি এক মিলিয়ন আমেরিকান ডলার পাঠিয়েছিলাম। একেবারে ট্রেস করা যাবে না, এমনভাবে সেটা পাঠানো হয়েছিলো।”

“তুমি কি মনে করো এজন্যে সে তোমাকে সাহায্য করবে না?”

জেসন চুপ মেরে গেলো। “সে নিজে হয়তো সাহায্য করতে পারবে না। তার একটা সমস্যা আছে। সে একজন মাতাল; একেবারে বন্ধ মাতাল। সে এটা জানে, পছন্দও করে। এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে সে কতো দিন বেঁচে থাকতে পারবে? তার চেয়ে বড় কথা ওয়াটারফ্রন্টের ঐ সব দস্যুর দল তাকে খুঁজে পাবার পর তাকে কতো দিন বাঁচিয়ে রাখবে ব’লে তুমি মনে করো?”

“তারপরও তুমি প্রমাণ করতে পারবে কোথায় ছিলে এতোদিন। তুমি অসুস্থ আর বিচ্ছিন্ন ছিলে। তুমি কারো সাথেই যোগাযোগ করতে পারো নি।”

“ট্রেডস্টোন-এর লোকেরা কিভাবে নিশ্চিত হবে? তাদের দৃষ্টিতে আমি হলাম অফিশিয়াল গোপনীয়তার এক জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। আমি যা করেছি তাই আমাকে করতে হবে। তারা কি ক’রে নিশ্চিত হবে যে, আমি ভুল কোনো লোকজনের সাথে কথা বলি নি?”

“তাদেরকে বলো পোর্ত নোয়ে’তে একটা দল পাঠাতে।”

“ওখানে তারা নিরব আর বিস্মিত কতোগুলো চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আমি সেই দ্বীপটা মাঝরাতে ছেড়ে এসেছি, ওয়াটারফ্রন্টের অর্ধেক লোক তখন আমার পিছু নিয়েছিলো। যদি সেখানকার কেউ ওয়াশবার্নের কাছ থেকে টাকাগুলো করায়ত্ত করতে পারে তো সে কিছুই বলবে না, সোজা চলে যাবে।”

“জেসন, আমি জানি না, তোমার উদ্দেশ্যটা কি। তুমি তোমার জবাবটা পেয়ে গেছো। পোর্ত নোয়ে’তে জেগে ওঠার পর থেকেই যে জবাবের জন্যে তুমি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কি চাও তুমি?”

“আমি কেবল সতর্ক হতে চাই, এই যা,” বর্ন কর্কশভাবে বললো। “আমি চাচ্ছি ভেবেচিন্তে কাজ করতে। তাড়াহুড়ো ক’রে আগুনে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছি না!” সে চিৎকার ক’রে বলেই থেমে গেলো।

মেরি তার সামনে এসে দাঁড়ালো। “খুব ভালো। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়, তাই না? মানে, কেবলমাত্র সতর্ক থাকাটা।”

জেসন মাথা ঝাঁকালো। “না, এটা তা নয়। প্রতিটি পদক্ষেপেই আমি ভয় পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি যেসব জিনিস আমি জানতে পারছি সেগুলো নিয়ে। এখন এই শেষের দিকে এসে আমি আরো ভীত হয়ে পড়েছি। আমি যদি জেসন বর্ন না হই, তবে আমি আসলে কে? পেছনে আমি কি ফেলে এসেছি? এটা কি তোমার মনে হয় নি?”

“একদিক থেকে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভীত। তবে আমি মনে করি না এটা আমাদেরকে থামাতে পারবে। আমি ঈশ্বরের কাছে কামনা করি তাই যেনো হয়। তবে আমি জানি এটা হবে না।”

আমেরিকান অ্যাম্বাসির অ্যাটাশি গ্যাব্রিয়েল এভিনুর অফিসে ঢুকে ফাস্ট সেক্রেটারির রুমে প্রবেশ করেই দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলে ডেস্কে বসা লোকটা তার দিকে মুখ তুলে তাকালো।

“তুমি নিশ্চিত, লোকটা আসলে সে-ই?”

“আমি কেবল নিশ্চিত সে কি-ওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছে,” অ্যাটাশি কথাটা বলেই একটা লাল বর্ডারের ইনডেক্স কার্ড বাড়িয়ে দিলো। “এখানে এই ফ্ল্যাগটা আছে,” সে ফাস্ট সেক্রেটারিকে কার্ডটা দিয়ে বললো। “আমি তার ব্যবহার করা কথাটা চেক ক’রে দেখেছি। আর সংকেতটা যদি যথার্থ হয় আমি বলবো, সে-ই আসল লোক।”

ডেস্কে বসা লোকটা কার্ডটা দেখে বললো, “কখন সে ট্রেডস্টোন নামটা ব্যবহার করেছে?”

“যখন আমি তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, সে যদি আমাকে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ না দেখাতে পারে তবে সে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের কারো সাথে কথা বলতে পারবে না, তখনই। তারপর সে যখন বললো সে জেসন বর্ন তখন আমি দারুণ অবাক হয়েছি। আমি যখন বললাম তার জন্যে আমি কি করতে পারি তখন মনে হলো সে একটু সমস্যায় প’ড়ে গেছে।”

“সে কি বলে নি তার জন্যে একটা ফ্ল্যাগ, মানে সংকেত দেয়া হয়েছে?”

“আমি সেটার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম কখন সে এটা বলে, তবে সে আর বলে নি। আটটা শব্দের স্কেচটা অনুযায়ী—‘অভিজ্ঞ ফিল্ড অফিসার। সম্ভাব্য

বিশ্বাসঘাতকতা অথবা শত্রুদের হাতে বন্দী—সে কেবল ‘ফ্ল্যাগ’ শব্দটা ব্যবহার করতে পারতো, তাহলেই আমরা মিলিয়ে নিতে পারতাম। সে তা করে নি।”

“তাহলে সে হয়তো আসল নয়।”

“বাকি সবই তো মিলে গেছে। সে বলেছে ডি.সি তাকে ছয় মাস ধরে খুঁজছে। তখনই সে ট্রেডস্টোন শব্দটা ব্যবহার করেছে। সে ট্রেডস্টোনের। এটা মনে হয় খুবই বিপজ্জনক হবে। সে আমাকে আরো বলেছে ডেল্টা, কেইন আর মেডুসা কোড শব্দগুলো রিলে করতে। প্রথম দুটো ফ্ল্যাগে আছে। আমি সেগুলো চেক ক’রে দেখেছি। আমি জানি না মেডুসা মানে কি।”

“আর আমি জানি না এসবের মানে কি,” ফার্স্ট সেক্রেটারি বললো। “কেবল আমার অর্ডারগুলো ছাড়া। ল্যান্সলেই’তে যোগাযোগের ব্যাপারে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং সব ধরনের ভেজালমুক্ত পথে ককলিন নামের একজন ভূতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। তার ব্যাপারে আমি শুনেছি : একটা বানচোত যে দশ-বারো বছর আগে ভিয়েতনামে নিজের একটা পা হারিয়েছে। সে কোম্পানির উপরে অদ্ভুত সব বোতাম চেপে গেছে। সে নিধনযজ্ঞের হাত থেকেও বেঁচে গেছে, সেই থেকে আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি, সে পথে পথে ঘুরে কাজ খুঁজে বেড়াক সেটা তারা চায় না। তার মুখ দিয়ে কিছু বের হোক সেটা তারা কোনোভাবেই চায় না।”

“এই বর্ন লোকটা আসলে কে ব’লে আপনি মনে করেন?” অ্যাটাশি জিজ্ঞেস করলো। “যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আট বছর ধরে আছি অথচ এরকম আকার-আকৃতিহীন ব্যক্তিকে শিকার করাটা আমি কক্ষনও দেখি নি।”

“কেউ এটা তীব্রভাবেই চাচ্ছে।” ফার্স্ট সেক্রেটারি উঠে দাঁড়ালো। “এসবের জন্যে ধন্যবাদ। আমি ডি.সি’কে বলবো কতো ভালোভাবে তুমি এটা সামলিয়েছো। আমার মনে হয় না সে তোমাকে কোনো ফোন নাম্বার দিয়েছে।”

“না, দেয় নি। সে পনেরো মিনিট পরে ফোন করতে চেয়েছিলো, তবে আমি তাড়াহুড়ার ভাব করেছি। আমি তাকে বলেছি আমাকে এক ঘণ্টা পরে ফোন করতে। তার মানে পাঁচটা বাজে, যাতে ক’রে আমরা ডিনার করার জন্যে এক দু’ ঘণ্টা সময় পাই।”

“তাকে হারানোর ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। আমি ককলিনকে গেম প্ল্যানটা করার সময় দেবো। সে এটা নিয়ন্ত্রণ করে। তার অনুমতি ছাড়া কেউ বর্নের ব্যাপারে কোনো কিছু করতে পারবে না।”

আলেকজান্ডার ককলিন ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত ল্যান্সলের নিজের রুমের ডেস্কে ব’সে আছে। প্যারিসের অ্যান্ডার্সন লোকটার ফোন শুনেছে। বুঝতে পারছে এটা ডেল্টা। মেডুসার উল্লেখটাই হলো তার প্রমাণ। ডেল্টা ছাড়া আর কোনো লোক এই নামটা

জানবে না। বানচোত! সে এক পরিত্যক্ত এজেন্টের সাথে খেলছে। তার ট্রেডস্টোন ফোনটা যথার্থ কোড রেসপন্ড করছে না—তারা যেই হোক না কেন—কারণ মৃত ব্যক্তি কথা বলতে পারে না। বানচোতটার শক্তিশালী নার্ভ খুবই বিস্ময়কর। আসলেই একটা বানচোত!

কনট্রোলদের খুন করো, আর খুনগুলো ব্যবহার করো শিকার-পর্বটার সমাপ্তি টানার কাজে। এটা এর আগে কতো মানুষই না করেছে, ভাবলো আলেকজান্ডার ককলিন। সেও করেছে। হুয়োং খে'র পার্বত্য অঞ্চলে একজন সোর্স-কনট্রোল আছে। সেই ম্যানিয়াকটা উন্মাদগ্রস্তের মতো সব অর্ডার দিয়ে মেডুসার এক ডজন সদস্যকে খুন করিয়ে ছিলো। ককলিন তখন একজন তরুণ ইন্টেলিজেন্স অফিসার, একটা উত্তর ভিয়েতনামি রাইফেল দিয়ে বেজ-ক্যাম্প কিলো'তে ক্যাম্পে ফিরে এসে দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছিলো ম্যানিয়াকটার মাথায়। শিকার-পর্বটা বাতিল করা হয়েছিলো। বেজ ক্যাম্প কিলো'তে কোনো কাঁচের টুকরোও পাওয়া যায় নি।

কাঁচের টুকরোগুলোতে একটা তর্কাতীত আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিলো, মেডুসার একজন অনিয়মিত রিক্রুটের। সেইরকম কাঁচের টুকরো পাওয়া গেছে সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রেট, কিন্তু খুনি এটা জানে না—ডেল্টা এটা জানে না।

“একটা সময় আমরা সিরিয়াসভাবেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছি, সে আসল কিনা,” ফার্স্ট সেক্রেটারি বললো। “একজন অভিজ্ঞ ফিল্ড অফিসার এটাশিকে বলেছিলো একটা ফ্ল্যাগ চেক করতে, কিন্তু সে সেটা করে নি।”

“একটা ভুল,” ককলিন জবাবে বললো ডেল্টা-কেইনের হিংস্র অধ্যায়ে আবার তার মন ফিরে গেলো। “ব্যবস্থাগুলো কি?”

“শুরুতে বর্ন চাচ্ছিলো পনেরো মিনিটের মধ্যে ফোন করতে, তবে আমি বুথের নিচের লেভেলে নির্দেশ দিয়েছি। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, আমরা ডিনারের সময়টা ব্যবহার করতে পারি...” অ্যাডমিসির লোকটা নিশ্চিত করতে চাইছে ওয়াশিংটনের একজন কোম্পানি এক্সিকিউটিভ যেনো বুঝতে পারে তার অবদানের যথার্থতা। ককলিন এর আগে অনেক ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনেছে।

ডেল্টা। সে কেন চোখ পাল্টালো? এই মানসিক অসুস্থতা তার মাথাটা চিবিয়ে খাবে, কেবল তার বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিটাই অবশিষ্ট রাখবে। সে অনেক দিন থেকেই এই কাজে জড়িত আছে। সে জানে আজ হোক কাল হোক তারা তাকে খুঁজে বের করবে, খুন করবে। আর কোনো বিকল্প নেই। যে মুহূর্তে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—অথবা ভেঙে পড়েছে, কিংবা যাই হোক না কেন—সেই মুহূর্ত থেকেই সে এটা জানে। পালিয়ে থাকার আর কোনো জায়গা নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে সে এখন একটা টার্গেট। সে কখনই জানতে পারবে না কোন্ লোকটা অঙ্ককার থেকে বের হয়ে তার জীবন সংহার করবে। এসবের মধ্যেই তারা বাস করে। সুতরাং আরেকটা সমাধান খুঁজে নিতে হবে : বেঁচে থাকা। কল্পিত কেইন হলো প্রথম ব্যক্তি যে

ভাতৃহত্যা করেছে। এই রূপকথার নামটা কি এরকম অশ্লীল সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে, একটা কৌশল হিসেবে? এটা কি এরকমই সহজ-সরল? ঈশ্বর জানে এটাই হলো যথার্থ সমাধান। তাদের সবাইকে খুন করো, তোমার ভাইকে খুন করো।

ওয়েব গেছে। সল্যাসী গেছে। ইয়াখটম্যান আর তার বউও...ডেল্টা যে নির্দেশ পেয়েছে সেটা কে অস্বীকার করতে পারে? সে মিলিয়ন ডলার সরিয়েছে, অর্ডার অনুযায়ী সেগুলো বন্টন করেছে। ব্লাইন্ড গ্রাহক, সে অনুমাণ করতে পারে সেটা সল্যাসীরই কৌশল ছিলো। সল্যাসীকে প্রশ্ন করার ডেল্টা কে? মেডুসার সৃষ্টিকর্তা, প্রতিভাবান সেই লোকটাই তো তাকে নিয়োগ দিয়েছিলো, সৃষ্টি করেছিলো তাকে। কেইনকে।

যথার্থ সমাধান। একেবারেই বোধগম্য। কেবল তার ভায়ের মৃত্যুরই প্রয়োজন ছিলো। কার্লোস ট্রেডস্টোনের ভেতরে অনুপ্রবেশ ক'রে সেটা ভেঙে ফেলেছে। গুপ্তঘাতক বিজয়ী হয়েছে। ট্রেডস্টোনকে পরিত্যক্ত করা হয়েছে। বানচোত!

“...তো স্বাভাবিকভাবেই আমি মনে করি পরিকল্পনাটা তোমার কাছ থেকে আসবে,” ফার্স্ট সেক্রেটারি এই কথাটা বলেই শেষ করলো। সে একটা গর্দভ, কিন্তু তাকে ককলিনের দরকার আছে। একটা সুর যখন বাজবে তখন আরেকটা সুর শোনা যাবে।

“তুমি ঠিক কাজটাই করেছো,” ল্যাস্গলের এক্সিকিউটিভ বললো। “আমি আমাদের এখানকার লোকজনকে জানিয়ে দেবো তুমি কতোটা ভালোভাবে সব সামলিয়েছো। তোমার কথাই একদম ঠিক। আমাদের সময় দরকার। তবে বর্ন সেটা বুঝতে পারে নি। আমরা তাকে বলবো না, এতে ক'রে এটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। আমরা একেবারে নিরাপদে আছি, আমি কি ঠিক বলছি?”

“অবশ্যই।”

“বর্ন খুব চাপের মধ্যে আছে। সে...দীর্ঘদিন...বন্দী ছিলো। আমি স্পষ্ট বোঝাতে পেরেছি?”

“সোভিয়েতদের হাতে?”

“লুবিয়ান্কায়। তার পালানোর অর্থ ছিলো ডাবল-এন্ট্রি। এই শব্দটার অর্থ কি তোমার কাছে পরিচিত?”

“হ্যাঁ। মস্কো ভাবছে সে এখন তাদের হয়ে কাজ করছে।”

“এটাই তারা ভাবে,” ককলিন একটু থামলো। “তবে আমরা নিশ্চিত নই। লুবিয়ান্কায় অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে।”

ফার্স্ট সেক্রেটারি মৃদু একটা শিস্ বাজালো। “এটাই হলো ফাঁদ। তুমি কিভাবে দৃঢ়প্রতীজ হবে?”

“আপনার সাহায্যে। কিন্তু গোপনীয়তার অগ্রাধিকারটা অ্যাগাসিরও উপরে।

এমনকি অ্যাম্বাসেডরদের স্তরেও । তুমি ঘটনাস্থলে আছো । তুমি দেখা করবে । তুমি শর্তটা গ্রহণ করতে পারো অথবা নাও পারো, সেটা তোমার উপরে নির্ভর করছে । যদি তুমি তা করো, আমার মনে হয় ওভাল অফিস থেকে একটা পুরস্কার পাবে ।”

ককলিন প্যারিসের লোকটার আশু ক’রে দম নেয়ার শব্দটা শুনতে পেলো ।

“আমার যা করার তা আমি করবো । নামটা বলুন ।”

“তুমি ইতিমধ্যেই সেটা বলেছো । আমরা তাকে ধরতে চাই । সে ফোন করলে তুমি নিজে কথা বোলো ।”

“স্বাভাবিকভাবেই,” অ্যাম্বাসির লোকটা বাঁধা দিয়ে বললো ।

“তাকে বোলো তুমি কোডগুলো রিলে ক’রে দিয়েছো । তাকে বলবে ওয়াশিংটন মিলিটারি ট্রান্সপোর্টের সাহায্যে একজন অফিসার অব রেকর্ড’কে ওখানে পাঠাবে । বলবে ডি.সি চাচ্ছে সে যেনো লোকচক্ষুর আড়ালে এবং অ্যাম্বাসি থেকে দূরে থাকে । সব রুটেই নজরদারী করা হবে । তারপর তাকে জিজ্ঞেস করবে সে কোনো প্রটেকশান চায় কিনা; যদি চায় তবে তাকে কোথেকে তুলতে হবে । তবে কাউকে পাঠিয়ে না । তুমি যখন আমার সাথে আবার কথা বলবে তখন আমি কাউকে ওখানে পাঠাবো । আমি তোমাকে একটা নাম দেবো তারপর তাকে তুমি একটা আই-স্পট দেবে ।”

“আই-স্পট?”

“দেখে চেনা যায় এমন কেউ ।”

“আপনার কোনো লোক?”

“হ্যা, আমরা মনে করি এটাই সবচাইতে ভালো পথ । তুমি ছাড়া অ্যাম্বাসিকে কোনোভাবেই জড়ানো হবে না । সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কথাই হোক না কেন সেটা রেকর্ড থাকবে না ।”

“আমি সেটা দেখবো,” ফার্স্ট সেক্রেটারি বললো । “সে একজন ডাবল-এন্ট্রি কিনা সেটা তার সাথে আমার একটা ফোনালাপ কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে?”

“কারণ একটা ফোনালাপ হবে না; এটা হবে দেশের কাছাকাছি ।”

“দশ?”

“ঠিক । আমাদের কথাগুলো তুমি বর্ণকে জানাবে—সে যেনো তোমাকে প্রতি একঘণ্টা পর পর ফোন ক’রে নিশ্চিত করে সে নিরাপদ কোনো জায়গায় আছে । ট্রেডস্টোনের অফিসার প্যারিসে পৌছে তার সঙ্গে দেখা করার আগপর্যন্ত তাকে এঁা করতে বলবে ।”

“তাতে কি হবে?” অ্যাম্বাসির লোকটা জানতে চাইলো ।

“সে জায়গা বদলাতে থাকবে...যদি সে আমাদের না হয়ে থাকে । প্যারিসে আধ ডজন সোভিয়েত ডিপ-কভার এজেন্ট রয়েছে । সবাই ফোনে যোগাযোগ করে ।

সে যদি মস্কোর সাথে কাজ ক'রে থাকে তবে ওগুলোর একটাকেই ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা নজর রাখবো। আর সেটা যদি ঘটে, আমার মনে হয় তুমি তোমার বাকি জীবন অ্যাম্বাসিতে কাটানোর কথা স্মরণ করেই কাটাবে। প্রেসিডেন্টের স্বীকৃতি কোনো মানুষের ক্যারিয়ারকে খুব উঁচু স্তরে নিয়ে যায়। অবশ্য, তোমার জন্যে অতো বেশি উচ্চপদ আর নেইও...”

“আছে, মি: ককলিন,” ফার্স্ট সেক্রেটারি বললো।

আলাপ শেষ হয়ে গেলো। অ্যাম্বাসির লোকটা বর্নের কাছ থেকে কিছু শোনার পর আবার ফোন করবে। ককলিন উঠে ঘরের এককোণে রাখা একটি ধূসর রঙের ফাইলিং ক্যাবিনেটের কাছে গেলো। উপ প্যানেলটা খুললো সে। ভেতরে একটা বন্ধ করা খাম আছে যাতে কিছু মানুষের নাম আর ঠিকানা রয়েছে, যাদেরকে খুব জরুরি প্রয়োজনে ফোন করার কথা। তারা এক সময় খুবই ভালো লোক ছিলো। কোনো এক কারণে তারা আর এখন ওয়াশিংটনের মাসোহারা পায় না। সব ক্ষেত্রে তাদেরকে অফিশিয়াল দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদেরকে অন্য পদ দেয়া হয়েছে নতুন পরিচয় দিয়ে—যারা অন্য ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে তাদেরকে বন্ধুপ্রতিম সরকারের সাহায্যে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। তারা বলতে গেলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারা সমাজচ্যুত মানুষ, যারা তাদের দেশের আইনের বাইরে চলে গিয়েছিলো, যারা প্রায়শই তাদের দেশের স্বার্থে খুনখারাবি করেছে। কিন্তু তাদের দেশ তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু স্বীকার করে না। তাদের ছদ্মবেশ প্রকাশিত হয়ে গেছে, তাদের কাজকর্ম সব ফাঁস হয়ে গেছে। এখনও তাদেরকে অনুরোধ করা যেতে পারে। কোনো রকম অফিশিয়াল নজরদারী ছাড়াই তাদের নির্দিষ্ট একাউন্টে টাকা পাঠানো হয়। এটা তাদের বেতন।

ককলিন ডেস্কে এসে খামটা ছিঁড়ে ফেললো। এটা আবার বন্ধ ক'রে সিলগালা করা হবে। প্যারিসে এক লোক আছে। সে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার কর্পস থেকে এসেছে। পয়ত্রিশ বছর বয়সে সে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলো। তার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। সে জাতীয় অগ্রাধিকারগুলো বোঝে। বারো বছর আগে সে একজন বামপন্থী ক্যামেরাম্যানকে খুন করেছিলো।

তিন মিনিট পরেই সে লোকটাকে ফোনে পেয়ে গেলো। ফোনটা তালিকায় নেই, রেকর্ডেও নেই। সাবেক অফিসার তাকে একটা নাম আর তার সরে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিলো।

“একজন ডাবল-এন্ট্রি?” প্যারিসের লোকটা জানতে চাইলো। “মস্কো?”

“না, সোভিয়েতদের নয়,” ককলিন জবাব দিলো। সচেতন আছে, যদি ডেল্টা প্রটেকশনের জন্যে অনুরোধ ক'রে থাকে তাহলে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে থাকবে।

“এটা কার্লোসকে ফাঁদে ফেলার একটি দীর্ঘমেয়াদী ডিপ-কভার।”

“গুপ্তঘাতক?”

“ঠিক।”

“আপনি হয়তো বলবেন এটা মস্কোর নয়, তবে আপনি আমাকে মানাতে পারবেন না। কার্লোস প্রশিক্ষণ নিয়েছে নভগোরোদ থেকে, আর আমি যতোটুকু জানি সে এখনও কেজিবি’র একটি নোংরা অস্ত্র।”

“হতে পারে। ডিটেইলগুলো বৃষ্টিংয়ের জন্যে নয়। তবে এটা বলা যায় আমাদের লোক বিক্রি হয়ে গেছে। সে কয়েক মিলিয়ন ডলার কামিয়ে একটা কাল্পনিক পাসপোর্ট চাচ্ছে।”

“তাহলে সে কন্ট্রোলগুলো নিয়ে নিয়েছে আর কার্লোসের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছে, যার কোনো অর্থই হয় না, কেবল তাকে আরেকটা খুনে প্ররোচিত করা ছাড়া।”

“সেটাই। আমরা এটা ব্যবহার করতে চাই, তাকে ভাবতে দাও, সে একেবারে মুক্ত। আমরা একটা নিয়োগ দিতে চাই, যে তথ্যই আমরা পাই না কেন, আমি ওখানে আসছি। তবে তাকে ঘায়েল করাটা প্রধান কাজ নয়। অনেক লোক অনেক জায়গায় আপোষ করেছে তাকে এ জায়গায় আনার জন্যে। তুমি কি সাহায্য করতে পারবে? করলে একটা বোনাস পাবে।”

“বেশ ভালো। বোনাসটা রেখে দিন, আমি তার মতো বানচোতাকে ঘৃণা করি। তারা পুরো নেটওয়ার্কটাকে ধ্বংস ক’রে দিয়েছে।”

“সে আমাদের সেরা একজন ছিলো। আমি সমর্থন দেবার কথা বলবো, কমপক্ষে একটি।”

“সেন গার্ডেই’তে আমার এক লোক আছে। তাকে ভাড়া করা যাবে।”

“ভাড়া করো তাকে। এই যে, এখানে সব তথ্য আছে। প্যারিসের কন্ট্রোলটা একজন অ্যান্ধাসি ব্লাইন্ড। সে কিছুই জানে না, তবে বর্নের সাথে তার যোগাযোগ আছে। সে হয়তো তার জন্যে প্রটেকশন চাইতে অনুরোধ করবে।”

“আমি সেটা দেবো,” সাবেক ইন্টেলিজেন্স অফিসার বললো। “এগিয়ে যাও।”

“এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু আর নেই। আমি এন্ড্রুজ থেকে একটা জেট নিয়ে নেবো। প্যারিসে আমার ই.টি.এ তোমার সময়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে হবে। আমি একঘণ্টার মধ্যেই বর্নকে চাই, যাতে তাকে আগামীকালের মধ্যে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসতে পারি। খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু এভাবেই এটা করতে হবে।”

“অ্যান্ধাসির ব্লাইন্ডটা হলো স্ময়ং ফার্স্ট সেক্রেটারি। তার নাম হলো...”

ককলিন বাকি তথ্যগুলো আর প্যারিসের দু’জন লোকের কনট্যাক্ট দিয়ে দিলো। কোডবদ্ধ শব্দগুলো সিআইএ’র লোকটাকে বলে দেবে কোনো সমস্যা থাকুক আর

নাই থাকুক তারা কখন কথা বলবে। ককলিন ফোনটা রেখে দিলো। সব কিছুই এগোচ্ছে যেমনটি ডেল্টা আশা করছে সেভাবে। ট্রেডস্টোনের উত্তরাধিকারীরা তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে। তাতে একেবারে নির্দিষ্ট ক'রে বলা আছে কোথায় কৌশলগুলো নস্যাত্ন হয়ে যাবে। আর কৌশলগুলোই চিন্তার বিষয়। সেগুলো উধাও হয়ে যাবে। ঝেড়ে ফেলা হবে। কোনো অফিশিয়াল যোগাযোগ অথবা অনুমোদন থাকবে না। ব্যর্থ কৌশল আর কৌশল প্রণেতারা ওয়াশিংটনের জন্যে বিব্রতকর। ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান শুরু থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি এবং কিছু বিদেশী সরকারকে ব্যবহার আর অপব্যবহার করেছে। ট্রেডস্টোনের কোনো বেঁচে যাওয়া লোক বিশাল একটা সমস্যা বয়ে আনবে।

ডেল্টা এসব কিছুই জানে, আর যেহেতু সে নিজে ট্রেডস্টোনকে ধ্বংস করেছে, সে পূর্ব সতর্কতাগুলো সাধুবাদ জানাবে। আলেকজান্ডার ককলিন সবই মনোযোগ দিয়ে শুনলো। চেষ্টা করলো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার রূপরেখাটা কিরকম হবে সেটা ভাবতে। কিন্তু সে জানে, সে কোনোটাই শুনবে না। তার সাথে মুখোমুখি হলে ডেল্টা ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ফার্স্ট-এ ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে কিছু জানে না ব'লে ভান করবে। কিন্তু ওখানে পাওয়া ভাঙা কাঁচের টুকরোতে আঙুলের ছাপ আছে। এমনসব আঙুলের ছাপ যা ছবির চেয়েও বেশি অকাটা। সেগুলো জাল করবার কোনো সুযোগ নেই।

ককলিন ডেল্টাকে দুই মিনিট সময় দেবে কথা বলার জন্যে। সে শুনবে, তারপর টুগার টিপে দেবে।

অধ্যায় ৩২

“তারা কেন এটা করছে?” জেসন জানতে চাইলো। জনাকীর্ণ এক ক্যাফেতে মেরির পাশে ব’সে আছে সে। পাঁচ ঘণ্টা আগে অ্যাম্বাসিতে প্রথম ফোন করার পর পঞ্চমবারের মতো ফোন করেছে। “তারা আমাকে দৌড়ের উপর রাখতে চায়। তারা আমাকে বাধ্য করছে দৌড়ের উপর রাখতে। আমি জানি না কেন?”

“তুমি নিজেই নিজেকে বাধ্য করছো,” মেরি বললো। “তুমি ফোনটা হোটেল রুম থেকেই করতে পারতে।”

“না, আমি পারতাম না। কোনো একটা কারণে তারা চায় আমি সেটা জানি। যখনই আমি ফোন করি বানচোতটা আমাকের জিজ্ঞেস করে আমি কোথায় আছি এখন, আমি কি ‘নিরাপদ জায়গায়’ আছি? হাস্যকর শব্দ, ‘নিরাপদ জায়গা।’ কিন্তু সে অন্য কিছু বলছিলো। সে আমাকে বলছিলো, আমি যেনো প্রতিটি ফোন ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে করি যাতে ক’রে ভেতরে কিংবা বাইরের কেউ আমাকে ট্রেস করতে না পারে। তারা আমাকে কাস্টডিতে দেখতে চায় না। তারা আমাকে চায়, তবে তারা আমাকে ভয়ও পাচ্ছে। এটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না!”

“এটা কি সম্ভব যে, তুমি এইসব কল্পনা করছো? কেউ আসলে এরকম কিছু বলে নি।”

“না, তা নয়। তারা কেন আমাকে অ্যাম্বাসিতে যেতে বলছে না? মানে অর্ডার করছে না। সেখানে আমাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। সেটা তো আমেরিকার নিজস্ব এলাকা। কিন্তু তারা সেটা বলে নি।”

“পথেঘাটে নজরদারী করা হচ্ছে, এটা তো তোমাকে বলা হয়েছে।

“আমি সেটা মেনে নিয়েছিলাম—অন্ধের মতো—কিন্তু ত্রিশ সেকেন্ড আগে সেটা মনে পড়ার আগপর্যন্ত। কারা? কারা পথেঘাটে নজরদারী করছে?”

“অবশ্যই কার্লোস। তার লোকেরা।”

“সেটা তুমি জানো, আমি জানি—আমরা সেটা অনুমান করতে পারি—কিন্তু তারা তো সেটা জানে না। আমি হয়তো জানি না আমি কে, কোথেকে এসেছি, কিন্তু বিগত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমি জানি আমার মধ্যে কি হচ্ছে। তারা তো সেটা জানে না।”

“তারাও তো অনুমান করতে পারে, পারে না? তারা হয়তো গাড়িতে ক’রে অথবা আশেপাশে ঘুরঘুর করছে এরকম কিছু অজানা-অচেনা লোককে চিহ্নিত করেছে।”

“কার্লোস এসব ব্যাপারে অনেক প্রতিভাবান। একটি নির্দিষ্ট গাড়ি দ্রুত অ্যাডমিসিতে ঢোকার অনেক পথ রয়েছে। মেরিন কনটিনজেন্টদের এরকম ট্রেনিং দেয়া থাকে।”

“আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।”

“কিন্তু তারা সেটা করছে না; এমনকি এরকম কিছু করার কথাও বলে নি। তার বদলে তারা আমার সাথে খেলছে, আমাকে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু কেন?”

“এটা তুমি নিজেই বলেছো, জেসন। ছয় মাস ধরে তারা তোমার কোনো খোঁজ পায় নি। তারা সেজন্যে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করছে।”

“এভাবে কেন? তারা আমাকে অ্যাডমিসির ভেতরে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তারা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা আমাকে কারো কাছে দিয়ে দিতে পারে, একটা সেলে ভরে রাখতে পারে। কিন্তু তারা সেটা না করে আমাকে স্পর্শ করতে চাচ্ছে না। আবার আমাকে হাতছাড়া করতেও চাচ্ছে না।”

“তারা ওয়াশিংটন থেকে একজন লোকের আসার জন্যে অপেক্ষা করছে।”

“অ্যাডমিসির ভেতরের চেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করার আর কি কোনো ভালো জায়গা আছে?” বর্ন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। “কিছু একটা সমস্যা আছে। চলো এখান থেকে বের হয়ে যাই।”

আটলান্টিক মহাসাগর পেরোতে ট্রেডস্টোনের উত্তরাধিকারী আলেকজান্ডার ককলিনের ঠিক চার ঘণ্টা বারো মিনিট সময় লাগলো। ফিরে যাবার জন্যে সে প্যারিস থেকে কনকর্ডে ক’রে ওয়াশিংটনের ডালেস বিমানবন্দরে পৌছাতে পারবে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে, আর সেখান থেকে ল্যাঙ্গলে’তে পৌছে যাবে ৯টা বাজে। এই সময়ের মধ্যে কেউ যদি তাকে ফোন ক’রে খোঁজ করে তবে পেন্টাগনের একজন মেজর ককলিন পরিচয় দিয়ে জবাব দেবে। আর প্যারিস অ্যাডমিসির ফার্স্ট সেক্রেটারিকে বলা হবে সে যদি ল্যাঙ্গলের লোকটার সাথে ফোনে কথাটা বলাটা কাকাপক্ষীকেও জানায় তবে তাকে ডিমোশন দিয়ে তিয়েরা দেল ফুয়েগো’তে পোস্টিং দিয়ে দেয়া হবে। এটার একদম নিশ্চিত।

ককলিন সারসরি একসারি পে-ফোনের দিকে গিয়ে অ্যাডমিসিতে একটা ফোন করলো।

“সবই শিডিউল মোতাবেক করা হয়েছে, ককলিন,” অ্যাডমিসির লোকটা বললো। “বর্ন খুব উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে শেষবার যখন কথা হচ্ছিলো সে বার বার বলছিলো তাকে কেন অ্যাডমিসির ভেতরে আসতে বলা হচ্ছে না।”

“তাই নাকি?” প্রথমে ককলিন খুব অবাক হলেও পরে বুঝতে পারলো। ডেল্টা এমন ভান করছে যেনো সে সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রিটের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাকে যদি অ্যাডমিসিতে আসতে বলা হতো তবে সে পালিয়ে যেতো। সে এটা

ভালো করেই জানে। এখানে অফিশিয়াল কোনো কানেকশান থাকতে পারে না। ট্রেডস্টোন একটি অবমাননাকর আর ঘৃণ্য কৌশল, বড়সড় একটি বিব্রতকর ব্যাপার। “তুমি কি তাকে বলেছো, পথঘাটে নজরদারি করা হচ্ছে?”

“অবশ্যই। তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তারা কারা। আপনি ভাবতে পারেন?”

“পারি। তুমি কি বললে?”

“বললাম, আমি যতোটুকু জানি সেও ততোটুকু জানে। আর সবদিক বিবেচনা ক’রে মনে হচ্ছে এসব নিয়ে ফোনে কথা বলাটা ঠিক হবে না।”

“বেশ ভালো।”

“আমিও তাই মনে করি।”

“তখন সে কি বললো? সে কি এটা মেনে নিয়েছে?”

“হ্যা, অদ্ভুতভাবে। সে বলেছে, ‘আচ্ছা’। এই।”

“সে কি তার মত বদলেছে, প্রটেকশানের জন্যে অনুরোধ করেছে?”

“সে এটা অস্বীকার ক’রে আসছে। এমনকি আমি চাপাচাপি করার পরও।” ফার্স্ট সেক্রেটারি একটু থামলো।

“সে চায় না তাকে নজরদারি করা হোক, তাই না?” আস্তে ক’রে বললো সে।

“না, সে চায় না। তার পরের ফোনটা কখন আশা করছো?”

“পনেরো মিনিটের মধ্যে।”

“তাকে বোলো ট্রেডস্টোনের অফিসার এসে পৌছেছেন।” ককলিন পকেট থেকে ম্যাপটা বের করলো। রুটটা নীল রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। “তাকে বলবে সাক্ষাৎটা হবে দেড়টা বাজে, ভার্জেই থেকে সাত মাইল দক্ষিণে শেভরুইয়ে এবং র্যামবোয়া সড়কের মাঝামাঝি সিমেন্টিয়ে দ্য নেবলে’তে।”

“দেড়টা বাজে...গোরস্থানে। সে কি জানে ওখানে কিভাবে যেতে হবে?”

“ওখানে সে এর আগেও গিয়েছে। সে যদি বলে সে একটা ট্যাক্সিতে ক’রে যাবে, তবে তাকে বলবে স্বাভাবিক সতর্কতাগুলো যেনো অবলম্বন করে। ট্যাক্সিটা যেনো ছেড়ে দেয়।”

“সেটা কি অদ্ভুত দেখাবে না? মানে, ড্রাইভারের কাছে। শোক করার জন্যে সময়টা তো অদ্ভুত।”

“আমি তোমাকে বলছি সেটা ‘তাকে বলবে’। অবশ্যই সে একটা ট্যাক্সি নেবে।”

“তাতো ঠিকই,” ফার্স্ট সেক্রেটারি বললো সঙ্গে সঙ্গে। “যেহেতু আমি আপনার এখানকার লোককে ফোন করি নি, আমি কি তাকে ফোন ক’রে জানিয়ে দেবো আপনি এসে পৌছেছেন?”

“সেটা আমি দেখবো। তোমার কাছে কি তার নামারটা আছে?”

“হ্যা, অবশ্যই।”

“পুড়িয়ে ফেলো সেটা,” ককলিন আদেশের সুরে বললো। “ওটা তোমাকে পুড়িয়ে ফেলার আগেই। আমি তোমাকে বিশ মিনিট পরে ফোন করছি।”

একটা মেট্রো ট্রেন নিচের লেভেল দিয়ে ছুটে চললে কম্পনটা পুরো প্লাটফর্মে টের পাওয়া যাচ্ছে। বর্ন পে-ফোনের ফোনটা রেখে সেটার দিকে চেয়ে রইলো। তার মনের গভীরে, বহু দূরে আরেকটা দরজা খুলে গেছে। দেখা যাচ্ছে কিছু ইমেজ। র‍্যামবোয়ার পথে...একটা লোহার খিলানযুক্ত দরজা...নিরিবিল এক গোরস্থান। কিন্তু জায়গাটা গোরস্থানের চেয়েও বেশি কিছু। এমন একটি জায়গা যেখানে মৃতদের মাঝে, নিরব নিখর কবরের পাশেই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর সব লোকজনের মতোই দু'জন মানুষ শোকের পোশাক পরে এসেছে। শোকসন্তপ্ত লোকজনের ভীড় ঠেলে তারা মুখোমুখি হয়ে নিজেদের মধ্যে যে কথা বলার দরকার ছিলো সেটা বললো। একটা মুখ, কিন্তু ঝাঁপসা, ফোকাসের বাইরে। সে কেবল চোখ দুটো দেখতে পেলো। সেই চোখ দুটো আর আর ঝাঁপসা মুখের লোকটার একটা নাম আছে। ডেভিড...অ্যাবোট। সল্ল্যাসী। যে লোকটাকে সে জানে কিন্তু চেনে না। মেডুসা আর কেইনের সৃষ্টিকর্তা।

জেসন বার কয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ দুটো পিট পিট ক'রে তাকালো যেনো চারপাশে আচমকা কোনো কুয়াশা সরিয়ে দিচ্ছে। সে তার থেকে পনেরো ফিট দূরে একটা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেরির দিকে তাকালো, চারপাশে কেউ জেসনকে নজরদারী করছে কিনা সেটা দেখার কথা তার। কিন্তু না, সে দেখছে না। সে দেখছে জেসনকে। তার চোখেমুখে দৃষ্টিস্তার ছাপ। বর্ন তার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো। সময়টা তার জন্যে খুব একটা খারাপ নয়। বরং তার মাথায় কতোগুলো ইমেজ আসছে। এই গোরস্থানে সে আগেও এসেছিলো ব'লে তার মনে হচ্ছে। সে মেরিরর কাছে গেলো। সামনে আসতেই সে ঘুরে জেসনের পাশাপাশি হাটতে হাটতে বের হবার পথের দিকে পা বাড়ালো।

“সে এখানে এসেছে,” বললো বর্ন। “ট্রেডস্টোন এসে গেছে। আমি তার সঙ্গে র‍্যামবোয়ায় দেখা করবো। গোরস্থানে।”

“এটা তো ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হচ্ছে। গোরস্থানে কেন?”

“আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে মনে হয়।”

“বলে কি, কিভাবে?”

“এখানে আমি এর আগেও এসেছি। লোকজনের সাথে দেখা করেছি...এই জায়গায় দেখা করতে বলার মধ্য দিয়ে ট্রেডস্টোন আমাকে বোঝাতে চেয়েছে সে আসল।”

মেরি তার হাতটা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। “আমি তোমার সাথে যেতে চাই।”

“দুঃখিত ।”

“তুমি আমাকে বাদ দিতে পারো না!”

“কিন্তু সেটাই আমাকে করতে হবে । কারণ আমি জানি না ওখানে গিয়ে আমি কি খুঁজে পাবো । আর সেটা যদি আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয় তবে আমি চাইবো কেউ আমার পাশে থাকুক ।”

“ডার্লিং, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না! পুলিশ আমাকেও খুঁজছে । তারা যদি আমাকে খুঁজে পায় তবে পরের প্লেনেই আমাকে জুরিখে পাঠিয়ে দেবে । তুমিই এ কথা বলেছো । আমি জুরিখে গেলে তোমার কি লাভ হবে?”

“তুমি না । ভিলিয়ার্স । সে আমাদেরকে বিশ্বাস করে । আমি যদি সকালের মধ্যে ফিরে না আসি অথবা তোমাকে ফোন না করি তবে তুমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে । সে অনেক হাউকাউ করতে পারবে । সে-ই আমাদের একমাত্র ব্যকআপ । আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তার বউকে তার মাধ্যমেই ধরা যাবে ।”

মেরি মাথা নেড়ে সায় দিলো, যুক্তিটা মনে নিলো সে । “তুমি র‍্যামবোয়াঁতে যাবে কিভাবে?”

“আমাদের একটা গাড়ি আছে, মনে নেই? আমি তোমাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে গ্যারাজের দিকে যাবো ।”

সে মঁতমার্বের গ্যারাজ কমপ্লেক্সের লিফটে ঢুকলো । তার মন প’ড়ে রইলো গোরস্থানে । একটার মধ্যে সে ওখানে পৌছে যাবে । আধঘণ্টা হেটে যাবে আর একজোড়া হেডলাইট অথবা কোনো সিগনালের জন্যে অপেক্ষা করবে । তাহলে অন্য অনেক কিছু তার মনে আসবে ।

লিফটের দরজাটা খুলে গেলো । ফ্লোরটার তিন চতুর্থাংশ গাড়িতে পূর্ণ, বাকিটা ফাঁকা । জেসন তার রেনল্টটা কোথায় পার্ক করেছে মনে করার চেষ্টা করলো । মনে পড়লো, শেষ মাথায় এককোণে রেখেছিলো । কিন্তু ডান না বাম, কোন্ দিকে? সে দ্বিধাগ্রস্তভাবেই বাম দিকে এগোলো । কয়েকদিন আগে যখন গাড়িটা রেখেছিলো তখন লিফটের বাম দিকেই রেখেছিলো । সে থেমে গেলো । তার মধ্যে যুক্তি ফিরে এসেছে । ঢোকার সময় লিফটটা তার বাম দিকে ছিলো, বের হবার সময় নয় । তাহলে ডান দিকেই যেতে হবে । সে ঘুরে গেলো ।

হয় খুব আচম্কা দিক পরিবর্তন অথবা অনভিজ্ঞ নজরদারির জন্যে বর্নের জীবনটা বেঁচে গেলো । তার ডান দিক থেকে একটা গাড়ির ভেতর থেকে এক লোক উঁকি দিলো । এই লোকটা তাকে নজরদারী করছিলো । জেসন নতুন এই পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আরো দ্রুত হাটেতে গুরু করলো । এই লোকটা কে? সে তাকে কিভাবে খুঁজে পেলো? তারপরই জবাটা পরিষ্কার হলো তার কাছে । নিজেকে তার খুব বোকা বলে মনে হলো । অবার্জ দু কোয়েঁর ক্লার্ক ভদ্রলোকটি ।

কার্লোস খুবই মেথডিক্যাল—যেমনটি সে সব সময় থাকে—ব্যর্থতার প্রতিটি খুঁটিনাটি সে পরীক্ষা ক’রে দেখে। আর সেই ব্যর্থতার সময় একজন ছিলো, সেই ক্লার্কটি। এরকম একজন লোকের কাছ থেকে তথ্য আদায় করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। একটা ছুরি অথবা অস্ত্র দেখালেই যথেষ্ট।

এখন কথা হলো কতোক্ষণ ধরে তারা এই জায়গাটা নজরদারি করছে? কতোজন লোক নিয়োজিত আছে এ কাজে? ভেতরে এবং বাইরে? বাকিরা কতোক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে? কার্লোসও কি আসবে?

এসব প্রশ্ন করাটা এখন গৌণ ব্যাপার। তাকে এক্ষুণি সরে যেতে হবে। গাড়ি ছাড়াও সে সরতে পারবে হয়তো, কিন্তু তাতে ক’রে সমস্যাও হবে। হয়তো অপ্রত্যাশিত কোনো প্রয়োজনে গাড়িটা তার ভীষণ দরকার হয়ে যেতে পারে। তার গাড়ির দরকার রয়েছে, আর সেটা এক্ষুণি। রাত একটা বাজে কোনো ট্যাক্সি তাকে নিরিবিলা গোরস্থানে নিয়ে যেতে রাজি হবে না। রাস্তা থেকে একটা গাড়ি চুরি করার মতো সময়ও তার নেই।

সে থেমে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের ক’রে দেয়াশলাই দিয়ে জ্বালাতে লাগলো। জ্বালানোর সময় ঘাড়টা একটু কাত ক’রে চোখের কোণ দিয়ে একটা ছায়া দেখতে পেলো—ছোটোখাটো, গাট্টাগোট্টা ধরণের এক লোক। সে এখন কাছের একটা গাড়ির পেছনে আছে, লোকটা তার মাথাটা একটু সরিয়ে রাখলো যেনো সে অন্য কিছু খুঁজছে।

জেসন চোখের পলকে নিচু হয়ে বাম দিকে দুটো গাড়ির মাঝখানে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো। হামাগুঁড়ি দিয়ে সে গাড়ি দুটোর মাঝখানে, আরো ভেতরে চলে গেলো এমনভাবে যেনো কোনো মাকড়শা তার জালে চলাফেরা করছে। এখন সে লোকটার ঠিক পেছনে চলে এসেছে। সে একটা গাড়ির হেডলাইটের নিচ দিয়ে উঁকি মারলো। লোকটা সোজা দাঁড়িয়ে আছে। খুব অবাক হয়েছে বোঝা গেলো। আশ্চর্যে আশ্চর্য সে তার রেনল্ট গাড়িটার কাছে চলে এলো। উইন্ডশিল্ডের পেছন থেকে আবারো লোকটার দিকে তাকালো। কিন্তু সে যা দেখতে পেলো সেটা তাকে আরো ভড়কে দিলো। কেউ নেই সেখানে। তার সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে। সে বুঝতে পারলো, কিন্তু পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করলো না। লোকটা রেনল্টের ড্রাইভারকে কিছু বললো, বিপদটা ব্যাখ্যা ক’রে এক্সিট র‍্যাম্প দিয়ে বের হয়ে যেতে লাগলো।

এখন। জেসন উঠে দৌড়াতে লাগলো। লোকটার পিছু নিলো। তাকে ধরতে হবে। পেছন থেকে লোকটার ঘাড়ের প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালালে সে মেঝেতে পড়ে গেলো। জেসন তার বাম হাতের আঙুল দিয়ে লোকটার দু’চোখ চেপে ধরলো।

“তুমি ঠিক পাঁচ সেকেন্ড সময় পাবে বলার জন্যে। বাইরে কে আছে।” সে কথাটা ফরাসিতে বললো। “বলো! এক্ষুণি!”

“একজন লোক, একজনই!”

জেসন চোখে চাপ দিলো আঙুল দিয়ে। “কোথায়?”

“একটা গাড়িতে। রাস্তার ওপারে পার্ক করা আছে। হায় ঈশ্বর, তুমি দেখছি আমার চোখ গেলে দেবে!”

“এখনও তা করছি না। তবে কথা না শুনলে তাই করবো। গাড়িটা কোন্ ধরনের?”

“বিদেশী। আমি চিনি না। মনে হয় ইতালিয়ান। অথবা আমেরিকান। আমি জানি না। প্রিজ! আমার চোখ!”

“রঙটা কি?”

“কালো! সবুজ, নীল, খুবই গাঢ়। ওহ ঈশ্বর!”

“তুমি কার্লোসের লোক, তাই না?”

“কে?”

জেসন আবাবো জোরে চাপ দিলো। “তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না—তোমাকে কার্লোস পাঠিয়েছে!”

“আরে আমি কোনো কার্লোসকে চিনি না। আমরা একটা লোককে ফোন করি, এই যে তার নাম্বার। এছাড়া আর কিছু আমরা জানি না।”

“তাকে কি ফোন করা হয়েছে?” লোকটা কোনো জবাব দিলো না। বর্ন আবাবো জোরে তার চোখে চাপ দিলো। “বলো আমাকে!”

“হ্যা। আমাকে করতে হয়েছে।”

“কখন?”

“কয়েক মিনিট আগে। দ্বিতীয় র‍্যাম্পের কয়েন ফোন থেকে। হায় ঈশ্বর! আমি তো কিছুই দেখতে পারছি না।”

“ওঠো!” জেসন লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড় করালো। “গাড়িটার দিকে যাও। জলদি!” বর্ন তাকে পেছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে রেনন্টের দিকে নিয়ে গেলো। লোকটা ঘুরে কিছু বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু বর্ন শুনলো না। “আমার কথা বোঝো নি। জলদি!” চিৎকার ক’রে বললো সে।

“আমি কেবল কয়েক ফ্রাঁ কামানোর জন্যে এটা করছিলাম।”

“এখন তুমি তাদের জন্যে গাড়ি চালাবে।” বর্ন তাকে আবাবো রেনন্টের দিকে ধাক্কা মারলো।

কয়েক মিনিট পরে ছোট্ট কালো গাড়িটা এক্সিট র‍্যাম্প দিয়ে কাঁচের বুথের সামনে এসে পড়লো। একজন রেজিস্টারই আছে সেখানে। জেসন পেছনের সিটে ব’সে আছে, তার হাতের অঙ্গুষ্ঠা সামনের ড্রাইভারের আসনে বসা লোকটার ঘাড়ের তাক করা। বর্ন জানালা দিয়ে টিকেটটা বের ক’রে দিলে রেজিস্টার সেটা নিয়ে নিলো।

“চালাও!” বর্ন বললো। “আমি যা বলবো ঠিক তাই করবে!”

লোকটা এক্সেলেটরে চাপ দিলে গাড়িটা ছুটে চললো। পথে নেমেই লোকটা আচম্কা ইউ-টার্ন নিলে টায়ারের কর্কশ শব্দ হলো। তাদের সামনে একটা গভীর

সবুজ রঙের শেভলে গাড়ি পড়তে তাদের গাড়িটা থেমে গেলো। তাদের পেছনে অন্য একটা গাড়ির পেছনের দরজা খুলে গেলে পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

“জুলস্? কুয়ে সে পাসে তিল? সেস্ত তোয়ে কুয়ে কদুয়া?” খোলা জানালা দিয়ে এক লোক উঁকি মারলো।

বর্ন সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ বরাবর পিস্তলটা তুলে ধরলো। “দু’পা পিছিয়ে যাও,” ফরাসিতে বললো সে। “বেশি নয়, কেবল দু’পা। এবার সোজা দাঁড়িয়ে থাকো।” সে জুলস্ নামের লোকটার মাথায় টোকা মারলো।

“বের হও, আস্তে আস্তে।”

“আমরা কেবল তোমাকে অনুসরণ করছিলাম,” গাড়ি থেকে নামতে নামতে জুলস্ বললো। “আর তোমার অবস্থানের ব্যাপারে রিপোর্ট করছিলাম।”

“তুমি তারচেয়েও ভালো কিছু করবে এখন,” বর্ন বললো, প্যারিসের ম্যাপটা নিয়ে রেনল্ট থেকে বের হয়ে গেলো সে। “তুমি আমাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে, তোমরা দু’জনেই!”

প্যারিস থেকে পাঁচ মাইল দূরে, শেফ্রজে রাস্তার উপর দু’জন লোককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়া হলো। বেশ অন্ধকার, আলো নেই বললেই চলে। তৃতীয় শ্রেণীর হাইওয়ে। কোনো দোকানপাট, ভবন আর বাড়িঘর নেই। পেছনের তিন মাইলের মধ্যে কোনো ফোনবুথও দেখা যাচ্ছে না।

“কোন নাম্বারে তোমাকে ফোন করতে বলা হয়?” জেসন জানতে চাইলো। “মিথ্যে বলো না। তোমার খুবই মারাত্মক সমস্যা হবে।”

জুলস্ তাকে নাম্বারটা দিয়ে দিলো। বর্ন মাথা নেড়ে সাই দিয়ে শেভলের ড্রাইভিং সিটে ব’সে পড়লো।

জীর্ণ ওভার কোট পরা বৃদ্ধলোকটি ফাঁকা বুথে টেলিফোনটার পাশে ব’সে আছে। ছোট্ট রেস্টোরাঁটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে সে আছে কারণ তার পুরনো দিনের এক বন্ধু এটির মালিক। ফোনটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবছে কখন এটা বাজবে। খালি সময়ের ব্যাপার। আর যখন এটা বাজবে তখন সে আরেকটা ফোন করবে, সেই ফোন কলটার জন্যে তার সুদিন আবার ফিরে আসবে। স্থায়ী হবে সেটা। সে হবে প্যারিসে কার্লোসের একমাত্র লোক। এই কথাটা ফিস্ফাস্ শোনা যাবে, সবাই তাকে আবার সম্মান করবে।

সশব্দে ফোনটার রিং বেজে উঠলে বৃদ্ধ খুশিতে অনেকটা নেচে উঠলো। এটা হলো একটা সিগনাল। কেইনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়া হয়েছে! ফোনটা সে তুলে নিলো।

“হ্যা?”

“জুলস্ বলছি!” দমবন্ধ হওয়া কণ্ঠটা চিৎকার ক’রে বললো।

বৃদ্ধলোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তার হৃদস্পন্দন এতোটাই বেড়ে গেলো যে, ভয়ঙ্কর কথাগুলো ঠিকমতো শুনতেই পেলো না। তবে কথাটা সে বুঝেছে।

সে একজন মৃত মানুষ।

চারদিকে সাদা আলোর ঝলকানি দেখতে পেলো সে। কোনো বাতাস নেই। ভো ভো শব্দ হতে লাগলো দু'কানে। ভিক্ষুক মেঝেতে যেনো ডুবে গেলো। ফোনটা সে এখনও ধরে আছে। ফোনের দিকে হা ক'রে চেয়ে রইলো সে। এখন সে কি করতে পারবে? সে এখন কি করবে?

বর্ন হাটছে। নিজের মনকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিয়েছে সে। পোর্ত নোয়ের ডাক্তার ওয়াশবার্ন এরকমটিই করতে বলেছিলো তাকে। ট্রেডস্টোনের লোকটি বেশ ভালোমতোই সেটা টের পাবে। সে কোনো চুক্তি ভঙ্গ করে নি। বিশ্বাসঘাতকতাও করে নি, অথবা পালিয়ে যায় নি...অসমর্থ ছিলো সে; এটা এরকমই সহজ আর সরল।

তাকে ট্রেডস্টোনের লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। সে তার কাছ থেকে কি আশা করছে? জেসন একটা বাজার বেশ আগেই গোরস্থানে পৌঁছে গেলো। রেনল্টের চেয়ে শেভ্রলে গাড়িটা অনেক বেশি দ্রুত গতির ছিলো। প্রধান দরজাটা পেরিয়ে সে আরো একশো গজ ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর রাস্তার একপাশে গাড়িটা নামিয়ে রেখে দিলো যাতে কারোর নজরে না পড়ে। দরজার কাছে ফিরে যাবার সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। খুবই ঠাণ্ড বৃষ্টি। এটাকেই বলে মার্চের বৃষ্টি। শান্ত বৃষ্টি নিরবতায় খুব একটা বিদ্য ঘটালো না।

অনেকগুলো কবর আর চারপাশে লোহার নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। মাঝখানে একটা আট ফিট উঁচু সৌধ আছে। সেটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। এখানে কি সে এর আগে এসেছিলো? তার মনের আরেকটা দরজা কি খুলে গেলো? নাকি সে নিজেই মরিয়া হয়ে এরকম কিছু খুঁজছে? এরপরই সেটা তার মনে পড়লো। এটা কবরগুলো, রেলিংটা কিংবা সৌধটার জন্যে নয়। বরং বৃষ্টিটা। হঠাৎ ক'রে নামা বৃষ্টি। কালো পোশাক পরা একদল শোকগ্রস্ত মানুষ একটা কবরকে কেন্দ্র ক'রে জড়ো হয়েছে। অনেকগুলো হাতা তোলা হয়েছে। মৃদু গুঞ্জন হচ্ছে। পকেট থেকে পকেটে, হাতে হাতে একটা লম্বা বাদামী খাম বদল হলো শোকগ্রস্ত লোকগুলোর অগোচরেই।

আরো কিছু আছে। একটা ছবি আরেকটা ছবিকে উস্কে দিচ্ছে। হালকা বৃষ্টি পড়ছে।

পাহাড়ের অন্য দিকে। গেটের কাছাকাছি একটা শ্বেতস্তম্ভ সমাধি। কেউ হয়তো এটাকে পার্থেনন-এর ক্ষুদ্র সংস্করণ ব'লে ভাবতে পারে। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে সে এটা অতিক্রম ক'রে এসেছে। চোখে পড়েছে, কিন্তু ভালো ক'রে দেখে নি।

ঐখানেই আচম্কা বৃষ্টিটা নেমেছিলো। যেখানে দুটো ছাতার নিচে একটা খাম বদল করা হয়েছিলো। সে তার হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো। একটা বেজে চৌদ্দ মিনিট বেজে গেছে। সে পথের দিকে ফিরে গেলো। এখনও সময় আছে। একটা গাড়ির হেডলাইট দেখার জন্যে আরো কিছু সময় রয়ে গেছে...একটা দেয়াশলাই জ্বালানো, অথবা...

একটা টর্চের আলো দেখা গেলো। পাহাড়ের নিচে। আর সেটা উপরে নিচে দুলছে। আবার পরক্ষণেই আলোর রশ্মিটা গেটের উপর এসে পড়ছে। যেনো টর্চ ধরা লোকটা জানে কেউ এসেছে। বর্ন প্রায় দৌড়ে গিয়ে চিৎকার ক'রে বলতে চাচ্ছিলো; আমি এখানে! এই যে আমি। আমি আপনার মেসেজটার অর্থ বুঝেছি। আমি ফিরে এসেছি! অনেক কথা বলার আছে আমার...আর আপনারও আমাকে অনেক কিছু বলার রয়েছে!

কিন্তু সে দৌড়ালোও না, চিৎকারও করলো না। বরং বেশ নিয়ন্ত্রণে রাখলো নিজেকে। তাকে খুব স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। হালকা বৃষ্টির মধ্যেই সে পাহাড়ের দিকে হেটে গেলো।

টর্চের আলোটা। পাঁচশো ফিট নিচে টর্চের আলোটাতে একটু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। সেটা একটু উপরে নিচে দুলছে যেনো টর্চটা ধরে রাখা লোকটা আরেকজনকে কিছু বোঝাচ্ছে।

তাকে। জেসন নিচু হয়ে গেলো। বৃষ্টির মধ্যেই দেখানোর চেষ্টা করলো। সে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। তার চোখ টর্চের আলোটার দিকে। এখন সে আরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সে থেমে গিয়ে মনোসংযোগ করলো। দু'জন লোক আছে। একজন টর্চটা ধরে রেখেছে, অন্যজন ছোটো ব্যারেলের একটা রাইফেল ধরে আছে। বর্নের কাছে অস্ত্রটা খুব বেশি চেনা চেনা লাগছে। ত্রিশ ফিট দূর থেকে এটা দিয়ে গুলি করলে কোনো মানুষকে হয় ফিট শূন্যে তুলে ফেলতে পারবে। ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো একজন অফিসার অব রেকর্ডের জন্যে এরকম একটি অস্ত্র বহন করা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।

টর্চের আলোটা শ্বেতশব্দ সমাধির উপরে গিয়ে পড়লে রাইফেল হাতের লোকটা দ্রুত পিছু হটে গেলো, টর্চ হাতে থাকা লোকটার থেকে বিশ ফিট দূরে একটা কলামের পেছনে চলে গেলো সে।

জেসনকে ভাবতে হলো না। সে জানে কি করতে হবে। এখানে কোনো অস্ত্র নিয়ে আসার অনেক ব্যাখ্যা দেয়া হতে পারে, কিন্তু সে জানে জিনিসটা তার উপরেই প্রয়োগ করা হবে। হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দূরত্বটা মেপে নিয়ে এবার এগোতে লাগলো সে। নিজের কোমরে থাকা অস্ত্রটা টের পেলো, সে মনে করেছিলো এটা তাকে ব্যবহার করতে হবে না।

সে সমাধি থেকে সমাধিতে নিচু হয়ে ছুটে গেলো। পাথর আর মূর্তির আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগলো। আশ্বে আশ্বে ডান দিকে সরতে লাগলো একটি

অর্ধবৃত্তাকার পথে । শ্বেত সমাধি থেকে তার দূরত্ব এখন মাত্র পনেরো ফিট দূরে । অস্ত্র হাতের লোকটা বাম দিকের কলামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছাউনীর নিচে, বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে । সে তার অস্ত্রটা এমনভাবে ধরে রেখেছে যেনো সেটা তার গোপনাস্ত্র । রাইফেলের ফুটোতে আঙুল চালাচ্ছে খুবই অশ্রীল ভঙ্গীতে ।

এখন । বর্ন সমাধির পেছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো, লোকটার সাথে তার দূরত্ব এখন মাত্র ছয় ফিট । এক শিকারী প্যাঙ্কারের মতো সে নিঃশব্দে অভীষ্ট লক্ষ্যের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে । বিদ্যুৎ গতিতে একটা হাত রাইফেলটা আর অন্য হাতটা দিয়ে লোকটার মাথা ধরে ফেললো । মাথাটা সজোরে মারবেলে আঘাত করলে লোকটা টলে গেলো । জেসন লোকটাকে ধরে কলামের আড়ালে শুইয়ে রাখলো । লোকটার কোমর থেকে .৩৫৭ ম্যাগনাম পিস্তল, চামড়ার খাপে রাখা ধরালো একটা চাকু আর পায়ে চামড়ার খাপ থেকে একটা .২২ রিভলবার নিয়ে নিলো । কোনোটাই সরকারী মাল নয় । এই লোকটা একজন ভাড়াটে খুনি ।

তার আঙুলগুলো ভেঙে ফেলো । বর্নের কাছে কথাগুলো ফিরে এলো আবার । গোল্ডরিম চশমা পরা লোকটা এসব বলেছিলো স্টেপডেকস্ট্রাসে যাবার পথে একটা বিশাল সিড়ানের ভেতরে । সেই হিংস্র আচরণটির অবশ্যই কারণ ছিলো । জেসন লোকটার হাতের সবগুলো আঙুল মোচড়ে ভেঙে ফেললো । দু'হাতের সবগুলো আঙুলই এভাবে একেজো করে রাখলো সে । এই কাজটা করার সময় লোকটার মুখ জেসন তার বাহু দিয়ে আটকে রাখলো । যেটুকু গোঙানী হলো তা বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গেলো । তার হাত আর কোনো অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না, নিজের হাতটাকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না সে ।

জেসন উঠে দাঁড়িয়ে কলামের আড়াল থেকে উঁকি মারলো । ট্রেডস্টোনের অফিসার এখন তার সামনের মাটিতে টর্চের আলো ফেলছে । এটা থেমে থাকার সিগনাল । অন্য কিছুও হতে পারে—পরবর্তী কয়েক মিনিট সেটা বলে দেবে । লোকটা গেটের দিকে পা বাড়ালো এমনভাবে যেনো একটু দ্বিধায় ভুগছে । সে হয়তো কোনো কিছু শুনেছে । আর এই প্রথম বর্ন হাতের লাঠিটা দেখতে পেলো, বুঝতে পারলো লোকটা একটু খোঁড়া । ট্রেডস্টোনের অফিসার অব রেকর্ড একজন পশু ব্যক্তি ।

জেসন প্রথম সমাধিটার দিকেই দৌড়ে চলে গেলো । ট্রেডস্টোনের লোকটা এখনও গেটের দিকে চেয়ে আছে । বর্ন তার ঘড়ির দিকে তাকালো । ১টা ২৭ বাজে । সময় আছে । সে দৌড়ে পাহাড়ের উপরে যেতে লাগলো । একটু থেমে দম নিয়ে নিলো । পকেট থেকে একটা দেয়াশলাই বের করলো ।

“ট্রেডস্টোন?” সে বেশ জোরেই বললো যেনো নিচ থেকেও সেটা শোনা যায় ।

“ডেল্টা!”

কেইন হলো চার্লি, ডেল্টা হলো কেইন । ট্রেডস্টোনের লোকটা কেইন না বলে ডেল্টা নামটি ব্যবহার করলো কেন? ডেল্টা তো ট্রেডস্টোনের কোনো অংশ নয় । সে

মেডুসা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো।

জেসন পাহাড়ের নিচে নামতে শুরু করলো এবার। ঠাণ্ডা বৃষ্টির ঝাপটা তার চোখেমুখে এসে লাগছে। অগোচরেই তার হাতটা কোমরে রাখা অস্ত্রটার দিকে চলে গেলো। শ্বেতশুভ্র সমাধির সামনে বিশাল একটা লন দিয়ে সে হেটে গেলো। ট্রেডস্টোনের লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার কাছে এসে থামলো। টর্চটা তুলে ধরলে বর্ন তীব্র আলোর কারণে চোখ দুটো কুচকে মুখটা সরিয়ে ফেললো।

“অনেক দিন পর,” টর্চটা নামিয়ে পঙ্খু অফিসার বললো। “আমার নাম ককলিন। যদি তুমি ভুলে গিয়ে থাকো সেজন্যে বলছি।”

“ধন্যবাদ, আপনাকে। আসলেই ভুলে গিয়েছিলাম। এটা সেরকমই একটা ব্যাপার।”

“কিসের একটা ব্যাপার?”

“যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।”

“যদিও তুমি এই জায়গাটা স্মরণ করতে পেরেছো। আমার ধারণা ছিলো তুমি পারবে। আমি অ্যাবোটের লগ্‌টা পড়েছি। এখানেই তুমি শেষবার দেখা করেছিলে। শেষ একটা ডেলিভারি দেয়া হয়েছিলো তোমাকে। কোনো এক রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যানুষ্ঠানের সময়, মনে হয় একজন মন্ত্রী ছিলো সেটা, তাই না?”

“আমি জানি না। সেটা নিয়েই তো আমাদের প্রথমে কথা বলতে হবে। আপনি ছয় মাস ধরে আমার কোনো খোঁজ পান নি। সেটার একটা ব্যাখ্যা আছে।”

“তাই নাকি? তাহলে শুনি, সেটা কি।”

“সহজ ক’রে বলতে গেলে আমি আহত হয়েছিলাম, গুলি খেয়েছিলাম, সেটার পরিণতি খুবই মারাত্মক ছিলো...সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো।”

“বেশ লাগছে শুনতে। এর মানে কি?”

“আমার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পুরোপুরি। আমি ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের একটি দ্বীপে কয়েক মাস কাটিয়েছি—মার্সেই’র দক্ষিণে—কোথেকে এসেছি, আমি কে, কেউই জানতো না। ওখানে ওয়াশবার্ন নামের এক ইংরেজ ডাক্তার আমাকে চিকিৎসা করেছে। সে সবকিছুর রেকর্ড রাখে। আমি যা বললাম সেটা আপনি খুঁজে দেখতে পারেন।”

“আমি নিশ্চয় তার কাছে রেকর্ড রয়েছে,” ককলিন মাথা নাড়তে নাড়তে বললো। “আমি বাজি ধরে বলতে পারি তার কাছে বিশাল একটি রেকর্ড আছে। ঈশ্বর জানে, তুমি তাকে প্রচুর টাকা দিয়েছো!”

“আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?”

“আমাদের কাছেও রেকর্ড আছে। জুরিখের একজন ব্যাঙ্ক অফিসার আছে যে মনে করে সে একটি ট্রেডস্টোন তহবিল ট্রান্সফার করতে দেখেছে। এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সুইস ফ্রাঁ, মার্সেই’র একটি একাউন্টে পাঠানো হয়েছে যেটা ট্রেস করা যাবে না। নামটা আমাদেরকে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।”

“এই ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে। সেই লোকটা আমার জীবন বাঁচিয়েছে, আমাকে আবার বাস্তবে ফিরিয়ে এনেছে। তার কাছে যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি একটা ল্যাশই ছিলাম বলা যায়।”

“তাহলে তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে, মিলিয়ন ডলার খুব ভালো একটি অঙ্ক, তাই না? ট্রেডস্টোনের বাজেটের সৌজন্য।”

“আমি তো বলেছি, আমি জানতাম না। ট্রেডস্টোন আমার কাছে অজানা ছিলো। অনেক দিক থেকে এটা এখনও আমার কাছে অজানাই আছে।”

“আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি তো তোমার স্মৃতি হারিয়েছো। কি যেনো বললে, এলোমেলো?”

“হ্যা, তবে সেটা যথার্থ শব্দ নয়। কথাটা হবে এমনেসিয়া।”

“কিন্তু এলোমেলো শব্দটাই ভালো। কারণ, মনে হচ্ছে তুমি গুছিয়ে টুছিয়ে সোজা জুরিখে চলে গেলে, একেবারে গেইমেনশেফট-এ।”

“আমার উরুর নিচে একটি নেগেটিভ অপারেশন ক’রে ঢুকিয়ে দেয়া ছিলো।”

“অবশ্যই ছিলো। তুমিই তো এ ব্যাপারে বেশি জোর দিয়েছিলে। আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই এটা বুঝতে পেরেছিলো। এটাই ছিলো তোমার জন্যে সবচাইতে সেরা বীমা।”

“আমি জানি না আপনি কি বলছেন। আপনি কি বুঝতে পারছেন না?”

“অবশ্যই। তুমি একটা নাম্বার পেলে আর তাতে ক’রে ধরে নিলে তোমার নাম জেসন বর্ন।”

“ব্যাপারটা সেভাবে ঘটে নি! প্রতি দিন মনে হয় আমি কিছু কিছু শিখছি। কিছু কিছু স্মৃতি ফিরে পাচ্ছি। এক হোটেল ক্লার্ক আমাকে বর্ন নামে ডেকেছিলো। ব্যাঙ্কে যাবার আগে আমি জানতাম না আমার নাম জেসন বর্ন।”

“কোথেকে তুমি জানতে পারলে এতো সব করতে হবে,” ককলিন কথার মাঝখানে বললো। “কোনো কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে চার মিলিয়ন উধাও।”

“ওয়াশবার্ন আমাকে বলেছিলো কি করতে হবে!”

“তারপর এক মেয়ে এসে হাজির হলো, যে কিনা ফিনান্সিয়াল কাজে খুব দক্ষ। সে তোমাকে বললো কিভাবে বাকি কাজটুকু করতে হবে। আর তার আগে তুমি লাওয়েনস্ট্রাসের চারনাক এবং তিনজন লোককে হত্যা করলে। ঐ তিনজনকে অবশ্য আমরা চিনি না, তবে তারা তোমাকে চিনতো বলেই মনে হয়। এখানে, এই প্যারিসে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার কাজে নিয়োজিত ট্রাকে গুলি করা হলো। আরেকজন সহযোগী? তুমি বানচোত—সব শেষ ক’রে ফেললে, কেবল একটা জিনিস বাদে।”

“আপনি কি আমার কথা শুনবেন! ঐসব লোক আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো। তারা মার্সেই থেকেই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো। এর বাইরে, আমি সত্যি বলছি, আপনি কি বলছেন কিছুই জানি না আমি। কখনও কখনও আমার মানসপটে কিছু ছবি, কিছু কথা, কিছু পথঘাট আর জায়গার ছবি ভেসে

আসে। কিন্তু সেগুলো আমি ঠিক ধরতে পারি না। আর আসে অনেক নাম—কিন্তু কোনো মুখ নয়। আরে, আপনাকে বুঝতে হবে—আমি একজন এমেনেসিয়াক! এটাই হলো সত্যি কথা!”

“সেই সব নামগুলোর মধ্যে কার্লোস থাকে না, থাকে কি?”

“হ্যা, থাকে, আপনি সেটা জানেন। এটাই তো আসল ব্যাপার। আপনি এটা আমার চেয়েও বেশি জানবেন। আমি কার্লোসের ব্যাপারে হাজার হাজার তথ্য বলতে পারি। কিন্তু আমি জানি না কেন। আমাকে এক লোক বলেছে, যে এখন এশিয়ার পথে আছে, ট্রেডস্টোনের সাথে নাকি আমার একটা চুক্তি আছে। লোকটা কার্লোসের হয়ে কাজ করে। সে বলেছে কার্লোস জানে। কার্লোস নাকি আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে। আপনি নাকি জানিয়ে দিয়েছেন আমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছি। সে কৌশলটা বুঝতে পারে নি। আর আমিও তাকে কিছু বলতে পারি নি। আপনি ভেবেছেন আমি বিশ্বাসঘাতক, কারণ আমি ছয় মাস ধরে লাপাত্তা। আর আমি যোগাযোগ করতে পারি নি, কারণ আমি জানতাম না আপনি কে। আমি এখনও জানি না আপনি আসলে কে!”

“অথবা সন্ন্যাসীকে।”

“হ্যা, হ্যা...সন্ন্যাসী। তার নাম অ্যাবোট।”

“খুব ভালো। আর ইয়াখটম্যান? তার কথা তোমার মনে আছে, আছে না? তার বউ?”

“নামগুলো। হ্যা। কোনো চেহারা নয়।”

“এলিয়ট স্টিভেন্স?”

“না।”

“অথবা...গর্ডন ওয়েব।” ককলিন নামটা শান্ত কণ্ঠে বললো।

“কি?” বর্নের বুকটা ধরফর ক’রে উঠলো। মাথায় আবার ব্যাথাটা ফিরে এলো। তার দু’চোখ দিয়ে আগুন বের হতে লাগলো! আগুন! বিস্ফোরণ আর অন্ধকার। ঝড়ো বাতাস আর যন্ত্রণা...ডেন্টাকে আলমানাক! পরিত্যক্ত, পরিত্যক্ত! অর্ডার অনুসারে জবাব দাও। “গর্ডন...” জেসন তার নিজের কণ্ঠটা শুনতে পেলো। চোখ দুটো বন্ধ ক’রে ফেললো। চারপাশের কুয়াশাটা সরাতে চাইলো। তারপর চোখ খুলে ককলিনের হাতের অস্ত্রটা তার মাথা বরাবর তাক ক’রে রাখতে দেখে খুব একটা অবাক হলো না।

“আমি জানি না, তুমি এটা কিভাবে করলে, কিন্তু তুমি করেছে। একটা জিনিসই করা বাকি ছিলো আর সেটাও তুমি করেছে। তুমি নিউইয়র্কে ফিরে গিয়ে তাদের সবাইকে শেষ ক’রে দিয়েছে। তুমি তাদের সবাইকে হত্যা করেছে, বানচোত। আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ওখানে ফিরে নিয়ে গিয়ে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসিয়ে দেই। কিন্তু আমি সেটা করতে পারবো না। তাই আমি এখানেই যা করার করবো। আমি নিজেই তোমাকে শেষ করবো।”

“আমি তো কয়েক মাস ধরে নিউইয়র্কে যাই নি। এর আগে গিয়েছি কিনা তাও জানি না। তবে বিগত ছয় মাসে তো নয়ই।”

“মিথ্যুক! তুমি এটা ঠিক মতো কেন করলে না? তুমি কেন তোমার এই ভেক্সিবাজিটা সময় মতো করলে না যাতে ক’রে শেষকৃত্যে যেতে পারতে? তুমি তাহলে অনেক পুরনো বন্ধুকে দেখতে পেতে। এবং তোমার ভাইকেও! হায় ঈশ্বর! তুমি তার বউকে চার্চে হাত ধরে নিয়ে যেতে পরতে। হয়তো একটা শোকবাণীও পাঠ করতে পারতে। অন্ততপক্ষে যে ভাইকে খুন করেছো তার সমক্ষে কিছু ভালো কথা বলতে পারতে।”

“ভাই?...বন্ধ করুন! ঈশ্বরের দোহাই, থামুন!”

“কেন থামবো? কেইন বেঁচে আছে! আমরা তাকে তৈরি করেছি, সে জীবন পেয়েছে।!”

“আমি কেইন নই। সে কখনও ছিলো না! কখনই না।!”

“তাহলে তুমি জানো! মিথ্যুক! বানচোত!”

“অস্ট্রটা সরিয়ে রাখুন। আমি বলছি, সরিয়ে রাখুন!”

“সেটা হবে না। আমি নিজের কাছে প্রতীজ্ঞা করেছি, তোমাকে দুই মিনিট সময় দেবো, কারণ আমি শুনতে চাই তুমি কি বলতে চাও। তো আমি সব শুনেছি। তোমাকে এসব করার অধিকার কে দিয়েছে? আমরা সবাই কিছু না কিছু হারিয়েছি। এটা কাজের মধ্যেই পড়ে। আর তুমি যদি এই বালের কাজটা পছন্দ না করো তবে কাজটা ছেড়ে দাও। সেটাই তুমি করেছিলে। উধাও হয় গিয়েছিলে। সেটা ঠিকই ছিলো। কিন্তু না, তুমি আবার ফিরে এলে, তোমার অস্ত্র আমাদের দিকে তাক করলে।”

“না! এটা সত্য নয়!”

“কথাটা ল্যাবরেটরির টেকনিশিয়ানদের বোলো, যারা আট টুকরা কাঁচ থেকে আঙুলের ছাপ নিয়েছে। ডান হাতের তৃতীয় এবং তজনীর। তুমি ওখানে পাঁচজন লোককে হত্যা করেছো। তুমি সবাইকে হত্যা করেছো। খুব ভালো সেটআপ। ভিন্ন ভিন্ন গুলি। ট্রেডস্টোনকে ধ্বংস করেছো তুমি!”

“না, আপনি ভুল বলছেন! এটা কার্লোসের কাজ। আমার নয়। আপনি যা বলছেন সেটা যদি হয়ে থাকে তবে সেটা কার্লোসই করেছে। সে জানে। তারা জানে। সেভেনটি ফার্স্ট স্ট্রট। ১৩৯ নাম্বার। তারা এ সম্পর্কে জানে!”

ককলিন মাথা নেড়ে সাই দিলো, তার চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে। বৃষ্টির মধ্যেও সেই চোখে স্পষ্ট ঘৃণা দেখা গেলো।

“খুবই নিখুঁত,” আশ্বে ক’রে বললো সে। “টার্গেটের সাথে হাত মিলিয়ে পুরো পরিকল্পনাটা নস্যং করা। তাহলে চার মিলিয়ন ছাড়ো আর কি নিয়েছো? কার্লোস তোমাকে রেহাই দিয়েছে? তোমরা দু’জনে তো দেখছি বেশ ভালো জুটি হয়ে উঠেছে।”

“এটা তো পাগলের প্রলাপ!”

“কিন্তু সত্যি,” ট্রেডস্টোনের লোকটা বললো। “গত শুক্রবার সাড়ে সাতটার আগে কেবল নয় জন লোকই জানতো ঠিকানাটা। তিন জন নিহত হয়েছে, আর আমরা হলাম বাকি চারজন। কার্লোস যদি সেটা জেনে থাকে তবে একজনই সেটা তাকে দিয়েছে। তুমি।”

“আরে আমি কি ক’রে দেবো? আমি তো এটা জানতামই না। আমি এটা এখনও জানি না!”

“তুমি তো এইমাত্র বললে,” ককলিন বাম হাতে লাঠিটা নিলো গুলি করার প্রস্তুতি হিসেবে।

“গুলি করবেন না!” বর্ন চিৎকার ক’রে বললো। জানে এই আকৃতির কোনো মূল্য নেই। চিৎকার দিয়েই সে বাম দিকে ঘুরে ডান পা দিয়ে সজোরে লাথি মারলো অস্ত্র ধরে রাখা হাতটাতে। ককলিন পড়ে যাবার সময় লক্ষ্যহীনভাবে একটা গুলি করলো। জেসন অস্ত্রটা ধরে রাখা হাতে আবারো লাথি মারলে অস্ত্রটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো।

ককলিন মেঝেতে গড়িয়ে গেলো, তার চোখ শ্বেতশুভ্র সমাধিটার কলামের দিকে। ওখান থেকে একটা গুলি এসে তার আক্রমণকারীকে ঘায়েল করবে ব’লে সে আশা করছে। না! সে আবারো গড়িয়ে গেলো। এবার ডান দিকে। ভালো ক’রে দেখে সে ভড়কে গেলো—ওখানে অন্য কেউ!

পরপর চারটা গুলি তার দিকে ছুটে এলে বর্ন মাটিতে শুইয়ে পড়লো। দ্রুত গড়িয়ে নিজের অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নিলো। দেখতে পেলো একটা সমাধির কাছেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। পর পর দু’বার গুলি চালালে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

দশ ফিট দূরে ককলিন ঘাসের উপর দু’হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সামনে থাকা অস্ত্রটা নেবার জন্যে হাত বাড়চ্ছে। জেসন উঠেই তার কাছে ছুটে গিয়ে হাটু মুড়ে বসলো। একহাতে লোকটার ভেঁজা চুল ধরে অন্য হাতে অস্ত্রটা তার মাথায় ঠেকালো। দূরের কলাম থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো।

“এটা আপনার ভাড়াটে গুণ্ডার চিৎকার,” ককলিনের মাথাটা ঝাঁকিয়ে জেসন বললো। “ট্রেডস্টোন খুবই অদ্ভুত লোকজনকে নিয়োগ দিয়েছে। অন্য লোকটা কে?”

“সে তোমার চেয়ে ভালো লোক,” ককলিন জবাব দিলো। “তারা সবাই। তারা তোমার মতোই সব হারিয়েছে, কিন্তু তারপরও বেঈমানী করে নি। তাদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি!”

“আমি যাই বলি না কেন, আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করতে চান না!”

“কারণ আমি জানি তুমি কোন্ জিনিস—তুমি কি করেছে। এইমাত্র তুমি পুরো জিনিসটা আবারো নিশ্চিত করেছে। তুমি আমাকে খুন করতে পারো। কিন্তু তারা তোমাকে ঠিকই ধরবে। তুমি হলে সবচাইতে বাজে টাইপের লোক। তুমি অবশ্য

নিজেকে স্পেশাল ভাবো। সবসময়ই তাই ভাবো। নম পেন-এর পরে আমি তোমাকে দেখেছি—সবাই সেখানে হেরেছে, কিন্তু তুমি নয়। কেবল তুমি! তারপর মেডুসাতে! ডেন্টার জন্যে কোনো নিয়ম নেই! পণ্ডটা কেবল হত্যা করতে চায়। আর এরকম পণ্ডরাই বেঙ্গম্যানী করে। তো, আমিও হেরে গেছি। কিন্তু কখনও বেঙ্গম্যানী করি নি। চালাও গুলি! খুন করো আমাকে! তারপর কার্লোসের কাছে ফিরে যাও। কিন্তু আমি যখন ফিরে যাবো না তারা সবই বুঝে যাবে। তারা তোমাকে শেষ করার আগপর্যন্ত তোমার পিছু নেবে। চালাও গুলি!”

ককলিন চিৎকার করলেও বর্ন তার কথা খুব একটা শুনলো না বলেই মনে হলো। তার বদলে সে দুটো শব্দ শুনতে পেলো, আর এই দুটো শব্দ তার সমস্ত শরীরে একধরনের শিহরণ বইয়ে দিলো। *নম পেন! নম পেন। আকাশে মৃত্যু। আকাশ থেকে মৃত্যু। অল্পবয়সীদের মৃত্যু। পাখির কিচির মিচির আর যন্ত্রের শব্দ। অরণ্য আর নদী। সে আবারো অন্ধ হয়ে গেলো, ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।*

তার নিচে ট্রেডস্টোনের লোকটা তার হাত থেকে ছুটে গেলো। হামাণ্ডি দিয়ে পশু লোকটা পাগলের মতো ছুটে লাগলো। জেসন চোখ দুটো পিটপিট ক’রে বাস্তবে ফিরে আসার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো তাকে অস্ত্রটা দিয়ে গুলি করতে হবে। ককলিন নিজের অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো। কিন্তু বর্ন ট্গার টিপতে পারলো না।

সে ডান দিকে সরে গিয়ে ঘাসের উপর গড়িয়ে মার্বেলের কলামটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলো। ককলিনের গুলিটা লক্ষ্য খুঁজে পেলো না। সে নিজের নিশানা ঠিক রাখতে পারছে না। তার হাত আর পা কাঁপছে। এরপরই গুলি করাটা থেমে গেলে জেসন উঠে দাঁড়ালো। কলামটার পেছন থেকে উঁকি দিলো সে। তার হাতের অস্ত্রটা এবার তাক্ কন্না হলো সেই লোকটার দিকে, তাকে এখন হত্যা করতে হবে। তা না হলে সেই লোকই তাকে এবং মেরিকে খুন ক’রে ফেলবে। তাদের দু’জনকে কার্লোসের সাথে জড়িয়ে দেবে।

ককলিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেটের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বাইরে একটা গাড়ি তার গন্তব্য। বর্ন তার অস্ত্রটা তুলে গুলি করার জন্যে উদ্যত হলো। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সব চুকেবুকে যাবে। ট্রেডস্টোনে তার শত্রুটি মরে যাবে। কিন্তু সে গুলি করতে পারলো না। ট্গারটা কোনোভাবেই টিপতে পারলো না। চেয়ে চেয়ে দেখলো ককলিন গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছে।

গাড়ি! তাকে প্যারিসে ফিরে যেতে হবে। একটা উপায় আছে। সেটা ওখানেই আছে। ওখানে মেরি আছে!

সে দরজায় টোকা দিলে মেরি টোকাটা বুঝে দরজা খুলে দিলো।

“হায় ঈশ্বর, তোমার একি অবস্থা! কি হয়েছে?”

“সময় নেই,” সে ঘরের ভেতরে টেলিফোনটার দিকে এগোলো জেসন। “ওটা একটা ফাঁদ ছিলো। তারা মনে করছে আমি বেঈমানী করেছি। কার্লোসের কাছে বিক্রি ক’রে দিয়েছি নিজেকে।”

“কি?”

“তারা বলছে আমি নাকি গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে গিয়ে পাঁচজন লোককে খুন ক’রে এসেছি...তাদের মধ্যে আমার নিজের এক ভাইও আছে।” জেসন কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করলো। “একজন ভাই আছে—আমার। আমি জানি না। আমি আর এখন ভাবতেও পারছি না।”

“তুমি তো প্যারিস ছাড়ো নি! এটা তুমি প্রমাণ করতে পারবে!”

“কিভাবে? আট, দশ ঘণ্টা সময় দরকার আমার। আমি কি ক’রে সেটা প্রমাণ করবো?”

“আমি করবো। তুমি আমার সাথে ছিলে।”

“তারা মনে করে তুমিও এসবের সাথে জড়িত,” ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে করতে বর্ন বললো। “চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, পোর্ত নোয়ে, সবই। তারা তোমাকেও আমার সাথে জড়িয়ে ফেলেছে। কার্লোস আমার আঙুলের ছাপ নকল ক’রে ঘটনাস্থলে রেখে দিয়েছে। ঈশ্বর!”

“তুমি এখন কার কাছে ফোন করছো?”

“আমাদের ব্যাকআপ, মনে আছে? আমাদের কাছে ঐ একজনই আছে। ভিলিয়ার্স। আর তার বউ। ঐ মেয়েটা হলো মূল্যবান। তাকে এখন আমাদেরকে কজায় নিতে হবে। তার কাছ থেকে কথা বের করতে হবে। দরকার হলে তাকে নির্মম নির্যাতন করা হবে। কিন্তু সেটা করতে হবে না। কারণ সে জিতবে না, তাই মুখ বন্ধ রেখে তার কোনো লাভও হবে না...ধ্যান্তরিকা! ফোনটা ধরছে না কেন?”

“তার প্রাইভেট ফোনটা তো তার অফিসে থাকে। এখন রাত তিনটা বাজে। সে হয়তো—”

“ধরেছে! জেনারেল? আপনি বলছেন তো?” জেসন জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যা, আমি বলছি। বন্ধু। আমার বউয়ের সাথে উপরের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম।”

“তার ব্যাপারেই আমি ফোন করেছি। আমাদেরকে চলে যেতে হবে। এখনই। ফরাসি ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারপোল এবং আমেরিকান অ্যান্টিসিক্রেট সতর্ক ক’রে দিন। কিন্তু তাদেরকে বলে দেবেন আমি আপনার বউকে না দেখা পর্যন্ত, কোনো কথা না বলা পর্যন্ত যেনো তারা কোনোরকম নাক না গলায়।”

“আমার তা মনে হচ্ছে না, মি: বর্ন...আমার বউয়ের সাথে কোনো কথা বলাটা মনে হয় সম্ভব হবে না। মানে, আমি তাকে খুন ক’রে ফেলেছি।”

অধ্যায় ৩৩

জেসন হোটেলের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। “কেন?” সে খুব শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো। “আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝতে পেরেছেন।”

“আমি চেষ্টা করেছিলাম, বন্ধু,” ভিলিয়ার্স বললো। তার কণ্ঠটা খুবই নির্বিকার। “ঈশ্বর জানে আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমি আর পারলাম না। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি সে আমার একমাত্র ছেলের হত্যাকারী সেই নরপশুটার ঘনিষ্ঠ এক অনুচর। আমার খানকিটা আসলে অন্য আরেকজনের খানকি...জানোয়ারটার খানকি। আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না।” জেনারেল একটু থামলো। “সেও আমার চোখ দেখে সব বুঝতে পেরেছিলো। শেষে আমি তাকে সুযোগটা দিয়েছিলাম, যেটা আমি তোমাকেও বলেছিলাম।”

“আপনাকে খুন করতে?”

“হ্যাঁ। এটা খুব কঠিন ছিলো। আমাদের বিছানার মাঝখানে একটা নাইটস্ট্যান্ড আছে, সেটার ড্রয়ারে একটা অস্ত্রও রাখা থাকে। সে বিছানায় শুয়ে ছিলো, গয়ার মাজার মতো। আমি ড্রয়ারটা খোলা রেখে একটা দেয়াশলাই দিয়ে চেয়ারে ফিরে পাইপ ধরিয়ে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। আমার মধ্যে টেনশন বাড়তে লাগলো। তারপর আমি তাকে খানকি বলে গাল দিলাম। আমার ছেলেকে খুন করেছে বলেও অভিযোগ করলাম। সে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। একবার আঁড় চোখে ড্রয়ারের পিস্তলটার দিকেও তাকালো...তারপর ফোনের দিকে। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে নিলো। আমি তাকে থামাতে পারি নি। বরং আমাকে তার কথা শুনতে হয়েছে। আমি যা শুনেছি সেটা আমার সাথে আমার কবরে যাবে। তাতে ক’রে আমার ছেলে এবং আমার কিছুটা সম্মান রক্ষা পাবে।”

“জেনারেল...” বর্ন মাথা ঝাঁকিয়ে বললো। “তারপর? সে আমার নাম বলেছে। কিভাবে? আপনাকে সেটা বলতে হবে। প্লিজ।”

“সে বলেছে তুমি একজন তুচ্ছ অস্ত্রবাজ, যে কিনা একজন দৈত্যের জুতা পরবার ইচ্ছে পোষণ করছে। তুমি জুরিখ থেকে টাকা চুরি করেছে। তুমি এমন একজন লোক যাকে তার নিজের লোকজনই অস্বীকার করে।”

“সে কি বলেছে, ঐ সব লোক কারা?”

“যদি সে তা বলে থাকে তবে আমি সেটা শুনি নি। আমি রাগে স্ফোভে অন্ধ আর কালা হয়ে গিয়েছিলাম। তবে আমার দিক থেকে তোমার কোনো ভয় নেই।

এই অধ্যায়টা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার জীবনটা একটা ফোন কলের সাথে শেষ হয়ে গেছে।”

“না!” জেসন চিৎকার ক’রে বললো। “আপনি এটা করবেন না! এখন তো নয়ই।”

“অবশ্যই করবো।”

“প্রিজ। কার্লোসের বেশ্যাটার কথায় বিশ্বাস করবেন না। কার্লোসকে ধরুন! তাকে ফাঁদে ফেলুন!”

“ঐ খানকিটার সাথে শুয়ে নিজের নামটাকে ঘৃণ্য করেছি। পণ্ডটার মাগীর কজায় থেকেছি।”

“উফ্! এসব কি বলছেন? আপনার ছেলের ব্যাপারটা কি হবে? যাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে!”

“তাকে শাস্তিতে থাকতে দাও। আমাকেও শাস্তিতে থাকতে দাও। সব শেষ হয়ে গেছে।”

“শেষ হয় নি! আমার কথা শুনুন! আমাকে কেবল একটু সময় দিন, এটাই কেবল আমার দাবি।” জেসন টের পেলো মেরি তার কাঁধে হাত রেখেছে। “গুলির শব্দটা কি অন্য কেউ শুনেছে?”

“কোনো গুলির শব্দ হয় নি। আমি আমার পবিত্র সামরিক অস্ত্রটাকে নোংরা করতে দেই নি। এটা কোনো খানকির উপর ব্যবহার করা হয় নি।”

“আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আপনি না বললেন তাকে আপনি খুন করেছেন।”

“আমি তাকে গলা টিপে হত্যা করেছি।”

“তার হাতে তো আপনার অস্ত্রটা ছিলো...”

“কারো চোখে যখন পাইপের গরম ছাই ছিটিয়ে দেয়া হয় তখন সে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এটা এখন অপ্রাসঙ্গিক। সে জিতেও যেতে পারতো।”

“সেই জিতে গেছে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? কার্লোস জিতে গেছে! মেয়েটা আপনাকে ধ্বংস ক’রে ফেলেছে! আর আপনার সেই ঘিলু নেই যে, তাকে মেরে ফেলা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারতেন! আপনি অশ্রদ্ধা আর ঘৃণার কথা বলছেন? আপনিই সেটা অর্জন করেছেন। এখন আর অশ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই!”

“তুমি কেন লেগে আছো, মঁসিয়ে বর্ন?” ভিলিয়ার্স ক্রান্তভাবে জানতে চাইলো। “আমি তোমার কাছ থেকে, কিংবা কারোর কাছ থেকে কোনো রকম বদান্যতা আশা করি না। আমাকে খালি একটু একা থাকতে দাও। তুমি কিছুই করতে পারবে না।”

“পারবো, যদি আপনি আমার কথা শোনেন! কার্লোসকে ফাঁদে ফেলুন! কতো বার আমি এই কথাটা আপনাকে বলবো? তাকেই তো আপনি চান! তাকে আমিও

চাই! তাকে ছাড়া আমি মৃত। আমরা মৃত। ঈশ্বরের দোহাই লাগে আমার কথা শুনুন!”

“আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই।”

“আছে।” তার মনের পর্দায় কতোগুলো ছবি ভেসে উঠলো। “পাল্টা ফাঁদে ফেলুন। ওখান থেকে কোনো কিছু স্পর্শ না করেই চলে আসুন।”

“আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি ক’রে সম্ভব?”

“আপনি আপনার বউকে খুন করেন নি। খুন করেছি আমি!”

“জেনসন!” মেরি পাশ থেকে চিৎকার ক’রে জেনসনের হাতটা খামচে ধরলো।

“আমি জানি আমি কি করছি,” বর্ন বললো। “এই প্রথম আমি সত্যি জানি আমি কি করছি। এটা খুবই হাস্যকর শোনাবে, তবে আমার মনে হয় এটা আমার প্রথম থেকেই জানা উচিত ছিলো।”

পার্ক মঁশিউ এলাকাটি খুব শান্ত, রাস্তাঘাট ফাঁকা, ঘন কুয়াশার মধ্যে বাড়িগুলোর সামনের জুলে থাকা বাতির আলো দেখা যাচ্ছে। সবগুলো বাড়ির জানালা বন্ধ আর ভেতরটা অন্ধকার, কেবল সেন সায়ার আর নরম্যান্ডির বীর, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য, স্ত্রী যাতক আঁদ্রে ফ্রাসোয়া ভিলিয়ার্সের বাড়িটা বাদে। সামনের জানালাটা এই বাড়ির শোবার ঘরের, যেখানে বাড়ির মালিক তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

ভিলিয়ার্স কোনো কিছুতেই রাজি হয় নি। সে এতোটাই বিস্মিত হয়েছে যে, কোনো জবাব দিতে পারে নি। কিন্তু জেনসন তাকে কিছুটা বোঝাতে পেরেছে। কার্লোসকে ধরতে হবে! তাকে ফাঁদে ফেলতে হবে! তার কাছে এটা খুবই পরিস্কার। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শেষ দিকেই এটা শুরু হবে—আর শুরুটা তার কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। বাঁচতে হলে গুপ্তযাতককে পাড়াও করতে হবে। আর সে যদি ব্যর্থ হয় তবে সে মারা যাবে। সেন মেরিও রেহাই পাবে না। হয় জেলে যাবে সারা জীবনের জন্যে, নয়তো খুন হবে।

ভিলিয়ার্সকে অনেক কিছুই বুঝতে হবে। আর বুঝিয়ে বলার মতো সময়ও নেই। জেনসন বুঝতে পারে জেনারেল সব কিছুর উপরে নিজের সম্মানকে স্থান দিচ্ছে। ভিলিয়ার্সের জন্যে সেটা করাটা হবে বিশাল এক সম্মানের ব্যাপার।

কার্লোসকে ধরো!

জেনারেলের বাড়িতে ঢোকার দ্বিতীয় একটি প্রবেশপথ আছে; মূল প্রবেশ পথের ডান দিকে সেটা, যেখান দিয়ে রান্নাঘরের মালপত্র আনা নেয়া হয়। বর্ন বৃদ্ধ সৈনিককে পরিকল্পনাটা বিস্তারিত বলতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু ভিলিয়ার্সের বাড়িটা নজরদারি করা হচ্ছে ব’লে একটা ঝুঁকিও আছে। এরকমটি করা কার্লোসের পক্ষে অনেক কারণ আছে। আবার একইভাবে না করারও কারণ রয়েছে। সব কিছু বিবেচনা ক’রে খুনি হয়তো ভিলিয়ার্সের বাড়িটা থেকে দূরে থাকারই চেষ্টা করবে।

তবে ফিলিপ দাঁজু! অবশ্যই সেখানে কেউ না কেউ লক্ষ্য রাখছে—দু'জন কিংবা দশ জনও হতে পারে! দাঁজু যদি ফ্রান্স ছেড়ে চলে যায় তবে কার্লোস অনুমাণ করতে পারবে কি হয়েছে। আর মেডুসার লোকটা যদি ফ্রান্স ছেড়ে না যায় তারপরেও কার্লোস জেনে যাবে সব। কেইনের সাথে বলা প্রতিটি কথা সে কার্লোসকে জানিয়ে দেবে। কোথায়? কার্লোসের লোকেরা কোথায় আছে? জেসন ভাবলো। আজ রাতে যদি কার্লোসের কোনো লোক পার্ক মঁশিউ'তে না থাকে তবে তার পুরো কৌশলটা মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

তা হবে না। তারা ওখানে আছে। একটা সিডানে—বারো ঘণ্টা আগে যে সিডানটা লুভর থেকে চলে গেছে। আর ঐ দু'জন লোকই আছে সেখানে—খুনিদের খুনিদের ব্যাআপে থাকা খুনিরা। গাড়িটা রাস্তা থেকে পঞ্চাশ ফিট দূরে বাম পাশে আছে। সেখান থেকে ভিলিয়ার্সের বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু ভেতরে ব'সে থাকা দু'জন লোকের চোখ সজাগ আর সতর্ক আছে কিনা বর্ন সেই ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। রাস্তার দু'পাশেই সারি সারি ক'রে গাড়ি রাখা আছে। একটা মার্সিডিজ, একটা লিমোজিন আর একটা বেটলি। জেসন থেমে থাকা সিডানটার পেছন দিক থেকে সতর্কভাবে নিচু হয়ে এগিয়ে গেলো। সে জানে তাকে কি করতে হবে। কিন্তু কিভাবে করবে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। তার দরকার কার্লোসের লোকগুলো যেনো কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হয়। লুকিয়ে থাকা অবস্থা থেকে তারা যেনো একটু বের হয়ে আসে।

আগুন। আচম্কা আগুন। ভিলিয়ার্সের বাড়ি থেকে একটু দূরে। এই নিরিবিলি ফাঁকা রাস্তায় এটাই হবে ম্লোক্ষম অস্ত্র। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি...সাইরেন; বিস্ফোরণ...বিস্ফোরণ। সেটা করা যেতে পারে।

বর্ন কোণার ভবনটার দিকে আবার ফিরে গেলো। কাছের একটা বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে থামলো সে। পরনের জ্যাকেট, শার্ট খুলে ফেলে কলার থেকে টেনে ছিড়ে দলা পাকিয়ে ফেললো কাপড়গুলো। সেগুলো নিয়ে আশেপাশে পার্ক ক'রে রাখা গাড়িগুলোর দিকে তাকালো সে। কোনো না কোনো গাড়ির অয়েল ট্যাঙ্কের মুখ অরক্ষিত আছেই। প্যারিসে এরকমটি থাকে।

তার যা দরকার এবার সেটা দেখতে পেলো। সামনের একটা বাড়ির গেটের ভেতরে একটা মোটর সাইকেল রাখা আছে। সেটার ট্যাঙ্কের কোনো লক্ না থাকারই কথা।

জেসন বাইকটার দিকে এগোলো। রাস্তার আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে লোকজন খুব কমই বের হচ্ছে এখন। সে ট্যাঙ্কের মুখে লাগানো ক্যাপটা মোচর দিতেই সেটা খুলে গেলো। ট্যাঙ্কি ভর্তি পেট্রল আছে। সে মুখটা আবার লাগিয়ে রাখলো। এখন শার্টটা ভেঁজানো যাবে না। তার আরেকটা জিনিসের দরকার আছে।

কাছের একটা কোণায় সুয়ারেজ ড্রেনের পাশে সে ওটা খুঁজে পেলো : পিচ থেকে একটা পাথরের টুকরো কিছুটা বের হয়ে আছে। আর তার পাশেই আছে একটা ইটের টুকরো। সে ইটটা পকেটে নিয়ে পা দিয়ে কয়েকবার লাথি মেরে পাথরটা খুলে ফেলে সেটা নিয়ে বাইকের কাছে আবার ফিরে এলো। ইটের টুকরোটা হাতে নিয়ে ওজন ক'রে দেখলো। কাজ হবে। দুটো জিনিসেই কাজ হবে।

তিন মিনিট পরে সে তার শার্টটা পেট্রলে ভিজিয়ে নিলো। সেই ভেঁজা শার্টটা পাথরের টুকরোতে পেঁচিয়ে নিয়ে সে প্রস্তুত হলো তার মিসাইলটা নিক্ষেপ করার জন্যে।

সিডানে ব'সে থাকা লোক দু'জন মনোযোগের সাথে ভিলিয়ার্সের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। সিডানটার পেছনে আরো তিনটি গাড়ি। জেসনের ঠিক সামনে একটা সাদা বাড়ি। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে আছে দুটো জানালা। বাম দিকের জানালাটা অবশ্যই ডাইনিং রুমের। জানালার কাঁচ দিয়ে সে চেয়ার টেবিল দেখতে পাচ্ছে।

বর্ন পকেট থেকে পাথরের টুকরোটা বের ক'রে সিডানটার দিকে নিশানা ক'রে ছুড়ে মারলো সেটা। পাথরের টুকরোটা সিডানের ছাদে লেগে রাস্তায় গড়িয়ে পড়লে সুনসান এলাকায় বেশ ভালো শব্দই হলো। সিডানে ব'সে থাকা লোক দু'জন চমকে গেলো। ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা দরজা খুলে এক পা বের করলো, তার হাতে একটা অস্ত্র। ড্রাইভার তার জানালার কাঁচ নামিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলো। কিন্তু সামনের একটা বাড়ির গ্যারাজের ধাতব দরজায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো। এই কাজটা একেবারেই বোকার মতো হয়ে গেলো। এতে ক'রে পার্ক মঁশিউ'তে ওঁ পেতে থাকা লোকদেরকেই চিহ্নিত ক'রে ফেলা হলো।

এবার জেসন রাস্তা দিয়ে দৌড় দিলো। তার মনোযোগ ঐ লোক দু'জনের উপর। যাদের হাত তাদের চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে হেডলাইটের প্রতিফলিত আলোর জন্যে। সে বেন্টলি গাড়ির অয়েল ট্যাঙ্কটার কাছে চলে এলো। ইটের টুকরোটা তার বগলের নিচে, বাম হাতে একটা দেয়াশলাই। সে নিচু হয়ে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালালো। ইটটা মাটিতে রেখে শার্টের হাতায় সেটা বেঁধে নিলো। এবার জ্বলন্ত কাঠিটা পেট্রলে ভেঁজা কাপড়ে ধরিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেলো তাতে। চট ক'রে উঠে কাপড়ে বাঁধা ইটটা দোলাতে লাগলো সে, ছুড়ে মারলো সাদা বাড়িটার জানালা বরাবর। ছুড়ে মেরেই দৌড়ে একটা ভবনের কোণে এসে লুকিয়ে পড়লো।

জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দটা নিরব নিখর এলাকায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলো।

বর্ন এক দৌড়ে ভিলিয়ার্সের বাড়ির কাছে একটা ভবনের আড়ালে চলে এলো। আগুনটা হড়িয়ে পড়ছে। ভাঙা জানালা দিয়ে বের হওয়া বাতাসের কারণে আগুনটা আরো বেড় যাচ্ছে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘরটা জ্বলন্ত চুলায় পরিণত হয়ে গেলো। চিংকার চেঁচামেঁচি আর আশপাশের জানালা খোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এক

মিনিটের মধ্যে হৈহুলাটা বেশ বেড়ে গেলো। আগুন লাগা বাড়িটার দরজা খুলে গেলে নাইট গাউন পরা একজন বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা আতঙ্কে বের হয়ে এলো।

লোকজনের ভীড় বাড়লে জেসন দৌড়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। কার্লোসের লোকদেরকে এখান থেকে দেখার চেষ্টা করলো সে। তার ধারণাই ঠিক। পার্ক মঁশিউ'তে কেবল এই দু'জন লোকই পাহারা দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে চারজন। সিডানটার সামনে এসে একে অন্যের সাথে কথা বলছে তারা। না, পাঁচজন। আরেকজন কোথেকে যেনো এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলো।

সাইরেনের শব্দ শুনতে পেলো জেসন। কাছেই তেড়ে আসছে সেটা। পাঁচজন লোক সতর্ক হয়ে উঠলো। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা যেখানে আছে সেখানে থাকতে পারে না। হয়তো গ্রেফতার করা হতে পারে। একমত হলো তারা। একজন লোক থাকবে। পঞ্চম জন। সে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভিলিয়ার্সের বাড়ির দিকে হেটে গেলো। বাকিরা সিডানে উঠে বসতেই সিডানটা ছুটে চলে গেলো।

একটা বাঁধা রয়ে গেলো : পঞ্চম লোকটা। জেসন লোকটাকে ভিলিয়ার্সের বাড়ির দিকে যেতে দেখলো। এখন সময় হয়েছে তার আরেকটা কৌশল প্রয়োগ করার।

আগুনের দিকে যেভাবে লোকজন দৌড়ে যাচ্ছে জেসনও ঠিক সেইভাবে দৌড়ে গেলো কিন্তু চোখ দুটো থাকলো কর্নারের দিকে। হৈহুগোলের মাঝে সে ঐ লোকটাকে অতিক্রম ক'রে গেলেও সে খেয়ালই করলো না, কিন্তু জেসন যদি ভিলিয়ার্সের বাড়ির প্রবেশপথের সিঁড়ির দিকে যেতে থাকে এবং দরজাটা খোলে তবে খেয়াল করবে নিশ্চিত। লোকটা সামনে পেছনে তাকালো। সে খুব সতর্ক আর বিস্মিত। হয়তোবা এখন একা একা নজরদারি করছে বলেও একটু ভড়কে থাকতে পারে। সে পার্ক মঁশিউ'র আরেকটা বিলাসবহুল বাড়ির প্রবেশপথের সিঁড়ির রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো।

জেসন থেমে গেলো, লোকটার পাশে দুই পা এগিয়ে গিয়ে বাম পা'টা মাটিতে রেখে ডান পা'টা ঘুরিয়ে লোকটার পেট বরাবর লাথি মারলো। লাথির আঘাতে লোকটা পেছন দিকে হুমরি খেয়ে রেলিংয়ের উপর প'ড়ে গেলো। লোকটা মেঝেতে পড়তেই চিৎকার দিলো। বর্ন রেলিং উপকে লোকটার বুকের উপর দু'পায়ের হাটু দিয়ে জোরে আঘাত করলে পাঁজরের হাড় ভাঙার শব্দ শোনা গেলো। দু'হাতে লোকটার গলা চেপে ধরলো সে। কার্লোসের সৈনিকটির দম বন্ধ হয়ে এলো। অনেকক্ষণ পর কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই কেবল তার জ্ঞান ফিরে আসবে। জেসন লোকটার দেহ তত্ত্বাশী ক'রে বগলের নীচ থেকে একটা অস্ত্র খুঁজে পেলো। অস্ত্রটা সে নিজের কোটের পকেটে রেখে দিলো। এটা সে ভিলিয়ার্সকে দেবে।

ভিলিয়ার্স। পথটা এখন পরিষ্কার।

তৃতীয় তলার সিঁড়িটা দিয়ে উঠছে সে। সিঁড়ির উপরে থেকেই দরজার নীচ দিয়ে শোবার ঘরের বাতির আলোটা দেখতে পেলো। সেই দরজার ওপাশেই এক বৃদ্ধ আছে, তার একমাত্র আশা। এখন আর বহরুপীর কোনো সুযোগ নেই। তার সব বিশ্বাসের ভিত্তি একটাই। কার্লোস তার পিছু নেবে। এটা সত্য। আর এটাই ফাঁদ।

সে শোবার ঘরের দিকে এগোলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলো নিজের বুকের ধূপ ধূপ শব্দটা বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু সেটা আরো বেড়ে গেলো।

একটা চুক্তি...একটা কন্ট্রাক্ট...একদল লোকের সাথে...সম্মানিত সব লোকজন—যারা কার্লোসের পেছনে লেগেছে। এটাই খালি ভিলিয়ার্সকে জানতে হবে। এটা সে মেনে নিয়েছে। সে বলবে না তার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে। সেন সায়ার-এর বীর এটা মেনে নেবে না। এখন তো নয়ই।

ওহ ঈশ্বর! বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে যে পাথর্য্য, সেটা খুবই ক্ষীণ...স্মৃতিভ্রষ্ট একজনের নাম জেসন বর্ন নয়।

দরজাটা খুলে সে ভেতরে ঢুকলো। বৃদ্ধলোকের ব্যক্তিগত নরকে। বাইরে সাইরেন আর হৈহুল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জেসন দরজাটা বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বড়সড় ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে আছে। একমাত্র আলো ছোট্ট একটা টেবিল ল্যাম্প। যে দৃশ্য সে দেখতে পেলো সেটা তার দেখার কথা নয়।

ভিলিয়ার্স একটা চেয়ার নিয়ে বিছানার পাশে বসে আছে। তাকিয়ে আছে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে প'ড়ে থাকা তার বউয়ের দিকে। এনজেলিক ভিলিয়ার্সের চোখ দুটো খোলা, যেনো কোটর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসছে। শরীরের পোশাক আলুথালু। স্তন জোড়া অনেকটাই উন্মুক্ত। এমনকি মৃত হলেও সেগুলো বেশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ।

বৃদ্ধ সৈনিকটি এবার বর্নের দিকে তাকালো। “বাইরে কি হয়েছে?” উদাস কণ্ঠে সে জানতে চাইলো।

“লোকজন আপনার বাড়ির দিকে নজর রাখছিলো। কার্লোসের পাঁচজন লোক। আমি ব্লকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। কেউ আহত হয় নি। সবাই চলে গেছে, কেবল একজন রয়ে গেছে। আমি তাকে ঘায়েল করেছি।”

“তুমি আসলেই কাজের লোক, মর্সিয়ে বর্ন।”

“আমি কাজের লোকই বটে,” জেসন একমত হয়ে বললো। “তবে তারা ফিরে আসবে। আগুনটা নিভে গেলেই তারা সবাই ফিরে আসবে। আর কার্লোস যদি বুঝতে পারে, আমার ধারণা সে বুঝতে পারবে, তাহলে এখানে অন্য কাউকে পাঠাবে। সে অবশ্য নিজে এখানে আসবে না। তার লোকজন আসবে। আর সেই লোক যখন আপনাকে, আপনার বউকে খুঁজে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খুন করবে। কার্লোস তার প্রিয়তমাকে হারালেও সে-ই জিতে যাবে। সে দ্বিতীয়বারের মতো জিতে যাবে। সে এই মেয়েটাকে দিয়ে আপনাকে ব্যবহার করেছে, শেষে

আপনাকে খুন করবে। পার পেয়ে যাবে সে। লোকজন অনেক কিছু ভাববে, তবে মনে হয় না ভালো কিছু ভাববে।”

“তুমি ঠিকই বলেছো। নিজের বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত।”

“আমি জানি আমি কি বলছি। আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা বলতে পছন্দ করছি না, কিন্তু না বলেও পারছি না। আপনার অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় আমাদের হাতে নেই।”

“আমার অনুভূতি ব’লে কিছু আর বাকি নেই। বলো, কি বলবে।”

“আপনার বউ আপনাকে বলেছে সে একজন ফরাসি, তাই না?”

“হ্যাঁ। দক্ষিণ ফ্রান্সের। তার পরিবার স্পেনের সীমান্তে লুরে বারুয়া এলাকার। কয়েক বছর আগে সে প্যারিসে এসেছে। তার এক চাচির সাথে থাকতো। তাতে কি হয়েছে?”

“আপনি কি তার পরিবারের কারোর সাথে কখনও দেখা করেছেন?”

“না।”

“আপনাদের বিয়েতেও তারা আসে নি?”

“সব দিক বিবেচনা ক’রে আমরা ঠিক করেছিলাম তাদেরকে না ডাকতে। আমাদের দু’জনের বয়সের পার্থক্য তাদেরকে বিব্রত করতো।”

“তার যে চাচি এখানে, এই প্যারিসে ছিলো, তার ব্যাপারটা কি?”

“এনজেলিকের সাথে আমার দেখা হওয়ার আগেই সে মরে গেছে। এসব বলার মানে কি?”

“আপনার বউ ফরাসি নয়। তার কোনো চাচি আছে বলেও আমি মনে করি না।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে?”

“সে একজন ভেনেজুয়েলান। কার্লোসের চাচাতো বোন। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তার প্রেমিকা। আমাকে বলা হয়েছে সে হলো একমাত্র ব্যক্তি যাকে কার্লোস পরোয়া করে।”

“একটা খানকি।”

“গুপ্তঘাতকের একটি হাতিয়ার। না জানি কতো লোককে টার্গেট করার কাজটা সে করেছে কার্লোসের জন্যে। তার কারণে না জানি কতো লোক খুন হয়েছে।”

“আমি তো তাকে দু’বার খুন করতে পারবো না।”

“আপনি তাকে ব্যবহার করতে পারতেন। এখন তার মৃত্যুকে ব্যবহার করতে পারেন।”

“পাগলের মতো সব কথা বলছো।”

“একমাত্র পাগলের মতো কাজ হবে আপনি যদি আপনার জীবনটা শেষ ক’রে দেন। তাহলে কার্লোসই জিতে যাবে। সে আপনাকে খুন করবে, আমাকে খুন করবে। আরো অনেককে খুন করবে। এটা হবে পাগলামি।”

“আর তুমি হলে সুস্থ একজন? তুমি এমন একটি অপরাধের জন্যে নিজেকে দোষী মনে করছো যে অপরাধটি তুমি করো নি? এই বেশ্যাটাকে খুন করা? এমন একটা খুন দাবি করা যা তোমার নয়?”

“এটাই এটার অংশ। সত্যি বলতে কি, আসল অংশ।”

“আমার সাথে এইসব পাগলামি কথাবার্তা বলবে না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, চলে যাও। তুমি যা বললে সেটা কেবল আমাকে পরম করুণাময়ের মুখোমুখি হতে সাহস যোগাবে। যদি কোনো খুনের দায় নিতে হয় তো সেটা আমিই নেবো।”

“তাহলে আপনি নিজেকে শেষ ক’রে দেবেন,” জেসন এই প্রথম বৃদ্ধের জ্যাকেটের পকেটে যে অস্ত্রটা আছে সেটা টের পেলো।

“আমি কোনো মামলার মুখোমুখি হবো না, যদি তুমি সেটা বুঝিয়ে থাকো।”

“ওহ, এটা তো বেশ ভালো হয়, জেনারেল! কার্লোস নিজেও এতোটা ভালো ভাবতে পারবে না। তাকে তো নিজের অস্ত্রটাও ব্যবহার করতে হবে না।”

“খুনি আর চোরেরা কি বললো তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।”

“আর আমি যদি সত্য কথাটা বলি? বলে দেই কেন আপনি তাকে খুন করেছেন?”

“কে শুনবে তোমার কথা? এসব বলার জন্যে কি তুমি বেঁচে থাকবে। আমি বোকা নই, মসিঁয়ে বর্ন। তুমি কার্লোসের চেয়েও বেশি দৌড়ের উপর আছে। তোমাকে অনেকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, একজন নয়। এটা তো তুমিই আমাকে বলেছো। তোমার দাবি, তুমি তোমার নাম আমাকে বলবে না...আমার নিজের নিরাপত্তার জন্যেই। আর এসব যখন শেষ হবে আমি আর তোমার সাথে দেখা করার ইচ্ছে পোষণ করবো না। এইসব কথা যে লোক বলে তার উপর তো আর বিশ্বাস রাখা যায় না।”

“আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।”

“হ্যা, করি। কেন করি বলছি,” তার মৃত বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললো ভিলিয়ার্স। “সেটা তোমার চোখে আছে।”

“সত্যটা?”

“সত্যটা।”

“আমার দিকে তাকান। সত্যটা দেখা যাবে। নানতেয়ার-এর পথে আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনি আমার কথা শুনবেন, কারণ কারণ আমি আপনার জীবন দিয়েছি। আমি আবারো সেটা দেবার চেষ্টা করছি। আপনি চলে যান। আপনি জিতে গেছেন!...আপনি বেঁচে থাকুন, এটাই একমাত্র পথ, আমি বেঁচে থাকবো।”

বৃদ্ধ সৈনিক চোখ তুলে তাকালো। “কেন?”

“আমি আপনাকে তো বলেছিই, আমি কার্লোসকে চাই, কারণ আমার কাছ থেকে কিছু একটা কেড়ে নেয়া হয়েছে—আমার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস কেড়ে নেয়া হয়েছে, আমার স্বাভাবিকত্ব —আর সেটা তার কারণেই। এটাই হলো সত্য—আমিও সেটা বিশ্বাস করি। আরো কিছু লোক এতে জড়িত আছে। কেউ হয়তো জঘন্য, কেউ হয়তো তা নয়। তাদের সাথে আমার চুক্তি ছিলো কার্লোসকে শেষ ক’রে দেয়া, তাকে ফাঁদে ফেলা। তারা যা চায় আপনিও তা চান। তবে এমন কিছু হয়েছে যা আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না—আমি সে চেষ্টাও করবো না—সেই সব লোক মনে করছে আমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তারা মনে করে আমি কার্লোসের সঙ্গে আঁতাত করেছি, তাদের কাছ থেকে মিলিয়ন ডলার চুরি ক’রে আমার আর তাদের মাঝে যেসব লোক আছে তাদের অনেককে হত্যা করেছি। সবখানেই তাদের লোক আছে। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে দেখা মাত্রই হত্যা করতে। আপনার কথাই ঠিক। আমি কার্লোসের চেয়েও বেশি দৌড়ের উপরে আছি। আমাকে যারা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদেরকে আমি চিনিও না, চোখেও দেখছি না। তারা যা বলছে আমি তা করি নি। কিন্তু তারা আমার কোনো কথাই শুনছে না। কার্লোসের সাথে আমার কোনো আঁতাত নেই—আপনিও সেটা জানেন।”

“আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। তোমার হয়ে একটা ফোন করা থেকে আমাকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারবে না। আমি সেটা তোমার কাছ থেকে পাবার দাবি রাখি।”

“কিভাবে? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? জেসন বর্ন নামের যে লোককে আমি চিনি তার সাথে কার্লোসের কোনো আঁতাত নেই। আমি এটা জানি কারণ সে আমার কাছে কার্লোসের রক্ষিতাকে উন্মোচিত করেছে। তাকে আমি গলা টিপে হত্যা করেছি...ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাই তো বলতে চাচ্ছেন, জেনারেল?”

বৃদ্ধ বর্নের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক’রে চেয়ে রইলো। বৈপরিত্যটা এখন তার কাছে পরিষ্কার। “তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।”

“বেশ। চমৎকার। কার্লোসই তাহেল জিতে যাবে। আপনি হেরে যাবেন। আপনা ছেলে হেরে যাবে। করুন—পুলিশকে ফোন করুন। তারপর নিজের ঐ অস্ত্রটা দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করুন! এটাই তো আপনি চান! আপনি একজন করুণার পাত্র! ঈশ্বর জানে আপনি কার্লোসের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। যে লোক আপনার ছেলেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে আপনি পেরে উঠবেন না।”

ভিলিয়ার্স মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। “এটা কোরো না। আমি বলছি, এটা কোরো না।”

“আমাকে বলছেন? আপনি আমাকে আদেশ করছেন? এক বৃদ্ধলোক আমাকে আদেশ করছে? ভুলে যান! আপনার মতো কোনো মানুষের কাছ থেকে আমি কোনো রকম অর্ডার মেনে নেবো না! আপনি একটা ধাপ্পাবাজ! আপনি আপনার শত্রুর চেয়েও খারাপ এক লোক। অন্ততপক্ষে তারা যা করতে চায় সেটা করার মতো বুকের পাঁটা তাদের আছে। আপনার সেটা নেই। যান, গুয়ে পড়ুন, মরে যান। কিন্তু আমাকে কোনো অর্ডার দেয়ার চেষ্টা করবেন না!”

ভিলিয়ার্স চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। “আমি তো তোমাকে বললামই। আর নয়!”

“আপনি কি বলেন আর না বলেন সেটা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিলো আপনি কার্লোসের লোক। সেটাই আসলে ঠিক। আপনি তার চামচা। তার হাতেই এখন মরবেন।”

বুড়ো লোকটার চেহারা তিক্ত একটা ভাব দেখা গেলো। সে নিজের অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো। “আমি জীবনে অনেক লোককে হত্যা করেছি। আমার পেশায় এটি অনিবার্য। প্রায়শই বিব্রতকরও। আমি এখন তোমাকে হত্যা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমার কথা না শুনলে আমি গুলি করতে বাধ্য হবো। চলে যাও। এই বাড়ি থেকে এক্ষুণি চলে যাও।”

“এটা তো খুবই চমৎকার। নিশ্চয় কার্লোসের মাথার সাথে আপনার মাথায় একটা সংযোগ রয়েছে। আপনি আমাকে খুন করবেন, তার জন্যে কাজটা সহজ ক’রে দেবেন!” জেসন এক পা এগিয়ে এলো। সে দেখতে পেলো ভিলিয়ার্সের চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে। তার হাতের অস্ত্রটা কাঁপছে। দেয়ালে সেটার ছায়াও কাঁপছে। টৃগারে একটু চাপ লাগলেই গুলি বের হয়ে যাবে। কিন্তু বর্নকে ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে। ভিলিয়ার্স ছাড়া সবই জলে যাবে। বুড়োকে সেটা বুঝতে হবে। জেসন আচমকা চিৎকার ক’রে উঠলো : “চালান গুলি! খুন করুন আমাকে। কার্লোসের কাছ থেকে অর্ডার নিন! আপনি তো আবার সৈনিক। আদেশ অমান্য করা আপনার কাজ নয়। আদেশ পালন করুন!”

কাঁপতে থাকা হাতটা একটু উঁচুতে উঠলো। অস্ত্রটা এবার ঠিক জেসনের মাথার দিকে তাক করা হলো। এরপরই বর্ন বুড়োর ফিস্ফিসাইনটা শুনতে পেলো।

“‘ভু এত উ সোলদাত...আরেতেজ...আরেতেজ।’”

“কি?”

“আমি একজন সৈনিক। কেউ একজন আমাকে সেটা বলেছে, এই তো কয়েক দিন আগেই। সে তোমার খুব প্রিয় একজন।” ভিলিয়ার্স বেশ শান্ত কণ্ঠে কথা বলছে। “মেয়েটা এক বুড়ো সৈনিককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সে কি, আর কি ছিলো এক সময়। সে আমাকে বলেছে আমি এক দৈত্য ছিলাম, আর সে সেটা

বিশ্বাস করে। তার কথা ঠিক ছিলো না—তার কথা মোটেও ঠিক ছিলো না—তবে আমার চেষ্টা করা উচিত।”

আন্দ্রে ভিলিয়ার্স অস্ট্রাটো নামিয়ে ফেললো। তার মধ্যে সৈনিকের আত্মমর্যাদা বোধ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। “তুমি আমাকে কি করতে বলবে?”

জেসন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো আবার। “কার্লোসকে আমার পিছু নিতে বাধ্য করুন। তবে এখানে, এই প্যারিসে নয়। এমনকি ফ্রান্সেও নয়।”

“তাহলে কোথায়?”

“আপনি কি আমাকে এই দেশ থেকে বের হতে সাহায্য করতে পারবেন? আপনাকে বলা উচিত, আমি একজন ফেরারি। ইউরোপের সবগুলো সীমান্তে আর ইমিগ্রেশন ডেস্কে আমার নাম আর বর্ণনা দেয়া আছে।”

“মিথ্যে অভিযোগে?”

“মিথ্যে অভিযোগে।”

“আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। উপায় অবশ্যই আছে। কনসিলার মিলেতেরার কাছে অনেক পথ আছে, আর আমি যা বলবো সে তা শুনবে।”

“একটা ভূয়া আইডেন্টিটি দিয়ে? তাদেরকে কারণটা না বলেই?”

“আমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমি সেটার যোগ্য।”

“আরেকটা প্রশ্ন। আপনি যে লোকটার কথা বলছেন, তাকে কি আপনি বিশ্বাস করেন—মানে, সে কি খুবই আস্তাভাজন?”

“খুব। সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি।”

“আরেকজন আছে। আপনি যাকে আমার খুব আপনজন ব’লে বললেন একটু আগে।”

“অবশ্যই। কেন? তুমি কি একা ভ্রমণ করবে?”

“একাই করতে হবে। সে আমাকে কখনও যেতে দেবে না।”

“তোমাকে তো তাকে কিছু বলতে হবে।”

“বলবো। বলবো, আমি এখানে, প্যারিসে, আমস্টারডামে অথবা ব্রাসেল্‌সের আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছি। সেসব শহরে, যেখানে কার্লোস অপারেশন চালায়। কিন্তু তাকে চলে যেতে হবে। আমাদের গাড়িটা মর্তমার্দ্দে’তে পাওয়া যাবে। কার্লোসের লোকেরা প্রতিটি রাস্তা, ফ্ল্যাট আর হোটেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে। আপনি এখন আমার সাথে কাজ করছেন। আপনার সহযোগী মেরিকে দেশে নিয়ে যাবে—সে ওখানে নিরাপদে থাকবে। আমি তাকে সেটা বলবো।”

“আমি এখন তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো। তুমি যদি না ফিরে আসো তবে কি হবে?”

বর্ন তার কণ্ঠটা দৃঢ় রাখার চেষ্টা করলো। “প্লেনে আমি অনেক সময় পাবো। যা ঘটবে সবই আমি লিখে রাখবো, আমার যা মনে আসবে...সবই। আমি সেটা

আপনার কাছে পাঠাবো, তার সঙ্গে মিলে আপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। সে আপনাকে দৈত্য বলেছে। সিদ্ধান্তটি ঠিক মতো নেবেন। মেরিকে রক্ষা করেন।”

“‘ভূ এত উ সোলদাত...আরেতেজ।’ তোমাকে আমি কথা দিলাম। তার কোনো ক্ষতি হবে না।”

“এটাই কেবল আমি আপনার কাছে চাইবো।”

ভিলিয়ার্স অস্ত্রটা বিছানার উপর ছুড়ে ফেলে দিলো। একটু কেশে সে বললো, “আমার তরুণ নেকড়ে বন্ধু, তোমার পরিকল্পনাটা কি?”

“আপনাকে দিয়ে শুরু করা, আপনি একেবারে বিধবস্ত আর বিপর্যস্ত। আপনি হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়ে গেছেন। একটা নির্দেশ পালন করছেন কিন্তু সেটা মোটেও আপনার বোধগম্য নয়।”

“বাস্তবতার চেয়ে তো তেমন ভিন্ন কিছু নয়, তাই না?” ভিলিয়ার্স কথার মাঝখানে বললো। “কিন্তু এটা কিভাবে হলো? কেন হলো?”

“আপনি যা জানেন—আপনার যা মনে আছে, সেটা হলো, আগুন লাগার সময় এক লোক আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার মাথায় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে আপনি জ্ঞান হারান। জেগে উঠে দেখেন আপনার বউ খুন হয়ে পড়ে আছে, শ্বাসরোধ ক’রে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার লাশের পাশে একটা চিরকুট। আর এই চিরকুটটা পড়েই আপনি হতবুদ্ধিকর অবস্থায় প’ড়ে গেছেন।”

“সেটা কি রকম?” সতর্কভাবেই বুড়ো সৈনিক জানতে চাইলো।

“সত্যটাই থাকবে,” জেসন বললো। “যে সত্যটা আপনি অন্য কাউকে জানতে দিতে চান না। কার্লোসের সাথে তার সম্পর্ক কি ছিলো সেটা। আপনার ছেলের হত্যাকাণ্ডের সাথে বেশাটা জড়িত ছিলো, ইত্যাদি। খুনি একটা চিরকুট আর ফোন নাম্বার রেখে গেছে, আপনাকে বলছে সেটা কার্লোসের কাছে পৌঁছে দিতে।”

“কার্লোসের কাছে?”

“না। সে একজন রিলেকে পাঠাবে।”

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি যদি জানি লোকটা কার্লোস তবে হয়তো নিজেকে ঠিক রাখতে পারবো না।”

“মেসেজটা তার কাছে পৌঁছে যাবে।”

“সেটা কি?”

“আমি সেটা আপনার জন্যে লিখে দেবো; আপনি সেটা তার পাঠানো লোকের কাছে দিয়ে দেবেন। একেবারে যথাযথভাবে হতে হবে সেটা।” বর্ন মৃত মেয়েটার দিকে তাকালে তার গলাটা শুকিয়ে এলো।

“আপনার কাছে কি এলকোহল আছে?”

“মদ?”

“না। পরিস্কার করার এলকোহল। পারফিউম হলেও চলবে।”

“আমি নিশ্চিত, মেডিসিন ক্যাবিনেটে এলকোহল আছে।”

“আপনি কি সেটা নিয়ে আসবেন, সেই সাথে একটা তোয়ালে?”

“তুমি করবেটা কি?”

“আপনার হাত যেখানে যেখানে রেখেছেন সেখানে আমার হাত রাখবো। যদি প্রয়োজন পড়ে সেজন্যে। অবশ্য আমি মনে করি না কেউ আপনার কথায় অবিশ্বাস করবে। আমি যখন এই কাজটা করবো তখন আমাকে এখান থেকে বের করার জন্যে যে লোকের সাথে কথা বলার দরকার তাকে ফোন করবেন আপনি। সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কার্লোসের রিলেকে ফোন করার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। পুলিশকে ডাকার অনেক আগে এটা করতে হবে। তা না হলে তারা এয়ারপোর্টে আমাকে ধরে ফেলবে।”

“আমি সকাল পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারবো ব’লে মনে হয়। একজন বৃদ্ধলোক খুবই মুশড়ে পড়েছে। সুতরাং সেটা খুবই স্বাভাবিক। তুমি কোথায় যাবে?”

“নিউইয়র্কে। আপনি সেটা করতে পারবেন? আমার কাছে জর্জ ওয়াশবার্ন নামের এক লোকের একটা পাসপোর্ট আছে। এটাতে ভালো কাজই হবে।”

“আমার কাজটা আরো সহজ ক’রে দিলে। তুমি ডিপ্লোমেটিক স্ট্যাটাস পাবে। আটলান্টিকের উভয় পাশেই প্রি-ক্রিয়ারেন্স পাবে।”

“একজন ইংরেজ হিসেবে? পাসপোর্টটা কিন্তু বৃটিশ।”

“ন্যাটো’র ব্যবস্থায় তুমি হলে একজন অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান টিমের সদস্য, একটি মিলিটারি নিগোশিয়েশনে জড়িত। আমরা তোমাকে দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে আরো নির্দেশনা নেবার জন্যে সহযোগীতা করছি। এরকমটি প্রায়শই ঘটে। দুটো ইমিগ্রেশন পয়েন্টেই তুমি দ্রুত পার হতে পারবে।”

“ভালো। আমি শিডিউল চেক ক’রে দেখেছি। সকাল সাতটায় একটা ফ্লাইট রয়েছে, এয়ার ফ্রান্সের একটা বিমান কেনেডি এয়ারপোর্টে যাবে।”

“ওটাতে তোমার ব্যবস্থা করা হবে,” বৃদ্ধলোকটি থামলো। “নিউইয়র্কে কেন? তোমার কি ক’রে মনে হলো কার্লোস তোমাকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত অনুসরণ করবে?”

“দুটো প্রশ্ন, কিন্তু অনেকগুলো জবাব,” বর্ন বললো। “সে আমাকে যেখানে চারজন লোক আর একজন মহিলাকে হত্যার অপবাদ দিয়েছে, যাদেরকে আমি চিনি না, আমি সেখানেই তাকে ফঁসাবো...তাদের একজন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ, আমার একেবারে নিকটজন।”

“আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।”

“আমি নিজেও বুঝতে পারছি কিনা জানি না। সময় নেই। পেনে আমি সব লিখে জানাবো আপনাকে। আমাকে প্রমাণ করতে হবে নিউইয়র্কের একটি ভবন সম্পর্কে কার্লোস জানতো। ওখানেই সব ঘটেছে। তাদেরকে বুঝতে হবে সে এটা জানতো। বিশ্বাস করুন আমাকে।”

“করছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন। সে কেন তোমার পিছু নেবে?”

জেসন মৃত মেয়েটার দিকে তাকালো। “প্রবৃত্তি, হয়তো। আমি এমন একজনকে খুন করেছি যাকে সে এই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে। তার জায়গায় আমি হলে আমিও কার্লোসকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে বেড়াতাম।”

“সে হয়তো আরো বেশি বাস্তববাদী। আমার মনে হয় এটাই তোমার পয়েন্ট।”

“আরো কিছু আছে,” জেসন মৃত এনজেলিক ভিলিয়ার্সের উপর থেকে চোখ সরিয়ে বললো। “তার হারানোর কিছু নেই। সবই অর্জন করতে চায় সে। কেউ জানে না সে দেখতে কি রকম, তবে সে আমাকে চেনে। এখনও সে আমার মনের অবস্থা সম্পর্কে জানে না। সে আমাকে থামিয়ে দিয়েছে, আমাকে অন্য এক লোকে পরিণত করেছে। হয়তো সে খুব বেশি সফল, হয়তো আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। আমার হুমকীগুলো অযৌক্তিক। আমি কতোটা অযৌক্তিক? একজন অযৌক্তিক লোক, একজন পাগল, একজন ভীত মানুষ।”

“তোমার হুমকীগুলো কি অযৌক্তিক? তুমি কি তাকে ধরতে পারবে?”

“আমি নিশ্চিত নই। আমি কেবল জানি আমার এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।”

মেরিকে ফোন করে মিথ্যে কথাটা বলার পর দশ মিনিট অতিক্রম হয়ে গেছে। মেরি যে তার কথা বিশ্বাস করে নি সেটা তার নিরবতার মধ্য দিয়েই বোঝা গেছে। কিন্তু মেরি তাকে বিশ্বাস করে। তারও কোনো উপায় নেই। মেরির কষ্ট উপশম করার মতো সময় তার নেই। সব কিছু এখন দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ভিলিয়ার্স নিচে গিয়ে ফ্রান্সে একটা জরুরি ফোন করছে কনসিলার মিলিতেয়ার'র কাছে। একজন ভূয়া পাসপোর্টধারীকে কূটনৈতিক মর্যাদা দিয়ে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্যে। তিন ঘণ্টারও কম সময়ে এক লোক আটলান্টিকের উপর দিয়ে পাড়ি দেবে। নিজের মৃত্যুদণ্ডের বার্ষিকী পালন করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে সে। এটাই হলো মূলচাবিকাঠি। এটাই হলো ফাঁদ। আর এটা হলো শেষ অযৌক্তিক কাজ। বর্ন ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু আগে লেখাগুলো পড়ে দেখছে। এই ভাঙা ভাঙা শব্দগুলো একজন হতবাক হওয়া বৃদ্ধ ফোনে অজ্ঞাত এক রিলেকে জানাবে, যে কাগজটা কার্লোসকে দিয়ে দেবে।

আমি তোর কুণ্টিটাকে খুন করেছি। তোর কাছেও আমি খুব
জলদি আসবো। জঙ্গলে সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রট আছে। ঠিক তাম
কুয়ান-এর মতোই ঘন এক জঙ্গল। একটা পথ তুই মিস্

করেছিল। সেলে একটা সিন্দুক আছে যা তুই জানিস না—
ঠিক যেমনটি এগারো বছর আগে আমাকে হত্যা করার সময়
তুই আমার ব্যাপারে জানতি না। অন্য একজন জানতো, তুই
তাকে হত্যা করেছিল। সেই সিন্দুকে কিছু ডকুমেন্ট আছে যা
আমাকে মুক্তি দেবে। তুই কি মনে করিস আমি সেই চূড়ান্ত
প্রটেকশন ছাড়া কেইন হতে পেরেছি? ওয়াশিংটন আমাকে স্পর্শ
করার সাহস দেখাবে না! মনে হয় বর্নের মৃত্যুর দিবসে কেইন
কাগজগুলো নিয়ে নেবে, এটা নিশ্চিত ক'রে বলা যায়। এতে
ক'রে সে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। তুই কেইনকে মার্ক
করেছিল। আমি তোকে মার্ক করছি। আমি ফিরে আসছি, তুইও
ঐ মাগিটার সাথে যোগ দিবি।

-- ডেল্টা

বর্ন ডেস্কের উপর নোটটা রেখে মৃত মহিলার পাশে চলে এলো। এলকোহল শুকিয়ে
গেছে। সে উপুড় হয়ে লাশের শরীরে এমন জায়গায় আঙুলগুলো দিয়ে ছাপ দিলো
যেখানে অন্য কারোর আঙুলের ছাপ ছিলো।

পাগলামী।

অধ্যায় ৩৪

উত্তর-পশ্চিম প্যারিসের লেভালোয়ে'র চার্চের উপর সকালের প্রথম আলোটা এসে পড়লো। মার্চের সকাল খুবই ঠাণ্ডা, রাতের বৃষ্টির জায়গায় ভোরের কুয়াশা জেকে বসেছে। শহরের একদল বৃদ্ধ নারী পরিস্কার-কর্মী কাজ শেষ ক'রে ফিরে যাচ্ছে। ঐসব বৃদ্ধ মহিলাদের সঙ্গে ছেঁড়াফাড়া পোশাক পরা একদল বৃদ্ধলোকও আছে—ঠাণ্ডার কারণে নিজেদের ওভারকোটের গলা ধ'রে রেখেছে তারা। তাদের পকেটে আছে মদের বোতল।

ঐসব বৃদ্ধের ভীড়ে একজন বৃদ্ধ বেশ তাড়াহুড়ো ক'রে হাটছে। তবে তার মধ্যে অনিচ্ছাও আছে—এমনকি ভয়ও হতে পারে সেটা—তার ফ্যাকাসে মুখে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তার মধ্যে কোনো রকম দ্বিধা রইলো না। এরকম সময়ে চার্চে প্রার্থনা করার জন্যে একটু অদ্ভুতই বটে। তাসত্ত্বেও ভিক্ষুকটি সোজা চলে গেলো প্রথম বুথের দিকে। পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

“অ্যাঙ্গেলাস দোমিনি।”

“আপনি কি সেটা নিয়ে এসেছেন?” পর্দার ওপাশে থাকা আবছায়া অবয়বটা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো। রাগে তার কণ্ঠটা কাঁপছে।

“হ্যাঁ। সে এটা আমার হাতে এমনভাবে দিয়েছে যেনো সে একেবারে বিপর্যস্ত, আমাকে বলছিলো এক্ষুণি চল্‌ যেতে। সে তার কাছে থাকা কেইনের চিরকুটটা পুড়িয়ে ফেলেছে, আর বলেছে যদি এসবের একবর্ণও প্রকাশিত হয় সে সোজা অস্বীকার করবে।” বুড়ো লোকটা পর্দার নিচ দিয়ে কাগজটা দিয়ে দিলো।

“সে মেয়েটার কাগজ ব্যবহার করেছে—” খুনি চাপা কণ্ঠে বললো। একটু পরই পর্দার ওপাশ থেকে মৃদু একটা যন্ত্রণার শব্দ শোনা গেলো। অনেকটা কান্নার মতো।

“আমি তোমাকে স্মরণ করতে বলবো, কার্লোস,” ভিক্ষুক অনুনয় ক'রে বললো। “খবরটা যে বয়ে নিয়ে এসেছে সে তো খবরটার জন্যে দায়ি নয়। আমি যে এটা শুনেছি তা অস্বীকার করতে পারতাম। তোমার কাছে এটা নিয়ে আসার জন্যে রাজি নাও হতে পারতাম।”

“কিভাবে এটা হলো? কেন?...”

“লাভিয়া। তাকে অনুসরণ ক'রে সে পার্ক মঁশিউ'তে চলে গিয়েছিলো। তারপর তারা দু'জনে চার্চে আসে। আমি তাকে নুয়েলে সুর সেইন-এ দেখেছি যখন আমি তোমার জন্যে ওখানে গিয়েছিলাম। আমি সেটা তোমাকে বলেছি।”

“আমি জানি। কিন্তু কেন? সে তাকে আমার বিরুদ্ধে অনেকভাবে ব্যবহার করতে পারতো! কিন্তু এটা করলো কেন?”

“এটা তার চিরকুটেই লোখা আছে। সে পাগল হয়ে গেছে। অনেক বেশি বাড়াবাড়ি ক’রে ফেলেছে, কার্লোস। লোকটার সোর্স আর কনট্রোল সব শেষ হয়ে গেছে; সে এমন এক জায়গায় নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে, সে জানে না সে কি?”

“সে জানে...” কথাটা বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো সে। “ডেন্টা হিসেবে নিজেকে উল্লেখ ক’রে সে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে জানে। আমরা দু’জনেই জানি কোথেকে এটা এসেছে, কোথেকে সে এসেছে।”

ভিক্ষুক একটু চুপ মেরে বললো, “এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সে এখনও তোমার জন্যে বিপজ্জনক। সে ঠিকই বলেছে। ওয়াশিংটন তাকে স্পর্শ করবে না। তারা হয়তো তাকে স্বীকারই করবে না। এতে ক’রে তাকে হয়তো তার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে একটা বা দুটো সুবিধা দেয়া হতে পারে।”

“যে সব কাগজের কথা সে বলেছে?” গুপ্তঘাতক জানতে চাইলো।

“হ্যাঁ। বার্লিনে, প্রেগে, ভিয়েনাতে পুরনো সব দিনে—তারা বলতো ‘চুড়াগু পেমেন্ট’।”

বর্ন ‘চুড়াগু প্রোটেকশন’ ব্যবহার করবে, একটা ছোটোখাটো দ্বন্দ্ব। সেগুলো এমন সব কাগজপত্র যাতে প্রাথমিক সোর্স-কনট্রোল আর অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে সব কিছু বিস্তারিতভাবে আছে। এই ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার পুরো স্ট্র্যাটেজিটাকে ধ্বংস ক’রে ফেলবে। খুনখরাবি হবে, এজেন্টের জন্যে আর কোনো অভিনু খোলা থাকবে না। এটা এমন কিছু নয় যা তুমি নভগোরোদ-এ শিক্ষা নিয়েছো। সোভিয়েতদের এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। সোভিয়েত ডিফেক্টররা অবশ্য এইসব ব্যাপারে জোর দেয়।”

“তাহলে তো তারা দোষারোপ করে?”

“কিছুটা তো নিতেই হয়। যে ম্যানিপুলেটেড হয়েছে তার বেলায়। বিব্রত হওয়াটা সবসময়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়। তবে এটা তোমাকে আমার না বললেও চলে। তুমি এই টেকনিকটা বেশ ভালোভাবেই ব্যবহার করো।”

“‘জঙ্গলে সেভেনটি-ওয়ান স্ট্রট...’ ” কার্লোস তার হাতের কাগজটা পড়ে বললো। “‘তাম কুয়ান-এর মতো ঘন একটি জঙ্গল’...এবার হত্যাকাণ্ডটি ঠিক সময় মতোই সংঘটিত হবে। কেইনকে এবার মরতেই হবে, আর ডেন্টা যা করেছে তার জন্যে তাকে মরতে হবেই। এনজেলিক—তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি।” কার্লোস একটু থামলো। “বর্ন কখন তার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে, সে ব্যাপারে কি ভিলিয়ার্সের কোনো ধারণা আছে?”

“সে এটা জানে না। আমি তো তোমাকে বলেছিই, সে একেবারে উন্মাদের মতো হয়ে আছে।”

“তাতে কিছু যায় আসে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ফ্লাইট কিছুক্ষণ আগেই ছেড়ে চলে গেছে। সে ওরকম একটাতেই থাকবে। আমি নিউইয়র্কে তার সঙ্গে যাবো। আমি সময়টা হারাতে চাই না। আমার চাকু প্রতীক্ষা করছে। আমি তার মুখের চামড়া তুলে ফেলবো। আমেরিকানরা তাদের কেইনকে পাবে মুখহীন অবস্থায়! তখন তারা এই বর্ন কিংবা ডেল্টাকে তাদের যা খুশি একটা নাম দেবে।”

নীল স্ট্রাইপের ফোনটা আলেকজান্ডার ককলিনের ডেস্কে বেজে উঠলো। এই ফোনটার সাথে সরাসরি কম্পিউটার রুম আর ডাটা ব্যাক্সের সংযোগ আছে। ফোনটা ধরার মতো কোনো লোক এখন অফিসে নেই।

হঠাৎ করেই সিআইএ’র এক্সিকিউটিভ খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজা দিয়ে অফিসে ঢুকলো। টেলিফোনটার কাছে পৌছেই হাতের লাঠিটা রেগেমেগে ছুড়ে ফেলে দিলো সে। গত রাতেই ব্রাসেলস্ থেকে এন্ড্রুজ এয়ারফিল্ডে অবতরণ করেছে। না ঘুমানোর ফলে তার চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ট্রেডস্টোন ধ্বংসকারী লোকটা খুব ক্লান্ত। ওয়াশিংটন আর দেশবিদেশের গোপন-অপারেশনের কয়েকটি ব্রাঞ্চে আধভজন ফোন করেছে সে। বিগত চব্বিশ ঘণ্টার ভুলভ্রান্তিগুলো শোধরানোর চেষ্টা করেছে। তাকে ইউরোপের সর্বত্র অ্যালাট ক’রে দিতে হয়েছে। বর্ন বেঁচে আছে আর খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সে তার ডি.সি’র কন্ট্রোলকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। দশ ঘণ্টার মধ্যে সে যেকোনো জায়গায় চলে যেতে পারে। সমস্ত বিমানবন্দর আর রেল স্টেশনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সবগুলো আভারগ্ৰাউন্ড নেটওয়ার্ক সচল করা হয়েছে। তাকে খুঁজে বের করা! হত্যা করা!

“হ্যা?” ককলিন ডেস্কে বসেই ফোনটা তুলে নিয়ে বললো।

“কম্পিউটার ডক-১২ থেকে বলছি,” পুরুষ কণ্ঠটা বললো। “আমরা হয়তো কিছু একটা পেয়েছি। অশুভপক্ষে, স্টেটের কাছে এর উপর কোনো কিছু নেই।”

“কিসের?”

“যে নামটি আপনি আমাদেরকে চার ঘণ্টা আগে দিয়েছেন। ওয়াশবার্ন।”

“সেটার কি হয়েছে?”

“একজন জর্জ পি. ওয়াশবার্ন প্যারিস থেকে নিউইয়র্কে এসেছে ফ্রান্সের একটি ফ্লাইটে ক’রে, আজ সকালে। ওয়াশবার্ন নামটি খুবই কমন্। সে নিতান্তই একজন ব্যবসায়ী হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তার স্ট্যাটাস ন্যাটো-ডিপ্লোমেটিক, আমরা সেটা স্টেটের সাথে একটু চেক ক’রে দেখেছি। তারা কখনও এ নামটি শোনে নি। ফরাসি সরকারের সাথে এই নামে কোনো লোক ন্যাটোর পক্ষ হয়ে কোনো রকম নিগোশিয়েশনের কাজে জড়িত নয়।”

“তাহলে তাকে কিভাবে ক্লিয়ার করা হলো? তাকে কে ডিপ্লোমেটিক পরিচয়টা দিয়েছে?”

“আমরা প্যারিসে চেক ক’রে দেখেছি, এটা খুব সহজ কাজ নয়। বোঝা যাচ্ছে এটা কনসিলার মিলিতেয়ার ব্যবস্থা করেছে।”

“কনসিলার? আমাদের লোকদেরকে তারা কিভাবে ক্লিয়ার দেয়?”

“এটা আমাদের লোক অথবা তাদের লোক হতে হবে এমন ব্যাপার নয়। এটা যে কেউ হতে পারে। হোস্ট কান্ট্রির একটি সৌজন্যতা। তাছাড়া ওয়াশবার্নের পাসপোর্টটা এমনকি আমেরিকানও নয়, বৃটিশ।”

একজন ডাক্তার আছে, ইংরেজ এক ভদ্রলোক। নাম ওয়াশবার্ন...এটা তো সে! এটা হলো ডেল্টা, আর ফ্রান্সের কনসিলার তাকে সহযোগীতা করেছে। কিন্তু নিউইয়র্কে কেন? নিউইয়র্কে তার জন্যে আছেটা কি? আর প্যারিসের এমন উঁচু পর্যায়ের কে তাকে এরকম সহযোগীতা করার ব্যবস্থা ক’রে দিলো? তাদেরকে সে কি বলেছে? ওহ, যিশু! তাদেরকে সে কতোটুকু বলেছে?

“ফ্লাইটটা কখন এসে পৌঁছেছে?” ককলিন জানতে চাইলো।

“আজ সকাল সাড়ে সাতটায়। এখন থেকে প্রায় একঘণ্টা আগে।”

“ঠিক আছে,” ককলিন বললো। “তুমি এটা দিয়ে দিয়েছো, এবার রিল থেকে সব মুছে ফেলো। বুঝেছো?”

“বুঝেছি, স্যার। মুছে ফেলবো।”

ককলিন ফোনটা রেখে দিলো। নিউইয়র্ক? ওয়াশিংটন নয়, নিউইয়র্ক! ওখানে তো আর কিছু নেই। ডেল্টা তা জানে। সে যদি ট্রেডস্টোনের কারোর পিছু নেয়—তার পিছু নেয়—তবে সে সরাসরি ডালেস এয়ারপোর্টে নামবে। নিউইয়র্কে আছেটা কি? আর ডেল্টাই বা কেন ওয়াশবার্ন নামটি ব্যবহার করবে? সে তো জানেই এই নামটা খুব দ্রুত পিকআপ করা হবে। আমেরিকায় ঢোকান সাথে সাথেই এটা জানাজানি হয়ে যাবে। সে খালি ট্রেডস্টোন অপারেশনটাই ফাঁস ক’রে দেবে না, সে আর কতো গভীরে যাবে কে জানে। কৈইন হিসেবে সে যেসব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছে, লিসেনিং পোস্ট, ভূয়া কনসুলেট যা আসলে ইলেকট্রনিক গোয়েন্দাগিরি...এমন কি মেডুসার কথাও। কনসিলারের সাথে তার কানেকশনই প্রমাণ করে সে কতোটা উঁচু স্তরে যেতে পারে। সে ইঙ্গিত করছে, সে যদি এরকম কোনো লেভেলে অনুপ্রবেশ করতে পারে তো কোনো কিছুই তাকে থামাতে পারবে না। তাকে কী থেকে থামাবো? তার উদ্দেশ্যটা কি? তার কাছে কয়েক মিলিয়ন ডলার আছে। সে তো উধাও হয়ে যেতে পারতো!

ককলিন মাথা ঝঁকালো। মনে করলো। একটা সময় ছিলো যখন সে ডেল্টাকে উধাও হয়ে যেতে দিতো। বারো ঘণ্টা আগে প্যারিসের এক গোরস্থানে সে তাকে এটা বলেও ছিলো। কিন্তু ডেল্টা উধাও হয় নি! সে এক উন্মাদ বক্তব্য নিয়ে ফিরে এসেছে। অস্বাভাবিক দাবি করছে...এরকম বন্য কৌশল কোনো অভিজ্ঞ ইন্টেলিজেন্স অফিসার চিন্তাও করবে না। তার কাছে যে বিস্ফোরক তথ্যই থাকুক না কেন, সে যতো গভীরেই অনুপ্রবেশ করুক না কেন, কোনো সুস্থ মানুষ মাইনফিল্ডে

ফিরে আসবে না, যার চারপাশে রয়েছে অসংখ্য শত্রু । যতো ব্র্যাকমেইলই তুমি করো না কেন সেটা তোমাকে ফিরিয়ে আনবে না...

সুস্থ মানুষ নয় । সে মোটেও সুস্থ নয় । ককলিন চেয়ারে ব'সে পড়লো ।

আমি কেইন নই । সে কখনও তা ছিলো না । আমি কখনও সেটা ছিলাম না! আমি নিউইয়র্কে ছিলাম না...এটা কার্লোস । আমি নই, কার্লোস! যদি আপনার কথা অনুযায়ী সেভেনটি-ফার্স্ট স্ট্রট-এ সেটা হয়ে থাকে, এটা সে করেছে । সে জানে!

কিন্তু ডেন্টা তো সেভেনটি-ফার্স্ট স্ট্রট-এর ব্রাউনস্টোনে ছিলো । তার আঙুলের ছাপ আছে । পরিবহনের মেথডটা এখন বোঝা যাচ্ছে : এয়ার ফ্রাস, কনসিলারের সহায়তা...আসল কথা হলো : কার্লোস এটা জানতে পারবে না ।

আমার মনে অনেক কিছুই আসছে...অসংখ্য মুখ, দালানকোঠা...আমি কার্লোসের ব্যাপারে হাজারো তথ্য জানি, কিন্তু আমি জানি না কেন!

ককলিন চোখ বন্ধ করলো । একটা কোড যেটা ট্রেডস্টোনের শুরুতে ব্যবহার করা হতো । সেটা কি? এটা মেডুসা থেকে এসেছে...কেইন হলো চার্লি আর ডেন্টা হলো কেইন । এটাই সেটা । কেইন কার্লোসের জন্যে । ডেন্টা-বর্ন কেইন হয়ে উঠলো, আর সেটা কার্লোসের জন্যে একটা ফাঁদ হিসেবে ।

ককলিন চোখ খুললো । জেসন বর্ন ইলিচ রামিরেজ সানচেজকে প্রতিস্থাপন করবে, এটাই ছিলো ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান-এর পুরো পরিকল্পনা । এটা করা হয়েছিলো কার্লোসকে পাকড়াও করার জন্যে ।

বর্ন । জেসন বর্ন । একেবারেই একজন অজ্ঞাত লোক, এমন একজন লোক যে কিনা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চাপা প'ড়ে ছিলো । কিন্তু সে বেঁচে আছে; এটাও পরিকল্পনাটার একটি অংশ ।

ককলিন ডেস্কে ফাইলগুলো খুঁজে দেখলো । যে ফাইলটা চাচ্ছে সেটা পেয়েও গেলো । এটার কোনো টাইটেল নেই । কালো রঙের এক্স অক্ষরটার পরই একটি আদ্যাক্ষর আর দুটো সংখ্যা, নির্দেশ করছে এটাই হলো ট্রেডস্টোনের আসল ফোল্ডার ।

টি-৭১ এক্স । ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ান-এর জন্য ।

সে ফাইলটা খুললো, কী দেখতে পাবে সেটা নিয়ে সে একটু ভীতও বটে ।

দগাদেশের তারিখ । তাম কুয়ান সেক্টর । মার্চ ২৫...

ককলিন ডেস্কের ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকালো ।

মার্চ ২৪ ।

“ওহ্ ঈশ্বর,” সে চাপা একটা আত্ননাদ ক'রে ফোনটা হাতে তুলে নিলো ।

ডা: মরিস পানোভ বেথেসডার নাভাল এনেক্সের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ডের ডাবল দরজাটা দিয়ে প্রবেশ ক'রে কাউন্টারের নার্সদের দিকে

এগোলো। এক পোশাক পরা নার্সের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে যে কিনা কিছু ইনডেক্স কার্ড নাড়াচাড়া করছে, আর তার পাশে কটমট চোখে চেয়ে আছে একজন সিনিয়র নার্স। বোঝাই যাচ্ছে নার্সটি কোনো রোগীর ফাইল ওলটপালট ক'রে ফেলেছে।

“এ্যানির চোখ রাঙানিকে ভয় পেয়ো না,” পানোভ বললো নাভার্স নার্সের উদ্দেশ্যে। “এই ঠাণ্ডা আর অমানবিক চোখের আড়ালে বিত্তক গ্রানাইটের এক হৃদয় আছে। আসলে, সে দু'সপ্তাহ আগে পাঁচ তলার পাগলদের ওয়ার্ড থেকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু কথটা আমরা ভয়ে কাউকে বলি নি।”

নার্স খিল খিল ক'রে হেসে ফেললো। কিন্তু সিনিয়র নার্স বিরক্ত হয়ে মাথা দোলালো। এমন সময় কাউন্টারে রাখা ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলো।

“ফোনটা কি ধরবে, ডিয়ার,” তরুণীটিকে এ্যানি বললে সে মাথা নেড়ে ফোনের কাছে চলে গেলো। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সিনিয়র নার্স বললো, “ডাক্তার মো, আপনার উপস্থিতিতে আমি কিভাবে তাদের মাথায় এসব ঢোকাতে পারবো, বলবেন কি?”

“ভালোবাসার সাথে, ডিয়ার এ্যানি। ভালোবাসার সাথে। কিন্তু তোমার সাইকেলের চেইনটা ফেলে দিও না।”

“আপনি শোধরাবেন না। বলুন, আপনার পাঁচ-এ'র রোগী কেমন আছে? আমি জানি আপনি তাকে নিয়ে পেরেশানে ছিলেন।”

“এখনও আছি।”

“আপনি নাকি সারা রাত থাকবেন।”

“রাত তিনটায় একটা সিনেমা আছে টিভিতে, আমি সেটা দেখতে চাই।”

“সেটা করবেন না, মো,” সিনিয়র নার্স বললো। “ওসব দেখার বয়স আপনার হয় নি।”

“হয়তো সেসব না দেখার জন্যেও আমার বয়সটা একটু বেশি হয়ে গেছে, এ্যানি। ধন্যবাদ।”

আচমকাই পানোভ আর নার্স সচেতন হয়ে উঠলো যে, ডাক্তারকে পেইজ করা হয়েছে। তরুণী নার্স ডেস্কের মাইক্রোফোনটা দিয়ে কথা বলছে।

“ডা: পানোভের ফোন—”

“আমি ডা: পানোভ,” সাইক্রিয়াটুক মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললো। “আমরা চাই না কেউ জানুক, এ্যানি ডোনোভান আসলেই আমার পোল্যান্ডের আম্মাজান। কে ফোন করেছে?”

তরুণী নার্স পানোভের আই.ডি কার্ডের দিকে চেয়ে জবাব দিলো, “মি: আলেকজান্ডার ককলিন নামের একজন, স্যার।”

“ওহ্?” পানোভ চমকে গেলো। এলেক্স ককলিন পাঁচ বছর ধরেই তার একজন রোগী ছিলো, তারা যখন রাজি হলো সে মানিয়ে নিতে পারবে ততোদিন পর্যন্ত সে

অধীনেই ছিলো। অনেক কিছুই আছে কিন্তু তারা তার জন্যে খুব কমই করতে পেরেছে। “আমি কোথায় ফোনটা নিতে পারি, এ্যানি?”

“এক নাম্বার রুমে,” হলের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে নার্স বললো। “ওটা খালি আছে। আমি ফোনটা ওখানে ট্রান্সফার ক’রে দিচ্ছি।”

পানোভ দরজার দিকে যাবার সময় এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো।

“মো, আমি খুব দ্রুত কিছু জবাব চাই,” ককলিন ফ্যাস্ফ্যাসে কণ্ঠে বললো।

“আমি খুব দ্রুত জবাব দিতে অভিজ্ঞ নই, এলেক্স। আপনি কেন এখানে এসে আমার সাথে দেখা করছেন না?”

“এটা আমার ব্যাপারে নয়, অন্য কারোর জন্যে।”

“কোনো খেলা খেলবেন না, দয়া ক’রে। আমার মনে হয় এসব করার বয়স আমাদের নয়।”

“কোনো খেলা নয়। এটা ফোর-জিরো এমার্জেন্সি, আমার সাহায্যের দরকার।”

“ফোর-জিরো? আপনার একজন স্টাফকে ডাকুন। এরকম ক্রিয়ারেসের জন্যে আমাকে কখনও অনুরোধ করা হয় নি।”

“আমি পারবো না। এটা খুবই কঠিন একটি অবস্থা।”

“তাহলে সেটা ঈশ্বরের কানে কানে বলুন।”

“মো, প্রিজ! আমাকে কেবল সম্ভাবনাগুলো কনফার্ম করতে হবে, বাকিটা আমি নিজেই ক’রে নিতে পারবো। আর পাঁচ সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। একজন লোক হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো ভূতের বারোটা বাজাতে, সে যাকে ভূত মনে করবে তাকেই শেষ ক’রে দেবে। সে ইতিমধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোককে খুন করেছে, মনে হয় না সে এই ব্যাপারটা আদৌ জানে। আমাকে সাহায্য করুন। সাহায্য করুন!”

“যদি পারি তো করবো। বলুন।”

“দীর্ঘ দিন ধরে খুবই নাজুক আর প্রচণ্ড চাপের পরিস্থিতিতে আছে এক লোক, পুরো সময়টা একেবারে ডিপ কভারে রয়েছে। সে নিজেই একটা টোপ বা ফাঁদ—খুবই দৃশ্যমান আর নেতিবাচক। বিরামহীন চাপ দেয়া হয়েছে সেই দৃশ্যমানতাকে বজায় রাখার জন্যে। উদ্দেশ্যটা হলো ফাঁদটার সমজাতীয় একটি টার্গেটকে এই ব’লে ফাঁদে ফেলা যে, টোপটা তার জন্যে একটা হুমকি। এতে ক’রে টার্গেট প্রকাশ্য হবে...আপনি কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন?”

“এ পর্যন্ত বুঝতে পারছি,” পানোভ বললো। “আপনি বলছেন তাকে খুব চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে। তার পারিপার্শ্বিকতাটা কি রকম?”

“অসম্ভব হিংসাত্মক আর বন্য।”

“কতো দিন ধরে?”

“তিন বছর।”

“বাপরে বাপ,” মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বললো। “কোনো বিরতি নেই?”

“একদমই না। দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টা, বছরে তিনশ’ পয়ষট্টি দিন। তিন বছর। এমন একজন হিসেবে আছে যা তার নিজের পরিচয় নয়।”

“কখন আপনারা এই বোকার দল শিখবেন? এমনকি সবচাইতে বাজে বন্দী শিবিরের বন্দীরাও নিজেদেরকে নিজের মতো করেই ভাবে। অন্যদের সাথে কথা বলে—” পনোভ একটু থামলো। ককলিনের কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে সে। “এটাই তো আপনার পয়েন্ট, তাই না?”

“আমি ঠিক নিশ্চিত নই,” ইন্টেলিজেন্স অফিসার বললো। “এটা অস্পষ্ট, ঘোলাটে এমনকি স্ববিরোধীও বটে। আমি যেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হলো, এরকম লোক কি এইসব পারিপার্শ্বিকতায় ভাবতে শুরু করবে...মানে, বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে, সে নিজেই একটা ফাঁদ?”

“জবাবটা তো নিশ্চিত। আপনি জানতে চাইলেন ব’লে খুব অবাধ হচ্ছি। অবশ্যই সে ভাবতে শুরু করবে। সম্ভবত তাই করবে। সে যদি এটা বিশ্বাস করতে না শুরু করে তবে এতো দীর্ঘদিন ধরে সে ওরকম পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারবে না। অভিনেতা কখনও মঞ্চ থেকে নামতে পারবে না যদি নাটকটা শেষ না হয়।” ডাক্তার থেমে এবার আরো সতর্কভাবে বলতে লাগলো। “কিন্তু এটা বোধহয় আপনার প্রশ্ন নয়, তাই না?”

“না,” ককলিন জবাব দিলো। “আমি আরো একধাপ সামনে যাবো। ফাঁদটা বাদে এটাই একমাত্র ব্যাপার যা আমার বোধগম্য হচ্ছে।”

“দাঁড়ান,” পানোভ তীক্ষ্ণভাবে বাঁধা দিয়ে বললো। “আপনি ওখানেই থামুন। আপনি এখন যা নিয়েই ব্যস্ত থাকুন না কেন আমি কোনো ব্লাইন্ড ডায়াগনোসিস করি না। কোনোভাবেই না, চার্লি / এটা আপনি করতে পারেন, আমি পারি না—কোনো কনসালটেশন ফি দেন আর না দেন।”

“‘কোনোভাবেই না, চার্লি,’ এটা কেন বললেন, মো?”

“কি বলতে চাচ্ছেন, আমি কেন এটা বললাম? এটা একটা পদবাচ্য। আমি এটা সব সময় শুনে এসেছি। নোংরা নীল জিন্স পরা বাচ্চাছেলের দল আর আমার প্রিয় সেলুনের পতিতাদের কাছ থেকে।”

“আপনি কি ক’রে জানলেন আমি একটা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত?” সিআইএ’র লোকটা জানতে চাইলো।

“কারণ আমাকে বই-পুস্তক পড়তে হয়। আর আপনিও খুব অস্পষ্ট ক’রে কিছু বলেন নি। আপনি একজন ক্লাসিক প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যার একাধিক পারসোনালিটি রয়েছে। এটা এমন নয় যে, আপনার লোকটা ফাঁদ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, বরং ফাঁদটা নিজেই টার্গেটে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা নিয়েই আপনি বিচলিত, অ্যালেক্স। আপনি বলছেন আপনার লোকটা তিন জন

লোক : সে নিজে, ফাঁদ আর টার্গেট। আমি আবারো বলছি, কোনোভাবেই না, চার্লি। আমি কোনো এক্সামিন করা ছাড়া কোনো কিছু নিশ্চিত ক'রে বলবো না!”

“আমি আপনাকে কোনো কিছু নিশ্চিত ক'রে বলতে বলছি না! আমি কেবল জানতে চাই এটা সম্ভব কিনা। ঈশ্বরের দোহাই লাগে, মো। একজন ভয়ঙ্কর লোক অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর লোকজনকে খুন করছে। সে এমন সব লোকদের খুন করছে যাদের হয়ে সে তিন বছর কাজ করেছে। আর এ কাজটা সে করছে, তাও মনে হয় সে জানে না। একটা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট জায়গায় গেছে ব'লে অস্বীকারও করছে অথচ সেই জায়গায় তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। সে বলছে তার মনে কিছু ছবি, কিছু শব্দ আসছে—কিন্তু সেগুলোকে সে ঠিক ধরতে পারছে না। সে দাবি করছে সে কখনও ফাঁদ ছিলো না। কখনই ছিলো না! কিন্তু সে তো তাই! এটা কি সম্ভব? এটাই কেবল জানতে চাইছি। প্রচণ্ড চাপ এবং প্রতিদিনকার অসহ্য অবস্থার ফলে কি সে এভাবে তিন তিনটি ব্যক্তিতে ভেঙে পড়তে পারে?”

পানোভ কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রাখলো। “এটা সম্ভব,” সে আস্তে ক'রে বললো। “যদি আপনি যা বললেন সেগুলো সত্য হয়ে থাকে। এটাই আমি বলবো, কারণ আরো অন্যান্য সম্ভাবনাও রয়েছে।”

“ধন্যবাদ আপনাকে।” ককলিন একটু থামলো। “শেষ একটা প্রশ্ন। ধরুন একটা তারিখ আছে—একটা মাস আর একটা দিন—সেটা টোপটার ডোসিয়েরের জন্যে জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।”

“আপনাকে আরো নির্দিষ্ট ক'রে বলতে হবে।”

“বলছি। ঐ দিনটিতে ফাঁদের জন্যে যার নামটা নেয়া হয়েছিলো তাকে খুন করা হয়েছিলো।”

“তাহলে তো সেটা ওয়ার্ল্ডিং ডোসিয়েরের অংশ নয়, তবে আপনার লোক সেটা জানতো। আমি কি ঠিক বলছি?”

“হ্যা, সে জানতো সেটা। বলা যায় সে ওখানেই ছিলো। সে কি স্মরণ করতে পারবে?”

“ফাঁদ হিসেবে নয়।”

“অন্য দু'জন হিসেবে?”

“ধরে নিচ্ছি টার্গেটও সেটা জানতো। যদি জেনে থাকে সেক্ষেত্রে আমার জবাবটা হবে হ্যা।”

“আরেকটা জায়গা আছে, যেখানে স্ট্র্যাটেজিটা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে ফাঁদটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি আমাদের লোক সেই জায়গার আশেপাশে যায় আর সেটা যদি মৃত্যুর তারিখের দিন হয়ে থাকে, সেটা কি তার মনে উদয় হবে?”

“হবে, যদি মৃত্যুর আসল জায়গার সাথে সেটার কোনো সংযোগ থাকে। কারণ টোপটা সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে। এটা সম্ভব। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে সেই মুহূর্তে কোন্ ব্যক্তি তার উপরে ভর ক'রে আছে তার উপর।”

“ধরুন, সে নিজেই টার্গেট?”

“এবং সে জায়গাটা চেনে?”

“হ্যা, কারণ তার আরেকটা অংশ সেটা জানে।”

“তাহলে সে সেখানে যাবে। এটা ঘটবে অবচেতন মনের শক্তিতে।”

“কেন?”

“ফাঁদটাকে খুন করার জন্যে। সে যা দেখবে তাই খুন করবে। তবে প্রধান উদ্দেশ্য হবে ফাঁদটি। সে নিজে।”

ফোনটা রেখে দিলো আলেকজান্ডার ককলিন। তার চিন্তাভাবনাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে লাগলো। নিজেকে ধাতস্থ করার জন্যে বন্ধ ক’রে ফেললো দু’চোখ। প্যারিসের বাইরে একটি গোরস্থানে সে ভুল করেছে। একজন লোককে ভুল কারণে খুন করেছে চেয়েছিলো সে। আসল কারণটি তার বোধগম্যতার বাইরে। সে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের মোকাবেলা করেছে। এমন একজন, যার সমস্যা, যন্ত্রণা আর দুঃখগুলো বিশ বছরের ট্রেনিংয়েও ব্যাখ্যা করা হয়ে ওঠে নি। সত্যি ক’রে কেউ কিছু জানে না। একজন কার্লোস ফাঁদে পড়বে, আজকে খুন হবে, আরেকজন তার জায়গা দখল করবে। আমরা কেন সেটা করবো...ডেভিড?

ডেভিড। অবশেষে আমি তোমার নামটা বললাম। এক সময় আমরা বন্ধু ছিলাম, ডেভিড...ডেন্টা। আমি তোমার বউ আর বাচ্চাদের চিনি। আমরা এশিয়ার এক পোস্টে ব’সে কয়েকবার ডিনার করেছি, মদ পান করেছি। তুমি ছিলে প্রাচ্যে কর্মরত ফরেন সার্ভিসের সবচাইতে সেরা অফিসার, আর এটা সবাই জানতো। তুমি নতুন এক পলিসির মূলচাবিকাঠি হতে যাচ্ছিলে। তারপরই এটা ঘটলো। মেকং-এ আকাশ থেকে মৃত্যু। তুমি বেসমানী করেছো, ডেভিড। আমরা সবাই হেরে গেছি, তবে মেডুসায় আমাদের মধ্যে একজনই ডেন্টা হবে। তোমাকে অতো ভালো ক’রে চিনি না—দুয়েকবার ডিনার আর মদ খেলে তো ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। তবে আমাদের মধ্যে অল্পকয়েকজন প্ত হয়ে উঠেছিলো। যেমন তুমি, ডেন্টা। এখন তোমাকে মরতে হবে। তোমাকে আর কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

“চলে যাও, প্রিজ,” মর্তমার্কের ক্যাফে’তে মেরির মুখোমুখি বসতেই জেনারেল ভিলিয়ার্স তার সহকারীকে বললো। কিন্তু সহকারী মাথা নেড়ে সাই দিয়ে বুখ থেকে দশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। ক্লান্ত বৃদ্ধ লোকটি মেরির দিকে তাকিয়ে বললো, “তুমি কেন আমাকে এখানে আসার জন্যে চাপাচাপি করছিলে? সে চাচ্ছে তুমি প্যারিসের বাইরে চলে যাও। আমি তাকে কথা দিয়েছি তোমাকে নিরাপদে পাঠিয়ে দেবো।”

“প্যারিসের বাইরে, এসব ছেড়েছুড়ে,” মেরি বললো, বুড়ো লোকটার বিষন্ন মুখটার একপাশ স্পর্শ করে। “আমি দুঃখিত। আমি আপনার জন্যে আরেকটা বোঝা হতে চাই না। রেডিওতে আমি খবরটা শুনেছি।”

“বিকারগ্রস্ত সব কাজ,” সামনে রাখা ব্র্যাভিটা তুলে নিয়ে ভিলিয়ার্স বললো। “তিন ঘণ্টা ধরে পুলিশের সাথে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছি। এমন একজন লোককে অপরাধের জন্যে গালিগালাজ করে যাচ্ছি যে লোকটা আসলে আমি নিজেই।”

“বর্ণনাটা খুবই নিখুত। তাকে চিনতে কেউ ভুল করবে না।”

“সে নিজেই এটা আমাকে দিয়েছে। সে বলেছে এটাই হলো একমাত্র পথ। কার্লোস কেবলমাত্র আমার পুলিশের কাছে যাওয়াতেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। একটা মানুষ শিকার অভিযান সৃষ্টি করা। অবশ্য, তার কথাই ঠিক।”

“তার কথাই ঠিক,” মেরিও একমত হলো। “কিন্তু সে প্যারিসে, ব্রাসেল্‌সে কিংবা আমস্টারডামে নেই।”

“কি বললে, বুঝলাম না?”

“আমি চাই আপনি আমাকে বলুন, সে কোথায় আছে এখন।”

“সে নিজেই তোমাকে সেটা বলবে।”

“সে আমার কাছে মিথ্যে বলেছে।”

“তুমি কি করে নিশ্চিত হলে সে মিথ্যে বলেছে?”

“কারণ আমি জানি কখন সে আমার কাছে সত্য বলে। আমরা দু’জনেই সেটা বুঝি।”

“দু’জনেই...? আমি বুঝতে পারছি না।”

“আমার মনে হয় না আপনি বুঝতে পারবেন। আমি নিশ্চিত সে আপনাকে বলে নি। সে যখন আমার কাছে ফেনে মিথ্যে বলে একটু ইতস্তত করে, জানি কথাগুলো মিথ্যে। তবে রেডিওর খবরটা শোনার আগে আমি বুঝতে পারি নি। বর্ণনাটা খুবই নিখুত। এমনকি তার মাথার একটি দাগসহ দেয়া হয়েছে। তখনই আমি জানতাম সে আর প্যারিসে নেই। অথবা প্যারিসের পাঁচশ’ মাইলের মধ্যে নেই। অনেক দূরে চলে গেছে সে। যেখানে এইসব বর্ণনা খুব একটা কাজে আসবে না। যেখানে কার্লোস তার পিছু পিছু যাবে, তাকে তাদের কাছে ধরিয়ে দেয়া হবে যাদের সাথে জেসনের চুক্তি আছে। আমি কি ঠিক বলেছি?”

ভিলিয়ার্স মদের গ্রাসটা নামিয়ে রাখলো। “আমি কথা দিয়েছি, তোমাকে নিরাপদে রাখা হবে। তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“তাহলে আমি আরো পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করছি,” মেরি সামনের দিকে ঝুঁকে এসে বললো। “রেডিওতে আরেকটা রিপোর্ট ছিলো, সেই খবরটা আপনি শোনে নি। তখন আপনি পুলিশের ওখানে ছিলেন। আজ সকালে র‍্যামবোয়ের গোরস্থানে দু’জন লোক খুন হয়েছে। একজন সেন গার্ডেই’র খুনি হিসেবে পরিচিত। অন্যজন প্যারিসে বসবাস করা সিআইএ’র সাবেক এক কর্মকর্তা। খুবই

বিতর্কিত এক লোক, যাকে এক ভিয়েতনামি সাংবাদিক হত্যার দায়ে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছিলো।”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছো ঘটনাগুলোর সাথে সম্পর্ক রয়েছে?” বুড়ো লোকটি জানতে চাইলো।

“জেনসনকে আমেরিকান অ্যাশাসি গত রাতে নির্দেশ দিয়েছিলো গোরস্থানে যেতে। ওয়াশিংটন থেকে আসা এক লোকের সাথে ওখানে দেখা করার কথা ছিলো তার।”

“ওয়াশিংটন?”

“হ্যা। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের একটি ছোট্ট দলের সাথে তার একটি চুক্তি আছে। গতরাতে তারা তাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো। তারা মনে করে তাকে খুন করতেই হবে।”

“হায় ঈশ্বর, কেন?”

“কারণ তারা তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা জানে না দীর্ঘদিন ধরে সে কোথায় ছিলো অথবা কি করেছে সে। আর সেও তাদেরকে সেটা বলতে পারছে না।” মেরি চোখ দুটো বন্ধ করে একটু থামলো। “সে জানে না সে কে। সে এও জানে না তারা কারা। গতরাতে ওয়াশিংটন থেকে আসা লোকটা তাকে খুন করার জন্যে খুনি ভাড়া করেছিলো। সেই লোকটা কোনো কথা শুনবে না। তারা মনে করে সে তাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে, তাদের কাছ থেকে মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে। এমন সব লোককে খুন করেছে যাদেরকে সে কখনও দেখে নি। তবে তার কাছে এসবের কোনো পরিস্কার জবাবও নেই। তার কোনো স্মৃতি নেই বললেই চলে। একেবারে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে।”

ভিলিয়ার্সের দোমড়ানো মুখটাতে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো। “‘মিথ্যে অভিযোগ...’ সে আমাকে কথটা বলেছিলো। ‘তাদের সব জায়গাতেই লোকজন রয়েছে...আমাকে দেখামাত্রই হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আমাকে একদল লোক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে যাদেরকে আমি চিনি না, জানি না। সবই মিথ্যে অভিযোগে।’”

“একেবারেই মিথ্যে অভিযোগে,” মেরি কথটা জোর দিয়ে বলে বৃদ্ধের হাতটা ধরলো। “তাদের আসলেই সবখানে লোকজন রয়েছে। তারা দেখামাত্রই তাকে খুন করবে। সে যেখানেই যাক না কেন, তারা অপেক্ষা করবে।”

“সে কোথায় গেছে সেটা তারা কিভাবে জানবে?”

“তাদেরকে সে-ই বলবে। এটাই তার কৌশলের অংশ। আর সেটা যখন সে করবে তখন তারা তাকে হত্যা করবে। সে তার নিজের ফাঁদেই পা দিচ্ছে।”

ভিলিয়ার্স কিছুক্ষণ চুপ মেরে রাইলো। অবশেষে নিচু স্বরে কথা বললো সে। “হায় ঈশ্বর, আমি একি করেছি?”

“আপনি যা ভেবেছেন সেটা ঠিকই ছিলো। সে আপনাকে যা বুঝিয়েছে সেটাও ঠিক। আপনি নিজেকে এজন্যে দোষ দিতে পারেন না। অথবা তাকে।”

“সে বলেছে তার যা হবে সবই সে লিখে জানাবে। যা তার মনে আসে তাও জানাবে। তার জন্যে সেই বক্তব্যটা দেয়া কতোটা যন্ত্রণার ছিলো কে জানে! আমি চিঠির জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না, মাদামোয়াজেল। আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। তুমি আমাকে সব বলো। এখনই।”

“আপনি কি করতে পারবেন?”

“আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে যাবো। অ্যাম্বাসেডরের কাছে সব বলবো।”

মেরি একটু উদাস হয়ে গেলো। তার দু’চোখে অশ্রু। “সে আমাকে বলেছে তার জীবনটা শুরু হয়েছে ভূমধ্য সাগরের ছোট্ট একটা দ্বীপ ইল দ্য পোর্ট নোয়ে’তে...”

কনসুলার অপারেশন ডাইরেক্টরের অফিসে পররষ্ট্র সচিব রেগেমেগে ঢুকলো। এই ডিপার্টমেন্টটা গোপন অপারেশন পরিচালনা ক’রে থাকে।

“মি: সেক্রেটারি?...আমি আপনার অফিসের মেসেজ পাই নি, স্যার। আমি এক্ষুণি উপরে আসছি।”

সেক্রেটারি একটা হলুদ রঙের কাগজ ডাইরেক্টরের ডেস্কে আছাড় মেরে রাখলো। কাগজটার উপরে ছয়টি নাম বড়বড় ক’রে লেখা।

বর্ন। ডেন্টা। মেডুসা। কেইন। কার্লোস। ট্রেডস্টোন

“এটা কি?” সেক্রেটারি জানতে চাইলো। “আমি জানতে চাইছি এসব কি?”

ডাইরেক্টর কনস-অপ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। “আমি জানি না, স্যার। এগুলো নাম, এটা অবশ্য বুঝতে পারছি। কোনো কোড হবে হয়তো। মেডুসার নামটা অবশ্য আমি শুনেছি। আর কার্লোস মনে হয় ঐ কুখ্যাত খুনিটাই হবে। কিন্তু বর্ন, কেইন অথবা ট্রেডস্টোন নামটি আমরা কখনও শুনি নি।”

“তাহলে উপরে আমার অফিসে এসে এইমাত্র আমার সাথে প্যারিসের একজনের ফোনালাপের টেপটা শুনে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ক’রে যান!” সেক্রেটারি বিস্ফোরিত হলো। “সেই টেপে অসাধারণ কিছু জিনিস আছে। তার মধ্যে অটোয়া আর প্যারিসের খুনখারাবির কথাও রয়েছে। আর মতৌঁ’তে আমাদের ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে একজন সিআইএ’র অদ্ভুত সব কাজকারবারের কথাও আছে তাতে। এমন সব জিনিস আছে ঐ টেপে যার সম্পর্কে পররষ্ট্র দপ্তর কিছুই জানে না অথচ ইউরোপের সব পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে! আমরা কূটনৈতিক সংকটে প’ড়ে গেছি। কানাডিয়ান সরকারের একজন মহিলা অর্থনীতিবিদ জুরিখে হত্যার আসামী হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা একজন ফেরারিকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ সেই মেয়েটা যদি তার মুখ ঝুলে, সব সত্য বলে দেয়, তাহলে আমাদের পাছা আর আশু থাকবে না! আমি জানতে চাই এসব হচ্ছেটা কি? আপনার ক্যালেন্ডারের সব

বাতিল ক'রে দিন—সব কিছু মানে সব কিছুই। এই পুরো বিষয়টা জানতে যদি আপনাকে সারাটা দিন-রাত এখানে আমার সাথে থাকতে হয়, আপনাকে তাই করতে হবে। একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে যে জানে না সে কে। আর তার মাথায় যে গোপন তথ্য রয়েছে সেটা দশটি কম্পিউটারে রক্ষিত তথ্যের চেয়েও নাকি বেশি!”

প্রায় মধ্য রাতের পরই ক্লাস্ত কনসুলার ডাইরেক্টর সংযোগটা পেলো। আরেকটুর জন্যে কানেকশানটা মিস্ করতো। প্যারিসের ফাস্ট সেক্রেটারিকে এক্ষুণি বরখাস্ত করা হবে হুমকি দিলে সে আলেকজান্ডার ককলিনের নামটা বললো। কিন্তু ককলিনকে কোথাও পাওয়া গেলো না। সে ওয়াশিংটনে এসে পৌছেছে ব্রাসেল্‌স থেকে একটা মিলিটারি বিমানে ক'রে সকাল বেলায়। কিন্তু ল্যান্সলে'তে সাইন আউট করেছে দুপুর ১টা ২২মিনিটে। কোনো ফোন নাম্বার রেখে যায় নি—এমনকি কোনো জরুরি নাম্বারও। আর ডাইরেক্টর ককলিনের ব্যাপারে যা জানতে পারলো তাতে দেখা গেলো ভুলটা খুবই অসাধারণ।

সিআইএ'র এই লোকটাকে সবাই হান্স-শিকারী বলেই ডাকে। সে সারা বিশ্বে এমন সব স্বতন্ত্র কৌশল পরিচালনা ক'রে যাতে বিচ্যুতি আর বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ থেকে যায়। প্রায় সব স্টেশনে এই লোকটার অনুমোদন অথবা নিষেধাজ্ঞাকে আমলে নেয়া হয় যেকোনো সময়। এটা তো যুক্তিসঙ্গত নয় মোটেও। আরো যেটা অস্বাভাবিক সেটা হলো তার ফোন লগটা কাটাকুটি করা। বিগত দুই দিনের কোনো রেকর্ড নেই সেখানে। অথচ সিআইএ এ ব্যাপারে কড়াকড়ি নিয়ম মেনে চলে। নতুন সরকারের নতুন আদেশ হলো ট্রেস্ করা যায় এরকম জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। যাইহোক, কনস্-অপ'র ডাইরেক্টর শেষপর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছে : ককলিন মেডুসায় ছিলো।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ধমকিতে ডাইরেক্টর ককলিনের বিগত পাঁচ সপ্তাহের ফোন কলগুলো খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করেছে। ডাইরেক্টর তার পেটাগনের সোর্সকে ফোন ক'রে একটা বিষয়ে খোঁজ নিতে বললো : মেডুসা। বৃগেডিয়ার জেনারেল আরউইন আর্থার ক্রফোর্ড, বর্তমান পদবী আর্মির ইন্টেলিজেন্স ডাটা ব্যাঙ্কের অফিসার ইন চার্জ, সাইগনের সাবেক গোপন অপারেশন কমান্ডার—এখনও যেটা গোপনীয়। মেডুসা।

ডাইরেক্টর কনফারেন্স রুমের ফোনটা তুলে নিলো, এটার সাথে সুইচবোর্ডের বাইপাস রয়েছে। সে বৃগেডিয়ারের ফেয়ারফ্যাক্সের বাড়িতে ফোন করলে চতুর্থবার রিং হবার পর জেনারেল ফোনটা ধরলো। নিজের পরিচয় দিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকটা জেনারেলকে ফিরতি ফোন করার অনুরোধ জানালো।

“আমি কেন এটা করবো?”

“এটা ট্রেডস্টোন সংক্রান্ত একটি ব্যাপার।”

“ঠিক আছে, আমি আপনাকে একটু পরে ফোন করছি।”

আঠারো সেকেন্ড পরেই সে ফোনটা করলো, দুই মিনিটের মধ্যেই ডাইরেক্টর স্টেট ইনফর্মেশন-এর রুপরেখাটা দিয়ে দিলো।

“এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না,” বৃগেডিয়ার। “শুরু থেকেই এ ব্যাপারে একটি কনট্রোল কমিটি ছিলো, প্রচলনের এক সপ্তাহের মধ্যেই ওভাল অফিস একটি প্রাথমিক সামারি দিয়ে ছিলো। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্যে এর প্রয়োজন ছিলো, আপনি হয়তো সেটা জানেন।”

“এটার সাথে কি এক সপ্তাহ আগে ঘটে যাওয়া নিউইয়র্কের ঘটনাটার কোনো সম্পর্ক আছে? এলিয়ট স্টিভেন্স—মেজর ওয়েব এবং ডেভিড অ্যাবোট? পরিস্থিতিগুলো বদলে ফেলা হয়েছে বলে কি বলতে পারি?”

“আপনি বদলে ফেলার ব্যাপারে অবগত আছেন?”

“আমি কনস-অপ-এর হেড, জেনারেল।”

“অবশ্যই। স্টিভেন্স বিবাহিত ছিলো না। বাকিটা বোধগম্য। ডাকাতি এবং হত্যাকাণ্ডই বেশি পছন্দনীয় ছিলো। জবাবটা ইতিবাচক।”

“বুঝেছি...আপনাদের বর্ন গতকাল সকালে নিউইয়র্কে এসে পৌছেছে।”

“জানি। আমরা সেটা জানি—ককলিন এবং আমি। আমরাই তো উত্তরাধিকার।”

“আপনি ককলিনের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন?”

“আমি তার সাথে শেষ কথা বলেছি দুপুর একটার দিকে। এটা রেকর্ড করা নেই। সত্যি বলতে কি, সে রেকর্ড না করার ব্যাপারে জোর করেছে।”

“সে ল্যাসলে থেকে চলে গেছে। তাকে ফোন করার মতো কোনো নাম্বার নেই।”

“আমি সেটাও জানি। কোনো কিছু করার চেষ্টাও করবেন না। যথযথ সম্মানের সাথেই বলছি, সেক্রেটারিকে বলবেন এ নিয়ে যেনো তারা মাথা না ঘামায়। আপনিও মাথা ঘামাবেন না। এসবে জড়িয়ে পড়বেন না।”

“আমরা জড়িত হয়ে পড়েছি, জেনারেল।

“আমরা কানাডিয়ান মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসছি।”

“কিন্তু কেন?”

“আমরা বাধ্য হচ্ছি। মেয়েটা আমাদেরকে বাধ্য করছে।”

“তাহলে তাকে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখুন। আপনাকে সেটা করতেই হবে! সে আমাদের। আমরাই দায়ি হবো।”

“আমার মনে হয় আপনাকে এটা বুঝিয়ে বলতে হবে।”

“আমরা একজন মানসিক ভারসাম্যহীন লোককে নিয়ে কাজ করছি। একজন মাল্টিপাল সিজোফ্রেনিক। সে একটা জীবন্ত ফ্যারিং স্কোয়াড। সে এক ডজন নিরীহ লোককে খুন করতে পারে। কিন্তু সে জানে না কেন।”

“আপনি কি ক’রে জানলেন সেটা?”

“কারণ সে এরই মধ্যে খুনখারাবি ক’রে ফেলেছে। নিউইয়র্কের হত্যাকাণ্ডটি—সে-ই করেছে। স্টিভেন্স, ওয়েব আর সল্ল্যাসিকে হত্যা করেছে সে—আর বাকি যে দু’জনকে সে খুন করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি কিছু শোনেন নি। আমরা এখন বুঝতে পারছি সেটা। সে দায়ি নয়, তবে তাতে এখন আর কিছুই যায় আসে না। তাকে আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন। ককলিনের হাতে।”

“বর্নকে?”

“হ্যাঁ। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। তার আঙুলের ছাপ আছে। ব্যুরো সেটা নিশ্চিত করেছে। সে-ই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে।”

“আপনাদের লোক আকাম ক’রে নিজের আঙুলের ছাপ রেখে গেছে?”

“তাই তো করেছে।”

“এটা তো সে করতে পারে না,” স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকটা অবশেষে বললো।

“কি?”

“আমাকে বলুন কোথেকে আপনি এই ধারণায় আসলেন যে, লোকটা মানসিকভাবে অসুস্থ? ঐ যে বললেন না, মাল্টিপাল সিজোফ্রেনিয়া নাকি কি সব রোগ।”

“ককলিন একজন নামকরা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছে। ডাক্তার সাহেব নিশ্চিত এই রোগটির ব্যাপারে।”

“উনি এটা বলেছেন?” ডাইরেক্টর জানতে চাইলেন।

“হ্যাঁ।”

“ককলিনের কথার উপর ভিত্তি করেই? মানে, ককলিন যা মনে করে তার উপর ভিত্তি ক’রে?”

“আর কিছু বলতে পারবো না। তাকে আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন। সে আমাদের সমস্যা, আমরাই সেটা সমাধান করবো।”

“আপনি একটা বোকাচোদা, জেনারেল। আপনার উচিত আপনাদের ডাটা ব্যাল্কে একটু খোঁজ করা।”

“আমি সেটা করতে পছন্দ করি না।”

“পছন্দ করেন না। আমি যা মনে করছি সেটা যদি আপনি ক’রে থাকেন তবে আপনি আর কিছু করেন নি, কেবল অপছন্দ আর ঘৃণা ছাড়া।”

“বুঝিয়ে বলুন,” ক্রুফোর্ড রুক্ষভাবে বললো।

“আপনি কোনো অসুস্থ লোককে মোকাবেলা করেন নি, এরকম সিজোফ্রেনিয়া কিংবা মানসিক বৈকল্য সম্পন্ন কাউকে। আমার ধারণা আপনি আমার চেয়ে এসব বেশি জানেন না। আপনি এমন একজনকে মোকাবেলা করছেন যার কোনো স্মৃতি নেই। কয়েক মাস ধরে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কে, কোথেকে এসেছে। আর আমরা

যা জানতে পেরেছি তাতে বোঝা যাচ্ছে সে আপনাকে—ককলিনকে বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু ককলিন কিছুই শোনে নি। আপনারা কেউই শোনে ন। আপনারা একজন লোককে তিন বছরের জন্যে ডিপ কভারে পাঠিয়েছিলেন—কার্লোসকে পাকড়াও করার জন্যে। আর যখনই পুরো কৌশলটা ভেস্তে গেলো আপনার সবচাইতে বাজে কাজটা করার চিন্তা করলেন।”

“স্মৃতিভ্রষ্ট?...না, আপনি ভুল করছেন! আমি ককলিনের সাথে কথা বলেছি; সে সব শুনেছে। আপনি বুঝতে পারছেন না। আমরা দু’জনেই জানতাম—”

“আমি তার নামটা শুনতে চাই না!” কনসুলার অপারেশনের ডাইরেক্টর চিৎকার করে বললো।

জেনারেল একটু চুপ মেরে রাইলো। “আমরা দু’জনেই জানতাম...বর্ন...কয়েক বছর আগে। আপনি তো জানেনই কোথায়; আপনি নামটা আমার কাছে বলেছিলেন। সে আমার দেখা সবচাইতে অদ্ভুত এক লোক। বলা চলে, একেবারে প্যারানয়েড একজন। সে এমন সব মিশন গ্রহণ করেছে যা কোনো সুস্থ মানুষ কখনও করবে না। তারপরও সে কিছু দাবি করে নি। তার ভেতরে শুধু ঘৃণা। ঘৃণা আর ঘৃণা।”

“আর এজেন্সিই সে দশ বছর পরে এক সাইকোট্রিক ওয়ার্ডে একজন রোগী হয়ে গেলো?”

“সাত বছর,” ক্রফোর্ড শুধরে দিলো। “আমি তাকে ট্রেডস্টোনে নিয়োগ দিতে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সল্যাসী বলেছিলো সে সবচাইতে সেরা। আমি অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো তর্ক করি নি। তবে আমি আমার আপত্তির কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলাম। তার মনসিক ভারসাম্য একেবারে শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিলো। আমরা জানতাম সেটা কেন। অবশেষে আমার কথাই ঠিক হলো।”

“আপনার কোনো কথা ঠিক হয় নি, জেনারেল। আপনি আপনার লোহার পাছটা নিয়ে পতিত হবেন। কারণ সল্যাসির কথাই ঠিক। আপনাদের লোকটাই সেরা ছিলো। তার স্মৃতি থাকুক আর নাই থাকুক, সে কার্লোসকে টেনে নিয়ে এসেছে। একেবারে আপনাদের দরজার সামনে। বর্নকে যদি খুন না করেন, তবে তাই হবে।” ক্রফোর্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “আপনি ককলিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না, পারবেন কি?” সে জানতে চাইলো।

“না।”

“তার পতন হয়েছে, হয়েছে না? নিজের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে সে, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পার্টির মাধ্যমে পেমেন্ট করেছে। যারা একে অন্যকে চেনে না। সোর্সটা ট্রেস করা যাবে না। এজেন্সি আর ট্রেডস্টোনের সাথে সব রকম যোগাযোগের আলামত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আর এখন, অনেক লোকের হাতে কিছু ছবি চলে গেছে ককলিন যা জানে না, চিনবেও না। আমাদের ফায়রিং স্কোয়াডের কথা বলবেন না। আপনারটা জায়গা মতোই আছে, তবে আপনি সেটা

দেখতে পারছেন না—আপনি জানেন না সেটা কোথায় আছে। তবে এটা প্রস্তুত করা হচ্ছে—দোষী মানুষটাকে দেখামাত্রই আধ ডজন রাইফেল গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি কি চিত্রটা প'ড়ে শোনাবো?"

"আমি এই প্রশ্নের জবাব দেবো সেটা আপনি আশা করতে পারেন না," ক্রফোর্ড বললো।

"আপনাকে সেটা করতে হবে না। আমি কনসুলার অপারেশন, আমি সেখানে ছিলাম। তবে আপনি একটি বিষয়ে ঠিক বলেছেন। এটা আপনাদের সমস্যা। আপনাদের কোর্টেই সেটা ফিরে আসবে। আপনাদের সাথে আমরা কোনো যোগাযোগ রাখবো না। আমি এটাই সেক্রেটারিকে অনুরোধ করেছি। আপনি কে সেটা স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানার ক্ষমতা রাখে না। এই ফোন কলটাকে আনলগ বলেই ভাববেন।"

"বুঝেছি।"

"আমি দুঃখিত," ডাইরেক্টর বললো। জেনারেলের কণ্ঠে হতাশাটা টের পেলো। "যে কোনো সময় এটা বিবেক্ষারিত হবে।"

"হ্যাঁ। আমরা মেডুসায় এটা শিখেছি। মেয়েটাকে নিয়ে কি করতে চান আপনারা?"

"আমরা এমনকি এটাও জানি না আপনাকে নিয়েই বা কি করবো?"

"সেটা তো সহজ। আমরা চালিয়ে যাবো। আমরা জুরিখের বুকগুলো থেকে মেয়েটার রেকর্ড সরিয়ে দিতে পারবো।"

"আমরা মেয়েটাকে বলে দেবো। এতে হয়তো সাহায্য হবে। আমরা সবখানে ক্ষমা চাইবো। মেয়েটাকে নিয়ে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বোঝাপড়া করতে পারবো।"

"আপনি নিশ্চিত?" ক্রফোর্ড বললো।

"বোঝাপড়া নিয়ে?"

"না। স্মৃতিভ্রষ্ট ব্যাপারটা নিয়ে। আপনি কি পজিটিভ?"

"আমি কমপক্ষে বিশ্বাস টেপটা শুনেছি, তার কণ্ঠটা শুনেছি। আমি খুবই নিশ্চিত। ঘটনাচক্রে কয়েক ঘণ্টা আগে আরো একবার তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সে পিয়েরে হোটেলে আমাদের কজায় আছে। আমরা কি করবো সেটা ঠিক করার পরই তাকে সকালে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসবো।"

"দাঁড়ান!" জেনারেলের কণ্ঠটা চড়া হলো। "আগামীকালকে নয়! মেয়েটা এখানে...? তার সঙ্গে আমার দেখা করার ক্লয়ারেন্স দিতে পারবেন?"

"নিজের কবর আর বেশি খুঁড়বেন না, জেনারেল। মেয়েটা যতো কম নাম জানবে ততোই সবার জন্যে মঙ্গল। বর্ন যখন অ্যাডমিসিতে ফোন করেছিলো তখন সে তার সঙ্গেই ছিলো। সে ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং সম্ভবত ককলিনের ব্যাপারে জেনে গেছে। সে নিজেই নিজের পতন ঘটাক। আপনি এসব থেকে দূরে থাকুন।"

“এইমাত্র আমাকে বললেন দূরে সরে থাকতে ।”

“এভাবে নয় । আপনি একজন ভদ্রলোক, আমার মতোই । আর আমার হলাম পেশাদার লোক ।”

“আপনি বুঝতে পারছেন না! আমাদের কাছে ছবিগুলো আছে, হ্যা, তবে সেগুলো হয়তো কোনো কাজে লাগবে না । তিন বছরের পুরনো সেগুলো । বর্ন বদলে গেছে, আমূল বদলে গেছে । এজন্যেই ককলিন দৃশ্যপটে আবিভূত হয়েছে—কোথায়, আমি জানি না—তবে সে ওখানে আছে । সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে দেখেছে । তবে সেটা রাতের বেলায়, বৃষ্টির মধ্যে । মেয়েটা হতে পারে আমাদের একমাত্র সুযোগ । সে বর্নের সাথে ছিলো—কয়েক সপ্তাহ ধরেই ছিলো । তাকে সে ভালো করেই চেনে । অন্য কারোর চেয়ে সে-ই তাকে দ্রুত চিনতে পারবে ।”

“আমি বুঝতে পারছি না ।”

“আমি খুলে বলছি । বর্নের অনেকগুলো গুনের মধ্যে নিজের বেশভূষা আমূল পাল্টে ফেলার সক্ষমতা রয়েছে । রয়েছে জনতার ভীড়ে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার দক্ষতা । আপনার আশেপাশে থাকবে অথচ আপনি তাকে দেখতে পাবেন না । তাকে মেডুসায় একটা নামে ডাকা হতো...বহরুপী ।”

“সেটা তো কেইন, জেনারেল ।”

“আমাদের ডেল্টা । তার মতো কেউ নেই । আর এজন্যেই মেয়েটা সাহায্য করতে পারবে । এখন । আমাকে তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিন । তার সঙ্গে কথা বলতে দিন ।”

“আপনাকে সেই সুযোগ দিয়ে আমরা আপনাকে স্বীকার ক’রে নেবো । আমার মনে হয় না সেটা আমরা করতে পারি ।”

“ঈশ্বরের দোহাই, আপনি এইমাত্র বললেন আমরা দু’জন ভদ্রলোক! আমরা তার জীবনটা বাঁচাতে পারি! মেয়েটা যদি আমার সাথে থাকে আর তাকে যদি আমরা খুঁজে পাই তবে আমরা তাকে সেখান থেকে বের ক’রে আনতে পারবো!”

“সেখান থেকে? আপনি কি আমাকে বলছেন ঠিক কোথায় সে যেতে পারে?”

“হ্যা ।”

“কিভাবে?”

“কারণ সে এছাড়া আর কোথাও যাবে না ।”

“আপনি জানেন সে কখন ওখানে যাবে?”

“হ্যা । আজ হলো তার নিজের মৃত্যুদণ্ডের তারিখ ।”

অধ্যায় ৩৫

ট্যান ট্যান ক'রে রেডিওতে রক সঙ্গীত বাজছে, সেই গানের তালে তালে স্টিয়ারিংয়ের উপর দু'হাত রেখে চাপড় মারছে ইয়েলো ক্যাবের ড্রাইভার। ট্যাক্সিটা সেভেনটি ফাস্ট স্ট্রের পূর্ব দিকে মোড় নিতেই ইস্ট রিভার ড্রাইভ থেকে আসা গাড়িগুলোর মাঝখানে আঁটকা পড়ে গেলো। এখন সকাল ৮টা ৪৫ বাজে। কিন্তু নিউইয়র্কের ট্র্যাফিক জ্যামটার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এতো সকালেও সেটা জেকে বসেছে।

পেছনের সিটে গুটিসুটি মেরে ব'সে আছে বর্ন, কালো টুপি পরে সানগ্লাসের আড়াল থেকে বাইরের সারি সারি গাছের রাস্তাটা দেখছে সে। এখানে এর আগেও এসেছে, এ ব্যাপারে সে একদম নিশ্চিত। এখানকার পথঘাট, বাড়িঘর সবই তার চেনা। একটা বাড়ির ছাদে বাগান দেখতে পেলো। ঠিক এরকম আরেকটি বাড়ি আছে পাকিং এলাকাটার কয়েক ব্লক পরেই। বিশাল একটা ফ্রেঞ্চ দরজার একটা বাড়ি। সেই বাড়ির ভেতর একটা ঘর আছে। সেই ঘরটাও তার চেনা।

সেই বাড়িটা তার চেনা, সে জানে বাড়িটা খুব কাছেই। তার বুকের স্পন্দনটা টের পেলো। যতোই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ততোই তার স্পন্দনটা বাড়ছে। এই জায়গাটা দেখতে ঠিক প্যারিসের পার্ক মঁশিউর মতো।

আন্দ্রে ভিলিয়ার্সের কথা ভাবলো সে। শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে কেনা একটা নোটবুকে তার যতো দূর সম্ভব মনে পড়ে সবই লিখেছে। সেই বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় পোর্ট নোয়ে থেকে মার্সেই, জুরিখ আর প্যারিস—বিশেষ ক'রে প্যারিস। আন্দ্রে ভিলিয়ার্সের হাতে পড়লে এটার ভালো ব্যবহার হবে। মেরির পক্ষেও সম্ভব হবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া। কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকেই নোটবুকটা একটা খামে ভরে পার্ক মঁশিউ'র ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে সে। এটা পৌছাতে পৌছাতে সে মরেও যেতে পারে, বেঁচেও থাকতে পারে। কার্লোস তাকে খুন করবে, নয়তো সে কার্লোসকে খুন করবে। কেবল এই ব্যাপারেই সে নিশ্চিত।

এইতো সেটা! কালো রঙের দরজাটাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। দরজাটা খুবই ভারি কাঠের। কিন্তু উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রাইফেল আর হেভি ক্যালিবারের অটোমেটিক অস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে পারবে না সেটা। এখানে সে ছিলো—কিন্তু এ জায়গা সম্পর্কে তার মধ্যে যে আবেগের সঞ্চার হচ্ছে সেটা ঠিক ধরতে পারছে না। তার দু'চোখে জল এসে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে এই জায়গাটা তার শরীরেরই একটা অংশ। কিন্তু তার নিজের বাড়ি নয় এটা।

বাড়িটার দিকে তাকিয়েই মনে হচ্ছে এসব । কিন্তু কিছু একটা আছে—ফিরে আসার এক ধরণের তুমুল উত্তেজনা । যেখানে শুরু সেখানেই ফিরে এসেছে সে । তার ইচ্ছে করছে ট্যান্ড্রি থেকে নেমে ভারি দরজাটার কাছে দৌড়ে চলে যেতে, দু'হাতে দরজায় ধাক্কা মারতে ।

আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও! আমি এসেছি! আমাকে ভেতরে আসতে দাও! তোমরা কি বুঝতে পারছো না?

আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও!

তার চোখের সামনে অসংখ্য ছবি ভাসছে, কানে আসছে অনেক শব্দ । মাথাটা দপ দপ করে ব্যথা করছে এখন । একটা অন্ধকার ঘরে সে—সেই ঘরে—একটা পর্দার দিকে চেয়ে আছে যেখানে অনেকগুলো ছবি একের পর এক ভেসে উঠছে ।

কে সে? দ্রুত । তুমি খুব দেরি করে ফেলেছো! তুমি একজন মৃত মানুষ । এই রাস্তাটা কোথায়? এটা তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে? ওখানে কার সাথে তুমি দেখা করেছো? কি? ভালো । সহজ করে বলো । যতো কম সম্ভব, বলো । এই যে তালিকাটা : আটটি নাম আছে । কনটাক্টগুলো কোন্টা? দ্রুত! এই যে আরেকটা খুনের মেথড । তোমার কোন্টা?...না, না! ডেল্টা হয়তো এটা করবে, কেইন নয়! তুমি ডেল্টা নও, তুমি তুমি নও! তুমি হলে কেইন । তোমার নাম বর্ন । জেসন বর্ন । ধরতে পারো নি । আবার চেষ্টা করো । মনোযোগ দাও! বাকি সব বাদ । অতীতকে মুছে ফেলো । তোমার কাছে আর এটার অস্তিত্ব নেই । তুমি এখানে যা তুমি কেবল তাই!

ওহু ঈশ্বর । মেরি এটা বলেছিলো ।

হয়তো তোমাকে যা বলা হয়েছে কেবল তাই তুমি জানো...বার বার যেটা তোমাকে বলা হয়েছে । কিন্তু তুমি স্মরণ করতে পারছো না...

কারণ...ওগুলো তোমার নয় ।

তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো । সে কার্লোসকে লিখেছে সে ফিরে আসছে...সেইসব কাগজ-পত্র নিয়ে যা তার 'চূড়ান্ত প্রটেকশন' ।

এখন সে বুঝতে পারছে তার পরিচয়টা এই বাড়ির ভেতরে রয়েছে । তার পরিচয় । কার্লোস আসুক আর না আসুক, তাকে এটা খুঁজে বের করতে হবেই!

আচমকা একটা উন্মাদনা পেয়ে বসলো তাকে । নিজের মাথাটা পাগলের মতো এপাশ ওপাশ দোলাতে লাগলো এইসব চিন্তা দূর করার জন্যে । এখনও তার দু'কানে শব্দ আর চিৎকারগুলো হচ্ছে—চিৎকারটা তার নিজেরই । কষ্টটাও তার । কার্লোসের কথা ভুলে যাও । ফাঁদটার কথা ভুলে যাও । ঐ বাড়িটার ভেতরে যাও! ওখানেই আছে । ওখানেই শুরুটা আছে ।

বন্ধ করো এটা!

পরিহাসটা খুবই ভীতিকর । সেই বাড়িতে কোনো চূড়ান্ত সুরক্ষা নেই, কেবল তার জন্যে একটা সর্বশেষ ব্যাখ্যা আছে । আর কার্লোস ছাড়া এটা খুবই অর্থহীন

হবে। যারা তাকে শিকার করছে তারা সেটা জানে, তবে তারা এটা এড়িয়ে যায়। এজন্যেই তারা তাকে মৃত দেখতে চায়। কিন্তু সে খুব কাছে এসে পড়েছে...তাকে এটা খুঁজে বের করতেই হবে। ওখানেই সেটা আছে।

বর্ন চেয়ে দেখলো লম্বা চুলের ড্রাইভার রিয়ার ভিউ আয়না দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। “মাইগ্রেন,” জেসন চট ক’রে বললো। “এই ব্লকটা আবার ঘুরে আসুন। আমি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। আমি আপনাকে বলবো কোথায় আমাকে নামিয়ে দিতে হবে।”

“আপনার টাকা আপনার খুশি, মিস্টার।”

ব্রাউনস্টোন ভবনটা এখন তাদের পেছনে। বর্ন পেছন দিকে তাকিয়ে সেটা দেখলো। কার্পুনিটা কমে আসছে, তার মধ্যে জেকে বসা ভীতিটাও মিঁয়ে যাচ্ছে। শুধু ব্যথাটা রয়ে গেলো। তবে এটাও চলে যাবে। সে জানে। কয়েক মিনিট খুবই অসাধারণ কেটেছে। তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণটা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলো। এটা আর হতে দিতে পারে না সে। ফাঁদটা নিজেই সব কিছু। বাড়িটা আবার তাকে দেখতে হবে। ওটা আবার ভালো ক’রে নিরীক্ষণ করতে হবে। সারা দিন কাজ করতে হবে তাকে, নিজের কৌশলটাকে করতে হবে আরো পরিশুদ্ধ। নিজের ভেতরকার বহুপীড়াকে কাজে লাগাতে হবে। মোলো মিনিট পরে এটা একদম নিশ্চিত হয়ে যাবে।

আচম্কা সব কিছু আলাদা ব’লে মনে হচ্ছে। সবই বদলে গেছে। ব্লকের যানবাহনের গতি কমে আসছে। পথে আরেকটা ঝক্কির আর্বিভাব হলো। একটা ভ্যান ব্রাউনস্টোন বাড়িটার সামনে এসে থেমেছে। ওভার-অল পরা কিছু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট আর কফি খাচ্ছে। কাজ শুরু হবার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। কালো রঙের ভারি দরজাটা খুলে গেলে সবুজ জ্যাকেট পরা এক লোক বেরিয়ে এলো। বাম পকেটের উপরে কোম্পানির নামটি লেখা আছে। ফয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, তার হাতে একটা ক্লিপবোর্ড। ট্রেডস্টোন গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে! কয়েক ঘণ্টা পরে এটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। এটা তো হতে পারে না! তাদেরকে থামতে হবে!

জেসন সামনের দিকে ঝুঁকলো, তার হাতে টাকা, মাথার ব্যথাটা চলে গেছে। এখন তাকে সব দ্রুত করতে হবে। তাকে ওয়াশিংটনে ককলিনের কাছে পৌঁছাতে হবে। দেরি করা যাবে না, এখনই! ককলিন তাদেরকে এসব কাজ বন্ধ করতে বলবে! তার পুরো কৌশলটা ভিত্তি হলো অন্ধকার...সব সময় অন্ধকার। একজন গুপ্তঘাতক একটি পাথরের বাড়িতে রাতের বেলায় ঢুকবে। রাতের বেলায়। রাতেই এটা ঘটবে! এখন নয়! সে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

“এই যে, মিস্টার!” খোলা জানালা দিয়ে ড্রাইভার চিৎকার ক’রে বললো।

জেসন নিচু হয়ে উঁকি মেরে বললো, “কি হয়েছে?”

“আমি ধন্যবাদ দিতে চাইছিলাম। এটা আমাকে—”

হিস্ ক'রে তার কাঁধের উপর দিয়ে কিছু একটা চলে গেলো! তারপরই একটা আর্তনাদ। বর্ন ড্রাইভারের বাম কানের পাশ দিয়ে ঝরে পরা রক্তের দিকে চেয়ে রইলো। রাস্তার পাশে কোনো ভবনের জানালা থেকে করা গুলিতে লোকটা মরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গুইয়ে পড়লো জেসন। তারপরই গড়িয়ে বাম দিকে চলে গেলো সে। আরো দুটো ভোঁতা শব্দ হলে গুলি দুটো গাড়ির পাশে এসে বিধ্বলো।

এটা তো অবিশ্বাস্য! শিকার শুরু হবার আগেই তাকে মার্ক ক'রে ফেলা হয়েছে! কার্লোস আছে এখানে। ঐ জায়গায়! সে কিংবা তার কোনো লোক কোনো একটা বাড়ির ছাদে অথবা জানালা থেকে নজরদারি করছে অস্ত্রসহ। কিন্তু এভাবে জানালা থেকে খুন করাটা তো পাগলামী। পুলিশ আসবে, রাস্তাটা ব্লক হয়ে যাবে। এমনকি পাল্টা ফাঁদটা নস্যাৎ হয়ে যাবে। আর কার্লোস তো পাগল নয়! কিছুই মাথায় ঢুকছে না। তাকে ফাঁদটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে...পাল্টা ফাঁদটা থেকে। তাকে ফোনের কাছে যেতে হবে। কার্লোস আছে এখানে! ট্রেডস্টোনের দোরগোড়ায়! সে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। তাকে সত্যি ফিরিয়ে এনেছে। এটা তারই প্রমাণ।

সে উঠে লোকজনের ভীড়ের মধ্যেই দৌড়াতে লাগলো। রাস্তার মোড়ে এসে মোড় নিলো ডান দিকে—বুথটা বিশ ফিট দূরে। কিন্তু সেটাও একটা টার্গেট। এটা সে ব্যবহার করতে পারবে না। রাস্তার ওপাশে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে : টেলিফোন। সে এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু রাস্তা দিয়ে ছুটে চলা যানবাহনগুলোর জন্যে আরেকটু হলে সে মরতেই বসেছিলো। কার্লোসের হয়ে তারাই সেই কাজটা ক'রে ফেলেছিলো প্রায়। এই পরিহাসটাও ভীতিকর।

“সিআইএ সত্যিকার অর্থে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং অর্গানাইজেশন, স্যার,” ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটা একটু ঠাট্টাচ্ছলেই বললো কথাটা। “আপনি যে ধরণের কর্মকাণ্ডের কথা বলছেন সে রকম কিছু আমরা করি না। সত্যি বলতে কি চলচ্চিত্র আর কল্পকাহিনীর লেখকেরা এইসব উদ্ভট কাহিনী ছড়িয়ে থাকে।”

“আরে রাখুন আপনরা বকবকানি। আমার কথা শুনুন!” রেগেমেগে জেসন বললো। “আমাকে কেবল বলুন, ককলিন এখন কোথায়। এটা খুবই জরুরি!”

“উনার অফিস তো আপনাকে বলেছেই, উনি গতকাল বিকেলে চলে গেছেন, এই সপ্তাহের শেষে ফিরে আসবেন। যেহেতু আপনি বলছেন আপনি উনাকে চেনেন, তাহলে তো আপনারই ভালো করে জানা উচিত উনার কিছু শারিরীক সমস্যা রয়েছে। প্রায়শই উনি ফিজিক্যাল থেরাপি করতে যান—”

“আপনি এসব বলা বন্ধ করুন! আমি তাকে প্যারিসে দেখেছি—দু'রাত আগে। সে ওয়াশিংটন থেকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিলো।”

“আমরা ইতিমধ্যেই চেক ক'রে দেখেছি,” ল্যান্সলের লোকটা কথার মাঝখানে বললো, “এক বছরে মি: ককলিন দেশের বাইরে যান নি।”

“তাহলে লুকিয়ে গেছে! সে ওখানে ছিলো! আপনারা কোনো কোড চাচ্ছেন,” মরিয়্যা হয়ে বর্ন বলতে লাগলো। “আমার কাছে সেগুলো নেই। তবে ককলিনের সঙ্গে কাজ করে এমন কেউ কথাগুলো চিনতে পারবে। মেডুসা, ডেন্টা, কেইন...ট্রেডস্টোন! কেউ না কেউ চিনবেই!”

“কেউ চিনবে না। আপনাকে সেটা আগেই বলা হয়েছে।”

“যে বলেছে সে জানে না। এখানে এমন লোক আছে যারা এটা জানে। বিশ্বাস করুন!”

“আমি দুঃখিত। আমি আসলেই কিছু—”

“ফোনটা রাখবেন না!” আরেকটা পথ আছে। যেটা সে ব্যবহার করার কথা ভাবে নি। তবে এছাড়া আর কিছুই নেই। “পাঁচ-ছয় মিনিট আগে, আমি সেভেনটি-ফার্স্ট স্ট্রিট-এ গিয়েছিলাম। ওখানে কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো।”

“খুন...আপনাকে?”

“হ্যাঁ। আমি ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে উপড় হয়ে কথা বলতে গেলেই দূর থেকে আমাকে গুলি করা হয়। ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে যাই কিন্তু ড্রাইভার মরে গেছে। এটা সত্য, আর আমি জানি এই ব্যাপারটা আপনারা চেক ক’রে দেখতে পারেন। এরই মধ্যে ওখানে আধ ডজন পুলিশের গাড়ি পৌছে গেছে। আপনাদের তো চেক ক’রে দেখার অনেক উপায় আছে। এটা চেক ক’রে দেখেন। তবেই বুঝতে পারবেন আমার কথাগুলো কতোটা সত্যি।”

ওপাশে একটু নিরবতা নেমে এলো। “যেহেতু আপনি মি: ককলিনকে চাচ্ছেন, অন্ততপক্ষে উনার নামটা উল্লেখ করেছেন, আমি অবশ্যই এটা চেক ক’রে দেখবো। আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে পারি?”

“আমি এই লাইনে থাকবো। এই কলটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ডে করা। ফরাসি ইস্যু। নাম শামফোর্ড।”

“শামফোর্ড? কিন্তু আপনি বলেছেন—”

“প্ৰিজ।”

“আমি আসছি।”

অপেক্ষাটা অসহ্য লাগছে তার কাছে। এক মিনিট পরে ল্যান্সলের লোকটা ফিরে এলো।

“আমার মনে হয় এই সংলাপটি শেষ পর্যায়ে এসে গেছে, মি: বর্ন অথবা মি: শামফোর্ড। নিউইয়র্কের পুলিশকে ফোন ক’রে জানা গেছে এ রকম কোনো ঘটনা ওখানে ঘটে নি। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের চেক করার অনেক উপায় আছে। আমি আপনাকে বলছি এরকম ভূয়া খবর দেয়ার জন্যে কিন্তু আইনে কঠোর শাস্তির বিধান আছে। ভালো থাকবেন, স্যার।”

একটা ক্লিক ক’রে শব্দ হলে লাইনটা কেটে গেলো। অবিশ্বাসের চোখে বর্ন ফোনটার দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কয়েক মাস ধরে ওয়াশিংটনের লোকেরা

তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে, তার মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্যে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। কারণটা কি জেসন জানে না। অথচ এখন যখন সে নিজেকে তাদের কাছে উপস্থিত করছে, তারা তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। এখনও তারা তার কোনো কথা শুনছে না! কিন্তু ঐ লোকটা শুনেছে! তারপর লাইনে ফিরে এসে এমন একটা ঘটনা আর হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার করেছে যা আদতেই কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে। এটা তো একবারেই অসম্ভব। ঘটনাটা ঘটেছে।

জেসন ফোনটা রেখে বুথ থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে ফুটপাথ দিয়ে হাটতে লাগলো। নিজের কোটটি খুলে হাতে রেখে নিয়ে নিলো। চোখের সানগ্লাসটাও খুলে ফেলেছে। সে তাড়াহুড়া করে সেভেনটি-ফার্স্ট স্ট্রের চার রাস্তার মোড়ে এসে পড়লো।

মোড়ের দিকে রাস্তা পার হবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা একদল লোকের মাঝে ঢুকে পড়লো জেসন। মাথাটা বাম দিকে ঘোরালো। ট্যাক্সিটা নেই। নিখুঁত অপারেশন করে যেভাবে শরীরের ক্ষতিকর জিনিস সরিয়ে ফেলা হয় ঠিক সেভাবে ওটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটা যে ঘটেছে তার কোনো চিহ্নই নেই।

বর্ন এবার বিপরীত দিকে পা বাড়ালো। দক্ষিণ দিকে। তাকে একটা স্টোর খুঁজে বের করতে হবে। তাকে তার গায়ের চামড়া বদলে ফেলতে হবে। বহুধর্মে আর অপেক্ষা করতে পারবে না।

পিয়েরে হোটেলের সূটে ব্লেগডিয়ান জেনারেল আরউইন আর্থার ক্রফোর্ডের মেরিকে আটকে রাখা হয়েছে। মেরি ভীষণ ক্ষেপে আছে। “আপনি আমার কথা শুনছেন না!” সে অভিযোগের সুরে বললো। “আপনারা কেউই শুনছেন না। আপনাদের কি কোনো ধারণা আছে, তার সঙ্গে আপনারা কি করেছেন?”

“আমরা সবাই সেটা বেশ ভালো করেই জানি,” অফিসার জবাব দিলো। “আমি কেবল আপনাকে আবারো বলতে পারি যা ইতিমধ্যেই আপনাকে বলা হয়েছে। আমরা জানি না কি শুনতে হবে। যা শুনছি তার সাথে বাস্তবতার কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছি না। সে নিজেও কিছুই বুঝতে পারছে না। আমরা কি করে বুঝবো, বলুন?”

“সে সাত মাস ধরেই এসব বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে! কিন্তু আপনার কেবল লোক পাঠিয়ে তাকে খুন করতে চেয়েছেন। আপনারা কেমন লোক, বলুন তো?”

“ক্রটিয়ুক্ত, মিস্ মেরি। তবে ভদ্রলোক। আর এজন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। মানে, যদি আমরা পারি তো তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো।”

“ঈশ্বর, আপনারা আমাকে অসুস্থ করে ফেলবেন দেখছি!” মেরি মাথা ঝাঁকিয়ে নিলো একটু। তারপর নরম কণ্ঠে বললো, “আপনারা যা বলবেন আমি তাই

করবো, আপনারাও সেটা জানেন। এই ককলিন লোকটার সাথে কি যোগাযোগ করতে পারেন না?”

“আমি নিশ্চিত আমি সেটা করতে পারবো। আমি সেই বাড়িটার সামনে থেকে সরবো না যদি না সে আমার সাথে যোগাযোগ করে। সে হয়তো আমাদের চিন্তার বিষয় নয়।”

“কাল্‌সি?”

“হয়তো অন্যেরা।”

“আপনি কি বলছেন?”

“আমি সেটা যেতে যেতে বলবো। আমাদের একমাত্র ভাবনা হলো ডেল্টার সাথে যোগাযোগ করা।”

“জেন্সন?”

“হ্যাঁ। আপনি যাকে জেন্সন ব'লে জানেন।”

“সে আপনাদেরই একজন, শুরু থেকেই আপনাদের সাথে ছিলো,” মেরি বললো। “নিশ্চিহ্ন করার মতো কোনো ব্যাপার নেই, দরকষাকষির করার জন্যে কোনো পেমেন্ট অথবা ক্ষমার চাওয়ার কি কিছু আছে?”

“নেই। আপনাকে সময় মতো সবই জানানো হবে। কিন্তু এখন সেই সময়টা আসে নি। একটা আনমার্ক গাড়ির ব্যবস্থা করেছি আপনার জন্যে, আপনি সেটাতে ক'রে ঐ বাড়িটার আশেপাশে থাকবেন, আপনাকে একটা বাইনোকুলার দেয়া হবে। আপনি তো তাকে অন্য সবার চেয়ে ভালো ক'রে চেনেন। হয়তো আপনিই তাকে চিহ্নিত করতে পারবেন। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেনো সেটা করতে পারেন।”

মেরি ক্লোসেটের দিকে গিয়ে তার কোটটি তুলে নিলো। “একরাতে সে আমাকে বলেছিলো সে একজন বহুরূপী...”

“তার মনে পড়েছে তাহলে?” ক্রফোর্ড কথার মাঝখানে বললো।

“কি মনে পড়েছে?”

“কিছু না। কঠিন পরিস্থিতিতে সবার অলক্ষ্যে চলাফেরা করার প্রতিভা তার রয়েছে। এটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।”

“দাঁড়ান।” মেরি আর্মির লোকটার দিকে এগোলো। “আপনি বলছেন জেন্সনের সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। একটা ভালো উপায় আছে। তাকে আমাদের কাছে আসতে দিন। আমার কাছে। আমাকে সেই বাড়ির সামনে থাকতে দিন। আমার কথা শুনে রাখুন, সে আমাকে দেখবে। আমার কাছে খবর পাঠাবে!”

“ওখানে যে আছে তার হাতে দু'দু'জন টার্গেট তুলে দেয়ার কথা বলছেন?”

“আপনি আপনার নিজের লোককে চেনেন না, জেনারেল। আমি বলেছি ‘আমার কাছে খবর পাঠাবে’। সে কাউকে পাঠাবে, একজন নারী অথবা পুরুষকে ভাড়া ক'রে পাঠাবে আমার কাছে মেসেজটা পৌছে দিতে। আমি তাকে চিনি। সে

এটা করবে। এটাই একমাত্র নিশ্চিত উপায়।”

“আমি এটা করার অনুমতি দিতে পারি না।”

“কেন পারে না? আপনারা তো সবই বোকার মতো, অন্ধের মতো করেছেন! অস্তুত এই একটা জিনিস বুদ্ধিমানের মতো করেন!”

“আমি পারবো না। হয়তো এতে ক’রে সমস্যাটা সমাধান হবে, কিন্তু আমি সেটা করতে পারবো না।”

“আমাকে কারণটা বলুন।”

“ডেল্টার কথা যদি ঠিক হয়, কার্লোস যদি তার পিছু পিছু চলে আসে ওখানে, ঝুঁকিটা হবে খুবই মারাত্মক। ছবি দেখে কার্লোস আপনাকে চেনে। সে আপনাকে খুন করবে।”

“আমি স্বেচ্ছায় এই ঝুঁকিটা নিচ্ছি।”

“কিন্তু আমি নিচ্ছি না। এটা করতে হলে আমাকে আমার সরকারের সাথে কথা বলতে হবে।”

“আমার মনে হয় না আপনাকে তা করতে হবে।”

“এটা অন্যদের হাতেই ছেড়ে দিন। আমরা কি এবার বের হতে পারি, প্রিজ?”

“জেনারেল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,” নির্লিপ্তভাবে সুইচবোর্ডের অপারেটর জবাব দিলো।

“মি: জে. পেট্রোচিলি, প্রিজ,” আলেকজান্ডার ককলিন বললো। তার কণ্ঠটা খুবই চিত্তগ্রস্ত শোনাচ্ছে। নিজের কপালের ঘাম হাত দিয়ে মুছে নিলো সে। “একটু জলদি করুন!”

“সবাই দেখি বেশ তাড়ায় আছে—” কথাটা মিঁইয়ে গেলো। তার বদলে আরেকটা রিংয়ের শব্দ হলো।

“পেট্রোচিলি, রিক্রিমেশন ইনভয়েস ডিভিশন।”

“আপনারা করছেন কি?” সিআইএ’র লোকটা গর্জে উঠে বললো।

“এখন কোনো গর্দভের বোকা বোকা সব প্রশ্ন শুনছি।”

“তাহলে আরো শুনুন। আমার নাম ককলিন, সিআইএ থেকে বলছি। ফোর-জিরো ক্লিয়ারেন্স। এর মানে কি আপনি জানেন?”

“বিগত দশ বছর ধ’রে আপনার লোকেরা কি বলছে তার কিছুই আমি বুঝতে পারি নি।”

“এটা আপনি ভালো করেই বুঝবেন। এটা করতে আমার এক ঘণ্টা লেগে গেছে, তবে আমি নিউইয়র্ক থেকে একটা কোম্পানি সরিয়ে ফেলার কাজে নিয়োজিত ডিসপ্যাচারের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি। সে বলেছে তার কাছে

আপনার স্বাক্ষর করা একটা ইনভয়েস রয়েছে যাতে ১৩৯ নাম্বারের সেভেনটি-ফাস্ট স্ট্রের ব্রাউনস্টোনের সব আসবাব সরিয়ে ফেলার আদেশ আছে।”

“হ্যা, সেটা আমার মনে পড়েছে। তো হয়েছে কি?”

“আপনাকে এই আদেশটা কে দিয়েছে? এটা তো আমাদের জায়গা। আমরা গত সপ্তাহে সব ধরনের যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আবাবো বলছি, এর বেশি করার অনুরোধ তো করি নি।”

“একটু ধরুন,” বুরোক্র্যাট বললো। “আমি সেই ইনভয়েসটা দেখেছি। মানে, ওটা স্বাক্ষর করার আগে আমি বেশ ভালো করেই প’ড়ে দেখেছি। আপনারা আমাকে কৌতুহলী ক’রে তুলছেন। আদেশটা সরাসরি ল্যাঙ্গলে থেকে এসেছে।”

“ল্যাঙ্গলের কার কাছ থেকে?”

“আমাকে একটু সময় দিন, বলছি কে দিয়েছে। আমার কাছে ওটার একটা কপি আছে। আমার ডেস্কেই সেটা আছে।” ড্রয়ার খোলা আর কাগজপত্র ঘাটাঘাটির শব্দটা শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লাইনে আবার লোকটার গলা শোনা গেলো। “এই যে, সেটা, ককলিন। আপনারা এডমিনিস্ট্রেটিভ কনট্রোল।”

“তারা জানে না তারা কি করছে। অর্ডারটা বাতিল ক’রে দিন। ওখান থেকে লোকজনকে চলে আসতে বলুন। এফুনি!”

“ভূতুরে অর্ডার আমরা নেই না।”

“কি?”

“তিনটার বাজার আগে আমার ডেস্কে একটা লিখিত রিকুইজিশন পাঠান। আর সেটা পেলে আমরা আগামীকালকে কাজ শুরু করবো। সব কিছু আগের জায়গায় রেখে দেবো।”

“সব আগের জায়গায় রেখে দেবেন?”

“ঠিক। আপনারা বলবেন চলে আসতে আমরা চলে আসবো, আপনারা বলবেন রেখে দিতে আমরা রেখে দেবো। আপনারা মতোই আমাদের কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আমরা সেটাই অনুসরণ করি।”

“যন্ত্রপাতিগুলো—সব কিছু ধার করা! এটা এজেন্সির কোনো অপারেশন নয়।”

“তাহলে আপনি আমাকে কল করছেন কেন? এটা দিয়ে আপনি করবেন কি?”

“বুঝিয়ে বলার মতো সময় আমার নেই। খালি এসব লোককে ওখান থেকে তুলে আনুন। নিউইয়র্কে ফোন ক’রে তাদেরকে চলে যেতে বলুন। এটা ফোর-জিরো অর্ডার।”

“একশ’ চার হলেও কোনো লাভ হবে না। আপনি এখনও বায়বীয় কথা বলছেন। দেখুন মি: ককলিন, আপনি আমি দু’জনেই জানি আমার যা দরকার তা না পেলে আমি আপনার কোনো কথাই রাখতে পারবো না। বৈধভাবে করুন। সঠিকভাবে করুন।”

“আমি এজেন্সিকে জড়াতে পারছি না।”

“তাহলে আপনি আমাকেও জড়িত করবেন না।”

“এসব লোককে চলে যেতেই হবে! আমি আপনাকে বলছি—” ককলিন ব্রাউনস্টোনের নিচে তাকাতেই বোবা হয়ে গেলো। প্যারালাইজ হয়ে গেলো তার সমস্ত চিন্তাভাবনা। ওভার কোট পরা লম্বা এক লোক কংক্রিটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তারপর খোলা দরজাটার সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে রইলো। এটা ক্রফোর্ড। সে কি করছে? এখানে সে কি করছে? তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাগল হয়ে গেছে! সে স্থির একটি টার্গেট; সে ফাঁদটা ভেঙে ফেলতে পারে!

“ককলিন? ককলিন...?” ফোনটা রেখেই সিআইএ’র লোকটা চিৎকার ক’রে বললো।

ককলিন ছয় ফুট দূরের একটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাট্রাগোটা এক লোকের দিকে তাকালো। লোকটার হাতে টেলিস্কোপ লাগানো একটা রাইফেল। এলেক্স লোকটার নাম জানে না, জানতে চায়ও না।

“দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওভারকোট পরা বৃদ্ধলোকটাকে দেখেছো?” সে জিজ্ঞেস করলো।

“দেখেছি। আমরা যাকে খুঁজছি এই লোক সেই লোক নয়। তার বয়স অনেক বেশি।”

“ওখানে গিয়ে তাকে বলো রাস্তার ওপর পারে একজন খোঁড়া লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।”

বন থার্ড অভিনুর পুরনো কাপড়ের দোকানের দিকে গেলো। মোটা কাঁচের সামনে এসে তাকে কেমন দেখাচ্ছে সেটা ভালো ক’রে দেখার জন্যে একটু থামলো। কালো উলের টুপিটা তার কপাল ঢেকে রেখেছে। আর্মিদের জ্যাকেটটা তার সাইজের চেয়েও বেশ বড়। লাল চেকের ফ্লানেল শার্ট আর মোটা রাবার সোলের জুতা পরে আছে সে। তাকে কেবল এই সব কাপড়চোপড়ের সাথে মানানসই একটা ভঙ্গীতে হাঁটতে হবে। একজন শক্তসামর্থ্য লোকের হাটা। এই হাটাটা তাকে রণ্ড করতে হবে। এরকম কিছুতে সে এর আগে অভ্যস্ত ছিলো। কিন্তু তার আগে তাকে একটা ফোন করতে হবে। সামনের বকে সে একটা ফোন বুথ দেখতে পেলো বর্ন।

“বেলকিন মুভিং অ্যান্ড স্টোরেজ,” ব্রনক্স-এর অপারেটর বললো।

“আমার নাম জেসন বর্ন,” অধৈর্যের সাথে বললো। “আমার মনে হয় আমার একটা সমস্যা হয়ে গেছে। আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।”

“চেষ্টা করবো, স্যার। সমস্যাটা কি?”

“সেভেনটি-ফার্স্ট স্ট্রিটে আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলাম—বন্ধুটি কয়েক দিন আগে মারা গেছে। তাকে আমি একটা জিনিস দিয়েছিলাম, সেটাই নিতে যাচ্ছিলাম আর কি। ওখানে গিয়ে দেখি আপনাদের ভ্যানটা বাড়ির সামনে।

আমার মনে হয় আপনাদের লোক আমার জিনিসটা সরিয়ে ফেলেছে। এ ব্যাপারে কি আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি?”

“ডিসপ্যাচারের সাথে কথা বলুন, স্যার।”

“তার নামটা কি জানতে পারি?”

“কি?”

“তার নামটা।”

“অবশ্যই। মুরে। মুরে সুমাখ। আমি তার সঙ্গে সংযোগ দিয়ে দিচ্ছি আপনার।”

দুটো ক্লিক ক’রে শব্দ হলে একটা কণ্ঠ লাইনে শোনা গেলো।

“সুমাখ।”

“মি: সুমাখ?”

“হ্যা।”

বর্ন আবাবো তার গল্পটা বললো। “অবশ্যই আমি আমার অ্যাটর্নির কাছ থেকে একটা লেটার এনে দিতে পারবো। কিন্তু জিনিসটার মূল্য খুব বেশি নয়—”

“জিনিসটা কি?”

“একটা ফিশিং রড। খুব দামি না, তবে জিনিসটা আমার খুব প্রিয়। পুরনো ফ্যাশনের। পাঁচ মিনিট পর পর ফেঁসে যায় না।”

“হ্যা, বুঝেছি কি বলতে চাচ্ছেন। আমিও শিপহেড বে-তে মাছ ধ’রে থাকি। পুরনোগুলোই বেশি ভালো।”

“আমার মনে হয়, আপনি ঠিকই বলেছেন, মি: সুমাখ। আমি জানি ঠিক কোন্ ক্রোসেটে সে ওটা রেখেছে।”

“হায়রে ফিশিং রড। ঠিক আছে। ওখানে গিয়ে ডুগান নামের এক লোকের কাছে যান, সে হলো ঐ কাজটার সুপারভাইজার। তাকে বলবেন আমি বলেছি আপনি ওটা নিতে পারেন। তবে আপনাকে একটা স্বাক্ষর করতে হবে। সে যদি ধানাই-পানাই করে তাকে বলবেন বাইরে এসে আমাকে ফোন করতে। ঐ বাড়ির ফোনটা বিচ্ছিন্ন করা আছে।”

“মি: ডুগান। ধন্যবাদ আপনাকে মি: সুমাখ।”

“হায়রে জায়গাটা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে আছে!”

“কি বললেন?”

“কিছু না। কিছু গর্দভ ফোন ক’রে আমাদের বলেছে এখান থেকে বের হয়ে যেতে। টাকাও সেধেছে। বিশ্বাস করতে পারেন?”

কার্লোস। জেসন এটা বিশ্বাস করতে পারলো।

“খুবই খারাপ কথা, মি: সুমাখ।”

“আপনার মাছ ধরার মঙ্গল কামনা করছি,” বেলকিসের লোকটা বললো।

বর্ন লেক্সিংটন এভিনিউর সেভেনটিয়েক্স স্ট্রিটের পশ্চিম দিকে পা বাড়ালো। সে যেটা খুঁজছিলো সেটা তিন ব্লক পরে পেয়ে গেলো : আর্মি নেভির সারপ্লাস স্টোর। ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। আট মিনিট পরে চারটা ধূসর রঙের মোটা কম্বল, ছয়টা মেটাল বাকলসহ ক্যানভাস স্ট্র্যাপ নিয়ে বের হয়ে এলো। তার জ্যাকেটের পকেটে দুটো রোড-ফ্লয়ার। জিনিসগুলো কাঁধের উপর ফেলে সে সেভেনটি ফাস্ট স্ট্রিটের দিকে চললো। বহুরূপী জঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে। এই জঙ্গলটা তাম কুয়ানের মতোই ঘন আর বিপদসঙ্কুল।

ট্রেডস্টোন সেভেনটি-ওয়ানের সমস্ত গোপনীয়তা যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানে যখন এলো তখন ১০টা ৪৮ বাজে। সে তার গুরু দিকে ফিরে এসেছে—আর যে ভয়টা তার মধ্যে উদ্ভব হলো সেটা শারীরিক ক্ষতির কোনো ভীতি নয়। সে এর জন্যে প্রস্তুত। সে তার জন্মস্থানে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে সে কি খুঁজে পাবে সেটা নিয়েই খুব ভয়ে আছে—তার মনে পড়ে যাচ্ছে।

বন্ধ করো এই ভাবনাটা! ফাঁদটাই সব কিছু। কেইন হলো চার্লি, ডেন্টা হলো কেইন!

রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কমে আসছে। লোকজন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তাদের হাটার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ার ভাব নেই। জেসন রাস্তাটা পার হয়ে ট্রেডস্টোনের কাছে চলে এলো। পঞ্চাশ গজ দূরেই ব্রাউনস্টোন ভবনটা। কম্বল আর স্ট্র্যাপ জায়গা মতো আছে; একজন ক্রান্ত, ধীর গতির শ্রমিক এক পরিপাটি পোশাক পরা দম্পতির পেছন পেছন এগিয়ে যাচ্ছে। সে বাড়িটার সিঁড়ির সামনে এসে দেখতে পেলো দু'জন ব্রলশালী লোক একটা চাদরে ঢাকা পিয়ানো বাড়ির বাইরে বে ক'রে নিয়ে আসছে। বর্ন তাদের উদ্দেশ্যে চিংকার ক'রে ডাকলো। তার কণ্ঠটা একটু ফ্যাস্ফ্যাসে শোনালো।

“এই যে! ডুগান কোথায়?”

“আপনি কি মনে করেন; সে কোথায় থাকার কথা?” দু'জনের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ লোকটি পাল্টা বললো। “একটা বালের চেয়ারে বসে বসে বাল ফেলছে।”

“আরে, সে তো একটা ক্লিপবোর্ডের চেয়ে বেশি ভারি কিছু ওঠাচ্ছে না,” কালো লোকটা বললো। “ভুলে গেছিলাম, সে তো একজন অফিসার, তাই না, জো?”

“সে হলো একটা পাংচার হওয়া ফুটা বল। তার সাথে আপনার কি কাজ?”

“সুমাখ আমাকে পাঠিয়েছে,” জেসন বললো। “সে এখানে আরেকজন লোককে চাচ্ছে, আর এসব জিনিস আপনাদের দরকার হবে। আমাকে বলেছে এটা নিয়ে আসার জন্যে।”

“মুরে হারামজাদা!” কালো লোকটা হেসে বললো। “আপনি নতুন, না? আপনাকে তো আগে কখনও দেখি নি। আপনি এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে?”

“হ্যাঁ ।”

“এইসব জিনিস এক্সিকিউটিভের কাছে নিয়ে যান,” জো নামের লোকটা বললো । “সে এটা দেখবে, তাই না, পিট?”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই ।”

বর্ন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের অতিক্রম ক’রে ভেতরে প্রবেশ করলো । তার সামনে সংকীর্ণ একটা করিডোর, ত্রিশ ফুটের মতো হবে, যার শেষ মাথায় আছে একটা দরজা আর ডান দিকে ঘোরানো একটা সিঁড়ি । এই সিঁড়ি দিয়ে সে হাজার বার উঠেছে নেমেছে । এই করিডোরটা ব্যবহার করেছে তার চেয়েও বেশি । সে ফিরে এসেছে । তার মধ্যে অজুত এক উত্তেজনা অনুভূত হচ্ছে । অন্ধকার করিডোরটা দিয়ে সে এগোতে লাগলো । যে ঘরে কেইনের জন্ম হয়েছে সেই ঘরের দিকে । সেই ঘরটা । কাঁধের স্ট্র্যাপটা শক্ত ক’রে ধরলো, নিজের হাতের কাঁপুনিটা বন্ধ করার জন্যে ।

আমোর্ড প্লেটেড সরকারী সিডানের পেছনের সিটে ব’সে আছে মেরি, সে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো । বাইনোকুলারটা জায়গা মতোই আছে । কিছু একটা ঘটছে । সে নিশ্চিত নয় সেটা কি । তবে সে আন্দাজ করতে পারছে । কয়েক মিনিট আগে একজন গাট্টাগোটা লোক ব্রাউনস্টোন বাড়িটার সামনে দিয়ে চলে গেছে । জেনারেলের সামনে এসে হাটার গতিটা কমিয়ে এনেছিলো সে, অবশ্যই কিছু একটা বলেছে জেনারেলকে । এরপর লোকটা হেটে গেলে জেনারেল তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলো ।

ককলিনকে পাওয়া গেছে ।

জেনারেল যা বলেছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সিঁড়িটা হবে খুবই ছোট্ট । ভাড়াটে অস্ত্রধারী, তাদের নিয়োগদাতার কাছেও অচেনা । তার কাছেও তারা অচেনা । একজন লোককে খুন করার জন্যে ভাড়া হয়েছে...একগাদা ভুল কারণে! ওহ, ঈশ্বর, সে তাদের সবাইকে ঘৃণা করে । ঘিলুবিহীন বোকা সব লোক । অন্য মানুষের জীবন নিয়ে খেলে । খুব কমই জানে তারা, অথচ মনে করে তারা অনেক জানে ।

তারা কোনো কিছুই শোনে নি! তারা শুনবে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে, আফশোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না । অন্ধত্ব থেকে দুর্নীতির জন্ম হয় । আর বোকামী এবং বিব্রতকর কিছু থেকে আসে মিথ্যে । ক্ষমতাবানদেরকে বিব্রত কোরো না । নাপাম বোমা ভিয়েতনামে এটা প্রমাণ ক’রে দিয়েছে ।

মেরি বাইনোকুলারটা ঠিক ক’রে নিলো । বেকিন্স কোম্পানির একজন লোক

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার কাঁধে কমল আর স্ট্র্যাপ। এক বৃদ্ধ দম্পতির পেছনে পেছনে হাটছে সে। জ্যাকেট আর কালো টুপি পরা সেই লোকটা থামলো। দরজার সামনে একটা পিয়ানো নামাতে থাকা দু'জন লোকের সাথে সে কথা বলছে। এটা কি? একটা কিছু আছে... অদ্ভুত কিছু। মেরি লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না। সে যেখান থেকে দেখছে সেখান থেকে চেহারাটা ভালো ক'রে দেখার কথাও নয়। তবে লোকটার ঘাড় আর মাথাটা... সেটা কি? লোকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে, একজন ক্লান্ত শ্রান্ত লোক। মেরি বাইনোকুলারটা সরিয়ে ফেললো। খুবই উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠলো সে।

ওহ ঈশ্বর! আমার জেসন। তুমি কোথায়? আমার কাছে আসো। আমার কাছে ধরা দাও। এইসব অন্ধ আর হৃদয়হীন লোকগুলোর কাছে আমাকে রেখে চলে যেয়ো না।

ক্রফোর্ড কোথায়? সে তার কাছে প্রতীজ্ঞা করেছে প্রতিটি জিনিস তাকে জানিয়ে করবে। সব জানাবে। মেরি তাকে বিশ্বাস করে না। তাদের কাউকেই না। তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপরেও তার কোনো আস্থা নেই। ক্রফোর্ড কোথায়? ড্রাইভারের কাছে মেরি জানতে চাইলো। “জানালাটা কি নামাবে? দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার।”

“দুর্গন্ধিত, মিস্,” সাদা পোশাকের আর্মির লোকটা বললো। “আমি আপনার জন্যে এয়ারকন্ডিশন ছেড়ে দিচ্ছি।”

দরজা-জানালা নিয়ন্ত্রণ করার বোতাম ড্রাইভারের সামনে। ড্রাইভার আর পেছনের সিটের মধ্যে রয়েছে কাঁচের একটা দেয়াল।

“আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না!” ককলিন বললো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রেগেমেগে সে জানালার কাছে ফিরে গেলো আবার। বাইরে তাকিয়ে উদাসভাবে বললো, “একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না!”

“অ্যালেক্স, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে না,” ক্রফোর্ড পাল্টা বললো। “সমাধানটা খুব সহজ। খুবই সহজ।”

“তুমি সেই টেপটা শোনো নি। তুমি ভিলিয়ার্সের কথা শোনো নি!”

“আমি মেয়েটির কথা শুনেছি। সে বলেছে আমরা কোনো কথা শুনি না... তুমি শুনিছো না।”

“তাহলে মেয়েটা মিথ্যে বলেছে!” ককলিন হুট ক'রে ঘুরে বললো। “সে অবশ্যই মিথ্যে বলেছে! আর কেনই বা বলবে না? সে তো তার প্রেমিকা। তাকে বাঁচানোর জন্যে সে সবই করবে।”

“তুমি ভুল করছো, আর এটা তুমিও জানো। আসল কথা হলো, সে এখানে এসেছে তোমার কথা ভুল প্রমাণ করার জন্যে। তুমি যা বলেছো সেটা আমি যে মেনে নিয়েছি তা ভুল, এটা প্রমাণ করতেই সে এতদূর চলে এসেছে।”

ককলিন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, লাঠি ধ'রে রাখা তার ডান হাতটা কাঁপতে শুরু করেছে এখন। “হয়তো...হয়তোবা...” সে আর কথাটা শেষ করতে পারলো না। ক্রফোর্ডের দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো কেবল।

“আমাদেরকে সমাধানের পথেই থাকতে হবে?” অফিসার শান্ত কণ্ঠে বললো। “তুমি খুব ক্লান্ত, অ্যালেক্স। তুমি কয়েক দিন ধরে ঘুমাও নি। একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। আমার মনে হয় না আমি সেই কথাটা শুনেছি।”

“না।” সিআইএ'র লোকটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো। তার চোখেমুখে তিক্ততা। “না, তুমি সেটা শোনো নি, আর আমিও সেটা তোমাকে বলি নি। হায় আমি যদি জানতাম কোথেকে শুরু করতে হবে।”

“আমি জানি,” ক্রফোর্ড বললো। দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো। “আসো।”

গাট্টাগোট্টা লোকটা এগোলো, তার চোখ দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা রাইফেলটার দিকে। দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে সে মাথা দোলালো, যেনো ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। “এটা কি?”

“এক্সারসাইজটা বাতিল করা হয়েছে,” ক্রফোর্ড বললো। “আমার মনে হয় তুমি সেটা বুঝতে পেরেছো।”

“কোন এক্সারসাইজের কথা বলছেন? তাকে রক্ষা করার জন্যে আমাকে ভাড়া করা হয়েছে।” অস্ত্রধারী অ্যালেক্সের দিকে তাকালো। “আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার আর কোনো প্রটেকশানের দরকার নেই, স্যার?”

“আমরা কি বলতে চাচ্ছি সেটা তুমি জানো,” ককলিন উত্তেজিতভাবে বললো। “সব সিগনাল বন্ধ, সব বন্ধ।”

“সব মানে কি? আমি তো কোনো ব্যবস্থার কথা জানি না। আমার নিয়োগের শর্তগুলো খুব পরিষ্কার। আমি আপনাকে রক্ষা করছি, স্যার।”

“বেশ ভালো,” ক্রফোর্ড বললো। “এখন আমাদেরকে জানতে হবে বাইরে তাকে কে রক্ষা করছে?”

“কে, কোথায়?”

“এই ঘরের বাইরে, এই অ্যাপার্টমেন্টে। অন্য কোনো ঘরে, রাস্তায়, গাড়িতে, সম্ভবত। আমাদেরকে জানতে হবে।”

গাট্টাগোট্টা লোকটা রাইফেলটার কাছে গিয়ে সেটা তুলে নিলো। “আমার মনে হয় আপনারা ভুল বুঝেছেন। আমাকে একজনের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। অন্য কাউকে যদি এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয় সেটা আমার জানা কথা নয়।”

“তুমি তাদেরকে চেনো না!” ককলিন চিৎকার ক'রে বললো। “তারা কারা? কোথায় তারা?”

“আমার কোনো ধারণা নেই...স্যার।” বগলে রাইফেলটা চেপে রেখে অস্ত্রধারী লোকটা বললো। তার রাইফেলের নলটা মেঝের দিকে নামানো। দুয়েক ইঞ্চির

মতো সেটা উপরে উঠে গেলেও সেটা কারোর নজরে পড়লো না। “আমাকে যদি কোনো দরকার না লাগে তবে আমি চলে যাচ্ছি।”

“তাদের সঙ্গে কি তুমি যোগাযোগ করতে পারবে?” বৃগেডিয়ার কথার মাঝখানে বললো। “আমরা এর জন্যে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দেবো।”

“আমাকে ইতিমধ্যে বেশ ভালো টাকা দেয়া হয়েছে, স্যার। যে কাজ আমি করতে পারবো না সেই কাজের জন্যে আমার টাকা নেয়াটা ঠিক হবে না। আর এটা অব্যাহত রাখাটাও অর্থহীন।”

“একজন মানুষের জীবন বিপদাপন্ন!” ককলিন চিৎকার করে বললো।

“আমারটাও,” অস্ত্রধারী দরজার দিকে হেটে যেতে যেতে বললো। অস্ত্রটা আরেকটু উপরে উঠলো এবার। “বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ।” সে বাইরে চলে গেলো।

“হায় ঈশ্বর!” অ্যালেক্স জানালার দিকে আবার মুখ করে গর্জে বললো। “আমরা কি করবো?”

“প্রথমে, এই মুভিং কোম্পানিকে আগে স’রে যেতে বলো। আমি জানি না এটা তোমার কৌশলে কি ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু এটা এখন কেবল জটিলতাই সৃষ্টি করছে।”

“আমি পারবো না। তবে চেষ্টা করবো। এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা যখন আমাদের যন্ত্রটা বের করেছিলাম এজেন্সি কন্ট্রোলরা তখন আমাদের শিটগুলো তুলে নেয়। তারা সেই স্টোরটা বন্ধ হতে দেখে আমাদেরকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে জিএসএ’কে বলে।”

“এরকম দ্রুত গতিতে,” মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ক্রফোর্ড বললো। “সল্যাসী এই যন্ত্রটা স্বাক্ষর করে আড়াল করে রেখেছিলো। তার স্টেটমেন্টটা এজেন্সিকে দায়মুক্ত করেছে। এটা তার ফাইলে আছে।”

“আমরা যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাই তবে সেটা দারুন হবে। আমরা জানি না আমরা এমনকি চব্বিশ মিনিট সময় পাবো কিনা।”

“আমাদের সেটা দরকার পড়বে। একটা সিনেট তদন্ত কমিটি হবে। রাস্তাটা বন্ধ করে দাও।”

“কি?”

“আমার কথা তো শুনলেই—রাস্তাটা বন্ধ করে দাও! পুলিশকে খবর দাও। তাদেরকে বলো সব কিছু দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলতে!”

“এজেন্সির মাধ্যমে? এটা তো আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।”

“তুমি না করলে আমিই করবো সেটা। পেন্টাগনের মাধ্যমে, প্রয়োজন হলে জয়েন্ট চিফের মাধ্যমে। আমাদের চোখের সামনে থাকার পরও আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো আর অজুহাত খুঁজবো! রাস্তাটা ঘিরে ফেলো। দড়ি দিয়ে এই

জায়গাটার চারপাশ ঘিরে রাখো। একটা ট্রাকে পিএ সিস্টেম নিয়ে আসো। মেয়েটাকে দিয়ে মাইক্রোফোনে কথা বলাও! সে যা বলতে চায় বলতে দাও তাকে। মেয়েটার কথাই ঠিক। সে তার কাছে আসবেই!”

“তুমি জানো তুমি কি বলছো?” ককলিন জানতে চাইলো। “অনেক প্রশ্ন উঠবে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও। সব ফাঁস হয়ে যাবে। সবাই জেনে যাবে।”

“আমি এ ব্যাপারে সচেতন আছি,” বৃগেডিয়ার বললো। “যাই ঘটুক না কেন সে এটা করবেই। তবে আমি একজন লোকের জীবন বাঁচাতে চাইছি, তাকে যদিও আমি পছন্দ করি না। কিন্তু এক সময় তাকে আমি সম্মান করতাম, মনে হয় এখন তাকে আরো বেশি সম্মান করি।”

“আরেক লোকের কি হবে? কার্লোস যদি এখানে আসলেই থেকে থাকে, আপনি তাহলে তার জন্যে একটা দরজা খুলে দিচ্ছেন। আপনি তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ ক’রে দিচ্ছেন।”

“আমরা কার্লোসকে সৃষ্টি করি নি। আমরা কেইনকে সৃষ্টি করেছি, তাকে অপব্যবহার করেছি। আমরা তার স্মৃতি আর মনটাকে কেড়ে নিয়েছি। তার কাছে আমরা ঋণী। যাও, মেয়েটার কাছে যাও। আমি ফোনটা ব্যবহার করবো।”

বর্ন বাড়ির শেষ দিকের বিশাল লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়লো। ভেতরের দৃশ্যটা তার চেনা, আবার অচেনাও লাগছে। এগুলো তার স্বপ্নের ভগ্নাংশ—কিন্তু খুব মজবুত—ক্ষণস্থায়ী নয়। লম্বা এক টেবিলে হুইকি ঢালা হচ্ছে, আর্ম চেয়ারে লোকজন ব’সে কথা বলছে, চারপাশে বইয়ের শেলফ—কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে—একটা বোতাম চাপলেই সেটা উন্মোচিত হয়। এটা সেই ঘর যেখানে একটা মিথের জন্ম হয়েছিলো। যে মিথটা পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিলো আর বিস্তারিত হয়েছিলো ইউরোপে।

তার মধ্যে আবার ছবি আর শব্দ তেড়ে আসছে এখন। আলোর ঝলকানি, তারপরই পর্দায় কিছু ছবি ভেসে উঠছে, তার কানে কতোগুলো কণ্ঠ চিৎকার ক’রে কী যেনো বলছে।

কে সে? দ্রুত। তুমি অনেক দেরি করছো! তুমি মরে গেছো! এই রাস্তাটা কোথায়? এটা তোমার কাছে কি ব’লে মনে হয়? ওখানে তুমি কার সঙ্গে দেখা করেছো?...হত্যা করার পদ্ধতি। কোন্টা তোমার? না!...তুমি ডেন্টা নও, তুমি তুমি নও!...তুমি এখানে যা তুমি কেবল তাই। এখানে তুমি যা হয়েছো!

“আরে, তুমি আবার কে?” দরজার পাশে একটা আর্ম চেয়ারে বসা এক বড়সড় লাল মুখের লোক চিৎকার ক’রে তাকে বললো। তার হাটুর উপর একটা ক্রিপবোর্ড রাখা। জেসন তাকে অতিক্রম ক’রে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। খেয়াল করে নি।

“আপনি ডুগান?” বর্ন জানতে চাইলো।

“হ্যাঁ।”

“সুমাখ আমাকে পাঠিয়েছে। বলেছে আপনাদের আরেকজন লোকের দরকার।”

“কিসের জন্যে? আমার কাছে পাঁচজন তো আছেই। আর এই জায়গার বালের হলওয়েটা দিয়ে দু’জন মানুষও চলাফেরা করতে পারে না। পাছায় পাছায় ঘষাঘষি হয়।”

“আমি জানি না। সুমাখ আমাকে পাঠিয়েছে, এটাই কেবল আমি জানি। সে আমাকে এইসব জিনিস আনতে বলেছে।” বর্ন কম্বল আর স্ট্র্যাপগুলো মেঝেতে ফেলে রাখলো।

“মুরে নতুন একটা মাল পাঠিয়েছে? মানে এটা তো নতুন।”

“আমি—”

“জানি, জানি! সুমাখ তোমাকে পাঠিয়েছে। সুমাখকে জিজ্ঞেস করো।”

“আপনি সেটা করতে পারবেন না। সে আপনাকে বলতে বলেছে সে নাকি শিপহেড-এ যাচ্ছে। আজকের বিকেলে ফিরে আসবে।”

“ওহ্, দারুণ! সে আমাকে এই সব জঞ্জালের মধ্যে রেখে মাছ ধরতে গেছে...তুমি নতুন। আমাদের সাহায্য করতে এসেছো?”

“হ্যাঁ।”

“এটাই হলো মুরের সৌন্দর্য। আমার খালি আরেকটা ফুটা বল দরকার। দুটো বড়সড় গাধার পাছা আছে, আর এখন হলে চারটা ফুটা বল।”

“আপনি চাচ্ছেন আমি এখান থেকে শুরু করি? আমি এখান থেকে শুরু করতে পারবো।”

“না! তুমি উপর থেকে শুরু করবে, বুঝলে?”

“হ্যাঁ, বুঝেছি।” জেসন কম্বল আর স্ট্র্যাপগুলো নেবার জন্যে উপুড় হলো।

“এইসব জঞ্জাল এখানেই রেখে যাও—এটা তোমার দরকার নেই। উপরে যাও। একেবারে উপর তলায়। একটা একটা করে আসবাব বের করবে।”

বর্ন সিঁড়ি দিয়ে উপর তলায় উঠে গেলো। সেখানে আরেকটা ঘরের দিকে যাচ্ছে সে। ল্যান্ডিংয়ে কোনো আলো নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। কোন্ ঘরটা? তিনটি দরজা আছে, দুটো হলওয়ের বাম দিকে, অন্ধকারে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, আরেকটা ডান দিকে। সে বাম দিকের দ্বিতীয় দরজার দিকে পা বাড়ালো। এটাই সে ঘর। নব্বটা ধরে ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেলো। অন্ধকার, তবে পুরোপুরি নয়। ঘরের এক দিকে ছোট্ট একটা জানালা আছে। কালো পর্দায় ঢাকা। সেই পর্দার ফাঁকফোকর দিয়েই বাইরে থেকে আলো আসছে। বর্ন সেদিকে গেলো। একটা ফাঁক! অন্ধকারে একটা ফাঁক! সে ঘুরে গেলো, এই দৃষ্টি

বিভ্রমে একটু ভড়কে গেলো সে। কিন্তু এটা কোনো বিভ্রম নয়! অন্ধকারে ডায়মন্ডের মতো একটা কিছু চম্‌কালো। স্টিলে আলো প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্ধকারে একটা চাকু তার মুখ বরাবর ছুটে এলো।

“আপনি যা করেছেন তার জন্যে আমি আপনার মৃত্যু দেখে খুশিই হবো,” ককলিনকে চম্‌কে দিয়ে মেরি বললো। “এই ভাবনাটা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে।”

“তাহলে আপনাকে বলার মতো আমার আর কিছু নেই,” খোঁড়াতে খোঁড়াতে জেনারেলের দিকে যেতে যেতে সিআইএ’র লোকটা জবাবে বললো। “অন্য রকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে—সেটা আপনি এবং সে নিতে পারে।”

“পারে কি? সে কোথেকে শুরু করবে? যখন সেই লোকটা মার্সেই’তে খুন করার চেষ্টা করেছিলো? রুই সারাসিনে? যখন তারা জুরিখে তার পিছু নিয়েছিলো? প্যারিসে যখন তাকে গুলি করা হয়েছিলো? আর পুরোটা সময়েই সে জানতো না কেন এসব করা হচ্ছে। সে করবেটা কি, বলেন?”

“বেরিয়ে আসবে! শুধু বেরিয়ে আসবে, ধরা দেবে!”

“সে তাই করেছিলো। আর সে যখন তা করলো, আপনারা তখন তাকে খুন করার চেষ্টা করলেন।”

“আপনি তো সেখানে ছিলেন! তার সঙ্গেই ছিলেন। আপনার তো স্মৃতিশক্তি রয়েছে।”

“ধরে নিচ্ছি আমি জানতাম কার কাছে যেতে হবে, আপনি কি আমার কথা শুনবেন?”

ককলিন মেরির দিকে সরাসরি তাকালো। “আমি জানি না,” বলেই ক্রফোর্ডের দিকে ঘুরে বললো, “হয়েছে কি?”

“ওয়াশিংটন আমাকে দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে যেতে বলেছে।”

“কিন্তু, হয়েছে কি?”

“আমার মনে হয় না তুমি সেটা শুনতে চাইবে। স্টেট এবং মিউনিসিপ্যাল ডিক্রির উপর ফেডারেল হস্তক্ষেপ ঘটেছে। ক্রিয়ারেণ নিতে হবে।”

“হায় ঈশ্বর!”

“দ্যাখো!” সেনাবাহিনীর লোকটা আচম্‌কা জানালার দিকে উপুড় হয়ে তাকালো। “ট্রাকটা চলে যাচ্ছে।”

“কেউ ভেতরে ঢুকেছে,” ককলিন বললো।

“কে?”

“আমি সেটা খুঁজে বের করবো।” সিআইএ’র লোকটা ফোনের কাছে গেলো। টেবিলে কতোগুলো কাগজে টেলিফোন নাম্বারগুলো তাড়াহুড়া করে লেখা হয়েছে। সে একটা নাম্বার বেছে নিয়ে ডায়াল করলো। “সুমাখকে দিন...পিজ...সুমাখ? আমি সিআইএ’র ককলিন বলছি। আপনাকে কে বলেছে?”

ডিসপ্যাচারের গলাটা লাইনে শোনা গেলো। “কে বলেছে মানে, কি বলেছে? আমার পিছু ছাড়ুন! আমরা কাজ করছি, আর সেটা শেষ করতে যাচ্ছি! সত্যি বলতে কি, আপনি একজন বাচাল—”

ককলিন ফোনটা আছাড় মেরে রেখে দিলো। “হায় জিশু...ওহ্ জিশু!” তার হাতটা কাঁপতে লাগলো। সে আবারো ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলো। তার চোখ টেবিলে রাখা কাগজগুলোর দিকে। “পেত্রোচিল্লি? ককলিন বলছি।”

“আপনার কথাটা তখন ঠিক মতো শুনতে পাই নি। হয়েছে কি?”

“সময় নেই। এজেন্সি কনট্রোলের যে ইনভয়েস, সেটা কে স্বাক্ষর করেছে?”

“কে স্বাক্ষর করেছে, মানে? যে বড় বেড়ালটা সব সময় স্বাক্ষর ক’রে থাকে। ম্যাকগিভার্ন।”

ককলিনের চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। “এটাই আমি ভয় পাচ্ছিলাম,” নিচু কণ্ঠে বলে সে ফোনটা রেখে দিয়ে ক্রফোর্ডের দিকে ঘুরলো। “জিএসএ-এর আদেশটা এমন একজন স্বাক্ষর করেছে যে কিনা দু’সপ্তাহ আগেই অবসর নিয়েছে।”

“কার্লোস...”

“ওহ্, ঈশ্বর!” মেরি চিৎকার ক’রে উঠলো। “যে লোকটা কম্বল আর স্ট্র্যাপ বহন করছিলো! যেভাবে সে হাটছিলো, ঘাড় ঘোরাচ্ছিলো। এটা তো সে-ই! জেসন! সে ভেতরে ঢুকেছে।”

আলেকজান্ডার ককলিন জানালার দিকে ফিরলো। তার চোখ রাস্তার ওপাশে কালো দরজাটার দিকে। সেটা এখন বন্ধ।

হাতটা! গায়ের রঙ...কালো চোখ। কার্লোস!

ধারালো চাকুটা বর্নের গালের চামড়ায় পোচ বসিয়ে দিলে সে তার মাথাটা দ্রুত সরিয়ে ফেললো। চাকু ধ’রে রাখা হাতটাতে রক্ত লেগে রয়েছে। সে তার ডান পা’টা দিয়ে অদৃশ্য আক্রমণকারীর হাটুতে আঘাত হেনে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বাম পায়ে গোড়ালী দিয়ে লোকটার হাটুতে আঘাত করলো। কার্লোসও ঘুরে গিয়ে চাকু মারলো, এবার একেবারে বর্নের পেটের দিকে। জেসন পিছু হটে দু’হাত দিয়ে ক্রশ ক’রে বাঁধা দিলে তার দু’হাতের ফাঁকে আক্রমণকারীর চাকু ধরা হাতটা আঁটকে গেলো। জেসন সেই হাতটা ধরে এমনভাবে মোচড় দিলো যাতে ক’রে হাত থেকে চাকুটা ছুটে যায়। কিন্তু ছুটলো না। জেসন এবার চাকু ধরা হাতটা খপ্ ক’রে ধরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ দিয়ে খুনির বুকে আঘাত করলো। কিন্তু কার্লোস সরে গেলে একটা বাঁকি খেলো সে। অবশ্য জেসন অন্ধকারে চাকুটা মেঝেতে পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা যেখান থেকে এসেছে জেসন সেখানে ঝাঁপ দিলো। একই সময়ে নিজের বেস্টে থাকা অস্ত্রটাও হাতে নেবার চেষ্টা করলো এক

হাতে । সে মেঝেতে পড়তেই একটা জুতার হিল তার মাথার পাশে এসে সজোরে আঘাত করলো—আঘাতের তীব্রতায় ভড়কে গেলো সে । খুব দ্রুত গড়িয়ে সরে গেলো । দেয়ালের সাথে ধাক্কা লাগার আগ পর্যন্ত গড়ালো বর্ন । তারপর হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেই চেষ্টা করলো কিছু দেখার । জানালার পর্দার ফাঁক গ’লে আসা একটা আলোর রেখায় সে একটা হাত দেখতে পেয়ে সেদিকেই ঝাঁপ দিলো । তার নিজের হাতের পাঞ্জা দুটো এখন বাঘের থাবা হয়ে গেছে । আর হাত দুটো যেনো ভারি কোনো হাতুড়ি । হাতটা ধরে ফেলতেই কজিটা মোচড়ে ভেঙে ফেললে একটা আর্ত চিৎকারে পুরো ঘরটা ভরে গেলো । সেই চিৎকারের সাথে ভোঁতা একটা গুলির শব্দ । বর্নের কাঁধে গিয়ে বিদ্ধ হলো একটা বুলেট । তীব্র যন্ত্রণায় পিছু হটে গেলো সে । সশস্ত্র লোকটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরে একটা ধারালো কোণযুক্ত আসবাবের সাথে চেপে ধরলো তাকে । বিক্ষিপ্তভাবে আরো দুটো গুলি ক’রে কার্লোস দ্রুত স’রে গেলে জেসনও বাম দিকে ঝাঁপ দিয়ে অন্ধকারেই সামনে থেকে আসা শব্দটার দিকে তাক ক’রে গুলি চালালো । শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দিলেও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারলো না । দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলো সে । খুনি হলওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে এখন ।

বুক ভরে দম নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোলো বর্ন । দরজার কাছে পৌছাতেই তার মন বললো দরজার সামনে থেকে সরে যেতে । তাই করলো সে । দরজার পাশে সরে গিয়ে দরজার মাঝখানের হাত দিয়ে ঘুমি মারলো । যা ঘটলো সেটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি ব্যাপার । একটা অটোমেটিক অস্ত্র গর্জে উঠলে দরজাটার কাঠের গুঁড়ো ছিটকে তার চোখেমুখে এসে লাগলো । অস্ত্রটা থামতেই অস্ত্রটা তুলে দরজার দিকে গুলি চালালো জেসন । পাল্টা গুলি ছুটে এলে সে দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে সঁটে রইলো । প্রতিপক্ষের গুলি থামতেই আবার গুলি চালালো সে । এখন দু’জন লোক মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে আছে । একে অন্যকে খুন করতে উদ্যত তারা । কার্লোসকে ফাঁদে ফেলো । কার্লোসকে খুন করো!

এরপরই জেসন বুঝতে পারলো তারা আর খুব বেশি কাছাকাছি নেই । পায়ের শব্দটা তার কানে এলো । সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যাবার শব্দ । কার্লোস নিচে চলে যাচ্ছে, শূয়োরের বাচ্চা সাপোর্ট চাইছে । বর্ন তার মুখে এবং চোঁটের রক্ত মুছে ভাঙা দরজাটা দিয়ে বের হয়ে সংকীর্ণ করিডোরে এসে নিজের অস্ত্রটা চোখ বরাবর সোজা সামনের দিকে তুলে রাখলো । হাটা চলা করতে কষ্ট হলেও সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিচ থেকে চিৎকার আর চোঁচামেচির শব্দ শুনতে পেলো সে ।

“আরে তুমি করছো কি, অ্যা? পিট! পিট!”

দুটো কর্কশ কাশির শব্দ শোনা গেলো ।

“জোয়ি! জোয়ি!”

একটা ভোঁতা শব্দ হলে মাটিতে কোনো মানুষের পড়ে যাওয়ার আওয়াজটা শোনা গেলো স্পষ্ট ।

“হায় ঈশ্বর! সর্বনাশ—!”

আরো দুটো কর্কশ কাশির শব্দ শোনা গেলো, তারপরই একটা মরাকান্না । তৃতীয় আরেকজন মরলো ।

তৃতীয় লোকটা কি বলেছিলো? দুটো পাছামোটা গর্দভ আর চারটা ফুটা বল । মুভিং ভ্যানটা আসলে কার্লোসের অপারেশন! গুণঘাতক সঙ্গে ক’রে দু’জন লোক নিয়ে এসেছিলো । কার্লোসসহ তিনজন লোক সশস্ত্র, আর সে কিনা একটা অস্ত্র নিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে এসেছে । এই ভবনের এক কোণে সে এখন আঁটকা পড়ে গেছে । কার্লোস এখনও এই ভবনের ভেতরে আছে । ভেতরে । সে যদি বের হয়ে যেতে পারে তবে কার্লোসই উল্টো আঁটকা প’ড়ে যাবে ।

হলওয়ার সামনের দিকে কালো পর্দায় ঢাকা একটা জানালা আছে । নিজের ঘাড়টা চেপে ধরে ওদিকে ছুটে গেলো জেসন । তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে । সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে বুকের দিকে । পদটি টেনে ছিঁড়ে ফেললো । জানালাটা ছোটো, কাঁচ লাগানো আছে । খুবই মোটা আর শক্ত । সহজে ভাঙা যাবে না । কিভাবে এটা ভাঙবে সেটা যখন ভাবছে তখনই তার নজর গেলো নিচের সেভেনটি-ফার্স্ট স্ট্রের দিকে । ভ্যানটা নেই! কেউ এটা চালিয়ে নিয়ে গেছে...কার্লোসের এক লোকই এটা করেছে! তার মানে দু’জন রয়ে গেছে এখানে । তিনজন নয় । আর সে আছে উপরে । উপরে থাকাটা সব সময়ই একটু বেশি সুবিধার । বর্ন একটু ঝুঁকে নিচু হয়ে বাম দিকের প্রথম দরজার কাছে গেলো । এটা সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের ঠিক উল্টোদিক । দরজাটা খুলে সে ভেতরে ঢুকে পড়লো । একটা সাধারণ শোবার ঘর : ল্যাম্প, ভারি আসবাব, দেয়ালে ছবি । কাছের একটা ল্যাম্প ধরলো সে । সেটার ইলেক্ট্রিক প্লাগটা টেনে খুলে সেটা টেনে নিয়ে এলো রেলিংয়ের কাছে । মাথার উপর তুলে কাঁচের দিকে ছুড়ে মারলে কাঁচটা ভেঙে খান খান হয়ে গেলো । আবারো শোনা গেলো গুলির শব্দ । ছাদের দিকে গুলিগুলো বিঁধলে জেসন চিৎকার ক’রে উঠলো । চিৎকারটাকে একটা কান্নায় পরিণত হলো, তারপর একটা চাপা আর্তনাদ দিয়ে থেমে গেলো সেটা । রেলিংয়ের পেছনে গেলো এবার । অপেক্ষা করলো । নিঃশব্দে ।

এটা ঘটছে । সে সতর্ক পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে; খুনি দ্বিতীয় তলার ল্যান্ডিংয়ে আছে এখন । পায়ের আওয়াজটা খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে । আরো জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে । দেয়ালে একটা মৃদু ছায়া দেখা গেলো । এখনই । জেসন প্রচণ্ড দ্রুততায় ল্যান্ডিংয়ের সামনে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকা লোকটার দিকে পরপর চারটা গুলি করলো । লোকটার কলারের চারপাশে গুলিগুলো বিদ্ধ হলে রক্ত বের হতে লাগলো ফিনকি দিয়ে । খুনি তীব্র একটা আর্তনাদ দিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়লো । তার হাতে একটা অটোমেটিক অস্ত্র ।

এবার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো বর্ন। আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে চাচ্ছে না সে। তাকে যদি দ্বিতীয় তলায় যেতে হয় তো এখনই যেতে হবে। কার্লোসের লোকটার দেহ টপকে যাবার সময় বর্ন জানতো লোকটা কার্লোস নয়, তার একজন সৈনিক। লোকটা লম্বা আর শ্বেতাঙ্গ। তার চেহারা নর্ডিক অথবা উত্তর ইউরোপিয়ানদের মতো। কোনো মতেই লাতিন নয়।

দ্বিতীয় তলার হলওয়ে দিয়ে দৌড়াতে লাগলো জেসন। অন্ধকার জায়গা খুঁজছে সে। একটু থেমে গুনতে পেলো দূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ ঘর্ষনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিচ থেকে আসছে সেটা। সে জানে এখন তাকে কি করতে হবে। খুনি এখন নিচের তলায় আছে। আর যে শব্দ হচ্ছে সেটা ইচ্ছাকৃত নয় যে, একটা ফাঁদ ব'লে মনে হবে। কার্লোস আহত হয়েছে—হাটুর আঘাতটা কিংবা কজির মোচড়টা তাকে এমনভাবে আহত করেছে যে, সে দেয়াল ঘেষে অথবা আসবাব ধরে ধরে এগোচ্ছে। কিছু সময়ের জন্যে তার ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছিলো। কেবল এটাই জেসনের জানা দরকার ছিলো। আবার হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলো সে যেখানে মৃতদেহটা প'ড়ে আছে। তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামতে হলো। রক্তপাতের ফলে তার শক্তি ক'মে আসছে। বুকের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলো রক্ত বন্ধ করার জন্যে। এতে কোনো লাভ হবে না। বেঁচে থাকতে হলে তাকে এই ভবন থেকে বের হতে হবে। বর্ন আর কেইন যেখানে জন্ম নিয়েছে সেখান থেকে চলে আসতে হবে তাকে। মৃত লোকটার হাতে থাকা অটোমেটিক অস্ত্রটা নিয়ে নিলো। সে এখন প্রস্তুত।

মরে যাচ্ছে সে, সেই সঙ্গে প্রস্তুতও হচ্ছে। কার্লোসকে ধরো। ফাঁদে ফেলো তাকে...খুন করো! কার্লোসকে! সে বের হতে পারবে না; এটা সে জানে। সময় তার পক্ষে নেই। এটা ঘটার আগে তার শরীরের সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাবে। শেষটাই শুরু : কেইন হলো কার্লোসের জন্যে আর ডেন্টা হলো কেইনের জন্যে। কেবল একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্নই রয়ে গেলো : ডেন্টা কে? এতে আর কিছু যায় আসে না। এটা সে পেছনে ফেলে এসেছে। খুব জলদিই একটা অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সে, হিংস্র কোনো অন্ধকারে নয়, প্রশান্তির এক অন্ধকারে...এইসব প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাবে চিরতরে।

আর তার মৃত্যুতে মেরিরও মুক্তি আসবে। তার ভালোবাসা মুক্তি পাবে। ভদ্রলোকেরা এটা দেখবে, সেই দলে থাকবে প্যারিসের এক ভদ্রলোক যার ছেলে রুই দুবাক-এ নিহত হয়েছে। যার নিজের জীবন ঐ খুনির বেশ্যা একেবারে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। নিজের হাতের অস্ত্রটার ক্রিপ চেক্ ক'রে নিলো নিঃশব্দে, সে ঐ লোকটার কাছে করা প্রতীজ্ঞা রক্ষা করবে, যে সব অচেনা লোকের সাথে তার চুক্তি আছে সেটা পালন করবে। এ দুটো ক'রে সে নিজেকে প্রমাণ করবে। জেসন বর্ন এই দিনে মারা গিয়েছিলো। সে আবারো মরবে, তবে সঙ্গে কার্লোসকে নিয়ে মরবে। এজন্যে সে একেবারে প্রস্তুত।

সিঁড়িতে নিচু হয়ে বুকের উপর শুয়ে পড়লো সে। নিজের রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। আশ্তে আশ্তে সিঁড়ির উপরে শেষ ধাপে এসে পড়লো। পকেটে রাখা লেক্সিংটন এভিনু থেকে কেনা রোড-ফ্ল্যারগুলো থেকে একটা বের করলো জেসন। এখন সে বুঝতে পারছে কেন এগুলো সে কিনেছিলো। তাম কুয়ান-এর বিস্মৃত অতীতে ফিরে গেছে সে। ফ্ল্যারের সলতেটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে পকেট থেকে প্লাস্টিকের লাইটারটা বের ক'রে করে নিলো জেসন বর্ন।

সিঁড়ির ল্যান্ডিংটা অন্ধকার আর সুনশান। সব বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে...বাতি? বাতি? কয়েক মিনিট আগে এখানের হলওয়েতে যে সূর্যের আলো দেখা গিয়েছিলো সেগুলো কোথায় গেলো? হলওয়ের শেষ মাথায় একটা বড় ফ্রেঞ্চ দরজা দিয়ে আলোটা এসেছিলো—সেই ঘরটা করিডোরের ওপাশে। কিন্তু এখন সে কেবল অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ। তার নিচের আরেকটা যে দরজা আছে সেটাও বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। কার্লোস তাকে বেছে নিতে বাধ্য করছে। কোন্ দরজাটার পেছনে? নাকি খুনি আরো ভালো কোনো কৌশল ব্যবহার করছে? সংকীর্ণ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হলওয়েটাতেই কি সে ঘাপটি মেরে আছে?

কাঁধে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করলো বর্ন। সে জায়গা দিয়ে গল গল ক'রে বের হচ্ছে রক্ত। তার ফ্লানেল শার্টটা ভিজ়ে গেছে। আরেকটা সতর্ক বার্তা : খুব কমই সময় হাতে রয়েছে।

দেয়াল ঘেষে এগোতে লাগলো সে, হাতের অঙ্গটা অন্ধকার করিডোরের রেলিংয়ের পোস্টের দিকে তাক করা। এখনই! সে টুগারে চাপ দিলে গুলির আঘাতে পোস্টটা গুঁড়িয়ে রেলিংটা ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গটা নামিয়ে বাম হাতে থাকা ফ্ল্যারটায় লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো সে। তারপর টুগার টিপে নিচের দিকে একটা গুলি করলো। একটা ঝালর বাতি ভেঙে যাবার শব্দ শোনা গেলো নিচের কোনো ফ্লোর থেকে। আর ঠিক তারপরই—আলো! ফ্ল্যারটা জ্বলতেই তীব্র আলোয় জায়গাটা ভরে গেলো। জঙ্গলে আগুন প্রজ্বলতি করা হয়েছে। চার দিকে মৃত্যুর উৎকট গন্ধ আর ঘন জঙ্গল, সে আছে মাঝখানে।

ডেল্টাকে আলমানাক। ডেল্টাকে আলমানাক। পরিত্যাক্ত! পরিত্যাক্ত! কখনও নয়। এখন তো নয়ই। কার্লোসের জন্যে কেইন আর কেইনের জন্যে ডেল্টা। কার্লোসকে ফাঁদে ফেলো। খুন করো তাকে!

বর্ন উঠে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বাম হাতে ফ্ল্যার আর ডান হাতে অস্ত্র। সামনের দরজাটা লাথি মেরে খুলে ফেললো সে। টেবিলে রাখা ট্রফি আর ছবির ফ্রেমগুলো তার গুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো চারদিকে। থেমে গেলো সে। বিশাল শব্দ নিরোধক আর অভিজাত ঘরটাতে কেউ নেই। এই জঙ্গলে কেউ নেই। সে ঘুরেই হলওয়েতে চলে এলো। গুলি ক'রে ফুঁটো ক'রে ফেললো দেয়ালগুলো।

কেউ নেই। সংকীর্ণ অঙ্ককার করিডোরের শেষ মাথায় একটা ঘরেই কেইনের জন্ম হয়েছিলো। সেখানেই কেইন মারা যাবে, তবে একা নয়।

ফ্লোরিটা ডান হাতে নিয়ে পকেট থেকে আরেকটা ফ্লোরিটার বের করলো সে। প্রথম ফ্লোরিটার আগুন দিয়ে জ্বালানো দ্বিতীয় ফ্লোরিটা। ফ্লোরিটার আগুন এতোটাই তীব্র যে, তার দু'চোখ ঝলসে গেলো। দুটো ফ্লোরিটাই বাম হাতে ধরে সামনের দরজার দিকে এগোতে লাগলো সে। কোনো রকম সামলে নিলো নিজের ভারসাম্য। তার দু'পা টলতে শুরু করেছে। দরজাটা খোলাই আছে। দরজার লকটা ভাঙা। খুনি স্বেচ্ছায় এটা করেছে। কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়ে জেসন সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস বুঝে গেলো; না, কার্লোস জানে না। এটা তার অতীতেরই একটি অংশ। যে ঘরে কেইন জন্ম নিয়েছে সেই ঘরের অংশ। দরজার সামনে এসে অস্ত্রটা দু'পায়ের ফাঁকে আঁটকে এক হাতে দরজার নবটা ধরে দরজাটা একটু ফাঁক করেই ফ্লোরিটার দুটো ঘরের ভেতর ছুঁড়ে মারলো বর্ন। দরজার পেছনের স্টিলের প্লেটে স্টেনগানের গুলিগুলো আঘাত হানলে পুরো ঘরটা জুড়ে, বলতে গেলে পুরো বাড়িটা জুড়েই গুলির শব্দ ভরে উঠলো।

গুলি করা থেমে গেলো। চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসে গেছে। এখনই। অস্ত্রটার টুগারে আঙুল রেখে কাঁধ দিয়ে সজোরে দরজায় আঘাত ক'রে ভেতরে ঢুকেই মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো জেসন। সেই অবস্থায়ই গুলি চালানো সামনের দিকে, অর্ধ চক্রাকারভাবে। গুলির উৎস যেখানটায় সেখানে অস্ত্রটা তাক করতেই তার দিকেও পাল্টা গুলি ছুটে এলো। অঙ্ককার ঘরে শোনা গেলো একটা ভয়াবহ আর্তচিৎকার। জেসন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো জানালাগুলো পর্দায় ঢেকে দেয়া হয়েছে। তাহলে এই ঘরে এতো আলো আসলো কোথেকে...উজ্জ্বল আলো। ফ্লোরিটার সূত্র আলোকেও সেটা ছাপিয়ে গেছে?

পর্দাটা! সিলিং থেকে একটা বিশাল রূপালি পর্দা টাঙানো আছে। বরফ-শীতল আগুন জ্বলছে সেখানে। উঠে দাঁড়িয়ে টুগারটা আবার চাপার জন্যে প্রস্তুত হলো সে—চূড়ান্ত একটা বিস্ফোরণ। শেষ গুলিটা ছোঁড়া হয়ে গেছে। ঘরের এক কোণে সাদা ওভারহল আর সিল্কের স্কার্ফ পরা এক লোকের মুখের দিকে অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারলো সে।

মুখটা! সে এই মুখটা চেনে! আগে এই মুখটা সে দেখেছে! কোথায়...কোথায়? মাসেই'তে? হ্যা...জুরিখে নয়? প্যারিসে? হ্যা এবং না! চেনা চেনা লাগলেও অচেনা লাগছে। কিন্তু সে তো লোকটাকে চেনে! কেবল নামটা খুঁজে পাচ্ছে না!

দ্রুত পিছু হটে একটা ভারি কপার ড্রাই-বারের পেছনে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে গুলিগুলো তার দিকে ছুটে এলো, দুটা...তিনটা। দ্বিতীয় বুলেটটা তার বাম হাতের বাহুর মাংস ভেদ ক'রে চলে গেলো। কোমরের বেল্ট থেকে আরেকটা অটোমেটিক নিয়ে নিলো সে, তার পিস্তলে এখনও তিনটি গুলি আছে। সেগুলোর একটাই খুঁজে

নেবে কার্লোসকে। প্যারিসে একটা ঋণ রয়ে গেছে, আর তার চুক্তিটাও তো সমাধা করতে হবে। এই খুনির মৃত্যু হলে তার ভালোবাসার মানুষটি অনেক বেশি নিরাপদ থাকবে। পকেট থেকে লাইটারটা বের ক'রে হকের সাথে খুলে থাকা কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিলো সে। কাপড়টা ডান দিকে ছুড়ে মেরেই বাম দিকে ঝাঁপ দিলো জেসন। আগুন লাগা কাপড়টা কার্লোসের দিকে ছুটে যেতেই বর্ন হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসলো। অস্ত্রটা টার্গেটের দিকে তাক ক'রে পর পর দুটো গুলি চালালো সে।

অবয়বটা একটু টলে গেলেও প'ড়ে গেলো না। বরং সে একটা সাদা প্যাঙ্কারের মতো সামনের দিকে দু'হাত প্রসারিত ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে করছেটা কি? তারপরই জেসন বুঝতে পারলো। খুনি বিশাল রূপালি পর্দাটির এক কোণ ধরে সিলিংয়ের সাথে আটকে থাকা লোহার ব্রাকেটটা টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। সেটা সিলিং থেকে খুলে সোজা জেসনের উপর এসে পড়তে লাগলে একটা ভয়াবহ চিৎকার দিলো সে। আচমকাই সেটা কার্লোসের চেয়েও বেশি ভীতিকর ব'লে মনে হলো তার কাছে। তার উপর পড়তে থাকা পর্দাটির দিকে গুলি চালালো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলো পর্দাটা। কিন্তু এও বুঝতে পারলো, শেষ গুলিটা খরচ ক'রে ফেলেছে সে। কেইন নামের কিংবদন্তিটাকে কার্লোস নিজের চোখে দেখে চিনে ফেলেছে। সে গুলিগুলোর হিসাব করেছে এখন।

খুনি তার দিকে ঝুঁকে এসে জেসনের মাথার দিকে অস্ত্রটা তাক করলো। “তোমার মৃত্যুদণ্ড, ডেল্টা। নির্দিষ্ট দিনেই হচ্ছে। যা তুমি করেছে তার জন্যে এই দণ্ড।”

বর্ন একটু পিছু হটে ডান দিকে উদ্ভ্রান্তের মতো সরে গেলো; অন্ততপক্ষে সে কোনো কিছু না ক'রে মরবে না! গুলির শব্দে প্রকম্পিত হলো পুরো ঘরটা। জেসনের মনে হচ্ছে তার ঘাড় দিয়ে যেনো কোনো গরম সুই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তার দু'পায়ে বিদ্ধ করেছে সেটা, তার কোমরটাও বিদ্ধ করেছে। গড়াও! গড়াও!

আচমকা গুলির শব্দটা থেমে গেলো। অনেক দূর থেকে কাঠ আর লোহার উপরে আঘাত করার শব্দ শুনতে পেলো সে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। লাইব্রেরির বাইরে একটা প্রচণ্ড জোরে শব্দ হলো অবশেষে। তারপরই লোকজনের চিৎকার আর চেষ্টামেচি। সেই সাথে বাইরে সাইরেনের আওয়াজ।

“এখানে! সে এখানে!” কার্লোস চিৎকার ক'রে বললো।

এটা তো একেবারেই অস্বাভাবিক! খুনি হ্রমুর ক'রে ঢোকা লোকজনকে তার দিকেই ইঙ্গিত করছে। তার দিকে! কারণটা একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

ওভারকোট পরা লম্বা এক লোক দরজাটা ধপাস ক'রে খুলে প্রবেশ করলো ভেতরে। তার সাথে আরেকজন। কিন্তু জেসন তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখে কুয়াশা নেমে এসেছে। দৃশ্য আর শব্দ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সে শূন্য ভাসছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। দূরে...বহু দূরে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এরপরই যে জিনিসটা সে দেখতে পেলো সেটা সে দেখতে চায় নি। প্রশস্ত কাঁধ আর সরু কোমরের লোকটা ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে মৃদু আলোর করিডোরটা দিয়ে চলে যাচ্ছে। কার্লোস। সে ফাঁদটা উল্টে দিয়েছে। হৈহল্লার মধ্যে শিকারীকেই ফাঁদে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে সে!

“কার্লোস...” বর্ন জানে তার কথাটা কেউ শুনতে পাবে না। তার রক্তাক্ত মুখ দিয়ে যা বের হলো সেটাকে ফিস্‌ফিসানি বলা চলে। জোর ক’রে সে আবারো বলার চেষ্টা করলো। “ঐ যে কার্লোস। ঐ যে...কার্লোস!”

তার কথায় কিছুই হলো না। বিশৃঙ্খল এক অবস্থা। ভয়াবহ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে কিছু আদেশ করা হচ্ছে। আস্তে আস্তে একটা অবয়ব তার দৃষ্টির গোচরে এলো। একজন লোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার কাছে আসছে, যে লোকটা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো প্যারিসের এক গোরস্থানে। আর কিছুই বাকি নেই! সে হামাগুড়ি দিয়ে জুলতে থাকা ফ্লোরার দুটোর কাছে এগোলো। একটা ফ্লোরার হাতে নিয়ে এমনভাবে ধরলো যেনো জিনিসটা একটা অস্ত্র। লাঠি হাতে এগিয়ে আসা খুনির দিকে তাক করলো সেটা।

“আসো! আসো! কাছে আসো, বানচোত! আমি তোমার চোখ ঝলসে দেবো! তুমি মনে করছো তুমি আমাকে খুন করবে, পারবে না! আমিই তোমাকে খুন করবো! আমি তোমার চোখ ঝলসে দেবো!”

“তুমি বুঝতে পারছো না,” পঙ্গু লোকটা কম্পিত কণ্ঠে বললো। “ডেল্টা, আমি ককলিন। আমি ভুল করেছিলাম।”

ফ্লোরারটা তার হাত আর চোখ ঝলসে দিচ্ছে!...উন্মাদনা। তার চার দিকে এখন বিস্ফোরণ, চোখ ঝলসে কানে তাল লাগার জোগার হলো। জঙ্গল! তাম কুয়ান! ভেঁজা আর উষ্ণ দুর্গন্ধ নাকে আসছে প্রতিটি বিস্ফোরণের সাথে, কিন্তু তারা পৌঁছে গিয়েছে সেখানে! ঘাঁটিটা তাদেরই! তার বাম দিকে একটা বিস্ফোরণ হলো, সে দেখতে পেলো সেটা! মাটি থেকে উপরে, দুটো গাছের মাঝখানে ঝুলছে, বাশের একটা খাঁচা। ভেতরের লোকটা নড়ছে। সে বেঁচে আছে! তার কাছে যাও। তাকে উদ্ধার করো!

তার ডান দিক থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে এলো। ঘোঁয়ার মধ্যে কাশছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে। রাইফেল হাতে এক লোক হাটু সমান ঝোঁপঝাঁড়ের দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এটা তো সে-ই। আলাতে সোনালী চুলটা দেখা গেলো। প্যারাসুট জাম্প দিয়ে তার একটা পা ভেঙে গেছে। বানচোত! এই জঘন্য লোকটা তাদের সাথেই ট্রেনিং নিয়েছে। তাদের সঙ্গেই মানচিত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তাদের সঙ্গেই তো উত্তর ভিয়েতনামে গিয়েছে...সব সময়ই তাদেরকে ফাঁদে ফেলতো! ওয়্যারলেস হাতের এক বিশ্বাসঘাতক, যে শত্রুদেরকে বলে দিতো জঙ্গলের ঠিক কোথায় তাদের অবস্থান। তাম কুয়ান!

এটা তো বর্ন। জেসন বর্ন। বিশ্বাসঘাতক, আবর্জনা! তাকে ধরো! তাকে যেতে দিও না। খুন করো তাকে! জেসন বর্নকে খুন করো! সে তোমার শত্রু! ফায়ার!

সে পড়ে গেলো না! যে মাথাটা ফেঁটে চৌচির হয়ে গেছে সেটা এখনও সেখানেই আছে। তার দিকে আসছে! হচ্ছেটা কি? পাগলামী। তাম কুয়ান...

“আমার সাথে আসো,” পঙ্গু লোকটা বললো, জঙ্গল থেকে বের হয়ে অভিজাত এই ঘরের অবশিষ্ট যা কিছু আছে সেখানে প্রবেশ করলো সে। সেই ঘরে। “আমরা তোমার শত্রু নই। আমাদের সঙ্গে আসো।”

“চলে যাও আমার সামনে থেকে!” বর্ন আবারো আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে এলে প’ড়ে থাকা পর্দাটা ঠিক তার পেছনে রইলো। এটাই তার আশ্রয়, তার মৃত্যুর চাদর, যে চাদরটা এক লোকের জন্মের সময় মেলে ধরা হয়েছিলো। তার কফিনের আচ্ছাদন। “তুমি আমার শত্রু! আমি তোমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মরবো। আমি আর কিছু পরোয়া করি না। এখন আর কিছুই যায় আসে না! তুমি কি বুঝতে পারছো না? আমি হলাম ডেল্টা! কেইন হলো চার্লির জন্যে আর ডেল্টা হলো কেইনের জন্যে! তুমি আর আমার কাছ থেকে কি চাও? আমি ছিলাম, আমি নেই! আমি আছি, আমি নেই! বানচোত! বানচোতের দল। আয়! কাছে আয়!”

আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেলো, গম্ভীর একটা কণ্ঠ, শান্ত আর নির্লিপ্ত। “মেয়েটাকে নিয়ে আসো।”

দূর থেকে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজটা থেমে গেলো। অন্ধকার নেমে এলে সেই অন্ধকারের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেলো জেসনকে। সে তলিয়ে যাচ্ছে। এক অন্ধকার আর হিংস্র গহবরে সে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ওজনহীন এক জগতে প্রবেশ করছে সে... স্মৃতি। রাতের আকাশে একটা বিস্ফোরণ হলো এবার, কালো পানি থেকে একটা অগ্নিকুণ্ডলী উঠে আসছে। এরপরই মেঘের ভেতর থেকে কিছু কথাবার্তা ভেসে এলো তার কানে।

“জেসন, আমার ভালোবাসা। আমার একমাত্র ভালোবাসা। আমার হাতটা ধরো। শক্ত ক’রে ধরো, জেসন। শক্ত ক’রে ধরো, ডার্লিং।”

অন্ধকারের সাথে এলো নির্মল এক প্রশান্তি।

Scan & Edit by Mahmud Rakib

উপসংহার

বৃগেডিয়ার জেনারেল ক্রফোর্ড সোফার পাশে ফাইল ফোল্ডারটা রেখে দিলো। “এটা আর আমার দরকার নেই,” কথাটা সে সামনের চেয়ারে বসা সেন মেরি জ্যাকের উদ্দেশ্যে বললো। “আমি এটা বার বার দেখেছি। চেষ্টা করেছি কোন্টা মিস্ করেছি সেটা খুঁজে বের করতে।”

“যা কেউ করবে না তা আপনি করছেন,” হোটেলের সুটে অন্য যে লোকটা ছিলো সে বললো। সে হলো মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার মরিস পানোভ। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। সকালের প্রথম আলোটা তার মুখে এসে পড়েছে। “আমি এসবের সঙ্গেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো।”

“প্রায় দু’সপ্তাহ হয়ে গেলো,” অধৈর্যের সাথে মেরি বললো। “আমি বিস্তারিত জানতে চাই। আমার মনে হয় আমি এটা চাইতেই পারি। এটা জানার অধিকার আমার আছে।”

“তা আপনার আছে। এটা হলো একটা মানসিক ভারসাম্যহীনতা, যাকে বলা যেতে পারে একধরনের ক্লিয়ারেন্স।”

“মানসিক ভারসাম্যহীনতা,” পানোভ এক মত হয়ে বললো।

“সুরক্ষা?” মেরি ভুরু তুলে বললো।

“সেটাতে আমরা আসছি,” পানোভের দিকে তাকিয়ে বললো জেনারেল। “সবার দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস আমরা সবাই এটা মেনে নেবো।”

“প্লিজ! জেসন—কে সে?”

“তার নাম ডেভিড ওয়েব। সে ফরেন সার্ভিসের একজন অফিসার ছিলো। দূরপ্রাচ্যের উপর পারদর্শী একজন। পাঁচ বছর আগে সরকারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের আগ পর্যন্ত সে তা-ই ছিলো।”

“বিচ্ছেদ?”

“আপোষ্যে পদত্যাগ করা আর কি। মেডুসাতে তার কর্মকাণ্ড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অনুমোদন করে নি। ‘ডেন্টা’ খুবই কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলো, আর অনেকেই জানতো সে হলো ওয়েব। এ ধরনের লোককে কোনো ডিপ্লোমেটিক কনফারেন্স টেবিলে মানায় না।”

“তারা বলে সে সবখানেই ছিলো? মেডুসায়?”

“হ্যাঁ। আমি ওখানে ছিলাম। তারা যা বলে সে তার সবটাই।”

“এটা তো বিশ্বাস করা কঠিন,” মেরি বললো।

“সে নিজের খুবই ব্যক্তিগত কিছু হারিয়েছিলো, আর সেটা সে মেনে নিতে পারে নি। ধ্বংসলীলায় মেতে উঠলো সে।”

“কি হারিয়েছিলো সে?”

“তার পরিবার। তার স্ত্রী ছিলো এক থাই মেয়ে। তাদের দুটো সন্তানও ছিলো। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। তার পোস্টিং ছিলো নম পেন-এ। মেকং নদীর কাছেই। এক রবিবার বিকেলে তার বউ-বাচ্চারা নদীর তীরে একটা ডকের উপর যখন ছিলো তখন একটা বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলা হয় তাদের আশেপাশে। ডেভিড ওখানে পৌছার আগেই ডকটা গুড়িয়ে যায় বোমার আঘাতে। তার বউ-বাচ্চারা তখন নদীর জলে ভাসছে। তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।”

“ওহ্ ঈশ্বর,” মেরি আফসোস ক’রে বললো। “প্লেনটা কাদের ছিলো?”

“এটা কখনও চিহ্নিত করা যায় নি। হ্যানয় এটা অস্বীকার করেছে। সায়গন বলেছে এটা তাদের ছিলো না। মনে রাখবেন, কম্বোডিয়া ছিলো নিরপেক্ষ। কেউ দায়দায়িত্ব নিতে চায় নি। ওয়েব স্কিণ্ড হয়ে উঠলো। সায়গনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে, মেডুসায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ডেল্টা বনে গেলো।”

“তখনই কি সে দাঁজুর সাথে পরিচিত হয়েছিলো?”

“হ্যা, ঠিক তারপরই। ডেল্টা তখন কুখ্যাত একজন। উত্তর ভিয়েতনামি ইন্টেলিজেন্স তার মাথার জন্যে চড়া দাম ঘোষণা করেছিলো। আর আমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে আশা করতো যে, ভিয়েতনামিরা এতে সফল হবে। এরপরই হ্যানয় জানতে পারলো ওয়েবের ছোটো ভাই সায়গনের একজন আর্মি অফিসার, সে ডেল্টার উপর স্টাডি করছে—তারা জানতো দু’ভায়ের মধ্যে বেশ ভালো সখ্যতা ছিলো—তারা ঠিক করলো একটা ফাঁদ পাতা হবে। তাদের তো হারাবার কিছু ছিলো না। লেফটেন্যান্ট গর্ডন ওয়েবকে তারা অপহরণ ক’রে উত্তর ভিয়েতনামে নিয়ে যায়, একজন ভিয়েত কং ইনফর্মারকে এই খবর দিয়ে পাঠায় যে, তাকে তাম কুয়ান সেণ্টরে বন্দী ক’রে রাখা হয়েছে। ডেল্টা সেই ইনফর্মারকে নিয়ে—যে কিনা একজন ডাবল এজেন্ট—ঐ এলাকাটা ভালো ক’রে চেনে এরকম কয়েকজন মেডুসানকে এক ক’রে একটা দল গঠন করলো। এমন এক রাতে বিমান থেকে সেই এলাকায় নামলো যখন কেউ ওখানে নামার দুঃসাহস করবে না। দাঁজু সেই ইউনিটেই ছিলো। সেই দলে আরেকজন ছিলো যাকে ওয়েব চিনতো না। এক শ্বেতাঙ্গ, যাকে হ্যানয় নিয়ে এসেছিলো। সে একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ছিলো। অস্কায়েও সে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি খুলে আবার ঠিকমতো লাগিয়ে নিতে পারতো। ঠিক এই কাজটাই সে করেছিলো। ইউনিটের অবস্থান শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেয় সে। ওয়েব ফাঁদটা এড়িয়ে তার ভাইকে খুঁজে পায়। সে ঐ ডাবল এজেন্ট আর শ্বেতাঙ্গকেও খুঁজে পায়, ঘটনাস্থলেই ডেল্টা তাদেরকে হত্যা করে।”

“আর সেই লোকটা?” মেরির চোখ ক্রফোর্ডের দিকে ঘুরলো।

“জেন্সন বর্ন। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসা এক মেডুসান। একজন অস্ত্রবাজ মাদক ব্যবসায়ী। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে সে কাজ করতো। খুবই হিংস্র একজন, যার ছিলো অপরাধের রেকর্ড। মেডুসার স্বার্থে তার মৃত্যু সংক্রান্ত খবরাখবর ধামাচাপা দেয়া হয়েছিলো। সে একটি বিশেষ ইউনিটের একজন এম.আই.এ হয়ে উঠলো। কয়েক বছর পরে যখন ট্রেডস্টোন গঠন করা হয় তখন ওয়েবকে ডেকে পাঠানো হলো। ওয়েব নিজেই বর্ন নামটি গ্রহণ করেছিলো। এটার বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলো। সে এমন এক লোকের নাম গ্রহণ করেছিলো যে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যাকে সে নিজে তাম কুয়ান-এর জঙ্গলে হত্যা করেছে।”

“তাকে যখন ট্রেডস্টোনের জন্যে ডাকা হলো তখন সে কোথায় ছিলো?” মেরি জানতে চাইলো। “সে করছিলো কি?”

“নিউ হ্যাম্পশায়ারের এক ছোট্ট কলেজে শিক্ষকতা করছিলো। বিচ্ছিন্ন এক জীবনযাপন করছিলো তখনও। অনেকের মতে ধ্বংসাত্মক জীবনযাপন করছিলো। তার নিজের জীবনটা ধ্বংস করছিলো আর কি।” ক্রফোর্ড ফোন্ডারটা তুলে নিলো। “এইসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মিস্ সেন জ্যাক। বাকিটা ডাক্তার পানোভ বুঝিয়ে দেবেন। তিনি বুঝিয়ে দেবেন আমার এখানে উপস্থিত থাকার কোনো দরকার নেই। অবশ্য একটা তথ্য বাকি আছে, যেটা পুরোপুরি বোঝা দরকার। এটা হোয়াইট হাউজের সরাসরি অর্ডার।”

“সুরক্ষা,” কোনো প্রশ্ন নয়, মেরি এমনি এমনিই বললো।

“হ্যাঁ। সে যেখানেই যাক, যে পরিচয়ই সে পরিচিত হোক, তাকে সারাক্ষণ নজরে রাখা হবে। যতো দিন দরকার পড়বে ততো দিনই এটা করা হবে।”

“প্রিজ, এটা একটু বুঝিয়ে বলুন।”

“সে-ই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে কার্লোসকে নিজের চোখে দেখেছে। মানে কার্লোস হিসেবে। সে তার পরিচয়টা জানে। কিন্তু সেটা তার মস্তিষ্কে তার বিস্মৃত অতীতের একটি অংশ হিসেবে বন্দী হয়ে আছে। তার কথায় আমরা জানতে পেরেছি, কার্লোস হলো এমন একজন লোক যাকে অনেকেই চেনে—কোনো সরকারের ভেতরের একজন লোক, যার মুখটা খুবই পরিচিত, অথবা কোনো মিডিয়া কিংবা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিংয়ের একজন কর্তা সে। এটা বিদ্যমান তত্ত্বের সাথে খাপ খায়। আসল কথা হলো, এই পরিচয়টা একদিন ওয়েবের কাছে উন্মোচিত হবে। আমরা বুঝতে পারছি ডাক্তার পানোভের সঙ্গে আপনার কয়েকবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমি যা বললাম সেটা তিনি আপনাকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।”

মেরি মনোবিজ্ঞানীর দিকে ঘুরলো। “এটা কি সত্যি, মো?”

“এটা সম্ভব,” পানোভ বললো।

ক্রফোর্ড চলে গেলে মেরি তাদের দু'জনের জন্যে কফি বানিয়ে আনলো। ক্রফোর্ড যেখানে বসেছিলো সোফার ঠিক সেই জায়গায় বসলো পানোভ।

“ক্রফোর্ডের জায়গাটা এখনও গরম আছে। ক্রফোর্ডের বিখ্যাত পাছাটা ঘামছিলো তাহলে। এরকমটি হবার কারণও আছে।”

“কি ঘটবে এখন?” মেরি জানতে চাইলো।

“কিছুই না। যতোক্ষণ না আমি তাদেরকে বলবো কিছু করতে ততোক্ষণ তারা কিছুই করতে পারবে না। আর সেটা কয়েক মাসের ব্যাপার হবে না। আমার ধারণা সেটা হবে কয়েক বছরের। সে পুরোপুরি সেরে ওঠার আগপর্যন্ত তো নয়ই।”

“কিসের থেকে?”

“প্রশ্নগুলো থেকে। এবং ছবিগুলো—অনেক ছবি। তার দেয়া বিক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে তারা একটা ফটোগ্রাফিক এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না। একদিন তাকে এটা শুরু করতেই হবে। সে এটা করতে চাইবে। আমরা সবাই সেটা চাই। কার্লোসকে ধরা পড়তেই হবে। কিছু না ক’রে তাদেরকে ব্র্যাকমেইল করাটা আমার উদ্দেশ্য নয়। অনেক লোককে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। সে তো আরো বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। তবে এখন তার কথাই আগে আসবে। আগে আসবে তার মাথাটা।”

“এটাই আমি বোঝাতে চাইছি। তার কি হবে?”

পানোভ তার কফিটা নামিয়ে রাখলো। “আমি এখনও নিশ্চিত নই। আমি মানুষের মনকে শ্রদ্ধা করি। ভুল মানুষের হাতে পড়েছে অনেকেই। আমি সবগুলো কনফারেন্সে ছিলাম। আমি অন্য সব ডাক্তার আর নিউরো সার্জনের সঙ্গে কথা বলেছি। এটা সত্যি যে, আমরা ছুরি হাতে স্টর্ম সেন্টারে যেতে পারি, তার উদ্বিগ্নতা কমিয়ে তাকে এক ধরনের শান্তি এনে দিতে পারি। এমনকি সে যা তাতেও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি। তবে এই শান্তিটা সে চাচ্ছে না...এতে অনেক বিপদ রয়েছে। আমরা হয়তো অনেক কিছু উপড়ে ফেলবো, সে যা খুঁজে পেয়েছে তা কেড়ে নেবো—যত্নের সাথেই। সময়ের সাথে।”

“সময়?”

“হ্যা, আমি এটা বিশ্বাস করি। কারণ প্যাটার্নটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাড়ছে সেটা। চিনতে পারা এবং উদ্বেজনার সূত্র এক যন্ত্রণা। এটা কি আপনাকে কিছু বোঝাচ্ছে?”

মেরি পানোভের গভীর কালো, ক্লান্ত দু’চোখের দিকে তাকালো। সেখানে এক ধরনের আলো দেখতে পেলো সে। “আমাদের সবাইকে বোঝাচ্ছে,” মেরি বললো।

“তা ঠিক। এক দিক থেকে সে আমাদের সবারই একটি কর্মক্ষম ক্ষুদ্র সংস্করণ। মানে, আমরা সবাই খোঁজার চেষ্টা করছি আমরা আসলে কে, তাই না?”

মেরি ওয়াটারফ্রন্টের কটেজের জানালার কাছে গেলো, যার পেছনে আছে একটা বড়সড় টিলা। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা। গ্রহরীর দল টহল দিচ্ছে। প্রতি

পঞ্চাশ ফিট অন্তর অন্তর একজন ক'রে সশস্ত্র প্রহরী। সে 'তাকে কয়েকশ' গজ দূরে সমুদ্র সৈকতে দেখতে পাচ্ছে। পানির উপর দাঁড়িয়ে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউ দেখছে। সপ্তাহগুলো তার জন্যে ভালোই কেটেছে। তার শরীরে ক্ষতচিহ্ন থাকলেও সে উঠছে সে। আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে ক্রমশ। তবে দুঃস্থপ্লুটা এখনও আছে। দিনের বেলায় কখনও কখনও তার মধ্যে যন্ত্রণাগুলো ফিরে আসে। কিন্তু আগের মতো ভীতিকরভাবে নয়। সে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে। আবারো হাসতে শুরু করেছে সে। পানোভ ঠিকই বলেছে। তার স্মৃতি আস্তে আস্তে ফিরে আসবে। ছবিগুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আগে যেখানে কোনো অর্থ ছিলো না সেখানে সব কিছু আরো বেশি অর্থবহ হয়ে উঠবে।

কিছু একটা হলো! ওহ, ঈশ্বর, সেটা কি? সে নিজেকে পানিতে নিষ্কেপ ক'রে চিৎকার করছে। তারপর আচম্কা ঢেউয়ের উপর ভেসে উঠে আসছে সৈকতে। দূরে একজন সশস্ত্র রক্ষী দৃশ্যটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাতের গুয়্যারলেন্সটা দিয়ে কাউকে কোনো খবর পাঠাতে লাগলো।

ভেঁজা বালুর উপর দিয়ে বাড়িটার দিকে ছুটে আসছে সে। সেটা কি?

মেরি জ'মে গেলো। তারা জানতো এ রকম একটি মুহূর্ত হয়তো আসতে পারে। তার জন্যে প্রস্তুতই ছিলো।

দরজা দিয়ে হ্রমুর ক'রে ঢুকলো সে, তার বুক নিঃশ্বাসে ওঠানামা করছে। মেরি কখনও তার চোখ দুটো এতো পরিষ্কার দেখে নি। এতো আস্তে আস্তে কথা বললো যে, মেরি খুব একটা শুনতে পেলো না। তবে কথাটা কি, বুঝতে পারলো।

“আমার নাম ডেভিড...”

মেরি তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো।

“হ্যালো, ডেভিড,” বললো সে।

. . .

তার কোনো অতীত নেই। সম্ভবত ভবিষ্যৎও নেই। তার স্মৃতি ভাঙার একেবারেই শূন্য, সে কেবল জানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভূমধ্যসাগর থেকে একদল জেলে তাকে উদ্ধার করেছে। নিজের শরীরে সংযুক্ত থাকা অদ্ভুত একটি রুই উদ্ধার হলে সে নিজের পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড ক্ষমতাসালী আর হিংস্র একদল লোক তাকে হত্যার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে—ওদিকে সন্ত্রাসের যুবরাজ কার্লোসও তাকে হত্যা করার জন্যে পিছু নেয়—কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, জেসন বর্ন তার কিছুই জানে না। নিজের পরিচয়ের সন্ধান করতে গিয়ে একে একে বদলে যেতে থাকে সমস্ত হিসেব নিকেশ। শেষপর্যন্ত কি জেসন বর্ন কার্লোসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে, নিজের সত্যিকারের পরিচয় জানতে পারবে—তার জবাব নিহিত আছে মহাকাব্যিক উপাখ্যান বর্ন আইডেন্টিটিতে।

Scan & Edit by Mahmud Rakib

‘লুডলামের এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু অন্যান্য থ্রার উপন্যাসের চেয়ে ভিন্ন আর স্বকীয়—পাঠক মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে’

—দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্

‘জেসন বর্ন রবার্ট লুডলামের অসাধারণ সৃষ্টি। থ্রার উপন্যাসকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি’

—ওয়াশিংটন পোস্ট

‘বর্ন সিরিজের মধ্যে অসাধারণ... পাঠক জেসন বর্নকে দীর্ঘদিন মনে রাখবে’

—সানডে টাইমস্

‘লুডলাম এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান নির্মাণ করেছেন আর সেই উপাখ্যানে কার্লোস দি জ্যাকেলও রয়েছে’

—মিরর

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872923-2



9 789848 729236